ইমাম মাহদী (আ.)- এর আত্মপ্রকাশ

(আসরে যুহুর)

আল্লামা আলী আল কুরানী

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান

ইমাম মাহদী (আ.)- **এর আত্মপ্রকাশ**(**আসরে যুহুর**)

লেখক : আল্লামা আলী আল কুরানী

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান

সম্পাদনা : এ.কে.এম আনোয়ারুল কবীর

প্রকাশক : ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ

প্রকাশকাল : সফর, ১৪২৯ হিজরী, ফাল্গুন, ১৪১৪ বাংলা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান, কম্পোজ, প্রুফ রিডিং ও সেটিং : মো. আশিকুর রহমান

মুদ্রণ : মাল্টি লিংক, ১৪৫/সি, হাজী খালেক মার্কেট, ফকিরাপুল, ঢাকা- ১০০০

অনুবাদকের ভূমিকা

ইমাম মাহদী (আ.)এবং তার আবির্ভাব প্রসঙ্গে অনেক বই- পুস্তক লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে । হাদীস গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক সূত্রসমূহে ইমাম মাহদীর যুগের ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রচুর হাদীস মহানবী (সা.) এবং তার পবিত্র আহলে বাইত থেকে বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু যেহেতু একদিকে এ সব হাদীস ও রেওয়ায়েত বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ সূত্রসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও হাদীস দুষ্প্রাপ্য এবং পাঠকের নাগালের বাইরে, অন্যদিকে এসব ঘটনার গভীর ও পূর্ণ বিশ্লেষণ এবং অতীত শতাব্দীসমূহের ঘটনাবলীকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর সাথে মিলানো হয়নি সেহেতু তা আমাদেরকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগের তাৎপর্যমণ্ডিত ইতিহাসের সাথে যেভাবে পরিচিতি করানো দরকার সেভাবে পরিচিত করাতে সক্ষম হয় নি ।

এ গ্রন্থের শ্রদ্ধেয় লেখক আল্লামা আলী কুরানী অন্ধ গোড়ামি ও একপেশে মন্তব্য পরিহার করে ব্যাপক ঐতিহাসিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা চালিয়ে অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের যুগের ঘটনাবলী সংক্রান্ত এক উজ্জ্বল পরিচিতিমূলক চিত্র এবং তার আবির্ভাবের বিষয়ে প্রসিদ্ধ শিয়া ও সুন্নী লেখক ও বিজ্ঞ আলেমগণের মতামত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করেছেন যা নিঃসে   হে মুসলমানদের আ   াকে সন্তুষ্ট করবে ।

এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং শিয়া- সুন্নী ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান অগণিত হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে চয়ন করা হয়েছে যা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগের পটভূমির চিত্রায়ন ও ব্যাখ্যা এবং এ ক্ষেত্রে সে   হপ্রবণ ব্যক্তিদের সে   হেরও স্বচ্ছ জবাব প্রদান করে । উল্লেখ্য যে, লেখক এ গ্রন্থে শিয়া হাদীস সূত্রসমূহের মধ্যে থেকে আল্লামা মাজলিসী সংকলিত বিহারুল আনওয়ার এবং সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহের মধ্য থেকে ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে সবচেয়ে বেশী হাদীস উদ্ধৃত (নাকল) করেছেন । এ ছাড়া এ গ্রন্থে শিয়া হাদীস সূত্রসমূহের মধ্য থেকে বিশারাতুল ইসলাম, সাইয়্যেদ ইবনে তাউস প্রণীত ওয়াল মালাহিম আল ফিতান, ইবনে মাইসাম আল বাহরানী প্রণীত আল মাহাজ্জাহ, শেখ তূসী প্রণীত আল গাইবাত ও ইলযামুন নাসিব, আন নুমানী প্রণীত কিতাবুল গাইবাত, শেখ মুফিদ

প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, সাইয়্যেদ রাযী সংকলিত হযরত আলী (আ.) এর ভাষণ, পত্র এবং সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বাণীর সম্ভার নাহাজুল বালাগাহ, ইবনে মাইসাম আল বাহরানী প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ (নাহজুল বালাগার ব্যাখ্যা), শেখ সাদূক প্রণীত কামালুদ্দীন, তাফসিরে আইয়াশী, আল্লামা তাবাতাঈ প্রণীত আল মিযান ফি তাফসীরুল কোরআন, আল্লামা কুলাইনী সংকলিত হাদীস গ্রন্থ আল কাফী, রওজাতুল কাফী, মিফতাহুল জান্নাত প্রভৃতি এবং সুন্নী হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে আল হাকিম আন নিশাবুরী সংকলিত মুসতাদরাকুস সাহীহাইন, সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আত তিরমিযী, ইবনে হাজার আল হাইসামী প্রণীত আস সাওয়ায়িক আল মুহরিকাহ, বায়ানুশ শাফেয়ী, আহমাদ ইবনে হাম্বল সংকলিত মুসনাদ-ই আহমাদ, হাফেয আবু নাঈম আল ইসফাহানী প্রণীত যিকরু আল ইসফাহান, ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ, ইবনে সাব্বাগ আল মালিকী প্রণীত কাশফুল গাম্মাহ, শেখ সুলাইমান আল কান্দুযী আল হানাফী প্রণীত ইয়ানাবীউল মাওয়াদ্দাহ, ইকদুদ দুরার, তাজুল জামেলিল উসূল, ইবনে খালদুন প্রণীত কিতাব আল মুকাদ্দামাহ প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন হাদীস, রেওয়ায়েত ও বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে । এ ছাড়া খ্রিষ্টান- ইহুদী সূত্রসমূহের মধ্য থেকে কিতাবুল মুকাদ্দাস বা বাইবেল থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি ও রেওয়ায়েত আনা হয়েছে ।

আল্লামা আলী আল কুরানী লেবাননের একজন শক্তিশালী লেখক, সুসাহিত্যিক এবং সংগ্রামী আলেম । তিনি লেবাননের জাবাল আমেলের অধিবাসী ।

তিনি বেশ কয়েক বছর যাবৎ ইরানের কোম নগরীতে বসবাস করেছেন । তিনি ইতিমধ্যে বৈচিত্রপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন । যেমন আল মুমাহহিদুনা লিল মাহদী (ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীরা), তারীকাতু হিযবিল্লাহ (আল্লাহর দলের পথ), গায়েবের ফেরেশতারা আসছে এবং বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ আসরে যুহুর (ইমাম মাহদীর আ প্রকাশের যুগ) উল্লেখযোগ্য ।

বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থ ঐ সব গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত যেখানে ইমাম মাহদী (আ.) এর শুভ আবির্ভাবের যুগের ঘটনাবলীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এ গ্রন্থের বৈচিত্রপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও নব নব

আলোচ্য বিষয় সকল আরব দেশে শিয়া সুন্নী সব মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি, বিশেষ করে ফিলিস্তিন, সিরিয়া লেবানন, ইরাক, ইরান আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিসহ মুসলিম বিশ্বের জলমান ঘটনাবলী আমাকে বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে ।

শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে আপামর মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত্য পোষণ করে যে, মহানবী (সা.) এর বংশধারার সর্বশেষ ইমাম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মদ আল মাহদী (আ.), যিনি শেষ যামানায় আবির্ভূত হয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী হুকুমত এবং ন্যায়বিচার কায়েম করবেন এবং পৃথিবীর বুক থেকে অন্যায়- অত্যাচার ও শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন । তার আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং এতে কোন সন্দেহ নেই । তার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না । প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য শিয়া- সুন্নী হাদীস গ্রন্থসমূহে মহানবী (সা.) থেকে এতদপ্রসঙ্গে বর্নিত হয়েছে :

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منّا يملأها عدلا كما ملئت جورا

“দুনিয়া ধ্বংস হতে মাত্র একদিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে মহান আল্লাহ (ঐ একদিনের মধ্যেই) আমাদের (আহলে বাইতের) মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রেরণ করবেন যে এ পৃথিবী যেভাবে অন্যায়- অবিচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে তা পূর্ণ করে দেবে ।” (মুসনাদ- ই আহমদ ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ.৯৯, বৈরুত, দারুল ফিকর কর্তৃক প্রকাশিত)

মহানবী (সা.) হুযাইফা বিন ইয়ামানকে বলেন :

يا حذيفة لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلک اليوم حتي يملک رجل من اهل بيتي، تجري الملاحم علي يديه و يظهر الاسلام لا يخلف وعده و هو سريع الحساب

“হে হুযাইফা! এ পৃথিবী ধ্বংস হতে মাত্র একদিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে মহান আল্লাহ ঐ দিনকে এত বেশী দীর্ঘ করবেন যাতে আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি (বিশ্বের) শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয় যার হাতে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং

ইসলাম ধর্ম বিজয়ী হবে । মহান আল্লাহ স্বীয় ওয়াদা ভঙ্গ করেন না এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী ।" (ইকদুদ দুরার, আবু নাঈম ইস্ফাহানী প্রণীত সিফাতুল মাহদী)

মহানবী (সা.) বলেছেন :

لا تذهب الدّنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی

"আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত এক ব্যক্তি- যার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ, সে যে পর্যন্ত সমগ্র আরবের অধিপতি না হবে, সে পর্যন্ত এ দুনিয়া ধ্বংস হবে না ।" (সুনান আত তিরমিযী, বৈরুত, দার ইহয়াইত তুরাস আল আরাবী, কিতাবুল ফিতান, ৫২তম বা মাহদী সংক্রান্ত অধ্যায়, পৃ ৬১১, হাদীস নং ২২৩০)

উপরিউক্ত এ সব সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, শেষ যামানায় কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী (আ.)এর আগমন একটি অকাট্য বিষয় যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে ।

আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদগণ ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত অগণিত হাদীস ও রেওয়ায়েত অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যা তাদের বড় বড় প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ।

গবেষক পণ্ডিত ও আলেমদের মতে, আহলে সুন্নাতের মুহাদ্দিসগণ মহানবী (সা.) এর তেত্রিশ জন সাহাবী থেকে ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত হাদীস নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন; একশ' ছয় জন প্রসিদ্ধ সুন্নী আলেম গায়েব ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন । বত্রিশ জন প্রসিদ্ধ সুন্নী আলেম ইমাম মাহদী (আ.) প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন ।

ইমাম মাহদী (আ.), তার গুণাবলী এবং তার আবির্ভাবের নিদর্শন সংক্রান্ত , মহানবী (সা.) এর হাদীসসমূহ আহলে সুন্নাতের প্রাচীন প্রামান্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে আহলে সুন্নাতের বড় বড় হাদীসশাস্ত্রবিদ ও হাফেয ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে মুতাওয়াতির অর্থাৎ অকাট্যসূত্রে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত বলে মত প্রকাশ করেছেন ।

আল্লামা শাওকানী, হাফেয আবু আবদিল্লাহ গাঞ্জী শাফেয়ী, হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফেয ইবনে হাজার আল আসকালানী আশ শাফেয়ী, শেখ মানসূর আলী নাসিফ প্রমুখের মতো বিখ্যাত আলেম ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহে মুতাওয়াতির বলে নিজ নিজ গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আল্লামা শাওকানী التوضيح فی تواتر ما جاء فی المنتظر অর্থাৎ প্রতীক্ষিত (ইমাম মাহদী) সংক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেছেন : "ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত যে সব হাদীস ও রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছি সেগুলোর সবই 'তাওয়াতুর' অর্থাৎ বহুল ও অকাট্যসূত্রে বর্ণিত হওয়ার পর্যায়ে উত্তীর্ণ। আর এ বিষয়টি হাদীসশাস্ত্র সংক্রান্ত যাদের সামান্য জ্ঞান আছে তাদের কাছে গোপন নয়। সুতরাং আমি যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি সেগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির...যা কিছু এখানে আলোচনা করা হল তা ঐ সব ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমান ও ইনসাফ বিদ্যমান।

তাই ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবে বিশ্বাসী নন বা ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয় অথবা শাব্দিকভাবে 'হেদায়েতপ্রাপ্ত' অর্থে 'মাহদী' শব্দের ব্যাখ্যা করে অথবা বলতে চায় যে, শেষ যামানায় 'মাহদী' নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি হবেন না; বরং প্রতি যুগের মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারক আলেমই হবেন মাহদী, এমনকি তিনি নিজেও হয়ত তা বুঝতে পারবেন না; তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কর্মকাণ্ড, অবাদন ও কর্মবহুল জীবন অধ্যয়ন করে বুঝতে পারবে যে, তিনি মাহদী ছিলেন- তাদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, তারা ঈমান, ইসলাম এবং আপামর মুসলিম উম্মাহর অন্যতম মৌলিক অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করেছে যা মুতাওয়াতির হাদীস ও রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। আর ধর্মের অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা ঈমান ও ইনসাফের পরিপন্থী। অতএব, ইমাম মাহদী সম্পর্কে গুটিকতক লোকের এ জাতীয় বিরল অভিমতের কোন তাত্ত্বিক মূল্য নেই।

ইমাম মাহদী (আ.) আগমন এবং তিনি যে সকল অত্যাচারী কাফির- মুশরিক ও বিকৃত ধর্মের অনুসারীকে পরাস্ত করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের সৌ র্যময় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে সকল ধর্ম ও মতবাদের ওপর বিজয়ী করবেন- এতদসংক্রান্ত বিশ্বাস মুসলিম উম্মাহ তথা সকল নিপীড়িত জনগোষ্ঠী ও জাতিকে অত্যাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবার সাহস ও অনুপ্রেরণা জোগায় । ইরানের সফল ইসলামী বিপ্লব এবং লেবাননে ইসরাইলের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহর সফল প্রতিরোধ সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় আসলে ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রতি বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত । কারণ, সবার জানা আছে যে, ইরান ও লেবাননের আপামর জনগণ বারো ইমামী শিয়া যারা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে । কেবল বারো ইমামী শিয়া মুসলমানরাই নয়; বরং সকল সুন্নী মুসলমানও শ্বাসরুদ্ধকর চলমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও নাস্তিক্য পরাশক্তিসমূহের উপর্যুপরি চাপ, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের কারণে উদ্ধারকর্তা ইমাম মাহদীর দ্রুত আগমন ও আবির্ভাবের প্রত্যাশী । এ বিশ্বাস সকল মাজহাব নির্বিশেষে গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির মূর্ত প্রতীক ।

শুধু মুসলমানরাই নয়, বিশ্বের সকল নিপীড়িত ও অধিকারহত জাতি অত্যাচারী শাসকবর্গের অন্যায়- অবিচারে অতীষ্ট হয়ে মহান মুক্তিদাতার আগমনের অপেক্ষা করছে যিনি তাদেরকে অন্যায়- অবিচারের তিমিরাধার থেকে মহামুক্তির আলোর পানে পথ দেখাবেন । তাই শেষ যামানার ইমাম মাহদী (আ.) তথা প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার আগমনে বিশ্বাস ও মহামুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিঃসে হে গোটা মানব জাতিকে এক মহান আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করবে । দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আজ আবার নতুন করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিকামী আ োলন জোরদার হচ্ছে এবং একের পর এক জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনসমূহে জনসমর্থন নিয়ে তারাই বিজয়ী হচ্ছে । ভেনেজুয়েলা, পেরু নিকারাগুয়া, ইকুয়েডর হচ্ছে এর জাজ্বল্য উদাহরণ । অন্যদিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদ আহমাদিনেযাদ ভেনেজুয়েলার কট্টর মার্কিনবিরোধী প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজকে ‘বিপ্লবী ভাই ও সঙ্গী’ বলে

আখ্যায়িত করেছেন । তাই অন্যায়, শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মজলুম মুসলিম উম্মাহর সাথে বিশ্বের আপামর মজলুম জাতির বৃহত্তর পরিসরে ঐক্য ও সংহতি যে গড়ে উঠবে তা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে । আর এ সার্বিক ঐক্য ও সংহতি নিঃসন্দেহে ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের যুগে চূড়ান্ত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে যা তার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ঐশী বিপ্লব এবং সত্য ও ন্যায়ের সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করবে ।

লেখক তার এ গ্রন্থে সংকীর্ণ মাজহাবী বিতর্ক পরিহার করে শিয়া সুন্নী হাদীস গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান অভিন্ন রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহের আলোকে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের যুগে বিশ্বে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যে সব ঘটনা ঘটবে সেগুলোর বিবরণ দিয়েছেন । লেখক শিয়া মাজহাবের অনুসারী । এতদসত্ত্বেও তিনি তার গ্রন্থের কোথাও আহলে সুন্নাতের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেন নি । এখানে আরেকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই । তা হল বসরাবাসীর ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস নির্ভরযোগ্য শিয়া সুন্নী হাদীস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান । এ সব হাদীস দু'ধরণের । যথা- ১. ঐ সব হাদীস যেগুলোতে বসরাবাসীকে তীব্র ভর্ৎসনা ও নিন্দা করা হয়েছে এবং ২. এ সব হাদীস যেগুলোয় বসরাবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে । এ গ্রন্থেরই 'ইরাক ও আবির্ভাবের যুগে উক্ত দেশের ভূমিকা' নামক অধ্যায়ে বসরা ও বসরাবাসী সংক্রান্ত হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে । এ দু'ধরনের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বসরাবাসীর মধ্যে দু'ধরনের লোক থাকবে ; ১. হেদায়েতপ্রাপ্ত, সৎকর্মশীল ও মুখলিসগণ (একনিষ্ঠ)- হাদীসসমূহে যাদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং ২. বিচ্যুত ও পাপীরা- হাদীসসমূহে যাদের তীব্র ভর্ৎসনা করা হয়েছে । যেহেতু বসরার অধিবাসী শিয়া মুসলমান তাই ইদানিং কোন কোন সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক লেখক বসরাবাসীর মধ্যে যারা বিচ্যুত ও বিপথগামী তাদেরকে ভর্ৎসনা করে যে সব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে শুধু সেসব রেওয়ায়েতের আলোকে ঢালাওভাবে সকল বসরাবাসীকে তথা শিয়া মুসলমানদেরকে বিচ্যুত বলার মতো একপেশে বা খণ্ডিত প্রয়াস চালিয়েছেন । অথচ তারা বসরাবাসীর মধ্যে যারা মুখলিস, সৎকর্মশীল ও হেদায়েতপ্রাপ্ত তাদেরকে ভূয়সী প্রশংসা করে যেসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা

করেছেন অথবা সেসব রেওয়ায়েত আদৌ তাদের কাছে পৌছেনি অথবা তারা সেসব অধ্যয়ন করেন নি । তাই তাদের প্রতি আমার অনুরোধ তারা যেন সকল হাদীস গ্রন্থের ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করে পাঠ করে নেন । তাহলেই এ সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা বা চুড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব হবে ।

আশা করা যায় যে, এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হযরত বাকীয়াতুল্লাহ আল কায়েম আল মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব ও আগমনের জন্য যারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বব্যাপী মুক্তিকামী মুসলমান ও সকল স্বাধীনতাকামী মানুষকে চূড়ান্ত ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জীবিত করবে ।

মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান

প্রথম অধ্যায়

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব কালের সার্বিক চিত্র

যদিও পবিত্র কোরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর চিরন্তন মুজিযা এবং সব যুগে সকল প্রজন্মের জন্য তা নতুন, এতদসত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের চির জীবন্ত মুজিযাসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মহানবী (সা.) কর্তৃক বর্ণিত ঐ সব হাদীস ও রেওয়ায়েত (বর্ণনা) যা ইসলাম ধর্মের (প্রতিশ্রুত) পুনর্জাগরণ পর্যন্ত মানব জাতির ভবিষ্যৎ জীবন এবং ইসলাম ধর্মের ভবিষ্যৎ গতিধারা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে । আর এটি হবে ঐ সময় যখন মহান আল্লাহ্ তাঁর ধর্মকে সকল কাফির ও মুশরিকের আশা- আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে পৃথিবীর সকল ধর্ম ও মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করবেন ।

ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের এ যুগই হচ্ছে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগ যা এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় । আর সাহাবী, তাবেয়ী ও সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের রচয়িতাগণের মাধ্যমে মহানবী (সা.) হতে বর্ণিত সুসংবাদ প্রদানকারী শত শত রেওয়ায়েতেও এ দুই যুগ ও মহাঘটনা (ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে । আসলে এ দু'মহাঘটনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যদিও এ সব রেওয়ায়েতে (বর্ণনার ক্ষেত্রে) পদ্ধতিগত পার্থক্য বিদ্যমান । যদি আহলে বাইতের ইমামদের রেওয়ায়েতসমূহ এ সব রেওয়ায়েতের সাথে যোগ করা হয়, তাহলে এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের সংখ্যা ১০০০- এরও অধিক হবে । যদিও ইমামগণ তাঁদের হাদীসগুলো সবসময় মহানবী (সা.)- এর সাথে সম্পর্কিত করেন নি, তবে তাঁরা অসংখ্যবার তাগীদ দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা যা বর্ণনা করেছেন তা তাদের পবিত্র পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁদের শ্রদ্ধেয় প্রপিতামহ মহানবী (সা.) থেকেই তাঁরা লাভ করেছেন ।

এ সব রেওয়ায়েতে আবির্ভাবের যুগে পৃথিবী, বিশেষ করে যে অঞ্চলে ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন সেই অঞ্চল, যেমন ইয়েমেন, হিজায, ইরান, ইরাক, শাম (সিরিয়া, লেবানন ও জর্দান), ফিলিস্তিন, মিশর ও মাগরিবের (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও লিবিয়া) যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা ছোট- বড় অনেক ঘটনা এবং বহু ব্যক্তি ও স্থানের নামকে শামিল করে ।

আমি অগণিত রেওয়ায়েত ও হাদীসের মধ্য থেকে এ সব রেওয়ায়েত ও হাদীস বাছাই করে যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট করে এবং ধারাবাহিকতা সহকারে সাধারণ মুসলিম পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি ।

এ সব রেওয়ায়েত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে এ অধ্যায়ে এগুলোর একটি সার সংক্ষেপ উল্লেখ করব যাতে করে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালের একটি সাধারণ চিত্র বা ধারণা আমরা পেতে পারি । বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরপরই পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বিপ্লব ও আ ালন শুরু হয়ে যাবে ।

এ সব রেওয়ায়েত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রোমানদের (পাশ্চাত্য) সাথে তুর্কী এবং তাদের সমর্থকদের (রুশ) বাহ্যত একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হবে- যা বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হবে ।

কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সমর্থক দু'টি সরকার ও প্রশাসন ইরান ও ইয়েমেনে প্রতিষ্ঠিত হবে । মাহদী (আ.)- এর ইরানী সঙ্গী- সাথীরা তাঁর আবির্ভাবের বেশ কিছুকাল আগে নিজেদের একটি সরকার গঠন করে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে । অবশেষে তারা ঐ যুদ্ধে বিজয়ী হবে ।

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কিছুকাল আগে ইরানীদের মধ্যে দু'ব্যক্তি (একজন খোরাসানী সাইয়্যেদ যিনি হবেন রাজনৈতিক নেতা এবং অপরজন শুআইব ইবনে সালিহ্ যিনি হবেন সামরিক নেতা) আবির্ভূত হবেন এবং এ দু'ব্যক্তির নেতৃত্বে ইরানী জাতি তাঁর আবির্ভাবের আ ালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।

কিন্তু ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কয়েক মাস আগে তাঁর ইয়েমেনী সঙ্গী- সাথিগণের বিপ্লব ও অভ্যুত্থান বিজয় লাভ করবে এবং তারা বাহ্যত হিজাযে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা পূরণ করার জন্য তাঁকে সাহায্য করবে ।

হিজাযের এ রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হচ্ছে হিজাযের কোন এক বংশের এক নির্বোধ ব্যক্তি যার নাম হলো আবদুল্লাহ্, সে দেশের সর্বশেষ বাদশাহ্ হিসেবে নিহত হবে এবং

তার স্থলাভিষিক্ত কে হবে- এ বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন এক মতবিরোধের সৃষ্টি হবে যা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব পর্যন্ত চলতে থাকবে ।

“যখন আবদুল্লাহর মৃত্যু হবে, তখন জনগণ কোন্ ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে- এ ব্যাপারে কোন ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবে না । আর এ অবস্থা ‘যুগের অধিপতি’র (ইমাম মাহদীর) আবির্ভাব পর্যন্ত চলতে থাকবে । বহু বছর রাজত্ব করার দিন শেষ হয়ে কয়েক মাস বা কয়েক দিনের রাজত্ব করার অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী শাসনের পালা চলে আসবে ।”

আবু বসীর বলেন : “আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এ অবস্থা কি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে? তিনি বললেন : কখনই না । বাদশাহর (আবদুল্লাহ্) হত্যাকাণ্ডের পরে এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হিজাযের গোত্রসমূহের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহে পর্যবসিত হবে ।”

“(ইমাম মাহদীর) আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে ঐ ঘটনা যা দু’হারামের (মক্কা ও মদীনা) মাঝখানে সংঘটিত হবে । আমি বললাম : কোন্ ঘটনা ঘটবে? তিনি বললেন : দু’হারামের মাঝে গোত্রীয় গোঁড়ামির উদ্ভব হবে এবং অমুকের বংশধরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বিরোধী গোত্রের ১৫ জন নেতা ও ব্যক্তিত্বকে অথবা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে ।”

এ সময়ই ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং সম্ভবত এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে আসমানী আহবান বা ধ্বনি যা তাঁর নামে ২৩ রমযানে শ্রুত হবে ।

সাইফ ইবনে উমাইরাহ্ বলেছেন : “আমি আবু জাফর আল মনসূরের (দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলীফা) নিকটে ছিলাম । তিনি কোন ভূমিকা ছাড়াই বললেন : হে সাইফ ইবনে উমাইরাহ্! নিঃসন্দেহে আকাশ থেকে একজন আহবানকারী আবু তালিবের বংশধরগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নাম ঘোষণা করবে । আমি বললাম : আমি আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি এ কথা বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, এ কথা আমি আমার নিজ কানে শুনেছি । আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এখন পর্যন্ত এ ধরনের হাদীস কারো কাছ থেকে শুনি নি । তিনি বললেন : হে সাইফ! এ কথা সত্য । যখন ঐ

ঘটনা ঘটবে তখন আমরাই সর্বপ্রথম এ আহবানে সাড়া দেব । তবে ঐ ধ্বনি আমাদের একজন পিতৃব্যপুত্রের প্রতি নয় কি? আমি বললাম : সে কি ফাতিমার বংশধর হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, হে সাইফ! অনন্তর যদি আমি এ রেওয়ায়েতটি আবু জাফার মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-বাকির থেকে না শুনতাম তাহলে সমগ্র জগৎবাসী আমাকে বললেও আমি তা মেনে নিতাম না । কিন্তু এর বর্ণনাকারী তো ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ।”

এ সব রেওয়ায়েত অনুসারে এই আসমানী আহবান শোনার পরই ইমাম মাহদী (আ.) গোপনে তাঁর কতিপয় সঙ্গী ও সমর্থকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন । তখন তাঁর ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আলোচনা হতে থাকবে এবং তাঁর নাম সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকবে । তাঁর প্রতি ভালোবাসা সবার হৃদয়ে আসন লাভ করবে ।

তাঁর শত্রুরা তাঁর আবির্ভাবের ব্যাপারে খুব ভীত হয়ে পড়বে এবং এ কারণে তারা তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করবে । জনগণের মাঝে ছড়িয়ে যাবে যে, তিনি মদীনায় অবস্থান করছেন ।

বিদেশী সামরিক বাহিনী অথবা হিজায সরকার সে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনয়ন এবং সরকারের সাথে গোত্রসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন করার জন্য সিরিয়াস্থ সুফিয়ানী সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইবে ।

এ সেনাবাহিনী মদীনায় প্রবেশ করে হাশেমী বংশীয় যাকে পাবে তাকেই গ্রেফতার করবে । তাদের অনেককে এবং তাদের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে এবং অবশিষ্টদেরকে জেলখানায় ব ী করে রাখবে ।

“সুফিয়ানী তার একদল সৈন্যকে মদীনায় প্রেরণ করবে এবং তারা সেখানে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে । মাহদী ও মানসূর সেখান থেকে পলায়ন করবেন । তারা মহানবীর সকল বংশধরকে গ্রেফতার করবে । আর এর ফলে কোন ব্যক্তিই মুক্ত থাকবে না । সুফিয়ানী বাহিনী ঐ দু’ব্যক্তিকে ধরার জন্য মদীনা নগরীর বাইরে যাবে এবং ইমাম মাহদী (ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে) হযরত মূসা (আ.)- এর মতো ভীত ও চিন্তিত অবস্থায় সেখান থেকে বের হয়ে মক্কাভিমুখে চলে যাবেন ।”

অতঃপর ইমাম মাহদী (আ.) মক্কা নগরীতে তাঁর কতিপয় সঙ্গী- সাথীর সাথে যোগাযোগ করবেন যাতে করে তিনি পবিত্র হারাম থেকে এশার নামাযের পরে মুহররম মাসের দশম রাতে (আশুরার রাতে) তাঁর আ লনের সূচনা করতে পারেন । তখন তিনি মক্কার জনগণের উদ্দেশে তাঁর প্রথম ভাষণ দান করবেন । এর ফলে তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করবে । কিন্তু তাঁর সঙ্গী- সাথীরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং শত্রুদেরকে বিতাড়িত করে প্রথমে মসজিদুল হারাম ও তারপর পবিত্র মক্কানগরীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে ।

মুহররম মাসের দশম দিবসের (আশুরার দিবস) প্রভাতে ইমাম মাহদী সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বাণী প্রদান করে বিশ্বের জাতিসমূহকে আহবান জানাবেন যাতে করে তারা তাঁকে সাহায্য করে । তিনি ঘোষণা করবেন যে, যে মুজিযার প্রতিশ্রুতি তাঁর শ্রদ্ধেয় প্রপিতামহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) দিয়েছিলেন তা ঘটা পর্যন্ত তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করবেন । আর উক্ত মুজিযা হবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আ লন দমন করার জন্য পবিত্র মক্কাভিমুখে অগ্রসরমান সুফিয়ানী প্রেরিত বাহিনীর ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়া ।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই প্রতিশ্রুত মুজিযা বাস্তবায়িত হবে এবং যে সুফিয়ানী বাহিনী পবিত্র মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল তা ধ্বংস হয়ে যাবে ।

যখন তারা (সুফিয়ানী প্রেরিত বাহিনী) মদীনার মরুপ্রান্তরে পৌঁছবে তখন মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ভূ- গর্ভে প্রোথিত করবেন । আর এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণীর বাস্তব রূপ । তিনি বলেছেন, “আর যদি আপনি হে নবী! যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত তাদের কঠিন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন তখন আপনি ভীত হয়ে যাবেন; আর তাদের শাস্তি বিন্দুমাত্র কম করা হবে না এবং তারা নিকটবর্তী স্থানে (মহান আল্লাহর শাস্তির) শিকার হবে । যখনই তারা মরুপ্রান্তরে পৌঁছে যাবে ঠিক তখনই তাদেরকে ভূমি গ্রাস করবে এবং যারা সামনে থাকবে তারা ঐ দল কি করছে তা দেখার জন্য পিছনে ফিরে আসবে অথচ তারাও ঐ একই ভাগ্য বরণ করবে; আর যারা পিছনে থাকবে তারা তাদের (যারা ভূমিধ্বসের কারণে ভূ- গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে) সাথে মিলিত হবে অর্থাৎ

তাদের স্থানে (ভূমি ধ্বসের স্থানে) পৌঁছে তাদের খুঁজতে থাকবে তখন তারাও ঐ একই বিপদে পতিত হবে ।

এ মুজিযার পর ইমাম মাহদী (আ.) ১০০০০-এরও অধিক সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন এবং শত্রুবাহিনীর সাথে যুদ্ধের পর সেখানে অবস্থান গ্রহণ এবং মদীনা শত্রুমুক্ত করবেন । এরপর তিনি দুই হারাম (মক্কা ও মদীনা) মুক্ত করার মাধ্যমে হিজায বিজয় এবং সমগ্র অঞ্চলের (আরব উপদ্বীপ) ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন ।

কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.) হিজায বিজয়ের পর দক্ষিণ ইরান অভিমুখে রওয়ানা এবং সেখানে খোরাসানী ও শুআইব ইবনে সালিহের নেতৃত্বাধীন ইরানী সেনাবাহিনী ও সেদেশের জনগণের সাথে মিলিত হবেন । তারা তাঁর হাতে বাইআত করবে । তিনি তাদের সহায়তায় বসরায় শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন যার ফলে তিনি এক সুস্পষ্ট ও বিরাট বিজয় লাভ করবেন ।

এরপর তিনি ইরাকে প্রবেশ করবেন এবং সেখানকার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করবেন । তিনি সেদেশে সুফিয়ানী বাহিনীর অবশিষ্টাংশ এবং অন্যান্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে পরাভূত ও হত্যা করবেন ।

এরপর তিনি ইরাককে তাঁর প্রশাসনের কেন্দ্র এবং কুফা নগরীকে রাজধানী হিসাবে মনোনীত করবেন । আর এভাবে ইয়েমেন, হিজায, ইরাক এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ সর্বতোভাবে তাঁর শাসনাধীনে চলে আসবে ।

রেওয়ায়েতসমূহ এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ইরাক বিজয়ের পর ইমাম মাহদী (আ.) সর্বপ্রথম যে যুদ্ধের উদ্যোগ নেবেন তা হবে তুর্কীদের সাথে তাঁর যুদ্ধ । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

أول لواء يعقده يبعثه إلى التّرك فيهزمهم

“প্রথম যে সেনাদল তিনি গঠন করবেন তা তিনি তুর্কদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন । অতঃপর তা তাদেরকে পরাজিত করবে ।”

বাহ্যত তুর্কী বলতে রুশদেরকেও বোঝানো হতে পারে যারা রোমানদের (পাশ্চাত্যের) সাথে যুদ্ধের পর দুর্বল হয়ে পড়বে ।

ইমাম মাহদী (আ.) সেনাদল গঠন করার পর তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে কুদসে (জেরুজালেম) প্রেরণ করবেন । এ সময় তাঁর সেনাবাহিনী দামেশকের কাছে 'মারজ আযরা' এলাকায় আগমন করা পর্যন্ত সুফিয়ানী পশ্চাদপসরণ করতে থাকবে এবং তাঁর ও সুফিয়ানীর মাঝে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে । তবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি জনসমর্থন বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাঁর সামনে সুফিয়ানীর অবস্থান এতটা দুর্বল হয়ে পড়বে যে, রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় সুফিয়ানী তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইবে । কিন্তু এ কাজের জন্য তার ইহুদী- রোমান মিত্র ও পৃষ্ঠপোষক এবং তার সঙ্গী- সাথীরা তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করবে ।

তারা তাদের সেনাবাহিনী মোতায়েন করার পর ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে এক বিরাট যুদ্ধে লিপ্ত হবে । এ যুদ্ধের উপকূলীয় অক্ষরেখাসমূহ ফিলিস্তিনের আক্কা (عكّا) থেকে তুরস্কের আনতাকিয়াহ্ (انطاكية) পর্যন্ত এবং ভিতরের দিকে তাবারীয়াহ্[1] থেকে দামেশক ও কুদস পর্যন্ত বিস্তৃত হবে ।

এ সময় সুফিয়ানী, ইহুদী এবং রোমান সেনাবাহিনী মহান আল্লাহর (ঐশী) ক্রোধে পতিত হবে এবং তারা মুসলমানদের হাতে এমনভাবে নিহত হতে থাকবে যে, তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রস্তরখণ্ডের পিছনেও লুকায় তখন ঐ প্রস্তরখণ্ড চিৎকার করে বলে উঠবে : "হে মুসলমান! এখানে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে । তাকে হত্যা করো ।"

এ সময় মহান আল্লাহর সাহায্য ইমাম মাহদী (আ.) ও মুসলমানদের কাছে আসবে এবং তাঁরা বিজয়ী বেশে আল কুদসে প্রবেশ করবেন ।

খ্রিস্টান পাশ্চাত্য আকস্মিকভাবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে ইহুদী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক শক্তিসমূহের পরাজয় বরণের কথা জানতে পারবে । তাদের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হবে এবং তারা ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে ।

কিন্তু আকস্মিকভাবে হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে পবিত্র কুদসের ওপর অবতরণ করবেন এবং তিনি সমগ্র বিশ্ববাসী,   বিশেষ করে খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন ।

হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)- এর অবতরণ বিশ্ববাসীর জন্য এমন এক নিদর্শন হবে যা হবে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের জন্য আনন্দের কারণ ।

সম্ভবত হযরত ঈসা (আ.),   ইমাম মাহদী ও পাশ্চাত্যের মাঝে মধ্যস্থতা করবেন এবং এ কারণে দু'পক্ষের মধ্যে সাত বছর মেয়াদী একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে ।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

"তোমাদের ও রোমানদের (পাশ্চাত্য) মধ্যে চারটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হবে । এগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হিরাক্লিয়াসের এক বংশধরের সাথে সম্পাদিত হবে এবং তা সাত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে ।" মাস্তূর বিন গাইলান নামীয় আবদুল কাইস গোত্রের এক ব্যক্তি তখন জিজ্ঞাসা করেছিল : "হে রাসূলাল্লাহ্! ঐ দিন জনগণের নেতা (মুসলমানদের নেতা) কে হবেন?" তিনি বলেছিলেন : "আমার বংশধর মাহদী । যাকে দেখে মনে হবে তার বয়স ৪০ বছর । তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল তারকার মতো জ্বলজ্বল করতে থাকবে । তার ডান গালের ওপর একটি তিল থাকবে । ঐ সময়ে সে দু'টি কাতাওয়ানী[২] কাবা[৩] পরিহিত থাকবে এবং তাকে দেখতে ইসরাইল বংশীয় পুরুষদের মতো লাগবে । সে ভূগর্ভস্থ সম্পদরাজি উত্তোলন করবে এবং শিরক ও পৌত্তলিকতায় পূর্ণ একটি নগরীকে মুক্ত ও পবিত্র করবে ।"

কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে পাশ্চাত্য দু'বছর পরে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করবে । সম্ভবত এ চুক্তি ভঙ্গ করার কারণ হচ্ছে ঐ ভয়- ভীতি যা ঈসা (আ.) কর্তৃক পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের মাঝে গণজাগরণ ও সংহতির জোয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভূত হবে । বহু পাশ্চাত্যবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং ইমাম মাহদী (আ.)- কে সাহায্য ও সমর্থন দান করবে ।

এ কারণেই রোমানরা দশ লক্ষ সৈন্য সহকারে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে অকস্মাৎ আক্রমণ চালাবে ।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

"তখন পাশ্চাত্য তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ৮০টি সেনাদল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। প্রতিটি সেনাদলে ১২০০০ সৈন্য থাকবে।"

আর মুসলিম বাহিনী তাদের মোকাবিলা করবে এবং হযরত ঈসা (আ.) ইমাম মাহদী (আ.)- এর নীতি অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে তাঁর নীতি ঘোষণা করবেন এবং ইমাম মাহদীর পেছনে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করবেন।

রোমানদের (পাশ্চাত্য) বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ যে সব স্থান বা অক্ষ বরাবর আল কুদস মুক্ত করার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে সব স্থানে অর্থাৎ আক্কা থেকে আনতাকিয়া, দামেশক থেকে আল কুদস (বাইতুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেম) এবং মারজ দাবিক[৪] পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সংঘটিত হবে। এ মহাযুদ্ধে রোমীয়গণ শোচনীয় পরাজয় বরণ করবে এবং (ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে) মুসলমানগণ স্পষ্ট ও বৃহৎ এক বিজয় লাভ করবে।

এ যুদ্ধের পর ইমাম মাহদীর সামনে খ্রিস্টান ইউরোপ ও পাশ্চাত্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর দৃশ্যত অনেক জাতি বিপ্লবের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশে ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আ.)- এর বিরোধী সরকারসমূহের পতন ঘটাবে এবং ইমাম মাহদীর সমর্থক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক সমগ্র পাশ্চাত্য বিজয় এবং তা তাঁর শাসনাধীনে চলে আসার পর অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। এ সময় হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করবেন। মাহদী (আ.) ও মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায পড়বেন। হাদীসের বর্ণনানুসারে ইমাম মাহদী হযরত ঈসা (আ.)- এর জানাযার নামায ও দাফন অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে জনতার উপস্থিতিতে সম্পন্ন করবেন যাতে অতীতের মতো তাঁর ব্যাপারে কেউ পুনরায় অগ্রহণীয় উক্তি করতে না পারে। অতঃপর ইমাম মাহদী তাঁকে তাঁর মা হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা (আ.) নিজ হাতে যে বস্ত্রটি বয়ন করেছিলেন তা কাফন হিসাবে পরিধান করাবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁর মায়ের কবরের পাশে দাফন করবেন।

ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক সমগ্র বিশ্ব বিজয় এবং বিশ্বের সকল দেশ, রাষ্ট্র ও প্রশাসন একটি একক ইসলামী প্রশাসনের আওতায় একীভূত হওয়ার পর তিনি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে বিভিন্ন পর্যায়ে ঐশী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন । তিনি পার্থিব জীবনের উন্নতি ও বিকাশ এবং মানব জাতির সচ্ছলতা, কল্যাণ ও সুযোগ- সুবিধা বাস্তবায়ন কল্পে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করবেন । তিনি সংস্কৃতি ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রসার এবং মানব জাতির ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের পর্যায়কে উন্নীত করার চেষ্টা চালাবেন ।

কতিপয় হাদীস অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আ.) মানব জাতির জ্ঞানের সাথে আরও যে জ্ঞান যোগ করবেন তার প্রবৃদ্ধির হার হবে ২৫ : ২ অনুপাতে । অর্থাৎ মানব জাতি এর আগে জ্ঞানের যে দু'ভাগের অধিকারী ছিল তার সাথে আরো ২৫ ভাগ যুক্ত করবেন এবং সার্বিকভাবে মানুষের জ্ঞান তখন ২৭ ভাগ হবে ।

ঠিক একইভাবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগে অন্যান্য গ্রহ ও নভোমণ্ডলের অধিবাসীদের সাথে পৃথিবীবাসীদের যোগাযোগের দ্বার উন্মুক্ত হবে । বরং আমাদের পার্থিব এ জগতের সামনে গায়েবী (আধ্যা ক ও অবস্তুগত) জগতের দ্বারসমূহ খুলে যাওয়া শুরু হবে । এর ফলে বেহেশত থেকে মানুষ এ পৃথিবীতে আগমন করবে যা হবে পৃথিবীবাসীদের কাছে অলৌকিক বিষয় ।

ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগে এবং তাঁর পরেও বেশ কিছু সংখ্যক নবী ও ইমাম এ পার্থিব জগতে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং যতদিন পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন তাঁরা বিশ্ব শাসন করবেন । আর এটি হবে কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন ।

সম্ভবত অভিশপ্ত দাজ্জালের অভ্যুত্থান ও ফিতনা ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগে মানব জাতি যে ব্যাপক ও অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন করবে তার ফলশ্রুতিতে ঘটবে অর্থাৎ দাজ্জাল এসবের অপব্যবহারের মাধ্যমে একটি বিচ্যুত ধারা সৃষ্টি করবে । সে মূলত যুবক ও নারীদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য চোখ ধাঁধানো উন্নত মাধ্যম ও পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করবে এবং এ শ্রেণীই তার অনুসারী হবে ।

দাজ্জাল সমগ্র বিশ্বব্যাপী ফিতনা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে । তার ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার দ্বারা অনেকেই প্রতারিত হবে । অনেকেই তার কথা বিশ্বাস করবে । কিন্তু ইমাম মাহ্দী দাজ্জালের ধোঁকাবাজি প্রকাশ্যে ধরিয়ে দেবেন এবং তাকে ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করবেন ।

যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো তা হচ্ছে প্রতিশ্রুত হযরত মাহ্দী (আ.)- এর বিশ্বজনীন আন্দোলন ও বিপ্লবের একটি সার্বিক চিত্র ও পটভূমি । কিন্তু যে যুগে এ সব ঘটনা ঘটবে সে যুগের সবচেয়ে স্পষ্ট নিদর্শন ও ঘটনাবলী রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে ।

প্রথমে যে ফিতনা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত হবে এবং রেওয়ায়েতসমূহে যা সর্বশেষ ও সবচেয়ে কঠিন ফিতনা বলে অভিহিত হয়েছে তা ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যাবে ।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের যাবতীয় সাধারণ ও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য এ শতাব্দীর (বিংশ শতক) শুরুতে পাশ্চাত্য এবং তাদের মিত্র প্রাচ্য দেশসমূহের সৃষ্ট ফিতনার সাথে মিলে যায় । কারণ এ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সকল মুসলিম দেশ ও এ দেশগুলোর সকল পরিবারকে আক্রান্ত করবে ।

"এমন কোন ঘর বিদ্যমান থাকবে না যেখানে এ ফিতনা প্রবেশ করবে না এবং এমন কোন মুসলমান থাকবে না যে এ ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ।"

"যেভাবে লোভাতুর ক্ষুধার্ত হরেক রকমের সুস্বাদু খাবাবের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে ঠিক সেভাবে কাফির জাতিসমূহ মুসলিম দেশগুলোর ওপর আক্রমণ চালাবে ।"

"ঐ ফিতনার সময় পাশ্চাত্য থেকে একদল এবং প্রাচ্য থেকে আরেকদল আমার উম্মতের ওপর শাসন চালাবে ।"

উল্লেখ্য যে, আমাদের শত্রুরা তাদের কালো সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের এ প্রক্রিয়া (ফিতনা) শামদেশ (সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) থেকে শুরু করবে এবং সে দেশকে তারা সভ্যতার আলো বিকিরণের উৎস বলে অভিহিত করবে । এর ফলে এমন একটি ফিতনার উদ্ভব হবে যা রেওয়ায়েতসমূহে 'ফিলিস্তিনের ফিতনা' নামে উল্লিখিত হয়েছে । মশকের ভিতরে পানি যেমন

আে ালিত হয়ে থাকে ঠিক তেমনি এ ফিতনার কারণে শামদেশ তীব্রভাবে আে ালিত হবে এবং লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে ।

"যখন ফিলিস্তিনের ফিতনার উদ্ভব হবে তখন মশকের ভিতর পানি যেভাবে উদ্বেলিত হয় ঠিক সেভাবে শামদেশ বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও অস্বাভাবিক অবস্থার শিকার হবে । আর যখন এ ফিতনার পরিসমাপ্তির সময় এসে যাবে তখন তার যবনিকাপাত হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় লোকই অনুতপ্ত হবে ।"

রেওয়ায়েতসমূহ (সে যুগের) মুসলমানদের সন্তান ও প্রজন্মসমূহকে এভাবে বর্ণনা করেছে যে, তারা এমনভাবে এ ফিতনা ও বিশৃঙ্খলাময় সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠবে যে, তারা ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারেই অনবগত থেকে যাবে । সে সব অত্যাচারী শাসনকর্তা অনৈসলামিক বিধি- বিধান এবং প্রবৃত্তির কামনা- বাসনার ভিত্তিতে মুসলমানদের ওপর শাসন করবে এবং তাদের ওপর সবচেয়ে নিকৃষ্ট পন্থায় নির্যাতন চালাবে ।

হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার উদগাতা হবে রোমান এবং তুর্কীরা । তুর্কীরা বাহ্যত রুশ জাতি হতে পারে । আর যখন ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে কতিপয় বড় ঘটনা ঘটবে তখন তারা তাদের সেনাবাহিনীকে ফিলিস্তিনের রামাল্লা, আনতাকিয়া এবং তুরস্ক- সিরীয় উপকূলে এবং সিরিয়া- ইরাক- তুরস্ক সীমান্তে অবস্থিত জাযীরায় (দ্বীপে) মোতয়েন করবে ।

"যখন রোমান ও তুর্কীরা (রুশজাতি) তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে তখন তারা নিজেরাও পরস্পর দ্বন্দ্ব- সংঘাতে লিপ্ত হবে এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ- বিগ্রহ ও সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে । তখন তুর্কীদের সমর্থকবৃ জাযীরাহ্ এলাকায় এবং রোমের বিদ্রোহীরা রামাল্লায় অবস্থান গ্রহণের জন্য রওয়ানা হয়ে যাবে ।

রেওয়ায়েতসমূহে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, ইরান থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সূত্রপাত হবে ।

“তাঁর আবির্ভাব ও প্রকাশের সূত্রপাত প্রাচ্য থেকে হবে এবং যখন ঐ সময় উপস্থিত হবে তখন সুফিয়ানী আবির্ভূত হবে ।”

অর্থাৎ সালমান ফারসী (রা.)- এর জাতি ও কালো পতাকাবাহীদের হাতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব ও আ প্রকাশের পটভূমি রচিত এবং কোম নগরী থেকে এক ব্যক্তির হাতে তাদের আ   ালনের সূত্রপাত হবে ।

“কোম থেকে এক ব্যক্তি উত্থিত হবে এবং জনগণকে (ইরানী জাতি) সত্যের দিকে আহবান করবে । যে দলটি তার চারপাশে জড়ো হবে তাদের হৃদয় ইস্পাত- কঠিন দৃঢ় হবে এবং তারা এতটা অক্লান্ত ও অকুতোভয় হবে যে, যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপও তাদের ভীত- সন্ত্রস্ত করবে না এবং তারা যুদ্ধে ক্লান্ত হবে না । তারা সব সময় মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে । আর শুভ পরিণতি কেবল মুত্তাকী- পরহেজগারদের জন্যই নির্ধারিত ।”

তারা (ইরানী জাতি) তাদের অভ্যুত্থান এবং বিপ্লব সফল করার পর তাদের শত্রুদের (পরাশক্তিসমূহের) কাছে অনুরোধ করবে যে, তারা যেন তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ না করে । কিন্তু তারা এ ব্যাপারে জবরদস্তি করবে ।

“তারা তাদের অধিকার দাবি করবে কিন্তু তাদেরকে তা দেয়া হবে না । তারা পুনরায় তা চাইবে । আবারও তাদের অধিকার প্রদান করা হবে না । তারা এ অবস্থা দর্শন করতঃ কাঁধে অস্ত্র তুলে নেবে এবং তাদের দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে । (অবশেষে তাদের অধিকার প্রদান করা হবে) কিন্তু এবার তারা তা গ্রহণ করবে না । অবশেষে তারা রুখে দাঁড়াবে এবং তোমাদের অধিপতির (অর্থাৎ ইমাম মাহদীর) হাতে বিপ্লবের পতাকা অর্পণ করা পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে । তাদের নিহত ব্যক্তিরা হবে সত্যের পথে শহীদ ।”

বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে অবশেষে তারা তাদের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে বিজয়ী হবে এবং যে দু’ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তারা তাদের মাঝে আবির্ভূত হবেন । এ দু’জনের একজন ‘খোরাসানী’ যিনি ফকীহ্ ও মারজা অথবা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এবং অপরজন শুআইব

ইবনে সালিহ্ যিনি হবেন শ্যামলা বর্ণের চেহারা ও স্বল্প দাঁড়িবিশিষ্ট এবং রাই অঞ্চলের অধিবাসী তিনি প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন ।

ইমাম মাহদী (আ.)- এর কাছে এ দু'ব্যক্তি ইসলামের পতাকা অর্পণ করে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়ে তাঁর আে ালনে অংশগ্রহণ করবেন । আর শুআইব ইবনে সালিহ্ ইমামের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হবেন ।

ঠিক একইভাবে বেশ কিছু রেওয়ায়েতে এমন একটি অভ্যুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে যা সিরিয়ায় উসমান সুফিয়ানীর নেতৃত্বে সংঘটিত হবে । এই উসমান সুফিয়ানী হবে পাশ্চাত্যপন্থী ও ইহুদীদের সমর্থক । সে সিরিয়া ও জর্দানকে একত্রিত করে নিজ শাসনাধীনে নিয়ে আসবে ।

"সুফিয়ানীর আবির্ভাব একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়- যার শুরু থেকে সমাপ্তিকাল পনের মাস স্থায়ী হবে । প্রথম ছয় মাস সে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকবে এবং পাঁচটি অঞ্চল নিজ দখলে আনার মাধ্যমে পূর্ণ নয় মাস সে ঐ সব অঞ্চলের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করবে ।"

অনেক রেওয়ায়েত অনুসারে সিরিয়া ও জর্দান ছাড়াও সম্ভবত লেবাননও ঐ পাঁচ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হবে ।

এ হচ্ছে এক ধরনের অশুভ ঐক্য যা সুফিয়ানীর মাধ্যমে শামদেশে বাস্তবায়িত হবে । কারণ এর উদ্দেশ্য হবে ইসরাইলের পক্ষে একটি (আরব) প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর হুকুমতের (সরকার ও প্রশাসনের) ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের প্রতিরোধ করার জন্য একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ও ফরন্ট লাইন গড়ে তোলা ।

এ কারণেই সুফিয়ানী ইরাক দখল করার পদক্ষেপ নেবে এবং তার সেনাবাহিনী ইরাকে প্রবেশ করবে ।

"সে (সুফিয়ানী) ১৩০০০০ সৈন্য কুফার দিকে প্রেরণ করবে এবং তারা রাওহা ও ফারুক নামক একটি স্থানে অবতরণ করবে । তাদের মধ্য থেকে ৬০০০০ সৈন্যকে কুফার দিকে প্রেরণ করা হবে এবং তারা নুখাইলায় হযরত হুদ (আ.)- এর সমাধিস্থলে অবস্থান গ্রহণ করবে । আর আমি যেন সুফিয়ানীকে (অথবা তার সহযোগী ও সঙ্গীকে) দেখতে পাচ্ছি যে, সে কুফা ও তোমাদের

সুবিস্তৃত ও চিরসবুজ জমিগুলোতে অবস্থান নিচ্ছে । তার পক্ষ থেকে একজন আহবানকারী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে থাকবে যে, যে ব্যক্তি আলীর অনুসারীদের (কর্তিত) মাথা আনবে তাকে এক হাজার দিরহাম দেয়া হবে । আর এ সময় প্রতিবেশী প্রতিবেশীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে বলবে যে, এ ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত ।”

তখন হিজাযে উদ্ভূত রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করার জন্য সুফিয়ানীকে উদ্বুদ্ধ করা হবে । ইমাম মাহদীর সরকার- যার কথা সবার মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকবে এবং মক্কা নগরী থেকে যার শুভ সূচনা হবে তা ধ্বংস করার জন্য সুফিয়ানী সরকারকে শক্তিশালী করা হবে ।

এতদুদ্দেশ্যে সুফিয়ানী হিজাযে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে । তার সেনাবাহিনী মদীনা নগরীতে প্রবেশ করেই সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে । এরপর তারা পবিত্র মক্কাভিমুখে রওয়ানা হবে । ইমাম মাহদী (আ.) মক্কা নগরী থেকেই তাঁর আ ালন শুরু করবেন । এরপর পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌঁছানোর আগেই সুফিয়ানী বাহিনীকে কেন্দ্র করে যে মহা অলৌকিক ঘটনা (মুজিযা) ঘটার প্রতিশ্রুতি মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হবে অর্থাৎ সুফিয়ানী বাহিনী ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে ।

“একজন আশ্রয় গ্রহণকারী মহান আল্লাহর গৃহে (বায়তুল্লায়) আশ্রয় নেবে । তখন একটি সেনাবাহিনী তার পিছনে প্রেরণ করা হবে । যখনই তারা মদীনার মরুভূমিতে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদা নামক স্থানে) পৌঁছবে তখন তারা ভূগর্ভে প্রোথিত হবে ।”

ইরাকে ইরানী ও ইয়েমেনীদের হাতে পরাজয় বরণ এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে হিজাযে ভূগর্ভে দেবে যাওয়ার মুজিযা সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে সুফিয়ানী বাহিনীর পরাজয় বরণ করার পর সুফিয়ানী পশ্চাদপসরণ করবে । আর ইমাম মাহদী সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশক ও বাইতুল মুকাদ্দাস (আল কুদস) অভিমুখে রওয়ানা হবেন । সুফিয়ানী ইমাম মাহদী (আ.)- কে মোকাবিলা করার জন্য শামদেশে তার সেনা বাহিনী সংগ্রহ ও পুনর্গঠনে ব্যস্ত থাকবে ।

রেওয়ায়েতসমূহে এ যুদ্ধকে ‘এক মহা বীরত্বপূর্ণ ঘটনা’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা উপকূলীয় এলাকায় আক্কা থেকে সূর (سور) ও আনতাকিয়াহ্ পর্যন্ত এবং শামের অভ্যন্তরে দামেশক থেকে তাবারীয়াহ্ ও কুদস পর্যন্ত বিস্তৃত হবে ।

ঠিক একইভাবে কতিপয় রেওয়ায়েতে অপর একটি আ ালনের কথা উল্লিখিত হয়েছে যা ইমাম মাহদী (আ.)- এর সরকারের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী এবং ইয়েমেনে সংঘটিত হবে । এ আ ালন ও বিপ্লবের নেতা ইয়েমেনীকে এ সব রেওয়ায়েতে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁকে সাহায্য করা মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব বলে গণ্য করা হয়েছে ।

“পতাকাসমূহের মধ্যে ইয়ামানীদের পতাকার চেয়ে হিদায়েতকারী আর কোন পতাকা নেই । ইয়ামানীর আবির্ভাব ও উত্থানের পর জনগণের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা হারাম হয়ে যাবে । আর যখন সে আবির্ভূত হবে এবং আ ালন করবে তখন তাকে সাহায্য করার জন্য দ্রুত ছুটে যাবে । কারণ তার পতাকা হবে হিদায়েতের পতাকা । তার বিরোধিতা করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হবে না । যদি কোন ব্যক্তি এ কাজ করে তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে । কারণ ইয়ামানী জনগণকে সত্য ও সৎ পথের দিকে আহবান জানাবে ।”

যেমন করে আমরা রেওয়ায়েতসমূহ থেকে সুফিয়ানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইরানীদের সাহায্য করার জন্য ইরাকে ইয়ামানী বাহিনী প্রবেশ করার বিষয়টি জানতে পারি ঠিক তেমনি হিজাযে মাহদী (আ.)- কে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ইয়ামানী ও তাঁর সেনাবাহিনীর ভূমিকার কথাও জানতে পারি ।

অনুরূপভাবে কতিপয় রেওয়ায়েতে ইয়ামানী ও সুফিয়ানী বাহিনীর আবির্ভাবের আগে একজন মিশরীয় ব্যক্তির আ ালনের কথা বর্ণিত হয়েছে । আবার মিশরীয় সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে পরিচালিত আরেকটি আ ালন এবং মিশরের আশপাশের কিবতীদের পরিচালিত তৎপরতার কথাও ঐ সব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে । এরপর ঐ সব রেওয়ায়েত মিশরে পাশ্চাত্য অথবা মাগরিবী (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও লিবিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট) সেনাবাহিনীর

অনুপ্রবেশ এবং এর পরপরই শামদেশে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও উত্থানের কথা আমাদেরকে অবহিত করে ।

“তখন তারা (ইমাম মাহদী ও তাঁর সঙ্গী- সাথীরা) মিশরে প্রবেশ করবে এবং সে সেখানে মিম্বারে আরোহণ করে সে দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে । পৃথিবী ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ফলে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে যাবে । আকাশ থেকে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হবে । বৃক্ষরাজি ফলদান করবে । ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ জন্মাবে এবং তা পৃথিবীবাসীদের জন্য শোভাবর্ধক হবে । বুনো জীব- জন্তু নিরাপদে বসবাস করবে, সেগুলো গৃহপালিত পশুর মতো নিরুপদ্রবে সর্বত্র চড়ে বেড়াবে । মুমিনদের অন্তরে জ্ঞান- বিজ্ঞান এতটা স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসবে যে, কোন মুমিনই জ্ঞানার্জনের জন্য তার দীনী ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হবে না । ঐ দিন ‘মহান আল্লাহ্ সবাইকে তাঁর অসীম সম্পদের মাধ্যমে ধনাঢ্য করে দেবেন’ (يغني الله كلّا من سعته)- পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটির বাস্তব নমুনা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে ।”

তবে অনেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলিম দেশ মাগরিবের (মরক্কো ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ) সেনাবাহিনী শাম ও মিশরে প্রবেশ করবে । এদের একটি অংশ ইরাকেও প্রবেশ করবে । তাদের ভূমিকা হবে বাঁধাদানকারী আরব অথবা আন্তর্জাতিক বাহিনীর ভূমিকার ন্যায় । তাই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী হবে না । বরং এ বাহিনী শামে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সরকারের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের এবং ইরানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে । এরপর তারা জর্দানের দিকে পশ্চাদপসরণ করবে এবং তাদের অবশিষ্টাংশ সুফিয়ানীর অভ্যুত্থানের পর পশ্চাদপসরণ করবে অথবা তার সাথে যোগ দেবে । অতঃপর তারা মিশরীয়দের আ লন ও গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখীন মিশর সরকারের সাহায্যার্থে অথবা শামে সুফিয়ানীর উত্থানের সামান্য প্রাক্কালে যে পাশ্চাত্যবাহিনী মিশরে প্রবেশ করবে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য মিশরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে ।

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শেষ যামানায় ইহুদীরা পৃথিবীর বুকে ফিতনা সৃষ্টি এবং দম্ভ প্রকাশ করবে ।

তারা নিজেদেরকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে । মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে তাদের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন । তাদের দম্ভ এবং শ্রেষ্ঠত্ব অন্বেষী মনোবৃত্তি ঐ সব পতাকাবাহীর হাতে চূর্ণ হয়ে যাবে যারা খোরাসান (ইরান) থেকে বের হবে ।

“ইসলামের ঝাণ্ডাসমূহ আল কুদসে পতপত্ করে ওড়া পর্যন্ত তাদেরকে (খোরাসানীদেরকে) তাদের সিদ্ধান্ত থেকে কোন কিছুই বিরত রাখতে পারবে না ।”

ইরানীরা এমন এক জাতি যাদেরকে মহান আল্লাহ্ শীঘ্রই ইহুদীদের ওপর বিজয়ী করবেন । কোরআনের ভাষায় :

“আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ থেকে অতি শক্তিশালী বা াদেরকে প্রেরণ করব ।”

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে এবং পরে এক দফায় অথবা কয়েক দফায় ইহুদীদের যে প্রতিশ্রুত ধ্বংস সংঘটিত হবে তা রেওয়ায়েতসমূহে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি । তবে এ সব রেওয়ায়েতে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তির সর্বশেষ পর্যায় উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর সেনাবাহিনী- যার অধিকাংশ সদস্যই হবে ইরানী তাঁদের হাতে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে ।

এ ঘটনাটি বিরাট এক যুদ্ধ আকারে সংঘটিত হবে । এ যুদ্ধে শামের শাসনকর্তা উসমান সুফিয়ানী ইহুদী জাতি ও রোমীয়দের (পাশ্চাত্য) পাশে এবং তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের প্রথম কাতারে অবস্থান করবে ।

কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম মাহদী (আ.) আনতাকিয়ার একটি গুহা, ফিলিস্তিনের একটি পাহাড় এবং তাবারীয়ার হ্রদ থেকে তাওরাতের আসল কপিগুলো বের করে আনবেন । তিনি তাওরাতের সেই সব কপির ভিত্তিতে ইহুদীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং তাদের কাছে নিদর্শন ও মুজিযাসমূহ স্পষ্ট করে প্রকাশ করবেন ।

আল কুদস মুক্ত করার যুদ্ধের পর যে কিছু সংখ্যক ইহুদী বেঁচে যাবে তারা ইমাম মাহদীর কাছে আ সমর্পণ করবে এবং যারা আ সমর্পণ করবে না তাদেরকে আরব দেশগুলো থেকে বিতাড়িত করা হবে ।

রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কিছু আগে রোমান ও তুর্কীদের মধ্যে অর্থাৎ পাশ্চাত্য ও রাশিয়ার মধ্যে একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে যার সূত্রপাত হবে পূর্ব দিক হতে। আরো কিছু রেওয়ায়েত থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপরিউক্ত যুদ্ধ আসলে একাধিক আঞ্চলিক যুদ্ধ আকারে সংঘটিত হবে।

"ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হবে যেগুলোর দ্বারা পাশ্চাত্যজগৎ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

"জ্বালানি কাঠে যেভাবে আগুন ধরে ঠিক তদ্রূপ পাশ্চাত্যে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে, এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেবে। আর মানব জাতি নিরাপত্তাহীনতার ভীতির কারণে কঠিন দুঃখ- কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হবে।"

ঠিক একইভাবে আরো কিছু হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ যুদ্ধের ফলে সংঘটিত জান- মালের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও তার আগে ও পরে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে প্লেগ বা মহামারী দেখা দেবে তাতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই- তৃতীয়াংশ ধ্বংস হবে। তবে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত মুসলমানগণ সরাসরি এ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে না।

"বিশ্বের দুই- তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ ঘটনা (ইমাম মাহদীর আবির্ভাব) ঘটবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : যখন পৃথিবীর জনসংখ্যার দুই- তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আর কোন্ ব্যক্তি অক্ষত থাকবে?" ইমাম বললেন, "তোমরা কি অবশিষ্ট এক- তৃতীয়াংশের মধ্যে থাকতে চাও না?"

কিছু কিছু রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ যুদ্ধ বেশ কয়েকটি ধাপে সংঘটিত হবে। আর ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব, তাঁর হিজায মুক্তকরণ এবং ইরাকে তাঁর প্রবেশ করার পরই এ যুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায় এসে যাবে।

তবে হিজায মুক্ত হওয়া সে দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও শূন্যাবস্থা এবং সেখানকার প্রশাসনিক সংকটের সাথে জড়িত। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ফিতনা ও গোলযোগ সৃষ্টি

'ফিতনা' (فتنة) শব্দটি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহয় সাধারণ ও বিশেষ এ দু'অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'ফিতনা'- এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে, যে কোন ধরনের পরীক্ষা মানুষ যার সম্মুখীন হয়ে থাকে- চাই তা মানুষের পক্ষ থেকেই হোক অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে; চাই সে এ পরীক্ষায় সফল হোক এবং এ ফিতনা ও গোলযোগ থেকে মুক্তি পাক অথবা এর মধ্যে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হোক।

'ফিতনা'- এর বিশেষ অর্থ : ফিতনা হচ্ছে ঐ সব ঘটনা ও পরিস্থিতি যেগুলো মুসলমানদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলবে এবং ধর্মের সীমানা থেকে বের করে দেবে ও বিচ্যুত করবে। আর যে সব অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন সেগুলোর অর্থও হচ্ছে ঠিক এটিই।

তবে সাহাবী ও তাবেয়িগণ নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু রেওয়ায়েত ও হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে তাঁর ওফাতের পর যে সব ফিতনা, গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হবে সেগুলোর ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)- এর সাহাবীদের মাঝে হুযাইফাহ্ ইবনে ইয়ামান (রা.) ফিতনা সংক্রান্ত যে সব রেওয়ায়েত ও হাদীস আছে সেগুলো সম্পর্কে তাঁর পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকার কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ তিনি ফিতনা ও গোলযোগ সম্পর্কে মহানবী (সা.)- কে জিজ্ঞাসা এবং ঐ সব রেওয়ায়েত ও হাদীস মুখস্ত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

এ কারণেই বেশ কিছু হাদীস গ্রন্থে ফিতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত হুযাইফাহ্ ইবনে ইয়ামানের সূত্রে মহানবী (সা.) অথবা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ছিলেন হযরত আলী (আ.)- এর বিশেষ শিষ্য ও সাথীদের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, তিনি বলতেন :

“কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল গোলযোগ সৃষ্টিকারী (ফিতনাবাজ) যাদের সংখ্যা ৩০০ পর্যন্ত পৌঁছবে আমি যদি তাদের নাম, তাদের পিতার নাম এবং তাদের বসবাস করার স্থান উল্লেখ করতে চাই তাহলে আমি তা করতে পারব । কারণ মহানবী (সা.) তাদের ব্যাপারে আমাকে জানিয়েছেন ।”

তিনি আরো বলতেন :

“আমি যা জানি তা সব কিছু যদি তোমাদের কাছে বলতাম তাহলে তোমরা আমাকে এক রাতেরও সুযোগ দিতে না, তৎক্ষণাৎ আমাকে হত্যা করতে ।”[৫]

ফিতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি এতটাই ছিল যে, তাদের কারো কারো গ্রন্থে ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ প্রাধান্য লাভ করেছিল । এ কারণেই হাদীস সংকলকগণ বেশ কিছু অধ্যায় ‘ফিতান’ (ফিতনাসমূহ) অথবা ‘মালাহিম ওয়া ফিতান’ (ঘটনা ও গোলযোগসমূহ)- এ শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছেন । ‘মালাহিম’ শব্দটি যুদ্ধ- বিগ্রহ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে এখানে ভবিষ্যতে যেগুলো ঘটার সংবাদ মহানবী (সা.) দিয়েছেন তা বোঝানো হয়েছে ।

এ কারণেই কতিপয় রাবী (বর্ণনাকারী) ও আলিম (শাস্ত্রীয় পণ্ডিত) ‘আল ফিতান ওয়াল মালাহিম’ নামে বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এতৎসংক্রান্ত বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েত ঐ সব গ্রন্থে সংকলন করেছেন ।

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা ফিতনা ও গোলযোগসমূহের সংখ্যা গণনা, এগুলোর সূত্রপাত এবং মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের সাথে এগুলোকে মিলিয়ে দেখার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং গুরত্বপূর্ণ হচ্ছে ‘সর্বশেষ ফিতনা পরিচিতি’- যে ব্যাপারে সবার ঐকমত্য আছে যে, তা হযরত মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের মাধ্যমে দূরীভূত হবে । আর এই ফিতনার বৈশিষ্ট্যগুলো পাশ্চাত্য ফিতনার সাথে পুরোপুরি মিলে যায় যার প্রভাব এ বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে মুসলিম জাতিসমূহের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং অগণিত সমস্যার সৃষ্টি করেছে । কারণ পাশ্চাত্য আমাদের দেশ অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তারা

আমাদের সম্পদ, ভাগ্য এবং যাবতীয় বিষয়ের ওপর কর্তৃত্বশীল হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রাচ্য দেশীয় শত্রুরা তাদের সাথে সহযোগিতা করেছে। তারা মুসলিম বিশ্বের একাংশ দখল করে নিয়েছে এবং ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে ঐ অঞ্চলকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখানে আমরা কতিপয় রেওয়ায়েত নমুনাস্বরূপ উপস্থাপন করছি :

মহানবী (সা.) বলেছেন :

"আমার উম্মতের ওপর চারটি ফিতনা আপতিত হবে। প্রথম ফিতনায় রক্তপাত, দ্বিতীয় ফিতনায় রক্তপাত ও সম্পদ লুণ্ঠন এবং তৃতীয় ফিতনায় রক্তপাত, সম্পদ লুণ্ঠন ও নারীহরণ বৈধ মনে করা হবে। তবে চতুর্থ ফিতনাটি অন্ধ ও বধিরের ন্যায় সর্বগ্রাসী হবে এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে একটি চলমান জাহাজের গতির মতো হবে যাতে কোন লোকই আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। ঐ ফিতনার উত্থান হবে শাম থেকে এবং তা সমগ্র ইরাককে গ্রাস করবে এবং জাযীরাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে। বিপদাপদ ও সংকট জনগণকে ট্যানারীর চামড়া পাকানোর মতো মলতে থাকবে এবং কোন ব্যক্তিই বলতে সাহস করবে না যে, 'ফিতনা বন্ধ কর'। যদি কোন এক দিকে এ ফিতনা বিলুপ্ত হয়, তাহলে তা অন্যদিকে পুনরায় প্রকাশ পাবে।"[৬]

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে :

"যখন ফিলিস্তিনের ফিতনার আবির্ভাব হবে তখন মশকের পানি যেভাবে আ ালিত হয় শামের অবস্থা ঠিক তেমন হবে। আর এ ফিতনা বিদূরিত হওয়ার সময় যখন নিকটবর্তী হবে তখন তা শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় লোকই অনুতপ্ত হবে।"[৭]

আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে :

"ঐ ফিতনা শামকে ঘিরে ফেলবে, ইরাককে ঢেকে ফেলবে এবং জাযীরাকে (ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তবর্তী একটি স্থান) লণ্ডভণ্ড করে দেবে।"[৮]

অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে :

"ঐ সময় এমন এক ফিতনার উদ্ভব হবে যার অবসানের কথা চিন্তাও করা যায় না। কারণ, তা এমনভাবে চলতে থাকবে যে, এমন কোন গৃহ থাকবে না যেখানে ঐ ফিতনা প্রবেশ করবে না

এবং এমন কোন মুসলমানও থাকবে না যে ঐ ফিতনা কর্তৃক চপেটাঘাতপ্রাপ্ত হবে না । আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তির (মাহদী) আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত এ ফিতনা চলতে থাকবে ।"[৯]

এ সব রেওয়ায়েত ও আরো অনেক রেওয়ায়েতে এ ফিতনার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে । উপরিউক্ত রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্য সকল রেওয়ায়েতের ভাষ্য অনুযায়ী এ চতুর্থ ফিতনাটি হবে সর্বশেষ ফিতনা ।

উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. ফিতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ শিয়া ও সুন্নী উভয় সূত্রে ইজমালী তাওয়াতুরের (অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির) পর্যায়ে বিদ্যমান । অর্থাৎ যদিও এ সব রেওয়ায়েতে শব্দগত পার্থক্য বিদ্যমান কিন্তু বিভিন্ন রাবী বর্ণিত এ সব রেওয়ায়েতে একটি সাধারণ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে । যে কেউ এগুলোর প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই নিশ্চিত হতে পারবে যে, এ সব রেওয়ায়েতের অন্তর্নিহিত অর্থ মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইত থেকে উৎসারিত হয়েছে ।

২. এ ফিতনা হবে ব্যাপক এবং তা মুসলমানদের নিরাপত্তা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিসহ সার্বিক অবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে । যেমন : সকল হারাম (অবৈধ) বিষয়কে হালাল (বৈধ) গণ্য করা হবে । আরেকটি রেওয়ায়েতে এ ফিতনাকে বধির ও অন্ধ বলা হয়েছে যা কোন কথাই শুনবে না এবং কোন কিছুই দেখবে না । তাই আলোচনার মাধ্যমেও এর পরিসমাপ্তি ঘটানো যাবে না । এ ফিতনা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন পার্থক্য করবে না; বরং তা সবকিছুকেই গ্রাস করবে । এ ফিতনা সকল পরিবারে প্রবেশ করবে এবং সকল মুসলমানের ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত হেনে তাদের ক্ষতিসাধন করবে । আর মুসলিম সমাজ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গমালার ওপর দোদুল্যমান জাহাজ যেমন প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি খায় ও তীব্রভাবে নড়াচড়া করতে থাকে ঠিক তেমনি তীব্র গোলযোগ ও সংকটের মুখোমুখি হবে ।

এ ফিতনার বিপক্ষে কেউ তার ধর্ম ও পরিবার রক্ষা করার জন্য অত্যাচারী শাসকবর্গ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাদের চরদের অন্যায়- অত্যাচার থেকে কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলই খুঁজে পাবে না ।

আর তারা মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে থাকবে । যেমন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে :

“তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে একদল লোক (ঔপনিবেশিক) এসে আমার উম্মতের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে শাসন করবে ।”

৩. অমঙ্গল ও গোলযোগের সূত্রপাত শাম থেকেই হবে । হাদীসে এসেছে تطير بالشّام অর্থাৎ তা শাম থেকে শুরু হবে । এ কারণেই আমাদের শত্রুরা ঐ দেশটিকে ‘সভ্যতার সূর্যের দেশ’ হিসাবে অভিহিত করে থাকে । বর্তমানে বৃহত্তর শামে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি যদি এর সাথে যোগ করি তাহলে এর অর্থ কী দাঁড়ায় ? আরেকটি রেওয়ায়েতে تطيف بالشّام বাক্যটি এসেছে যার অর্থ হচ্ছে ফিতনা ও গোলযোগ সমগ্র শামকে ঘিরে ফেলবে । আর তখন সেখান থেকে অন্যান্য আরব ও মুসলিম দেশে তা সম্প্রসারিত হবে । আবার ‘ফিলিস্তিনের ফিতনা’ নামক একটি রেওয়ায়েত যদি এর সাথে যোগ করি তাহলে বোঝা যায় এর সমস্যা ও সংকটসমূহ শামের অধিবাসীদের ওপর অন্য সকলের চেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত হবে ।

৪. সমাধানের পথ ও পদ্ধতিসমূহ কার্যকর হবে না এবং এ গোলযোগ দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকবে । কারণ সভ্যতার এ ফিতনা সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ অপেক্ষা গভীরতর । অন্যদিকে উম্মতের প্রতিরোধ- ক্ষমতা এবং শত্রুদের শত্রুতা সমস্যা সমাধানের যাবতীয় উপায় অকার্যকর করে দেবে । যেমন : রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে :

“একদিক থেকে এ ফিতনা অবসানের উদ্যোগ নিতে না নিতেই আরেক দিক থেকে তা প্রকাশ পাবে ।”

কারণ এ ফিতনার অবসানের পথ কেবল উম্মতের মাঝে ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী আ লন ও গণঅভ্যুত্থানের দ্বারা এবং এরপর তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে ।

ঠিক একইভাবে বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঐ ফিতনা হবে সর্বশেষ ফিতনা এবং তা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব পর্যন্ত চলতে থাকবে । কতিপয় রেওয়ায়েতে যদিও শর্তহীনভাবে তা বর্ণিত হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে ঐ ফিতনাকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর ‘আবির্ভাব- পূর্ব ফিতনা’ বলে উল্লেখ করা হয়নি তবুও একে ‘সর্বশেষ ফিতনা’ বলেছে এবং অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসহ উল্লেখ করেছে । আর যেহেতু হাদীসগুলোর সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে ঐ ফিতনা সেহেতু বাধ্য হয়েই শর্তহীন রেওয়ায়েতটি (روایت مطلق) শর্তযুক্ত রেওয়ায়েতের (روایت مقیّد) ওপর আরোপ (حمل) করতে হবে ।[১০]

তবে এ ফিতনার কতিপয় আসল বৈশিষ্ট্য এবং অন্য যে সব বৈশিষ্ট্য অন্যান্য হাদীসে এসেছে তা আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করব । উল্লেখ্য যে, ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে । কারণ, শুরু থেকে এ পর্যন্ত কেবল পাশ্চাত্য ফিতনা ব্যতীত মুসলিম উম্মাহ্ যে সব অভ্যন্তরীণ ও বহিঃফিতনার শিকার হয়েছে সেগুলোর কোনটির সাথে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো খাপ খায় না । তা ছাড়া এ ফিতনা ও গোলযোগ ইসলামের প্রথম যুগের অভ্যন্তরীণ এবং তৎপরবর্তী ফিতনাসমূহ, এমনকি মঙ্গোলদের ফিতনা ও ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের সাথেও (যার ঐতিহাসিক পর্যায়গুলো ৯০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল) মোটেও খাপ খায় না । বরং অনেক দিক থেকেই এগুলো পরস্পর থেকে ভিন্ন ।

তবে ঐ (ক্রুসেড) যুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায়ে পাশ্চাত্য মুসলিম উম্মাহর ওপর সম্মিলিত আক্রমণ চালায় । তাদের সৈন্যবাহিনী সকল মুসলিম দেশে প্রবেশ করে এবং তাদেরকে পর্যদুস্ত করার মাধ্যমে ইসলামী ভূখণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে তাদের ইহুদী মিত্রদের ঘাঁটি স্থাপনে সক্ষম হয় । এটি ঐ (আবির্ভাবকালীন) ফিতনার বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে ।

মহানবী (সা.)- এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে :

“ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার উম্মতের ওপর এমন এক গোষ্ঠী কর্তৃত্ব চালাবে যে, তারা (উম্মত) যদি শ্বাস নেয় তাহলে তারা তাদেরকে হত্যা করবে; আর তারা যদি চুপ

করে বসেও থাকে তবুও তাদের সবকিছুকে তারা (শাসকরা নিজেদের জন্য) বৈধ মনে করবে, তাদের সম্পদগুলোকে তাদের নিজেদের সম্পদ বলে মনে করবে এবং তাদের মান- স ম পদদলিত করে তাদের রক্তপাত করবে এবং তাদের অন্তরসমূহকে ঘৃণা, ভয়- ভীতি ও ত্রাসে ভরে দেবে । তোমরা তাদেরকে সবসময় ভীত- সন্ত্রস্ত দেখতে পাবে । তখন প্রাচ্য থেকে একদল এবং পাশ্চাত্য থেকে আরেক দল এসে আমার উম্মতের ওপর শাসন করবে । তাই অত্যাচারীদের হাতে নির্যাতিত আমার উম্মতের দুর্বল ব্যক্তিবর্গের জন্য আফসোস; আর অত্যাচারীদের ওপর আক্ষেপ এজন্য যে, তাদের ওপর মহান আল্লাহর ঐশী আযাব আপতিত হবে । কারণ তারা না ছোটদের ওপর দয়া করবে, না বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষা করবে । তারা অন্যায় কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না । তাদের দেহ হবে মনুষ্যসদৃশ তবে তাদের অন্তর হবে শয়তানদের অন্তরসদৃশ ।[১১]

গুরুত্বপূর্ণ এ রেওয়ায়েতটি অভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্র এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন করেছে । মুসলিম উম্মাহর ওপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাফিরদের আধিপত্যের কারণ হচ্ছে মুসলিম জাতিসমূহের ওপর দেশীয় শাসনকর্তাদের অন্যায়- অত্যাচার । তারা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মুসলিম জাতিসমূহের স্বাধীনতা হরণ করেছিল ।

কারণ, এ ধরনের অন্যায় আচরণ জনতাকে স্বৈরাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব- সংঘাত তাদেরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম করে ফেলে; আর এর ফলশ্রুতিতে শত্রুরা তাদেরকে ব্যবহার করে অত্যাচারী শাসকবর্গের কবল থেকে তাদেরকে মুক্ত করার বাহানায় ইসলামী দেশসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে । ঠিক এভাবেই নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করেছিলেন; যখন তাঁর যুদ্ধ জাহাজগুলো মিশরের উপকূলের নিকটবর্তী হয়েছিল তখন তিনি মিশরবাসীদেরকে পত্র প্রেরণ করেছিলেন এবং ইসলামের ব্যাপারে তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন । আর মিশরে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যকে তিনি মিশরবাসীদেরকে দাসদের (মামালিক বংশের) অত্যাচার থেকে উদ্ধার বলে অভিহিত করেছিলেন ।

তিনি এ ছলচাতুরীপূর্ণ রাজনীতি মিশর দেশ জবরদখল করার পরেও অব্যাহত রেখেছিলেন, এমনকি তিনি মিশরীয় পোশাক পরে নিজেকে মুসলিম বলে জাহির এবং মহানবী (সা.)- এর জন্মদিবসও পালন করেছিলেন ।

এখন ইংল্যান্ড, । , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াও অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করে দাবি করেছে যে, তারা মুসলিম জাতিসমূহকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্যই তাদের দেশসমূহে প্রবেশ করেছে ।

তারা সর্বদা মুসলিম দেশসমূহে তাদের কর্তৃত্ব স্থায়ীকরণ এবং মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখার জন্যই এ পন্থা ব্যবহার করেছিল ।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পবিত্র এ হাদীসে যে সব বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সূক্ষ্মভাবে এমন সব শাসকবর্গের ওপর বর্তায় যারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে । তেমনিভাবে সেগুলো আজকের ঐ সব মুসলিম শাসকের ওপরও বর্তায় যারা এ ধরনের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ।[১২]

আর এ সব বৈশিষ্ট্য নি রূপ :

১. চিন্তাগত স্বাধীনতা দানের পরিবর্তে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রতিবাদ ও কথা বলার কারণে হত্যাযজ্ঞ চালানো ।

২. যদি মুসলিম জাতিসমূহ তাদের শাসকদের কাজের প্রতিবাদ না করে চুপচাপ বসে থাকে, তাহলে তারা তাদের যাবতীয় বিষয়কে নিজেদের জন্য মুবাহ (বৈধ) বলে মনে করে । কারণ এ সব শাসকের নীতি হচ্ছে এটাই যে, জনগণ যদি তাদের ব্যাপারে কিছু না বলে চুপচাপ থাকে তাহলেও তারা জনগণের ওপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে না ।

৩. ইসলামী দেশসমূহের সম্পদ লুণ্ঠন এ সব সীমা ল নকারী অত্যাচারী শাসকের রাজনীতির মূলমন্ত্রস্বরূপ । আর তারা এটা এমনভাবে করছে যে, মুসলমানদের ধন- সম্পদ যেন তাদের পরিবারবর্গ ও তাদের শাসনের অংশীদার চাটুকার মুনাফিকদের উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ।

৪. মুসলমানদের মান- মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা । যেমন : তাদের দৈহিক সত্তা, ব্যক্তিত্ব, সম্মান, স্বাধীনতা ও ধন- সম্পদের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ ও সীমা ল ন ।

৫. যারা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে এবং যারা বলে যে, 'আমাদের প্রভু মহান আল্লাহ্' অর্থাৎ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ ে াগানের বাস্তবায়ন চায় তাদেরকে হত্যা ।

৬. মুসলমানদের অন্তরসমূহকে ঘৃণা ও ভীতিতে ভরে দেয়া অর্থাৎ এই জুলুম ও অত্যাচারের কারণেই তাদের অন্তরে অত্যাচারী শাসকবর্গের প্রতি অথবা মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি এমন শত্রুতা ও বিদ্বেষ লালিত হয় ।

কিন্তু মহানবী (সা.) যে সব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসী সম্পর্কে বলেছেন, 'তখন প্রাচ্য থেকে একটি গোষ্ঠী এবং পাশ্চাত্য থেকে আরেকটি গোষ্ঠী এসে আমার উম্মতের ওপর শাসনকর্তৃত্ব চালাবে'- এ বিষয়টি রুশ ও পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ব্যতীত আর কারো সাথে খাপ খায় না । রুশ ও পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ মুসলিম দেশসমূহের অত্যাচারী শাসকবর্গের অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে সে সব দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের সকল বিষয় নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়েছে বা নিচ্ছে (যেমন : অতি সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তান ও ইরাকে একই পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আধিপত্য কায়েম করেছে) ।

কখনো কখনো বলা হয় যে, প্রাচ্য থেকে একদল ও পশ্চিম থেকে একদল আসবে তা সম্ভবত আব্বাসীয়দের আ ালন যারা ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ব দিক থেকে এবং ফাতেমীয়দের আ ালন যারা ইসলামী রাষ্ট্রের পশ্চিম দিক থেকে আগমন করেছিল এবং এটি ছিল উমাইয়্যা শাসকবর্গের অন্যায়- অত্যাচারের পরপরই ।

অথবা বলা হয় যে, একদল প্রাচ্যবাসী এবং একদল পাশ্চাত্যবাসী বলতে মঙ্গোলদের আক্রমণও হতে পারে যা পূর্ব দিক থেকে সংঘটিত হয়েছিল অথবা ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ যা আব্বাসীয়দের অন্যায়- অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে পশ্চিম দিক থেকে শুরু হয়েছিল ।

তবে রেওয়ায়েতটির বাহ্য অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা হবে অমুসলিম যারা মুসলমানদের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে । এ কারণেই রেওয়ায়েতটি আব্বাসীয় ও

ফাতেমীয়দের ওপর প্রযোজ্য হয় না । কারণ মুসলমানদের ওপর পাশ্চাত্যবাসী ক্রুসেডারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এ সব আক্রমণের দ্বারা হয় নি; বরং তারা শামে উপকূলীয় এলাকাসমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তারা সেখানেই বসবাস করেছিল । মঙ্গোলিয়রা খুব অল্প সময়ের জন্য মুসলমানদের ওপর রাজত্ব করেছে । পরবর্তীতে ইসলামী দেশসমূহে অবস্থানকারী তাদের অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মিশে যায় ।

এর চাইতেও আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে, মুসলিম বিশ্বের ওপর মঙ্গোলিয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর পরপরই ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হন নি । অথচ হাদীসে উল্লিখিত পাশ্চাত্যবাসীদের বিজয় ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ফিতনা ও গোলযোগসমূহ ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটবে বলা হয়েছে ।

অতএব, বলা যায় হাদীসে উল্লিখিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দু'টি দলের বিষয়টি বর্তমান কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর ওপরই কেবল প্রযোজ্য- যারা হচ্ছে রুশ, ইউরোপীয় এবং মার্কিনীরা । বিশেষ করে আমরা যদি হাদীসটির শেষে তাদের ব্যক্তিত্ব ও গৃহীত নীতি সংক্রান্ত যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে পুরো ব্যাপারটি আমাদের জন্য পরিষ্কার হয়ে যাবে ।

যা হোক তারা যেমন মঙ্গোলদের প্রাচ্যদেশীয় উত্তরসূরি ঠিক তেমনি পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারদেরও উত্তরসুরী । কারণ অধিকতর পছ নীয় অভিমত অনুসারে রেওয়ায়েতসমূহে রুশদের 'তুর্ক' এবং পাশ্চাত্যের জাতিগুলোকে 'রোমান' বলে অভিহিত করা হয়েছে- যাদের সাথে শীঘ্রই আমরা পরিচিত হব ।

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

"তোমাদের অবস্থা এমনই চলতে থাকবে ঐ সময় পর্যন্ত যখন এমন সব সন্তান ভূমিষ্ট হবে যারা গোলযোগ ও ফিতনা ব্যতীত আর অন্য কিছুর সাথে পরিচিত হবে না । পৃথিবী অন্যায়- অত্যাচার দিয়ে এতটা ভরে যাবে যে, কোন ব্যক্তিই তখন মহান আল্লাহকে ডাকার সাহস করবে না । ঠিক

তখনই আমার বংশধরদের মধ্য থেকে মহান আল্লাহ্ এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যে পৃথিবীকে ন্যায় ও সাম্য দিয়ে ভরে দেবে যেমনভাবে তা অন্যায় ও অত্যাচার দিয়ে ভরে গিয়েছিল ।”[১৩]

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বশেষ ফিতনা ও গোলযোগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে । অবস্থা এমনই দাঁড়াবে যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন এক প্রজন্মের উদ্ভব হবে যারা বিচ্যুত চিন্তা ব্যতীত আর কোন চিন্তা এবং অন্যায়- অত্যাচারের রাজনীতি ব্যতীত আর কোন রাজনীতির সাথে পরিচিত থাকবে না । আর এটি হচ্ছে আমাদের মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার এবং পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারকারী সরকার ও রাষ্ট্রসমূহের রাজনীতির একটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা । বর্তমানে মুসলিম শিশুরা এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অশুভ ছায়াতলে প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তারা ইসলামী পরিবেশ, সংস্কৃতি ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে মোটেও পরিচিত নয় । তবে ঐ সব ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম মহান আল্লাহ্ যাদের বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন ।

‘পৃথিবী অন্যায়- অত্যাচার দিয়ে এতটা পূর্ণ হয়ে যাবে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারবে না’- মহানবী (সা.)- এর এ উক্তিটির অর্থ এটিই যে, জালিমদের কার্যক্রম মানব জীবনের সকল দিককে শামিল করবে । আর এ হচ্ছে এমন এক পরিবেশ যা পাশ্চাত্যের আক্রমণ ও আধিপত্য স্থাপনের পর সৃষ্টি হবে । কারণ তাদের আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে কোন কোন সময় কিছু কিছু এলাকায় মুসলমানদের জীবনে অন্যায় ও অত্যাচার বিদ্যমান ছিল না । কিন্তু পাশ্চাত্যের আগ্রাসন, তাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার বিস্তৃতি এবং নব্য অত্যাচারী শাসকবর্গের আধিপত্য বিস্তারের পরই ধীরে ধীরে তাদের অন্যায়মূলক রাজনীতি সকল মুসলিম দেশ ও সেগুলোর কেন্দ্রীয় এলাকাসমূহে বিস্তৃতি লাভ করবে । আর তা এমনভাবে ঘটবে যে, মুসলমানদের কণ্ঠস্বর তাদের বক্ষেই চাপা পড়ে যাবে । এর ফলে কোন ব্যক্তি তখন নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করতে ও বলতে পারবে না যে, ‘আমাদের প্রভু মহান আল্লাহ্’ অথবা ‘আমরা ইসলামের বিধি- বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চাই, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে অন্যায়- অত্যাচার বর্জন করে এর বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করার নির্দেশ দিয়েছেন' অথবা 'এই শাসনকর্তার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বিধান হচ্ছে যে, তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে অথবা শাসনকর্তৃত্ব থেকে অপসারিত করতে হবে' অথবা 'এ ধরনের আইন- কানুন সম্পর্কে মহান আল্লাহর বিধান হচ্ছে এর বিরুদ্ধে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে এবং এর পরিবর্তন সাধন করতে হবে' ।

এর অর্থ এ নয় যে, কোন ব্যক্তিই সার্বিকভাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারবে না । তবে হয়তো কেউ কেউ এ ধরনের চিন্তা করে থাকতেও পারে । কারণ যে বিষয় কাফির, জালিম ও স্বৈরাচারী, এমনকি ধর্মহীনদেরকে ক্রুদ্ধ করে তা হচ্ছে মহান আল্লাহর নাম ও তাঁর স্মরণ, বিশেষ করে যখন কুফর, জুলুম এবং জালিমদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের সাথে দ্বন্দ্ব- সংঘাতের সৃষ্টি হয় ।

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে : "কোন ব্যক্তিই 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' (لا إله إلّا الله) বলতে পারবে না ।"

খুব স্পষ্ট যে, এ বাণীটির অর্থ হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তিই মহান আল্লাহর একত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দিতে এবং সেই কাফির ও অত্যাচারীদের কর্তৃত্বকেও প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না যারা মহান আল্লাহর আইন- কানুন মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করে না ।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- এর নিকট থেকে বর্ণিত :

"তোমাদের নবীর আহলে বাইতের প্রশাসনের কতগুলো নিদর্শন আছে যা আখেরী যামানায় প্রকাশিত হবে... । ঐ সব নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঐ যুগটাও যখন রোমান ও তুর্করা অন্যদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে ও বিদ্রোহ করাবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীসমূহ মোতায়েন করবে ।... আর তুর্কীরা রোমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাবে ।"[১৪]

স্পষ্ট যে, রোমান ও তুর্কীদের ফিতনা ও গোলযোগ এবং ইসলামী দেশসমূহের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ও তৎপরতা সংক্রান্ত হযরত আলীর বাণী ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত ।

রেওয়ায়েতটিতে ব্যবহৃত إستأثرت শব্দটি সূক্ষ্ম অর্থ বহন করে । অর্থাৎ তারা ইসলামী দেশসমূহের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ করার জন্য এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যা তাদের প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় বাহক । আর ঠিক এভাবেই 'তুর্কী ও রোমানরা পরস্পর মতবিরোধ করবে' (يتخالف الترك و الروم) - এ বাক্যাংশ থেকে বোঝা যায় যে, তুর্কী ও রোমানরা পরস্পর মিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রভাবাধীন এলাকাসমূহের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও সেগুলো ভাগাভাগি করার বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে লিপ্ত হবে ।

কিন্তু ঐ অবস্থায়ই মুসলিম উম্মাহর সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার জন্য তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহ করানো এবং সেনাশক্তি প্রস্তুত করার ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা করবে । আর প্রকৃত চিত্রও হচ্ছে ঠিক এমনই ।

পৃথিবীতে যুদ্ধ- বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব- সংঘাত বৃদ্ধি পাবে । কোন মহাদেশই যুদ্ধ ও সংঘাত থেকে মুক্ত থাকবে না । আর কোন একটি যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই আরেকটি যুদ্ধের উদ্ভব হবে । এ সব কিছু রোমান ও তুর্কীদের প্রতিশোধ মনোবৃত্তি এবং নিজেদের অন্তর্বিরোধের কারণেই সৃষ্টি হবে । আর তাদের ইহুদী পৃষ্ঠপোষকরা সুযোগ পেলেই যে কোন সময় এবং যে কোন স্থানে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে । 'রোমান' ও 'তুর্কী' শব্দদ্বয়ের অর্থ শীঘ্রই বর্ণনা করা হবে ।

হযরত আলী (আ.)- এর নিকট থেকে বর্ণিত আছে : "হে লোকসকল! আমাকে হারানোর আগেই তোমরা যা কিছু জানতে চাও তা আমার কাছ থেকে জেনে নাও । কারণ আমার বক্ষে অনেক জ্ঞান আছে । ঐ উষ্ট্র যাকে বশীভূত করার ফলে খুরের নিচে লাগাম আটকে যায়, ফলে তার ভীতি ও অস্থিরতা চরমভাবে বৃদ্ধি পায় সেরূপ ফিতনা তোমাদের দেশ ও জনপদ ধ্বংস করা এবং তোমাদের দেশ ও ভূখণ্ডের ওপর এর অশুভ ছায়া বিস্তার করার আগেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও । অথবা পাশ্চাত্য হতে যে আগুনটি শুষ্ক ও প্রচুর জ্বালানি কাঠের ওপর পতিত হবে তার সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখা গর্জে ওঠার আগেই (তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যা জানা প্রয়োজন তা জেনে নাও) । ঐ প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষী ও রক্তের বদলা গ্রহণকারীদের জন্য দুর্ভোগ!

যখন কালের চাকার আবর্তন দীর্ঘ হবে (ইমাম মাহ্দীর আগমন বিড়ম্বিত হবে), তখন তোমরা বলবে যে, সে মারা গেছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে (আর যদি জীবিতও থাকে) তাহলে সে যে কোথায় চলে গেছে । আর ঠিক তখনই নি োক্ত আয়াতটি বাস্তব রূপ লাভ করবে । আয়াতটি হলো :

(ثمّ رددنا لكم الكرة عليهم و امددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيرا)

"অতঃপর আমরা তাদের ওপর বিজয়কে তোমাদের দিকে ঘুরিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করব এবং তাদের চেয়ে তোমাদের সংখ্যাকে অধিক করে দেব ।"

আর এরও বেশ কিছু নিদর্শন আছে ।[১৫] হযরত আলী (আ.) পাশ্চাত্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হওয়ার বিষয়টি 'শুষ্ক প্রচুর জ্বালানি কাঠে আগুন পতিত হবে'- এ উক্তির দ্বারা ব্যক্ত করেছেন । এ যুদ্ধের কারণ হচ্ছে ঐ ফিতনা যা পূর্বাঞ্চলে প্রকাশ পাবে অথবা যা রোমানদের বিরুদ্ধে প্রাচ্যদেশীয় তুর্কী অর্থাৎ রুশদের দ্বারা সৃষ্ট যুদ্ধের কারণেও হতে পারে ।

আমরা শীঘ্রই হাদীসসমূহের ভাষ্য অনুযায়ী এবং আমাদের অভিমত অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে যে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে তার বর্ণনা সেই বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের অধ্যায়ে দান করব ।

মহানবী (সা.)- এর নিকট থেকেও বর্ণিত হয়েছে : "আখেরী যামানায় আমার উম্মতের ওপর তাদের শাসকের পক্ষ থেকে এমন এক কঠিন বিপদ আপতিত হবে যার চেয়ে কঠিন কোন বিপদের কথা এর আগে কখনই শোনা যায় নি ।"

ঐ বিপদ এমনই হবে যে, তাদের জন্য বিস্তৃত এ পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং পৃথিবী শোষণ ও উৎপীড়ন দ্বারা এতটা পূর্ণ হয়ে যাবে যে, অন্যায় থেকে বাঁচার জন্য কোন মুমিনই নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না । আর এটি মহান আল্লাহ্ কর্তৃক আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে । সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে ঠিক সেভাবে যেভাবে তা অন্যায় ও অত্যাচার দিয়ে ভরে যাবে । আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা তার

প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং যমীন তার প্রোথিত সম্পদরাজি বের করে দেবে; ঐ সময় আসমান রহমতের বৃষ্টিবর্ষণ করা থেকে বিরত থাকবে না ।”[১৬]

হুযাইফা বিন ইয়ামান মহানবী (সা.)- এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন : “আমার ঐ উম্মতের জন্য আফসোস যারা অত্যাচারী শাসকদের হাতে নিহত হবে এবং ঐ অত্যাচারী শাসকরা তাদেরকে তাদের ঘর- বাড়ি ও মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করবে । তবে যারা তাদের আনুগত্য করবে কেবল তারা ব্যতীত । ঐ সময় পরহেজগার মুমিনগণ মুখে মুখে তাদের সাথে আছে বলে জাহির করবে অথচ অন্তরে তারা তাদের থেকে পৃথক থাকবে । আর যখন মহান আল্লাহ্ চাইবেন ইসলামের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে তখন তিনি প্রত্যেক যুদ্ধবাজ অত্যাচারীর পৃষ্ঠদেশ চূর্ণ করে দেবেন । তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান । তিনি ধ্বংসের পর মুসলিম উম্মাহর অবস্থা পুনরায় বিন্যস্ত এবং সংশোধন করে দেবেন । হে হুযাইফাহ্! পৃথিবীর বয়স যদি এক দিনের বেশি নাও থাকে তবু মহান আল্লাহ্ ঐ দিবসকে এতটা দীর্ঘ করবেন যে, আমার আহলে বাইত থেকে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে শাসন করবে এবং ইসলামকে প্রকাশ্যে বিজয়ী করবে । আর মহান আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান ।”[১৭]

মহানবী (সা.) বলেছেন : “শীঘ্রই বিভিন্ন জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহবান করবে, দস্তরখানের দিকে যেভাবে নিমন্ত্রণের আহবান করা হয় ঠিক সেভাবে । যদিও তোমরা সংখ্যার দিক থেকে অনেক হবে তবুও প্রবল স্রোতের সামনে খড়কুটার মতো হবে তোমাদের অবস্থা । মহান আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ব্যাপারে তাদের ভয়- ভীতি দূর করে দেবেন এবং দুনিয়ার প্রতি তোমাদের আগ্রহ এবং মৃত্যুকে অপছ   করার কারণে তোমাদের অন্তরকে তিনি দুর্বল করে দেবেন ।”[১৮]

এ সব রেওয়ায়েত অত্যন্ত স্পষ্ট যেগুলোর ওপর নবুওয়াতের নূর বিচ্ছুরিত হয়েছে । এ হাদীসগুলো অত্যাচারী শাসকবর্গ ও আধিপত্য বিস্তারকারী শত্রুদের সাথে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্ক এবং তৎকালীন অবস্থা ব্যক্ত করে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করেছে ।

মহানবী (সা.)- এর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে :

"আরবদের জন্য আফসোস ঐ অমঙ্গলের কারণে যা তাদের নিকটবর্তী । সেই ডানাগুলোই বা কি? ঐ বাতাস যার প্রবাহ ধ্বংস সাধনকারী; ঐ বাতাস যার প্রবাহ সবকিছু উচ্ছেদকারী এবং ঐ বাতাস যার প্রবাহ শৈথিল্য আরোপকারী সেটা কি? তাদের জন্য আক্ষেপ এজন্য যে, তাদের ওপর তাৎক্ষণিক মৃত্যু, কষ্টকর ক্ষুধা এবং বিপদাপদ আপতিত হবে ।"[১৯]

ডানাগুলোর অর্থ বোমারু বিমান হতে পারে যা দ্রুত ও মৃদুম বাতাসের মতো আসে এবং অগণিত হত্যাকাণ্ড ঘটায় অথবা এমন বাতাস যা শক্তিশালী ও দুর্বল বোমাসমূহের উপর্যুপরি বিস্ফোরণে সৃষ্ট হয় । এ ডানাগুলো ঐ সব ডানাও হতে পারে যেগুলোর বর্ণনা পবিত্র কুদস মুক্ত করার জন্য সুফিয়ানী এবং ইহুদী ও রোমানদের সমর্থক আরবদের বিরুদ্ধে ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুদ্ধ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে । কারণ ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে :

"তখন মহান আল্লাহ্ বাতাস ও পাখিসমূহকে রোমানদের ওপর কর্তৃত্বশীল করে দেবেন যারা নিজেদের ডানা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডলে এমনভাবে আঘাত হানতে থাকবে যে, এর ফলে তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে এবং মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং তাদেরকে গ্রাস করবে ।"[২০]

আবার সেগুলো আবাবীলের মতো সত্যিকার পাখির ডানাও হতে পারে অথবা উড়োজাহাজের মতো যুদ্ধাস্ত্রও হতে পারে যা ইমাম মাহদী (আ.) ব্যবহার করবেন ।

আর এতৎসংক্রান্ত আলোচনা আমরা আল কুদস মুক্ত করার বৃহৎ যুদ্ধ এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আ লন সংক্রান্ত অধ্যায়ে অবতারণা করব ।

মহানবী (সা.)- এর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : "মুশরিকগণ মুসলমানদেরকে নিজেদের কাজে নিয়োজিত করবে- তাদেরকে বিভিন্ন শহরে কেনা- বেচা করবে এবং ভাল- ম কোন ব্যক্তিই এ কাজ করতে ভয় পাবে না । এই বিপদ সে সময়ের জনগণকে এতটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে যে, তারা সবাই নিরাশ হয়ে যাবে এবং ভাবতে থাকবে তাদের মুক্তির আর কোন উপায়ই নেই । ঠিক তখন মহান আল্লাহ্ আমার পবিত্র বংশধরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন যে হবে ন্যায়পরায়ণ, পুণ্যময় এবং পবিত্র । সে ইসলামের কোন বিধানই

উপেক্ষা করবে না । মহান আল্লাহ্ তার মাধ্যমে ধর্ম, কোরআন, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মান- সম্মান প্রদান করবেন এবং মুশরিকদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবেন । সে সবসময় মহান আল্লাহকে ভয় করবে এবং মহান আল্লাহর বিধি- বিধান প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নিজ আ ীয়- স্বজনের দ্বারা প্রতারিত হবে না । সে (তার নিজের জন্য) পাথরের ওপর পাথর সাজাবে না এবং ইমারতও নির্মাণ করবে না । একমাত্র শারয়ী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সে কোন ব্যক্তিকে চাবুক মারবে না । তার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ সকল বিদআতের মূলোৎপাটন করাবেন এবং সকল ফিতনার অবসান ঘটাবেন । তার মাধ্যমে প্রতিটি সত্য ও ন্যায়সংগত অধিকারের দরজা উন্মুক্ত হবে এবং বাতিলের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে । আর যেখানেই মুসলমানরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা থাকুক না কেন আল্লাহ্ তার মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করে তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করাবেন ।”[২১]

এ রেওয়ায়েতটি মুসলমানদের দুর্বল করার প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য দেশে তাদের (দাসদের মতো) বেচাকেনা ও বি ত্বের বেদনাময় অবস্থা চিত্রিত করেছে । আর এ অবস্থা কেবল আমাদের যুগ এবং যে সব মুসলমান লাঞ্ছনা সহকারে মুশরিকদের কর্মচারী ও সেবকে পরিণত হয়েছে বা হচ্ছে তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়; বরং মুসলিম জাতিসমূহকে নিজেদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়ন এবং মুশরিকগণ কর্তৃক তাদের ব ীদশা সংক্রান্ত যে সব লেন- দেন সাধিত হচ্ছে সেগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে ।

অতঃপর এ রেওয়ায়েত স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঐ নিরাশার মধ্যেই হঠাৎ মানব জাতির মুক্তিদাতা প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন যাঁর জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হোক!

তৃতীয় অধ্যায়

রোমানরা এবং আবির্ভাবের যুগে তাদের ভূমিকা

আখেরী যামানা (সর্বশেষ যুগ) এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাব কালের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে 'রূম' (روم) শব্দের অর্থ 'ইউরোপীয় জাতিসমূহ' । বিগত শতাব্দীগুলোতে আমেরিকা মহাদেশেও তাদের বিস্তৃতি ঘটেছে । অর্থাৎ আমেরিকা মহাদেশের ইউরোপীয় বংশোদ্ভূতগণও রোমের সন্তান এবং ঐতিহাসিক রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ।

কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে যে, রোমানদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের একটি সূরা (সূরা রূম) অবতীর্ণ করেছেন এবং পরবর্তীকালে মহানবী (সা.) ও মুসলমানগণ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তারা এদের থেকে ভিন্ন । কারণ তারা ছিল বাইজানটাইনীয় যাদের আদি রাজধানী ছিল ইতালীর রোম নগরী । অতঃপর ক টানটিনোপল নগরী ৫০০ বছর আগে মুসলমানদের হাতে বিজিত হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজধানী বলে গণ্য হতো । মুসলমানগণ বিজিত এ নগরীর নাম দেয় 'ইসলাম বূল' এবং সাধারণ জনগণ এ শহরের নাম 'ইস্তাম্বূল' উচ্চারণ করত ।

এটি ঠিক যে, রোমানগণ সূরা- ই রূম অবতীর্ণ হওয়া এবং তাদের ব্যাপারে রেওয়ায়েতসমূহ বর্ণিত হওয়ার সমসাময়িক রোমান বা বাইজানটাইনীয় সাম্রাজ্যের সমর্থক বলে প্রসিদ্ধ ছিল । তবে আজকের পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা এদের থেকে ভিন্ন নয় । বরং বর্তমানকালের পাশ্চাত্যবিশ্ব হচ্ছে অতীত রোমান সভ্যতা ও রাজনীতিরই সম্প্রসারিত রূপ এবং তাদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ । আর (বর্তমানকালে) ফরাসী, ব্রিটিশ এবং জার্মান জাতিগুলো সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও রোমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্তম্ভ বলে গণ্য হয় । যেহেতু এ সব জাতি ঐ সময় রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল এবং রোমান সাম্রাজ্যের উপনিবেশ বলে গণ্য হতো সেহেতু এ বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না ।

বরং দীর্ঘ ২০০ বছর রোম ও ক টানটিনোপল ছিল রোমান বাইজানটাইনীয় রাজন্যবর্গ এবং আমীর- অমাত্যদের রাজধানী । অথচ তাদের সবাই ইতালীয় জাতিভুক্ত এবং একই বংশোদ্ভূত ছিলেন না । বরং তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন ইউরোপীয় গোত্র ও জাতিভুক্ত । অতঃপর গ্রীস বাইজানটাইনীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হলে রাজন্যদের মধ্যে গ্রীকদেরকেও দেখা যেত ।

আর সম্ভবত এ কারণেই রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল এবং তা ক টানটিনোপল ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলে তা মুসলিম জাতিসমূহ কর্তৃক আরোপিত সামুদ্রিক অবরোধের সম্মুখীন হয় এবং ইউরোপীয়রা রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের দাবি তোলে । তাই জার্মানী ও অন্যান্য দেশের কতিপয় শাসনকর্তা নিজেদেরকে 'কায়সার' (সিজার) বলে ঘোষণা করে ।

সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার । কারণ সরকার ও প্রশাসন এক দেশ থেকে আরেক দেশে এবং এক জাতি থেকে আরেক জাতিতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে । তাই এ স্থানান্তর পূর্ববর্তী সরকার ও প্রশাসনের নাম ও তার মৌলিক বিশেষত্বের সাথে মোটেও অসংগতিপূর্ণ নয় ।

সুতরাং যে সব রেওয়ায়েত রোমানদের ভবিষ্যৎ অথবা আরবদের ভাষায় 'বনি আসফার' বা হলুদ বর্ণবিশিষ্টদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ সকল ইউরোপীয় জাতিকে বাদ দিয়ে শুধু ইতালীয় বাইজানটাইনীয় রোমানগণ নয় ।

এ কারণেই মুসলমানরা তাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে ইউরোপীয়দেরকে কখনো কখনো 'রোমান' এবং কখনো কখনো 'ফিরিঙ্গী' বলে উল্লেখ করেছে এবং 'রূম' ও 'রোমান'- এর বহুবচন আরওয়াম করেছে ।

অধিকন্তু সূরা রূমের ৩১ ও ৩২ নং আয়াত এবং সূরা কাহাফের ১২ ও ২১ নং আয়াতসমূহে যা কিছু মহান আল্লাহর সাথে তাদের শরিক স্থাপন এবং তাদের অনুসারী বিভিন্ন জাতির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এ সব গোষ্ঠী ও জাতির কাঙ্ক্ষিত অর্থ হচ্ছে হযরত মসীহ্ (আ.)- এর অনুসারী হওয়ার দাবিদার ইউরোপীয় জাতি ও গোষ্ঠীসমূহ । এটি সুস্পষ্ট

যে, খ্রিস্টান জাতিসমূহের ধর্মীয় নেতৃত্ব ইতালীয় এবং ক টানটিনোপলের রোমানদের হাতে ন্যস্ত ছিল । অতঃপর বর্তমান পাশ্চাত্যবিশ্ব তাদের থেকে তা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছে ।

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগ সংক্রান্ত বহু রেওয়ায়েতে রোমের নাম উল্লিখিত হয়েছে । যেমন : তাদের ফিতনা ও গোলযোগ এবং মুসলমানদের ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ । আর এ সংক্রান্ত বিবরণগুলো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ।

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কিছু কাল আগে আরব ভূখণ্ডের উপকূলীয় এলাকাসমূহের দিকে রোমানদের যুদ্ধ জাহাজগুলোর আগমন সংক্রান্ত আরো কিছু রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে ।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : "যখন শামে তুমি বিপদাপদ ও বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করবে তখন হতে আরব দেশসমূহের দিকে পাশ্চাত্যের অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত রয়েছে কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু । তখন তাদের মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা সংঘটিত হবে ।"[২২]

আবির্ভাবের যুগ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত শামের ফিতনা ও গোলযোগ, মুসলিম উম্মাহর ওপর ধর্মদ্রোহীদের আধিপত্য বিস্তার ও গোলযোগ সৃষ্টি করার পর যে সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উদ্ভব হবে সেগুলোর সাথে মিলে যায় । তা এ কারণে যে, বনি আসফার অর্থাৎ পাশ্চাত্য ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের তীব্র প্রতিরোধ[২৩] এবং সেখানে বিদ্যমান রাজনৈতিক আ ালন ও সংঘাত- সংঘর্ষের কারণে ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় এবং অত্র এলাকায় তাদের সামরিক আগ্রাসন ভবিষ্যতে আরব দেশসমূহের মুসলমানদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকায় তাদের প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ করার বিষয়টিকে অনিবার্য বলে বিবেচনা করবে ।

হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত : "রমযান মাসের ফজরের সময় পূর্ব দিক থেকে একজন আহবানকারী আহবান করে বলবে : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে একত্রিত হও । আর সাদা ভাব মিলিয়ে যাবার পর পশ্চিম দিক থেকে আরেক জন আহবানকারী বলবে : হে বাতিলপন্থীরা! তোমরা সবাই একত্রিত হও ।

রোমানরা আসহাব-ই কাহাফের গুহার নিকটবর্তী সমুদ্র সৈকতে আগমন করবে এবং মহান আল্লাহ্ ঐ সব যুবককে তাদের কুকুরসহ গুহা থেকে বের করে আনবেন । তাঁদের মধ্য থেকে মালীখা ও খামলাহা নামের দু'ব্যক্তি থাকবেন যাঁরা হযরত কায়েমের (মাহদী) নির্দেশাবলী মেনে নেবেন ।"[২৪]

এই সামরিক অভিযান হয়তো অতীতের সামরিক অভিযানেরই ধারাবাহিকতা অথবা আবির্ভাবের কাছাকাছি সময়ের অভিযানও উদ্দেশ্য হতে পারে । আর রেওয়ায়েত থেকে যেন বোঝা যায় যে, এই সামরিক অভিযান ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের আ লনের খুব কাছাকাছি সময় সংঘটিত হবে । কারণ ঘটনাসমূহ রমযান মাসে আসমান থেকে একের পর এক গায়েবী ধ্বনির পরপরই শুরু হবে এবং মুহররম পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে । আর ইমাম মাহদী মুহররমের দশ তারিখের রাত অথবা দিবসের মধ্যে আবির্ভূত হবেন ।

কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য বাহিনীসমূহ শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং আক্কা ও সূর এলাকায় এবং উপরিউক্ত রেওয়ায়েত অনুসারে আসহাব-ই কাহাফের গুহার কাছে অর্থাৎ সিরিয়া-তুরস্কের সমুদ্র সৈকতের কাছে অবস্থিত আনতাকিয়ায় অবতরণ করবে ।

আসহাব-ই কাহাফ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আছে : মহান আল্লাহ্ তাদেরকে আখেরী যামানায় আবির্ভূত করাবেন যাতে করে তারা জনগণের জন্য নিদর্শন বলে গণ্য হতে এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথী হতে পারেন । আমরা ইমাম মাহদী (আ.)-এর সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারে যে আলোচনা করব সেখানে আসহাবে কাহাফের ব্যাপারেও আলোচনা করব ।

ঐ অতি সংবেদনশীল সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্যবাহিনীর আগমনের মুহূর্তে আসহাব-ই কাহাফের আবির্ভূত হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁরা খ্রিস্টানদের জন্য মুজিযা বলে গণ্য হবেন; কারণ রেওয়ায়েতসমূহ অনুযায়ী ইমাম মাহদীর সঙ্গী-সাথীরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের আসল কপিসমূহ আনতাকিয়ার গুহা থেকে বের করে আনবেন এবং এগুলোর মাধ্যমে তাঁরা রোমান ও

ইহুদীদের সাথে আলোচনা ও বিতর্ক করবেন । এই গুহাটি আসহাব- ই কাহাফের গুহা অথবা অন্য কোন গুহাও হতে পারে ।

ইমাম বাকির (আ.)- এর নিকট থেকে জাবির জুফী বর্ণনা করেছেন : "তিনি বলেছেন : রোমের বিদ্রোহীরা অতি শীঘ্রই রামাল্লায় অবতরণ করবে । হে জাবির! ঐ বছর পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রচুর দ্বন্দ্ব- সংঘাত সংঘটিত হবে ।"[২৫]

অবশ্য এই বিদ্রোহীরা পাশ্চাত্যের বেতনভুক চর হতে পারে যারা ইহুদীদের পক্ষে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনের রামাল্লায় আসবে । বাহ্যত এ মতবিরোধ পাশ্চাত্য অথবা মাগরিব (লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও মরক্কো)- এর পক্ষ থেকে হতে পারে । কারণ এর পরপরই রেওয়ায়েতটিতে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম যে ঘটনা শামে ঘটবে তা হচ্ছে সে দেশের ধ্বংস সাধন এবং সম্ভবত তা পাশ্চাত্যের কারণেই হবে ।

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে এমন কিছু বিষয় আহলে বাইত থেকে সূরা রূমের প্রথম দিকের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে :

(بسم الله الرّحمان الرّحيم ا لم غلبت الرّوم في أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء و هو العزيز الرّحيم)

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে । আলিফ লাম মীম । রোমানরা পরাজিত হয়েছে । নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর বিজয়ী হবে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই । অগ্র- পশ্চাতের কাজ মহান আল্লাহর হাতেই । সেদিন (যেদিন রোমানরা বিজয়ী হবে) মুমিনগণ আনন্দিত হবে মহান আল্লাহর সাহায্যে । তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।"[২৬]

ইমাম বাকির (আ.) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহর সাহায্য'- কে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব হিসাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁকে রোমানদের ওপর বিজয়ী করবেন ।[২৭]

এতদপ্রসঙ্গে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে ঐ সব রেওয়ায়েতও আছে যেগুলোতে হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণ এবং ইসলাম গ্রহণ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর অনুসরণ করার প্রতি খ্রিস্টানদেরকে তাঁর আহ্বান জানানোর বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে । আর এ সব রেওয়ায়েত মহান আল্লাহর নি োক্ত বাণীটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে :

“তিনি (ঈসা) কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন ।”[২৮]

“তার মৃত্যুর আগে সকল আহলে কিতাব তার প্রতি ঈমান আনবে এবং সে কিয়ামত দিবসে তাদের ওপর সাক্ষী থাকবে ।”[২৯]

হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.) কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন । আর যখন তিনি পৃথিবীতে আসবেন তখন সকল খ্রিস্টান ও ইহুদী তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তারা তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁকে এবং তাঁর মুজিযাসমূহকে প্রত্যক্ষ করবে ।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর সাহায্যে এবং যে সব মুজিযা মহান আল্লাহ্ তাঁকে দেবেন সেগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে রোমানদের সাথে আলোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত হবেন ।[৩০]

ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ করার পর পাশ্চাত্য দেশগুলোর শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের বিদ্রোহ এবং সে সব দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন । এতৎসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ আমরা হযরত মসীহ্ (আ.)- এর পৃথিবীতে অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করার সময় প্রদান করব ।

আলোচ্য রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে মুসলমান ও রোমানদের মধ্যকার যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ বিদ্যমান । হযরত মাহ্দী (আ.) রোমানদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন । বাহ্যত এ চুক্তিটি ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর সেনাবাহিনী এবং ইহুদী ও রোমানদের সমর্থনপুষ্ট সুফিয়ানী বাহিনীর মধ্যে আক্কা- কুদস- আনতাকিয়া ট্রায়াঙ্গলে কুদস মুক্ত করার যে বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হবে তার পরে সম্পাদিত হবে । ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর বিজয়, আল কুদসে তাঁর প্রবেশ এবং ঈসা (আ.)- এর অবতরণের পরে এ ঘটনা ঘটবে । সম্ভবত হযরত ঈসা (আ.)

এ যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব পালন করবেন । এ ব্যাপারে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব ।

মহানবী (সা.)- এর নিকট থেকে বর্ণিত : “হে আউফ! কিয়ামতের আগে ছয়টি ঘটনা স্মরণে রেখ... যে ফিতনা ও গোলযোগ থেকে কোন আরব পরিবার ও ঘর নিরাপদ থাকবে না । তন্মধ্যে তোমাদের ও ‘বনি আসফার’- এর (পাশ্চাত্য) মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে । এরপর তারা তোমাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং ৮০টি সেনাদল যাদের প্রতিটিতে ১২০০০ সৈন্য থাকবে, তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে ।”[৩১]

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত : “তোমাদের ও রোমানদের মাঝে চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে । এগুলোর চতুর্থটি হিরাক্লিয়াসের বংশের এক ব্যক্তির সাথে হবে এবং তা দু’বছর টিকে থাকবে । এই সময় সুদাদ ইবনে গাইলান নামীয় আবদুল কাইস গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : ঐ সময় জনগণের (মুসলমানদের) নেতা কে থাকবেন? তিনি বললেন : আমার বংশধর মাহদী ।”

কিছু রেওয়ায়েতে উক্ত চুক্তির মেয়াদ আট বছর হবে বলা হয়েছে । কিন্তু দু’বছর পরেই পাশ্চাত্য ঐ চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং ৮০টি পতাকাধারী প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিন ও শামের সমুদ্র সৈকতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে ।

এর পরপরই ইমাম মাহদী (আ.) ইউরোপ ও অনৈসলামী বিশ্ব জয় করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রযাত্রা শুরু করবেন যা আমরা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের আ লন সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করব ।

রোমানদের সাথে সুফিয়ানীর সম্পর্ক, তার পরাজয়ের পর তার সমর্থকদের রোম অর্থাৎ পাশ্চাত্যে পলায়ন এবং হযরত মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথী কর্তৃক তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ :

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত : “যখন আল কায়েম (মাহদী) আ লন শুরু করবে এবং বনি উমাইয়্যার (সুফিয়ানীদের) বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে তখন তারা রোমের দিকে পালিয়ে যাবে । রোমানরা তাদেরকে বলবে : যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ না করবে ততক্ষণ

পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার দেব না । তারা তা মেনে নেবে এবং রোমানরাও তাদেরকে রোমে প্রবেশ করতে দেবে । ঠিক তখনই ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী-সাথীরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে । তখন তারা সন্ধির প্রস্তাব দেবে । ইমাম মাহদীর অনুসারীরা তাদেরকে প্রত্যুত্তরে বলবেন : যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ধর্মানুসারীদের আমাদের হাতে অর্পণ না করবে সে পর্যন্ত আমরা তোমাদের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা দেব না । অতঃপর তারা তাদেরকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথীদের হাতে তুলে দেবে ।”[৩২]

অন্যান্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, সুফিয়ানী পাশ্চাত্যমনা হবে । সে প্রথমে পাশ্চাত্যে বসবাস করবে ও এরপর শামে এসে সেখান থেকে তার আন্দোলন শুরু করবে । আমরা এ বিষয়টি পরে বিস্তারিত আলোচনা করব ।

শেখ তূসীর ‘গাইবাত’ গ্রন্থে বর্ণিত আছে : “যে সুফিয়ানী কওমের নেতা হবে সে রোম থেকে আন্দোলন শুরু করবে এমতাবস্থায় যে, তার গলায় তখন ক্রুশ থাকবে ।”[৩৩]

ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক রোম বিজয় এবং তাঁর হাতে রোমানদের ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আছে, পাশ্চাত্য কর্তৃক শান্তি চুক্তি ভঙ্গ, ফিলিস্তিন ও শামের সমুদ্র সৈকতের ওপর তাদের সামরিক আক্রমণ এবং তাদের পরাজয় বরণের পরপরই এ ঘটনা ঘটতে পারে । এ যুদ্ধটিই ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে রোমানদের সবচেয়ে তীব্র যুদ্ধ হতে পারে- যার পরপরই ইসলাম ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ ঝুঁকে পড়বে ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে : “তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ৭০০০০ মুসলমান রোম দখল করবে ।”[৩৪]

“স্বয়ং পাশ্চাত্যবাসীদের আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং তাদের তাকবীরের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের এ রাজধানীর পতন হতে পারে । আর সে সময় ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা তাদেরকে সাহায্য করবেন ।”

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “তখন রোমবাসীরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবে । তিনি তাদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন । এরপর তিনি তাঁর সঙ্গী- সাথীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সেখানে তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে প্রত্যাবর্তন করবেন ।”[৩৫]

বাহ্যত পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের মাঝে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন । যে দু’তিন বছর ইমাম মাহদী (আ.) ও পাশ্চাত্যের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে সেই বছরগুলোতে সম্ভবত হযরত ঈসা পাশ্চাত্যে অবস্থান করবেন অথবা অধিকাংশ সময় তিনি পাশ্চাত্যে কাটাবেন ।”

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালে তুর্কীদের ভূমিকা

আমাদের দৃষ্টিতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর শুভ আবির্ভাব ও আে ালন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত ‘তুর্ক’ অর্থ রুশ জাতি এবং পূর্ব ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্য থেকে তাদের সমর্থকবৃ হতে পারে। যদিও তারা ঐতিহাসিকভাবে খ্রিস্টান এবং রোমান সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শাসন কবলিত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং জার্মানদের ন্যায় তারাও রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার দাবি করে নিজেদের রাজা- বাদশাহদেরকে ‘সিজার’ উপাধিতে ভূষিত করেছে। তদুপরি যেহেতু তারা প্রথমত ইউরেশিয়ার পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন গোত্রভূত সেহেতু তাদেরকে রেওয়ায়েত ও ইতিহাসের ভাষায় ‘তুর্কী জাতিসমূহ’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ নাম তুরস্ক ও ইরানের তুর্কীদের ছাড়াও তাতার, মঙ্গোল, বুলগার, রুশ ও অন্যান্যদেরকেও শামিল করে।

দ্বিতীয়ত : সম্প্রতি খ্রিস্টধর্ম তাদের মাঝে প্রসার লাভ করেছে। তবে এর আগে তাদের মধ্যে মৌলিকভাবে এ ধর্মের প্রসার হয় নি; বরং খ্রিস্টানরা একটি অপরিপক্ব শ্রেণী হিসাবে তাদের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের অবস্থার চেয়েও এদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের অবস্থা শোচনীয়। কারণ শিরকমিশ্রিত বস্তুবাদ তাদের ধর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। আর সম্ভবত এ কারণেই তারা কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং এ মতবাদের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ করে নি।

তৃতীয়ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে তুর্কীদের আক্রমণ পরিচালনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের কিছু অংশ সপ্তম হিজরী শতকে মধ্য এশিয়া, ইরান, ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অংশে তুর্কী- মঙ্গোলদের আক্রমণসমূহের সাথে মিলে যায়। তবে এ সব রেওয়ায়েতের কিছু অংশ মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ঘটনাবলীর সাথে সংযুক্ত এবং তাতে তুর্কীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমানদের সহযোগিতা করবে বলা হয়েছে এবং ঐ একই সময় তাদের মধ্যকার পারস্পরিক মতপার্থক্যের বিষয়টিও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি রুশ জাতি ব্যতীত অন্য

কারো ওপরই আরোপ করা যায় না। তবে যদি এর পরিধি আরো বর্ধিত করা যায় তাহলে তাদের রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উত্তরসূরিদের ওপরও তা আরোপ করা যাবে যারা রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের তুর্কী বংশোদ্ভূত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে ঐ সব রেওয়ায়েত থেকে গুটিকতক নমুনা পেশ করা হলো যেগুলোয় তাদের ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ফিতনা ও গোলযোগ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ : উল্লেখ্য যে, এ ফিতনা তুর্কী ও রোমানদের পক্ষ হতে মুসলমানদের ওপর আপতিত হবে যা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। আর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম দেশসমূহের ওপর রুশ ও পাশ্চাত্যের পরিচালিত আক্রমণ ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এ ফিতনা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মহান আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহর মাঝে মাহদী (আ.)- এর ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী আন্দোলন এবং তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে তা প্রশমিত করবেন।

তুর্কীদের সাথে সুফিয়ানীর যুদ্ধ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহও এ সব রেওয়ায়েতের সাথে জড়িত এবং এ সব রেওয়ায়েতে সম্ভবত তুর্কীদের অর্থ হচ্ছে রুশ জাতি। কারণ সুফিয়ানী রোম ও ইহুদীদের মিত্র হবে এবং হাদীসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সিরিয়ার ওপর তুর্কীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই সিরিয়া- জর্ডান এলাকায় সুফিয়ানীর উত্থান ও আন্দোলনের সূত্রপাত হবে। আর যদি এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েত সঠিক হয় তাহলে ঐ আধিপত্য ও কর্তৃত্বের সময়কাল সংক্ষিপ্ত হবে। কারণ ইলজ আসহাবের বিদ্রোহ দমন করার পর উক্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

"যখন ইলজ আসহাব বিদ্রোহ করবে এবং শামের রাজধানী দামেশক সংকটজনক অবস্থায় পতিত হবে তখন অল্প সময়ের মধ্যেই সে (ইলজ আসহাব) নিহত হবে। তখন আকহাল তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিদ্রোহ করবে। আর তখন শাম নাস্তিক্যবাদীদের (আরেকটি পাণ্ডুলিপিতে তুর্কীদের কাছে) হস্তগত হবে।"[৩৬]

আবির্ভাব সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে আসহাব ও আবকা (সুফিয়ানীর আন্দোলনের বিরোধী দু'জন নেতা)- এর কথা উল্লিখিত হয়েছে । সুফিয়ানী এ দু'জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং সমগ্র শামের ওপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে ।

দামেশক অথবা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তুর্কদের সাথে সুফিয়ানীর যুদ্ধ সম্পর্কে সরাসরি যে সব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আমি পাই নি । তবে ইজমালী তাওয়াতুর (অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির) সূত্রে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়েতে কিরকীসীয়ায় তুর্কীদের সাথে সুফিয়ানীর ব্যাপক যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, কিরকীসীয়া এলাকাটি সিরিয়া, ইরাক ও তুরস্ক সীমান্তে অবস্থিত । এ যুদ্ধ ঐ সব ভয়াবহ বিশাল যুদ্ধসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর ব্যাপারে পূর্ব হতেই আভাস দেয়া হয়েছিল । আর ফোরাত নদীর গতিপথে অথবা ফোরাত নদীর নিকটে যে বিশাল গুপ্তধন (খনিজ সম্পদ) আবিস্কৃত হবে সেটিকে কেন্দ্র করেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হবে ।

অধিকন্তু তুর্কী অর্থ এ যুদ্ধে রুশজাতি না হয়ে তুরস্কের তুর্কীরাও হতে পারে । আবার তুর্কীদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে রুশজাতি হয়তো বা গোপনে সুফিয়ানীর সাথে থাকতে পারে এবং তাকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে । আর আমরা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় অতি শীঘ্রই শামদেশের ঘটনাবলী এবং সুফিয়ানীর আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করার সময় কিরকীসীয়ার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করব ।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে তুর্কীদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত আযারবাইজানী বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ ।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "আমাদের জন্য আযারবাইজান (সম্ভবত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আযারবাইজান) গুরুত্বপূর্ণ । এ বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোন কিছুরই প্রতিরোধ করার শক্তি নেই । আর যখন আমাদের বিপ্লবী বিপ্লব করবে তখন তোমরা তার দিকে দ্রুত ছুটে যাবে, এমনকি চার হাত- পায়ে বরফের ওপর হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও ।"[৩৭]

'আযারবাইজান গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কিছুরই তার সামনে দাঁড়ানোর শক্তি পাবে না'- ইমাম সাদিক (আ.)- এর এ বাণীর অর্থ এও হতে পারে যে, এ বিপ্লব হবে হিদায়েতকারী আন্দোলন

যা আযারবাইজান অথবা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা সফল হবে । এরপর এর নিকটবর্তী নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক । আর নিচের রেওয়ায়েতটি থেকে বোঝা যায় রুশদের সাথে সংঘর্ষ ও প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটবে :

"তুর্কীরা (রুশ জাতি) দু'টি সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে যেগুলোর একটির দ্বারা আযারবাইজান ধ্বংস হবে এবং অরেকটি জাযীরায় পরিচালিত হবে যা বাসর ঘরে উপবিষ্টা নববধূদেরকেও ভীত- সন্ত্রস্ত করবে । এ সময় মহান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই মহান আল্লাহর জন্য কোরবানী হবে ।"[৩৮]

শুধু এ রেওয়ায়েতটি অধ্যয়ন করলে তা মুসলিম বিশ্বে মঙ্গোলদের আক্রমণ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হতে পারে । প্রথম পর্যায়ে মঙ্গোলরা আযারবাইজানে পৌঁছে তা ধ্বংস করে দেবে । এরপর তারা ফোরাতে পৌঁছবে । আর তখন মুসলমানরা তাদের ওপর বিজয়ী হবে এবং জালূত ঝর্ণা ও অন্যান্য স্থানে তাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হবে ।

কিন্তু এ রেওয়ায়েত ও পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় সাধন করলে উক্ত রেওয়ায়েতে উল্লিখিত তুর্কীরা রুশ জাতিও হতে পারে । তাদের প্রথম সমরাভিযান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব নিকটবর্তী নিদর্শনসমূহ ও তাদের মাধ্যমে আযারবাইজান দখল করার আগে পরিচালিত হবে ।

তাদের দ্বিতীয় সমরাভিযান জাযীরার দিকে পরিচালিত হবে । জাযীরাহ্ হচ্ছে ইরাক ও সিরিয়াকে বিভক্তকারী সীমান্তে কিরকীসীয়ার অদূরে অবিস্থত একটি জায়গার নাম । সুফিয়ানীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তারা সেখানে পৌঁছবে । আর উক্ত রণাঙ্গনে মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, তারা পরোক্ষভাবে বিজয়ী হবে অর্থাৎ তাদের অত্যাচারী শত্রুদের ক্ষয়- ক্ষতি ও ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে তারা এ বিজয় অর্জন করবে । কিরকীসীয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে কোন হিদায়েতকারী সেনাদল থাকবে না অথবা মুসলমানদের বিজয় আনয়ন করবে এমন কোন পতাকাধারী সেনাদল সেখানে থাকবে না । তবে মহানবী (সা.) ও ইমামদের এতদপ্রসঙ্গে সুসংবাদ প্রদান এ দিক থেকে হতে পারে যে, এ যুদ্ধে অত্যাচারীরা নিজেদের সমর্থকদের দ্বারাই নিহত ও ধ্বংস হবে ।

জাযীরাহ্ ও ফোরাত এলাকায় তুর্কীদের আগমন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ বিদ্যমান যেগুলোয় উল্লিখিত তুর্কগণের সম্ভাব্য অর্থ 'রুশজাতি' হতে পারে । কারণ ফিলিস্তিনের রামাল্লা ও এর সমুদ্র উপকূলসমূহে রোমানদের (পাশ্চাত্য) আগমনের সমসাময়িক হবে তাদের অত্র এলাকায় আগমন ।

ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কিরকীসীয়া জাযীরার অদূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল যা 'দিয়ারবাকর' ও 'জাযীরাহ্- ই রবীআহ্' নামেও পরিচিত । সাধারণভাবে ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে যে 'জাযীরাহ্' শব্দের অর্থ বর্ণিত হয়েছে তা এ এলাকাকেই নির্দেশ করে । তবে এ শব্দের দ্বারা জাযীরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) বা অন্য কোন দ্বীপকে বোঝানো হয় নি । (আরবী ভাষায় দ্বীপকে জাযীরাহ্ বলে ।)

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে জাযীরাহ্ ও ফোরাতে তুর্কী- মঙ্গোলদের আগমনের সাথে এ বিষয়টি মোটেও সাংঘর্ষিক নয় । কারণ কতিপয় ব্যক্তি তুর্কী- মঙ্গোলদের আগমনকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিকটবর্তী নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন । অথচ ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিকটবর্তী নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে জাযীরাহ্ এলাকায় তুর্কীদের আগমন এবং কিরকীসীয়ায় সুফিয়ানীর সাথে তাদের যুদ্ধ ।

তুর্কী- মঙ্গোলদের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং মুসলিম দেশসমূহে তাদের আক্রমণ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ মহানবী (সা.)- এর মুজিযা এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহের অন্তর্ভুক্ত । মুসলিম উম্মাহ্ এ সব হাদীস ও রেওয়ায়েত জানত এবং সেগুলো তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে বর্ণনা করেছে । অতঃপর তুর্কী- মঙ্গোলদের আক্রমণের যুগে এবং তৎপরবর্তী যুগে এ ধরনের রেওয়ায়েত ও হাদীস অধিক অধিক প্রচলিত হতে থাকে । অথচ এ সব রেওয়ায়েতে তাদের ফিতনা ও গোলযোগ প্রশমিতকরণ এবং মুসলমানদের বিজয় ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের দিকে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত করা ব্যতিরেকেই উল্লেখ করা হয়েছে । ঠিক একইভাবে যে তুর্কীদের নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহে ইমাম মাহদী (আ.)-

এর আবির্ভাবের সাথে তাদের (তুর্কদের) ফিতনা ও গোলযোগ প্রশমনের বিষয়টি মুসলমানদের বিজয়ের ইঙ্গিতসহ বর্ণিত হয়েছে।

এখানে মঙ্গোলদের আক্রমণ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের কতিপয় নমুনা পেশ করা হলো :

হযরত আলী (আ.)- এর নিকট থেকে বর্ণিত : "আমি যেন একটি জাতিকে দেখতে পাচ্ছি, হাতুড়ির ঘা খাওয়া ঢালের মতো যাদের মুখমণ্ডল স্পষ্ট দৃশ্যমান, যারা রঙিন রেশমী কাপড় পরিহিত এবং উন্নত জাতের অশ্ব চালনা করছে, সেখানে হত্যাযজ্ঞ এতটা অধিক যে, আহতরা নিহতদের লাশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পার হচ্ছে। ঐ যুদ্ধে পলায়নকারীদের সংখ্যা যুদ্ধব ীদের চেয়ে অনেক কম।" এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করল : "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞানের সাথে পরিচিত।" হযরত আলী হেসে বনি কালব গোত্রের ঐ লোককে বললেন : "হে বনি কালব গোত্রীয় ভ্রাতা! এটি গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান নয়; বরং এ হচ্ছে এক ধরনের অবগতি যা একজন জ্ঞানী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর নিকট থেকে শিখেছি। কারণ গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল কিয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং যা কিছু মহান আল্লাহপাক এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তা। আর আয়াতটি হচ্ছে : একমাত্র মহান আল্লাহ্ই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভসমূহে যা আছে সে ব্যাপারে জ্ঞাত, আর কোন ব্যক্তি জানে না যে, তার জীবন (আয়ু) কোথায় শেষ হয়ে যাবে...। একমাত্র মহান আল্লাহ্ মাতৃগর্ভে যা আছে- ছেলে না মেয়ে, সু র না কুৎসিত, দাতা না কৃপণ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা এবং কোন্ ব্যক্তি দোযখের অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ, কোন্ ব্যক্তি বেহেশ্তী এবং কোন্ ব্যক্তি নবীদের সাথী সে সম্পর্কে জ্ঞাত। অতএব, গায়েব সংক্রান্ত যে জ্ঞান মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই জানে না তা হচ্ছে ঠিক এটিই। যা কিছু বলা হয়েছে তা ছাড়া আর সবকিছু হচ্ছে এমন জ্ঞান যা মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে শিখিয়েছেন। মহানবী (সা.) আবার তা আমাকে শিখিয়েছেন এবং আমার জন্য দোয়া করেছেন যাতে করে মহান আল্লাহ্ তা আমার হৃদয়ে স্থাপন করে দেন এবং আমার অন্তঃকরণকে তা দিয়ে পূর্ণ করে দেন।"[৩৯]

পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতসমূহের ধারাবাহিকতার মধ্যে তুর্কীদের সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর যুদ্ধ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ বিদ্যমান ।

ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট থেকে বর্ণিত : "ইমাম মাহ্দী প্রথম যে বাহিনীটি গঠন করবে তা সে তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে । তাদেরকে পরাস্ত ও ব ী এবং তাদের ধন- সম্পদ গনীমত হিসাবে গ্রহণের পর সে শামদেশ অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং তা জয় করবে ।"[৪০]

এ হাদীসের অর্থ হলো ইমাম মাহ্দী (আ.) প্রথম যে সেনাবাহিনী গঠন করে প্রেরণ করবেন তাদের সাথে তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না । কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) হিজায ও ইরাক মুক্ত করার জন্য ইরাকে প্রবেশ এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর এ সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন ।

এখানে তুর্কী বলতে তুরস্কের তুর্কদেরও বোঝানো হতে পারে । তবে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে তুর্কগণ বলতে রুশ জাতিকেই বোঝানো হয়েছে যারা কিরকীসীয়ায় সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে । কিন্তু কোন পক্ষই প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর হাতে তুর্কীরা ধ্বংস হবে এবং প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে তাদের দেশ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে : তুর্কীদের দেশ বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । তাদের দেশ ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অস্ত্রসমূহের আঘাতেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে যেগুলোর ধ্বংসক্ষমতা হবে বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের অনুরূপ । সম্ভবত এ ঘটনা ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করার পরপরই ঘটবে এবং তাদের ধ্বংস এতটা ব্যাপক হবে যে, পরবর্তী রেওয়ায়েতসমূহে তাদের আর কোন উল্লেখই নেই । কেবল তাদের দ্বিতীয় সমরাভিযানের পরবর্তী রেওয়ায়েতসমূহে فلا ترك بعدها (অর্থাৎ এরপর আর কোন তুর্কী বিদ্যমান থাকবে না)- এ বাক্যটি বিদ্যমান আছে । আর এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'তুর্ক' শব্দটির দ্বারা 'রুশ' জাতিকেই[৪১] বোঝানো হয়েছে । কারণ এ ধরনের কথা কোন মুসলিম জাতির ক্ষেত্রে বলা হয় নি ।

পঞ্চম অধ্যায়

আবির্ভাবের যুগে ইহুদীদের ভূমিকা

সর্বশেষ যুগ অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে ইহুদীদের ভূমিকা সম্পর্কে সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতগুলো ব্যতীত আমাদের কাছে যদি আর কিছু অবশিষ্ট নাও থাকত তবুও ঐ আয়াতগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো । কারণ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এ সব আয়াত হচ্ছে ঐশী বাণী বা প্রত্যাদেশ এবং এতটা বলিষ্ঠ ও সাবলীল যা ইহুদী জাতির ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ বর্ণনা করেছে এবং অলৌকিক ও সূক্ষ্মভাবে তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য স্পষ্ট করে চিত্রিত করেছে । এ সব আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত ছাড়াও কিছু রেওয়ায়েত ও হাদীস আছে যেগুলোর কিয়দংশ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকী কিছু অংশ ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব ও বিপ্লবের যুগে ইহুদীদের সার্বিক অবস্থার ওপর আলোকপাত করে । আমরা আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করার পর ঐ রেওয়ায়েতগুলোও বর্ণনা করব ।

ইহুদীদের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রতিজ্ঞা :

(بسم الله الرحمان الرحيم سبحان الّذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الّذي بركنا حوله لنريه من آياتنا إنّه هو السّميع البصير، واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدىً لبني إسرائيل ألّا تتّخذوا من دوني وكيلاً، ذرّية مَنْ حملنا مع نوحٍ انّه كان عبداً شكوراً.)

"পরম করুণাময় চিরদয়ালু আল্লাহর নামে । পরম পবিত্র ও মহিমান্বিত ঐ সত্তার প্রশংসা যিনি নিজ বা াকে রাতের বেলায় মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন যার চারদিকে আমরা পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে আমাদের (কুদরত ও মহিমার) কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই । নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা । আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সে কিতাবকে বনি ইসরাইলের জন্য হেদায়েতের পথ হিসাবে মনোনীত করেছি । (আর তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি) তোমরা আমাকে ছাড়া আর কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না । তোমরা তাদের সন্তান (বংশধর) যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম । নিশ্চয়ই সে ছিল কৃতজ্ঞ বা া ।"[৪২]

(وقضينآ إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنَّ في الأرضِ مرّتين ولتعلنّ علوًّا كبيراً)

"আমি বনি ইসরাইলকে (তাদের) কিতাবে স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীতে দু'বার ফিতনা- ফাসাদ করবে এবং অন্যদের ওপর বড় ধরনের দম্ভ ও অহংকার প্রকাশ করবে ।"[৪৩]

অর্থাৎ যে তাওরাত আমরা তাদের জন্য নাযিল করেছি সেই গ্রন্থে তাদের ধ্বংস হওয়ার অমোঘ বিধানও লিখে দিয়েছি । কারণ তোমরা অচিরেই সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পুনরায় সমাজে ফিতনা- ফাসাদে লিপ্ত হবে । কারণ তোমরা শীঘ্রই অন্যদের ওপর গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে বসবে ।

(فإذا جآء وعْد أُوْلهما بعثنا عليهم عباداًلّنا أولي بأسٍ شديدٍ فجاسوا خلالَ الدِّيار، وكان وعداً مفعولاً.)

"অতঃপর যখন উক্ত ফাসাদদ্বয়ের প্রথমটির প্রতিশ্রুতিকাল উপস্থিত হবে তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কতিপয় কঠোর যোদ্ধা বা াকে প্রেরণ করব । অতঃপর তারা (তোমাদের) প্রতিটি জনপদের আনাচে- কানাচে পর্যন্ত প্রবেশ করবে । আর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবেই ।"[৪৪]

তোমাদের প্রথম ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য তোমাদের শাস্তির মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে আমার তরফ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে এমন সব বা াকে প্রেরণ করব যারা হবে অত্যন্ত কঠোর যোদ্ধা যাতে করে তারা তোমাদেরকে প্রচণ্ড শাস্তি দেয় এবং তোমাদের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালায় । আর এটি হবে অবশ্যম্ভাবী ঐশী অঙ্গীকার ।

(ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموالٍ و بنينَ وجعلناكم أكثر نفيراً)

"অতঃপর আমি তোমাদের অনুকূলে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দেব, তোমাদেরকে ধন- সম্পদ ও পুত্র- সন্তান দ্বারা সাহায্য করব এবং তোমাদের জনবল বৃদ্ধি করে দেব (এবং তোমাদের সামরিক শক্তিও বাড়িয়ে দেব) ।"[৪৫]

ব্যাখ্যা : অতঃপর যাদেরকে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করব (তোমাদের অন্যায়- অপরাধের শাস্তি প্রদান করার জন্য) তাদের বিপক্ষে তোমাদের অনুকূলে বিজয়ের পালা আবার ঘুরিয়ে দেব । আমি তোমাদেরকে প্রভূত ধন- সম্পদ এবং বহু সন্তান- সন্ততি দান করব এবং তোমাদেরকে

অধিক জনবল ও সাহায্যকারীর অধিকারী করব যারা তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে ।

(إنْ أحسنتم أحسنتم لأنفسكم قف وإنْ أسأتم فلها فإذا جاء وعْد الآخرةِ ليسوءا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرّةٍ وليتبّروا ما علوا تتبيراً.)

তোমরা যদি ভালো কর তবে নিজেদের জন্যই ভালো করবে । আর যদি ম কর তবে তাও (তোমাদের) নিজেদের জন্যই । এরপর যখন দ্বিতীয় অঙ্গীকারের সময় এসে যাবে তখন (অন্য) বা াদেরকে প্রেরণ করব যারা তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেবে, মসজিদে ঢুকে পড়বে যেমন প্রথমবার তারা ঢুকেছিল এবং যা কিছু তাদের করায়ত্বে আসবে তারা তা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে ।[৪৬]

আর তখন তোমাদের অবস্থা এমনই হবে এবং তোমরা যদি তওবা কর, যে সব নেয়ামত অর্থাৎ ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে সৎকাজ কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে । আর যদি তোমরা অসৎকর্ম সম্পাদন, সীমা ল ন, নাফরমানী এবং অন্যদের চেয়ে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতেই থাক, তাহলে তোমাদের এ আচরণের অশুভ পরিণতি তোমাদেরকেই বহন করতে হবে । তবে তোমরা শীঘ্রই ভালো কাজ তো করবেই না, বরং গর্হিত অন্যায় কাজেই হাত দেবে (এবং তা করতেই থাকবে) । তোমাদের দ্বিতীয় ফিতনার জন্য তোমাদের শাস্তিপ্রাপ্তির সময় আসা পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি । দ্বিতীয় অপরাধের শাস্তির সময় যখন আসবে তখন আমরা আমাদের তরফ থেকে এমন সব ব্যক্তিদেরকে প্রেরণ করব যারা তোমাদের সাথে প্রথম বারের চেয়েও অনেক বেশি কঠোর আচরণ প্রদর্শন করবে । যে সব বিপদ তোমাদের অপছ তোমাদের ওপর সেই সব বিপদ তারা আনয়ন করবে । অতঃপর তারা বিজয়ীবেশে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করবে এবং প্রথমবার শত্রুরা যেভাবে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল ও তোমাদের ঘরবাড়ীগুলোয় তল্লাশী চালিয়েছিল ঠিক সেভাবে তারা তোমাদের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাবে এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠান্বেষী মনোবৃত্তি এবং গোলযোগ সৃষ্টি ও অপরাধ করার প্রবণতার ধ্বংস সাধন করবে ।

(عسى ربّكم ان يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنّم للكافرين حصيراً.)
হয়তো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন । কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব । আমি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য সংকীর্ণ কয়েদখানা হিসাবে নির্ধারণ করেছি ।[৪৭]

সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক দ্বিতীয়বার শাস্তি প্রদান করার পর অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন; আর দ্বিতীয়বার শাস্তিপ্রাপ্তির পর যদি তোমরা আবারও বিচ্যুত হও, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে আবার শাস্তি দেব এবং তোমাদের ওপর এ পার্থিব জগতেই সীমাবদ্ধতা আরোপ করব । আর আখেরাতে দোযখকে তোমাদের জন্য সংকীর্ণ জেলখানায় পরিণত করব ।

আমরা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে প্রথম যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই তা হলো : হযরত মূসা (আ.)- এর পরে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ইহুদী জাতির ইতিহাসের সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, তারা সমাজে ফিতনা- ফাসাদ অব্যাহত রাখবে । এরপর যখন তাদের শাস্তিপ্রাপ্তির মুহূর্ত উপস্থিত হবে তখন মহান আল্লাহ্ তার পক্ষ থেকে একদল বা াকে প্রেরণ করবেন যারা তাদের ওপর বিজয়ী হবে । অতঃপর মহান আল্লাহ্ বিশেষ কিছু কল্যাণের ভিত্তিতে ইহুদীদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করে দেবেন । তাদেরকে বিপুল ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি প্রদান করবেন এবং পৃথিবীতে ঐ জাতির চেয়েও তাদের সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেবেন । কিন্তু ইহুদীরা তাদের এ সম্পদ এবং সঙ্গী- সাথীদেরকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করবে না, বরং তারা এ সব নেয়ামতের অপব্যবহারই করবে । তারা দ্বিতীয়বারের মত পৃথিবীতে ফিতনা করবে । অবশ্য এবার তারা ফিতনা ছাড়াও দম্ভ ও শ্রেষ্ঠত্বকামিতার দোষেও আক্রান্ত হবে । তারা নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য ও জাহির করবে । আর যখন তাদের শাস্তি প্রদানের সময় এসে যাবে তখন তিনি পুনরায় ঐ জাতিকে তাদের ওপর বিজয়ী করে দেবেন এবং তাদেরকে তিন পর্যায়ে এবং প্রথমবারের চেয়েও অত্যধিক কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন ।

দ্বিতীয় ফলাফল ও সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ্ যে জাতিকে তাদের বিরুদ্ধে প্রথমবার প্রেরণ করবেন, খুব সহজেই তাদেরকে ইহুদীদের ওপর বিজয়ী করবেন এবং তারা তাদের ঘরে

ঘরে তল্লাশী চালাবে । তখন তারা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে তাদের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেবে । এরপর মহান আল্লাহ্ দ্বিতীয় বার তাদেরকে প্রেরণ করবেন এবং তাদের ওপর ইহুদীদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব এবং সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক ও সঙ্গী- সাথীদের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও বিপরীতে তিন পর্যায়ে তারা তাদের ওপর তীব্র মরণাঘাত হানবে । প্রথম পর্যায়ে তারা ইহুদীদের অপবিত্র কুৎসিত চেহারা প্রকাশ এবং তাদেরকে অপমানিত করবে । যেমনভাবে তারা প্রথমবার মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করেছিল ঠিক তদ্রূপ তারা মসজিদুল আকসায় বিজয়ীবেশে প্রবেশ করবে । এরপর তারা ইহুদীদের দম্ভ ও অন্যান্য জাতির ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দর্পকে চূর্ণ করে দেবে ।

মুফাসসিররা যে মৌলিক প্রশ্নটি এ স্থলে উত্থাপন করেছেন সেটি হচ্ছে এই যে, এ দু'ধরনের ফিতনা যার একটির সাথে দম্ভ ও শ্রেষ্ঠত্বকামিতাও যুক্ত রয়েছে তার কি পরিসমাপ্তি ঘটেছে অথবা উক্ত প্রতিশ্রুত শাস্তিদ্বয় কি ইতোমধ্যে তাদেরকে দেয়া হয়েছে নাকি এখনো দেয়া হয়নি ।

কতিপয় মুফাসসির বিশ্বাস করেন যে, উক্ত প্রতিশ্রুত শাস্তিদ্বয় বাস্তবায়িত হয়েছে এভাবে যে, প্রথম ফিতনার শাস্তি বানুখায্ নাসর (বখতুন নাসর) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ফিতনার শাস্তি রোমান 'টাইটাসের' হাতে সংঘটিত হয়েছে । আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, প্রতিশ্রুত শাস্তিদ্বয় এখনও বাস্তবায়িত হয়নি ।

তবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত হচ্ছে এই যে, ইহুদীদের প্রথমবারের ফিতনার বরাবরে প্রথম শাস্তি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলমানদের হাতে বাস্তবায়িত হয়েছে । আর যখন মুসলমানরা ইসলাম ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় তখন মহান আল্লাহ্ ইহুদীদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করে দিয়েছেন । এ পর্যায়ে আবারও ইহুদীরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও সীমা ল ন করেছে । আর যখনই মুসলমানরা ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখনই দ্বিতীয় শাস্তির সময় এসে যাবে এবং তা মুসলমানদের হাতে পুনরায় বাস্তবায়িত হবে । আর এ ব্যাখ্যারই ভিত্তিতে আহলে বাইতের ইমামদের থেকে বেশ কিছু রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে । যেমন : মহান আল্লাহ্ যে গোষ্ঠীকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন তাঁরা হবেন ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর

সঙ্গীসাথীরা যাঁরা হবেন কোমবাসী এবং তাঁরা মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগেই প্রেরিত হবেন। তাফসীরে আইয়াশীতে ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি

(بعثنا عليكم عباداً لنا أُولي بأسٍ شديد)

'তোমাদের ওপর আমাদের একদল বা াকে প্রেরণ করব যারা হবে কঠোর যোদ্ধা ও শক্তির অধিকারী'- এ আয়াতটি পাঠ করে বললেন : এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো হযরত কায়েম আল মাহদী এবং তার সঙ্গীসাথী যারা হবে শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ও দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন।

'নূরুস সাকালাইন' নামক তাফসীরে ও 'রওযাতুল কাফী' গ্রন্থ হতে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

"হযরত কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাবের আগে মহান আল্লাহ্ এমন এক জাতিকে প্রেরণ করবেন যারা আলে মুহাম্মদ (সা.)- এর একজন শত্রুকেও জীবিত রাখবে না।

'বিহারুল আন্ওয়ার' গ্রন্থে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত : "যখন তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম : আপনার জন্য আমরা উৎসর্গীত হই, তাঁরা কারা?" ইমাম তিনবার বললেন : মহান আল্লাহর শপথ, তারা কোমের অধিবাসী; মহান আল্লাহর শপথ, তারা কোমের অধিবাসী।"[৪৮]

এ তিন রেওয়ায়েত অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক ও পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ কোমের অধিবাসীরা অর্থাৎ ইরানীরাই হবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথী যাঁদেরকে মহান আল্লাহ্ ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রেরণ করবেন এবং রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে হযরত মাহদীর (আ.) আবির্ভাবকালে তাঁর বিশেষ সঙ্গীসাথীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কোমবাসী অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে হতে বিদ্যমান থাকবে। ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভূত হওয়া পর্যন্ত এ সব জনগণ এবং তাদের মুসলিম সমর্থকদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের প্রতিরোধ কয়েক ধাপে সম্পন্ন হবে। তবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর নেতৃত্বে এবং তাঁর শক্তিশালী হস্তেই ইহুদীদের চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন হবে।

ইহুদীদের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় শাস্তিপ্রাপ্তি যে মুসলমানদের হাতেই হবে তা নির্দেশকারী যে সব বিষয় আছে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়টিও যে, যে জাতিকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পুনরায় প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ্ দিয়েছেন আসলে তারা একই উম্মতভুক্ত এবং তাদের যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এবং ইহুদীদের সাথে তাদের যুদ্ধের বিশেষত্বসমূহ কেবল মুসলমানদের সাথেই মিলে যায়। কারণ মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, ইরান, রোমের বাদশাহরা এবং অন্যান্য জাতির শাসকবৃ যারা ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য কায়েম করেছিল তাদের সাথে عباداً لنا (আমাদের কতিপয় বা ।)- এ বৈশিষ্ট্যটি খাপ খায় না। আর প্রথম শাস্তির বর্ণনা সম্বলিত আয়াতের পরের আয়াতগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী ঐ সব রাজা-বাদশাহ্ ও শাসকবর্গের ওপর ইহুদীদের বিজয়ী হবারও কোন ঘটনা এখনো ঘটে নি। অথচ ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের হাতে ইহুদীদের প্রথম শাস্তিভোগের পর তারা বর্তমানে আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আর মহান আল্লাহ্ তাদেরকে এমনভাবে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করেছেন যে বিশ্বে তাদের সমর্থকদের সংখ্যা মুসলমানগণ এবং তাদের মিত্রদের চেয়েও বেশি এবং তারা পরাশক্তিবর্গের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে ও বিদ্রোহ করেছে। আর এ সব ইহুদীই পৃথিবীর বুকে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ করছে এবং আমাদের ও অন্যান্য বঞ্চিত জাতির ওপর গর্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করছে। কুফরের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী ইসলামের মুজাহিদরাই তাদের ঘৃণ্য কুৎসিত দেহ ও মুখমণ্ডলের ওপর তীব্র আঘাত হানবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করবে।

যারা ইহুদী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য পড়াশোনা করেছেন এবং জানেন তাদের কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। আর আমরা তা খুব শীঘ্রই উল্লেখ করব।

ইহুদীদের ওপর চিরস্থায়ী বিজয় লাভ করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন : "তোমার প্রভু ঘোষণা করেছেন : তিনি এমন সব ব্যক্তিকে ইহুদীদের ওপর বিজয়ী করবেন যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি দেবে । আর মহান আল্লাহ্ই দ্রুত শাস্তি দানকারী । তিনিই ক্ষমাকারী ও দয়ালু । মহান আল্লাহর শাস্তিসমূহের একটি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে পৃথিবীতে দলে দলে বিভক্ত করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সৎকর্মশীল এবং কেউ কেউ অসৎকর্মশীল । আর আমরা তাদেরকে ভালো ও ম দিয়ে পরীক্ষা করেছি; সম্ভবত তারা তওবা করে সত্য ও হেদায়েতের পথে প্রত্যাবর্তন করবে ।"[৪৯]

এ দু' আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন এবং অবধারিত করে দিয়েছেন যে, অতি শীঘ্রই তিনি কাউকে ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্বশীল করে দেবেন যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের শাস্তি দেবে । মহান আল্লাহ্ই দ্রুত শাস্তি বিধায়ক এবং তিনিই ক্ষমাকারী ও দয়ালু । ইহুদীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর একটি শাস্তি হচ্ছে এ রকম : পৃথিবীর বুকে তিনি তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত এবং একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন । তাদের মধ্যকার একদল হবে সৎকর্মশীল এবং অপর দলটি হবে অসৎকর্মশীল; আর তিনি তাদেরকে ভালো ও ম দিয়ে পরীক্ষা করবেন । এর ফলে আশা করা যায় যে, তারা তওবা করবে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে ।

হযরত মূসা (আ.), হযরত ইউশা (আ.), হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মতো নবীদের শাসনকাল ব্যতীত ইতিহাসের অন্যান্য পর্যায়ে ইহুদীদেরকে শাস্তি দান সংক্রান্ত মহান আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করি । মহান আল্লাহ্ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্বশীল করে দিয়েছিলেন যারা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের বেদনাদায়ক নির্যাতনও চালিয়েছে ।

কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে যে, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, প্রাচীন পারস্য (ইরান), রোমের বাদশাহরা ও অন্যান্যরা ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের সাথে এ ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ করেনি, বরং তারা কেবল তাদের সামরিক শক্তির ওপর বিজয়ী হয়েছিল এবং এরপর বিজয়ী মুসলমানরা ইসলামী হুকুমতের ছায়াতলে ইহুদীদের বসবাস ও জীবন যাপন, তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং যাবতীয় অধিকার ভোগ করার বিষয়টি তাদের জিযিয়া কর প্রদানের বিনিময়ে মেনে নিয়েছিল।

তবে এর উত্তরে বলতে হয় যে: তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির স্বাদ মুসলমানরা আস্বাদন করিয়েছিল এর অর্থ এ নয় যে, সব সময় তারা তাদেরকে হত্যা অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে অথবা কারাগারে ব ী করে রেখেছে ঠিক যেমনভাবে ইসলাম- পূর্ব বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী তাদের ওপর বিজয়ী ও কর্তৃত্ব লাভের পর করেছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এমন প্রশাসনের কাছে আ সমর্পণ করেছিল যাদেরকে মহান আল্লাহ্ তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী করেছিল এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানরা ইহুদীদের শাস্তি ও নির্যাতন করার ব্যাপারে অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কোমল আচরণ ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে। তবে তারা (বিজয়ী মুসলমানরা) ছিল ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এবং এটিও তাদেরকে শাস্তি- প্রদানের বাস্তব নমুনা।

কখনো কখনো বলা হয় যে: ইহুদীদের ইতিহাস তাদের ওপর মহান আল্লাহর (অবিরত শাস্তি প্রদানের) এ ওয়াদা বাস্তবায়নের বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে। কিন্তু বর্তমানে এক শতাব্দী অথবা অর্ধ শতাব্দী গত হয়ে যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি তাদেরকে শাস্তি দেবে সে তাদের ওপর এখনো কর্তৃত্ব স্থাপন করেনি। উপরন্তু অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল থেকে ইহুদীরা ফিলিস্তিন ও অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর সবচেয়ে জঘন্য পন্থায় নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এ বিষয়কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

এর জবাব হচ্ছে : ইহুদীদের ইতিহাসের এ অধ্যায়টি আলাদা করে হিসাব করা উচিত । কারণ এটি হচ্ছে তাদের ক্ষমতা ও শক্তি অর্জনের যুগ- যার প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ্ সূরা ইসরায় দিয়ে বলেছেন : "অতঃপর আমরা (যাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিলাম) তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করব এবং তোমাদেরকে ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দেব এবং তাদের সংখ্যার চেয়েও তোমাদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যা বেশি করে দেব যাতে করে তোমাদের সহযোগিতায় তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ।" সুতরাং এ যুগটি ইহুদী জাতির ওপর অন্যদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার সংক্রান্ত সার্বিক অঙ্গীকার থেকে বাইরে । আর এ অবস্থাটি মুসলমানদের হাতে ইহুদী জাতির পুনরায় শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ।

এক্ষেত্রে পবিত্র ইমামদের থেকে প্রচুর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর এ অঙ্গীকারটিও মুসলমানদের হাতেই বাস্তবায়িত হবে । বিশেষ করে এ ব্যাপারে 'মাজমাউল বায়ান' গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা তাবারসী উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরে এ অর্থ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মুফাসসিরদের ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : সকল মুফাসসিরের দৃষ্টিতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর উম্মত । আর ঠিক এ অর্থ ও ব্যাখ্যাই ইমাম বাকির (আ.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে । আলী ইবনে ইবরাহীম কোমী এ অর্থটি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আবীল জারুদের সূত্রে ইমাম বাকির থেকে বর্ণনা করেছেন ।

ইহুদীদের সৃষ্ট যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত করা সংক্রান্ত মহান আল্লাহর অঙ্গীকার

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন : "ইহুদীরা বলে, মহান আল্লাহর হাত বাঁধা । তাদের হাতই বাঁধা হয়ে যাক । আর এ কথা বলার কারণে তারা মহান আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরে গেছে । বরং মহান আল্লাহর হস্তদ্বয় উন্মুক্ত ও প্রসারিত এবং তিনি যেভাবে চান সেভাবে দান করেন ।... যা কিছু আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অবাধ্যতা, বিরুদ্ধাচরণ ও কুফরী আরো বাড়িয়ে দেয় এবং আমরা তাদের মাঝে পুনরুত্থান দিবস

পর্যন্ত শত্রুতা নিক্ষেপ করেছি । আর যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে ঠিক তখনই মহান আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দিয়েছেন । তারা পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে । আর মহান আল্লাহ্ ফিতনা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না ।”[৫০]

ইহুদীরা যে সব যুদ্ধের আগুন লাগাবে সেগুলো নির্বাপিত করা সংক্রান্ত এই হচ্ছে মহান আল্লাহর ওয়াদা । প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করার স্বভাব ও মনোবৃত্তি তাদের থাকুক অথবা অন্যদেরকে তারা এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকুক না কেন, মহান আল্লাহর এ ওয়াদার কোন ব্যতিক্রম নেই । কারণ كلّما أوقدوا অর্থাৎ যখনই তারা যুদ্ধের আগুন লাগাবে - এ বাক্য সহকারে উক্ত আয়াতটিতে মহান আল্লাহর এ অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে ।

ইহুদীদের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা যুদ্ধ ও গোলযোগের আগুন প্রজ্বলিত করার ব্যাপারে সর্বদা চেষ্টা করত । কিন্তু মহান আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহ্ ও মানব জাতির ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন, তাদের নীলনক্সা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং তাদের প্রজ্বলিত যুদ্ধের আগুনও নির্বাপিত করেছেন । সম্ভবত তাদের সবচেয়ে বৃহত্তম যুদ্ধ ও গোলযোগের আগুন যা তারা মুসলিম উম্মাহ্ ও সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত করেছে তা হচ্ছে বর্তমান কালের যুদ্ধ যার বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকেও উস্কে দিচ্ছে । আর তারা নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে ফিলিস্তিনে এবং পরোক্ষভাবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিবাদমান পক্ষ । আর এ যুদ্ধ প্রশমিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হওয়ার তেমন কিছু বাকী নেই । তবে উল্লিখিত আয়াত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তাদের দ্বারা প্রজ্বলিত যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত করার একটি পথ হলো তাদের অভ্যন্তরীণ শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব- সংঘাত যা মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত । এ কথার পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, উক্ত আয়াতে তাদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও শত্রুতার বীজ বপন করার পরপরই إطفاء النّار অর্থাৎ যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত করার কথা উল্লিখিত হয়েছে । যেন প্রজ্বলিত যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত করার বিষয়টি তাদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ও শত্রুতার উদ্ভব ঘটানোর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে ।

“আর আমরা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছি; আর যখনই তারা কোন যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করবে, মহান আল্লাহ্ তখনই তা নিভিয়ে দেবেন ।”

এটি হলো ইহুদীদের ইতিহাসের একটি অংশ মাত্র । ‘ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ক্ষেত্রপ্রস্তুতকারীরা’ নামক গ্রন্থে আমরা পবিত্র কোরআনের যে সব আয়াতে ইহুদীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর অঙ্গীকারত্রয়ের কথা ব্যক্ত হয়েছে সেগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি ।

আবির্ভাবের যুগে ইহুদীদের ভূমিকা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের মধ্য থেকে গুটিকতক রেওয়ায়েত ইহুদীদের অস্তিত্ব বিলুপ্তকারী যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের আগমন ও বসতি স্থাপন এবং তাদের সে দেশটি জবর দখলের সাথেই সংশ্লিষ্ট । আর এ রেওয়ায়েতগুলো নি োক্ত আয়াতেরও ব্যাখ্যাস্বরূপ । আয়াতটি হলো : “আর তার পরে আমরা বনি ইসরাইলকে বললাম : তোমরা পৃথিবীতে বসবাস কর । আর যখন কিয়ামত দিবস ঘনিয়ে আসবে তখন তোমাদেরকে একে অন্যের সাথে মিশ্রিত করে পুনরুত্থিত করব ।”[৫১]

অর্থাৎ আমরা তোমাদেরকে প্রতিটি প্রান্ত অর্থাৎ এলাকা থেকে অথবা তোমাদের সকলকে একত্রিত করব । আর ঠিক এভাবেই ‘নূরুস সাকালাইন’ নামক তাফসীর গ্রন্থেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে । আক্কায় তাদের আগমন এবং সেখানে তাদের যুদ্ধের ব্যাপারেও উপরিউক্ত হাদীসটি থেকে এ ধারণা জন্মে । মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “তোমরা কি ঐ নগরীর নাম শুনেছ যার খানিকটা অংশ সমুদ্রের ভিতরে ।” যখন তাঁকে সবাই হ্যাঁ বলল, তখন মহানবী বললেন : “নবী ইসহাক (আ.)- এর বংশধর হতে সত্তর হাজার ব্যক্তি কর্তৃক ঐ শহর আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না ।”[৫২]

হযরত আলী (আ.) বলেছেন : “আমি মিশরে একটি মিম্বার স্থাপন করে অবশ্যই দামেশক ধ্বংস করব এবং আরবের শহর ও নগরসমূহ থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করব । আর এ লাঠি দিয়েই আমি আরবদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব ।” এ হাদীসটির রাবী (আবায়াহ্ আল আসাদী) বলেন : “আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি এমনভাবে বলছেন এবং ভবিষ্যতের খবর দিচ্ছেন যেন আপনি নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পর জীবিত হবেন?” তখন তিনি বললেন, “হে

আবায়াহ্! তুমি আমাদের পথ হতে ভিন্ন পথ ও মতানুযায়ী কথা বলছ । আমার বংশধারা হতে এক ব্যক্তি (ইমাম মাহদী) এ সব কাজ সম্পাদন করবে ।”[৫৩]

এ রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইহুদীরা আরবদের বহু শহর ও নগরের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে অথবা সে সব শহর ও নগরে তাদের জোর প্রভাব বিস্তারমূলক সক্রিয় উপস্থিতি থাকবে । আর আমরা শামদেশের এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আ ালনকেন্দ্রিক ঘটনাবলী বর্ণনা করার সময় সুফিয়ানী ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে ইমাম মাহদীর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করব ।

রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে ইহুদীদের উপাসনালয় আবিষ্কারের হাদীসটিও আছে । আর ‘উপাসনালয় আবিষ্কার’- ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য হয়েছে । সম্ভবত হযরত সুলাইমান (আ.)- এর উপাসনালয়ই আবিষ্কৃত হবে । ইমাম আলী (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বেশ কিছু নিদর্শন আছে । নিদর্শনগুলো হচ্ছে : গোপনে ওঁৎ পাতা এবং পাথর নিক্ষেপ করার মাধ্যমে কুফা নগরীকে অবরুদ্ধ করা, কুফার রাস্তা ও অলিগলির বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরা, ৪০ দিবারাত্রি মসজিদসমূহ বন্ধ রাখা (নামায পড়তে না দেয়া), উপাসনালয় আবিষ্কার এবং বড় মসজিদের (মসজিদুল হারাম) চারপাশে পতাকাসমূহের পতপত্ করে ওড়া । এ যুদ্ধের হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী হবে ।”[৫৪]

তবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের পক্ষ থেকেও ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের একটু আগে উপাসনালয়টি আবিষ্কৃত হতে পারে । কারণ রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয় নি যে, কে সেটি আবিষ্কার করবে । ঠিক একইভাবে তা কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনও হতে পারে যা হযরত সুলাইমান (আ.) কর্তৃক নির্মিত উপাসনালয় হতে ভিন্ন কিছু এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে না হয়ে অন্য কোন স্থানে তা অবস্থিত । কারণ, ‘উপাসনালয় আবিষ্কার’- এ কথাটি কোন শর্ত ছাড়াই উল্লিখিত হয়েছে ।

এ রেওয়ায়েতের প্রথম দিকে কুফা নগরীর যুদ্ধাবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে । আর অন্যান্য রেওয়ায়েতে কুফার পরিবর্তে ইরাকের যুদ্ধাবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে । কিন্তু এ রেওয়ায়েত কুফা নগরী অবরোধ, সেখানে প্রস্তর নিক্ষেপ এবং এ নগরীর অলি- গলি ও মহাসড়কসমূহে প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ অর্থেই হবে । তবে মসজিদুল হারামের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের পতাকা হিজাযের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সে দেশের গোত্রসমূহের সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকেই ইঙ্গিত দান করে যা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সামান্য আগ দিয়ে সংঘটিত হবে । আর এ ব্যাপারে প্রচুর রেওয়ায়েত বিদ্যমান ।

আরো কিছু রেওয়ায়েত আছে যেগুলোতে ঐ সব ব্যক্তির নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যাঁদেরকে মহান আল্লাহ্ ইহুদীদের ফিতনা সৃষ্টি এবং আধিপত্য বিস্তারের পর তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী করে দেবেন । এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে গুটিকতক রেওয়ায়েত পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং কতিপয় রেওয়ায়েত আবির্ভাবকালে ইরান ও ইরানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত । যেমন : কালো পতাকাসমূহের রেওয়ায়েত যা অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত । "খোরাসান থেকে কালো পতাকাসমূহ বের হবে পবিত্র কুদসে (বাইতুল মুকাদ্দাস) পতপত্ করে ওড়া পর্যন্ত কোন কিছুই সেগুলোকে প্রতিহত ও ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না ।"

ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক শাম, ফিলিস্তিন ও তাবারীয়ার হ্রদের নিকট অবস্থিত একটি পাহাড় এবং আনতাকীয়ার গুহা থেকে প্রকৃত তাওরাত উদ্ধার এবং উদ্ধারকৃত ঐ তাওরাতের মাধ্যমে ইহুদীদের কাছে [ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক] যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহও এ সব রেওয়ায়েতেরই অন্তর্ভুক্ত ।

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "তাওরাত ও ইঞ্জিল এমন এক স্থান থেকে উদ্ধার করা হবে যা 'আনতাকীয়াহ্' নামে পরিচিত ।"[৫৫]

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "(পবিত্র সিন্দুকটি) আনতাকিয়াস্থ একটি গুহা থেকে এবং তাওরাতের অধ্যায়সমূহ (পাণ্ডুলিপি) শামের একটি পাহাড় থেকে বের করে আনা হবে । আর ঐ

গ্রন্থের মাধ্যমে ইহুদীদের কাছে যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ পেশ করা হবে । আর পরিশেষে তাদের মধ্য থেকে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে ।"[৫৬]

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত : "তার দ্বারাই তাবারীয়ার হ্রদ হতে পবিত্র সিন্দুক উদ্ধার কাজ শুরু হবে । ঐ সিন্দুকটি বাইতুল মুকাদ্দাসে আনা হবে এবং তার সামনে রাখা হবে । আর যখন ইহুদীরা তা দেখবে তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সবাই ঈমান আনবে ।"[৫৭]

আর প্রশান্তির ঐ তাবূত (সিন্দুক) সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণীতেও বর্ণিত হয়েছে : "তাদের নবী বললেন : তার রাজত্ব ও বাদশাহীর নিদর্শন হচ্ছে, তোমাদের কাছে একটি তাবূত আসবে যার মধ্যে আছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রশান্তি এবং যা কিছু মূসার বংশধর এবং হারূনের বংশধররা রেখে গেছে সেগুলো । ঐ তাবূত ফেরেশতারা বহন করে আনবে, আসলে এর মধ্যে আছে তোমাদের জন্য মু'জিযা ও দলিল- প্রমাণ ।"[৫৮]

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত পবিত্র সিন্দুক যার মধ্যে মহান নবীদের উত্তরাধিকার বিদ্যমান এবং লিখিত রয়েছে কোন্ ব্যক্তি নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের জন্য উপযুক্ত । এ কারণেই উক্ত সিন্দুক বনি ইসরাইলের জন্য এক বিরাট নিদর্শন এবং ফেরেশতারা তা এনে বনি ইসরাইলের মাঝ দিয়ে হযরত তালূত (আ.)- এর সামনে উপস্থিত করেন । এরপর তালূত (আ.) তা হযরত দাউদ (আ.)- এর কাছে, তিনি হযরত সুলাইমান (আ.)- এর কাছে এবং তিনি তাঁর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত আসিফ ইবনে বারখিয়া (আ.)- এর কাছে অর্পণ করেছিলেন । আর হযরত সুলাইমান (আ.)- এর পর বনি ইসরাইল যেহেতু তাঁর (স্থলাভিষিক্তের) আনুগত্য করে নি এবং আরেক জনের আনুগত্য করেছিল, সেহেতু তারা সিন্দুকটি হারিয়ে ফেলে ।

فيسلم كثير منهم (অতঃপর তাদের মধ্য থেকে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে) অথবা

أسلمت إلا قليلا منهم (তাদের মধ্য থেকে গুটিকতক লোক ব্যতীত সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে)- এ বাক্যগুলোর অর্থ ঐ সব ইহুদী হতে পারে যারা পবিত্র সিন্দুক দেখবে অথবা যে সব ব্যক্তির কাছে ইমাম মাহদী (আ.) তাওরাতের মাধ্যমে যুক্তি প্রমাণ পেশ করবেন তারা । তা ছাড়া

ফিলিস্তিন মুক্তকরণ এবং পরাজিত হবার পরও যে সব ইহুদীকে সেখানে বসবাস করার জন্য ইমাম মাহদী (আ.) অনুমতি দেবেন তারাও হতে পারে ।

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে ত্রিশ হাজার ইহুদী তাঁর প্রতি ঈমান আনবে যাদের সংখ্যা সমগ্র ইহুদী জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য ।

এ সম্পর্কিত অন্যান্য রেওয়ায়েতগুলি ইহুদীদের সাথে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের যুদ্ধ এবং আরব উপদ্বীপ থেকে ইমাম মাহদী কর্তৃক তাদেরকে বহিষ্কার করার সাথে সংশ্লিষ্ট । যে রেওয়ায়েতটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে সেই রেওয়ায়েতটিতে যে ইহুদীদের অনেকের আ সমর্পণের কথা বলা হয়েছে তা তাদের ওপর বিজয় এবং তাদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কার করা ব্যতীত সম্ভব হবে না । আর অন্যদিকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বৃহৎ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহও বিদ্যমান । উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধে তাঁর প্রতিপক্ষ সরাসরি সুফিয়ানী এবং তার ইহুদী ও রোমীয় পৃষ্ঠপোষক ও মিত্ররা হবে । আর এ যুদ্ধের বিস্তৃতি আনতাকিয়া থেকে আক্কা পর্যন্ত অর্থাৎ সিরিয়া- লেবানন- ফিলিস্তিনের সমুদ্র উপকূল বরাবর প্রসারিত হবে । এরপর এ যুদ্ধ তাবারিস্তান, দামেশক ও আল কুদস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে ও অব্যাহত থাকবে । তাদের (ইহুদীদের) প্রতিশ্রুত চরম পরাজয় সেখানে বাস্তবায়িত হবে এমনভাবে যে, পাথর ও গাছ পর্যন্ত চিৎকার করে বলতে থাকবে : “হে মুসলমান! যে ব্যক্তি আমার পেছনে লুকিয়ে আছে সে ইহুদী; অতএব, তাকে হত্যা কর ।” আমরা এ বিষয়টি ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আ ালনের ঘটনাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করব ।

পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহের মধ্যে ‘মারজ আক্কার’ যুদ্ধ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহও আছে । আর এ যুদ্ধ পূর্ববর্তী বৃহৎ যুদ্ধের একটি অংশ মাত্র; কিন্তু যে সম্ভাবনাটি অধিক তা হচ্ছে এই যে, এ যুদ্ধ আসলে পাশ্চাত্য এবং তাদের ইহুদী সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকদের সাথে মাহদী (আ.)- এর দ্বিতীয় যুদ্ধেরই একটি অংশ হবে- যা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং পাশ্চাত্য ও ইহুদীদের পরাজয় দু’তিন বছর গত হওয়ার পরেই সংঘটিত হবে । রেওয়ায়েতসমূহের ভাষ্য অনুযায়ী, এ যুদ্ধের

পর ইমাম মাহদী (আ.) রোমীয়দের সাথে সাত বছর মেয়াদী যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

সম্ভবত হযরত ঈসা (আ.) এ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য চুক্তি স্বাক্ষরের দু'বছর পরে তা ভঙ্গ করবে এবং আশি ডিভিশন সৈন্য নিয়ে ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর এটি হবে সর্ববৃহৎ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহর অগণিত শত্রু নিহত হবে।

রেওয়ায়েত ও হাদীসে এ যুদ্ধ 'মহাবীরত্ব' ও 'মারজ আক্কার দস্তরখান' বলে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ সেটি হবে এমন এক দস্তরখান যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের জীব-জন্তু এবং আকাশের পাখিগুলো অত্যাচারীদের মাংস ভক্ষণ করবে। ইমাম সাদিক (আ.) এতদপ্রসঙ্গে বলেছেন, সত্তর হাজার মুসলমানের তাকবীর ধ্বনিতে রোম (পাশ্চাত্য) বিজিত হবে। এমতাবস্থায় মারজ আক্কায় মহাবীরত্বসূচক ঘটনা এবং মহান আল্লাহর দস্তরখান সবার দৃষ্টিগোচর হবে। সেখানে অত্যাচারীরা ধ্বংস হবে এবং তাদের অন্যায়ের অবসান ঘটবে।"[৫৯]

এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মধ্যে ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে আক্কা শহরের সামরিক অবস্থান ও গুরুত্ব সংক্রান্ত হাদীসসমূহও বিদ্যমান। হযরত মাহদী (আ.) ইউরোপ দখল করার জন্য ঐ শহরকে নৌঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করবেন।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "ইমাম মাহদী (আ.) আক্কার সমুদ্র উপকূলে চারশ' যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করবেন এবং নিজ সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে রোমীয়দের ভূ-খণ্ড অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং তা পদানত করবেন।"[৬০]

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের ঘটনাবলী বর্ণনা করার সময় এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ইহুদী জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এ সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে হযরত মূসা (আ.)- এর যুগ থেকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর যুগ পর্যন্ত ইহুদী জাতির একটি সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থা চিত্রিত হয়েছে । আমরা 'নিকট প্রাচ্যের গীর্জাসমূহের সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল বা 'কিতাব- ই মুকাদ্দাসের অভিধান' নামক গ্রন্থ এবং মরহুম মুহাম্মদ ইয্যাত দ্রুযেহ্ প্রণীত 'ইহুদীদের গ্রন্থসমূহের ভিত্তিতে তাদের ইতিহাস'- এ দু'গ্রন্থের ভিত্তিতে আমরা তাদের এ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেছি । এ দীর্ঘ সময়ে ইহুদী জাতির ইতিহাস দশ পর্যায়ে বিভক্ত । যথা-

১. হযরত মূসা (আ.) ও ইউশা (আ.)- এর যুগ (খ্রি.পূ. ১২৭০- ১১৩০)

২. বিচারকদের যুগ (খ্রি.পূ. ১১১০- ১০২৫)

৩. হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান (আ.)- এর যুগ (খ্রি.পূ. ১০২৫- ৯৩১)

৪. অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব- সংঘাতের যুগ (খ্রি.পূ. ৯০১- ৮৫৯)

৫. আশুরীয়দের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের যুগ (খ্রি.পূ. ৮৫৯- ৬১১)

৬. ব্যাবিলনীয়দের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের যুগ (খ্রি.পূ. ৫৯৭- ৬১১)

৭. ইরানীদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের যুগ (খ্রি. পূ. ৫৩৯- ৩৩১)

৮. গ্রীকদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের যুগ (খ্রি.পূ. ৩৩১- ৬৪)

৯. রোমীয়দের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের যুগ (খ্রি.পূ. ৬৪- ৬১৮ খ্রি.)

১০. ইসলাম ও মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্বের যুগ (খ্রি. ৬১৮- ১৯২৫)

১. হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ইউশা (আ.) এর যুগ

হযরত মূসা (আ.) ১২০ বছর জীবিত ছিলেন । তিনি তাঁর জীবনের প্রায় প্রথম ৩০ বছর মিশরের ফিরআউনের প্রাসাদে এবং হযরত শুআইব (আ.)- এর কাছে ক্বাদাশ বারনী নামক স্থানে ১০ বছর অতিবাহিত করেছিলেন । উল্লেখ্য যে, এ স্থানটি ফিলিস্তিনের দিক থেকে সীনাই পর্বতের শেষ প্রান্তে আরাবাহ্ উপত্যকার অদূরে অবস্থিত ।

বর্তমান তাওরাতের সিফরে খুরুজ পুস্তিকার ১২তম অধ্যায়ের ৩৭ নং আয়াতে এবং সিফরে আদাদ- এর ৩৩তম অধ্যায়ের ৩৬ নং আয়াতে যে সব ইসরাইলীয় হযরত মূসা (আ.)- এর সাথে হিজরত করেছিল তাদের সন্তানদেরকে বাদ দিয়ে তাদের সংখ্যা ছয় লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তবে কতিপয় পাশ্চাত্য গবেষকের মতে, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয় হাজার ।

ঐতিহাসিকগণ অধিকতর সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলেছেন : খ্রিস্টপূর্ব ১৩ শতাব্দী আগে অর্থাৎ প্রায় খ্রি.পূ. ১২৩০ সালে ফিরআউন মিনফাতাহ্- এর আমলে ইসরাইলীরা মিশর ত্যাগ করেছিল ।

হযরত মূসা (আ.) কাদাশ পর্বতের কাছে মারা যান এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ইউশা বিন নূন তাঁকে ঐ স্থানে দাফন করেন এবং তিনি তা গোপন রাখেন । হযরত মূসা (আ.) তাঁর জীবদ্দশায়, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও বনি ইসরাইলের কাছ থেকে বহু কষ্ট ও যাতনা পেয়েছিলেন । ইহুদীদের তাওরাতে তাঁর ও হযরত হারূন (আ.)- এর ব্যাপারে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ্ মূসা (আ.)- কে বলেছিলেন : “যেমন করে তোমার ভাই হারূন হুর পর্বতে মৃত্যুবরণ করেছে ঠিক তেমনি তুমিও এ পর্বতে মৃত্যুবরণ করবে । কারণ তোমরা দু’জন সীনাই দেশে কাদাশ ভূ- খণ্ডের জলাভূমিতে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করনি আর এভাবে তোমরা দু’জন আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ!! অতএব, তুমি যমীনকে ঠিক এর বিপরীত (দিক) থেকে দেখবে, অথচ যে ভূ- খণ্ড আমি বনি ইসরাইলকে প্রদান করেছি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না ।”[৬১]

আরো বলা হয়েছে : ইউশা বিন নূন সেখানে প্রবেশ করবেন ।[৬২]

মূসা (আ.)- এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরি নবী ইউশা বনি ইসরাইলের নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । তিনি তাদেরকে জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে নিয়ে যান এবং আবীহা (জেরিকো) শহর থেকে শুরু করে আরো ৩১টি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করেন যার প্রতিটি ছিল শহর বা ছোট শহর এবং এগুলোর প্রতিটির অধীনে বেশ কিছু কৃষিনির্ভর গ্রাম ছিল । উল্লেখ্য যে, এ সব নগররাজ্যের অধিবাসীরা ছিল কিনআন গোত্রীয় পৌত্তলিক ।

তখন তিনি ঐ অঞ্চলকে ইয়াকূব (আ.)- এর বংশধরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন যারা একে অপরের প্রতি হিংসা- দ্বেষ পোষণ করত । ইউশার পুস্তিকায় ১৫ থেকে ১৯ অধ্যায়ে উক্ত অঞ্চলের নগর ও ক্ষুদ্র শহরের সংখ্যা ২১৬ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । হযরত ইউশা (আ.) খ্রিস্টপূর্ব ১১৩০ সালে প্রায় ১১০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন ।

২. বিচারকদের যুগ

অস্থিতিশীল যুগের বিচারকদের শাসন কর্তৃত্ব এবং ইহুদী জাতির ওপর স্থানীয় শাসক ও রাজন্যবর্গের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার : হযরত ইউশা ইবনে নূনের পর বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব বিচারকদের কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং তাদের মধ্যে ১৫ জন শাসনকর্তা হয়েছিল । তাদের যুগের দু'টি বৈশিষ্ট্য সবসময় বনি ইসরাইলের মাঝে লক্ষ্য করা যায় ।

একটি বৈশিষ্ট্য হলো মহান নবীদের পথ থেকে তাদের (বিচারকদের) বিচ্যুতি এবং অপর বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহ্ কর্তৃক এমন সব ব্যক্তিকে তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল করা যারা তাদের অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবে; আর এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ।

তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিচারকদের পুস্তিকায় হযরত ইউশা (আ.)- এর পর বনি ইসরাইলের বিচ্যুতির কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

কিনাআনী, হেইথী, আমূরী, ফার্যী, হেভী ও ইয়াবুসীয়দের মাঝে তারা বসবাস করতে থাকে এবং ঐসব জাতির মেয়েদেরকে তারা স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের

কন্যাসন্তানদেরকে তারা তাদের ছেলেদের কাছে বিবাহ দিয়েছেল । তারা ঐ সব জাতির প্রতিমা এবং দেব- দেবীদেরও পূজা করত ।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : বিচারকদের মধ্য থেকে যে সর্বপ্রথম বনি ইসরাইলের ওপর শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেছিল এবং তাদেরকে ৮ বছর শাসন করেছিল সে ছিল আরামুন নাহরাইনের শাসনকর্তা রাশ্তাআম ।

তখন বনি আম্মোন এবং আমালিকারা তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আরীহা (জেরিকো) শহর দখল করে নেয় ।[৬৩] এরপর কিনআন দেশের শাসনকর্তা ইযারীন হাসূর অঞ্চলে তাদের ওপর ১০ বছর শাসন করেছিল ।[৬৪]

এরপর বনি আমোন ও ফিলিস্তিনীরা তাদেরকে ১৮ বছর দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছিল ।[৬৫]

এরপর ফিলিস্তিনীরা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল এবং চল্লিশ বছর তাদেরকে নিজেদের আধিপত্যাধীন রেখেছিল ।[৬৬]

ইউশা ইবনে নূনের পর বিচারকদের শাসন নবী হযরত সামূঈল (আ.)- এর যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । হযরত সামূঈল (আ.) ছিলেন ঐ নবী পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ নি ক্ত আয়াতে যাকে এভাবে স্মরণ করেছেন :

“আপনি কি বনি ইসরাইলের ঐ গোত্রকে দেখেছেন যারা মূসার পরে তাদের নবীর (সামূঈল) কাছে এ প্রার্থনা করেছিল : আপনি আমাদের জন্য এমন একজন বাদশাহ্ নিযুক্ত করে দিন যাতে করে আমরা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি । তাদের নবী বলেছিলেন : তোমাদের ওপর জিহাদ অবধারিত (ফরয) হয়ে গেলে কি তোমরা নাফরমানী করবে? তারা বলেছিল : এটি কিভাবে সম্ভব যে, আমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করব না । অথচ তারা আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে । অতঃপর যখন তাদের ওপর জিহাদ নির্ধারণ করা হলো তখন তাদের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং মহান আল্লাহ্ অত্যাচারীদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত আছেন ।”[৬৭]

ঐতিহাসিকরা এ যুগকে খ্রিস্টপূর্ব ১১৩০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০২৫ সাল পর্যন্ত একশ’ বছর অর্থাৎ হযরত তালুত ও হযরত দাউদ (আ.)- এর শাসনকালের শুরু পর্যন্ত বলে মনে করেন, অথচ তাওরাতে বিচারকদের পুস্তিকায় এ সময় কাল (বিচারকদের শাসনকাল) একশ’ বছরের চেয়েও অধিক বলে উল্লিখিত হয়েছে ।

৩. হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলাইমান (আ.)- এর শাসনামল

রাজা তালুতের যুগকে আমরা হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলাইমান (আ.)- এর শাসনামলের অংশবিশেষ বলে গণ্য করব । কারণ যদিও তালূত নবী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন মহান নবীদের ধারার একজন শাসক । ঐতিহাসিকরা তাঁর শাসনামল খ্রি.পূ. ১০২৫ থেকে ১০১৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর বলে উল্লেখ করেছেন । তারপর হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলাইমান (আ.) খ্রি.পূ. ১০১০ সাল থেকে খ্রি.পূ. ৯৩১ সাল পর্যন্ত শাসন করেছেন । হযরত সুলাইমান (আ.) খ্রি.পূ. ৯৩১ সালে ইন্তেকাল করেন ।

বর্তমান তাওরাত (পুরাতন নিয়ম)- এর রচয়িতারা হযরত মূসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলাইমান (আ.)- এর ওপর জুলুম করেছে এবং জঘন্য চারিত্রিক, রাজনৈতিক ও বিশ্বাসগত মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে ।

পাশ্চাত্যের অধিকাংশ খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা কেবল এ সব রচয়িতার অনুসরণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তাঁদের বক্তব্যের সাথে আরো বেশ কিছু ভিত্তিহীন বিষয়ও যোগ করেছেন । অতঃপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমর্থক মুসলমান নামধারীরাও পাশ্চাত্যের এসব লেখকের অনুসরণ করেছে । মহান আল্লাহর দরূদ ও সালাম তাঁর সকল নবী- রাসূলদের ওপর বর্ষিত হোক । আর যে সব ব্যক্তি এ সব মহামানবের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে মহান আল্লাহর দরবারে আমরা তাদের থেকে সম্পর্কোচ্ছেদ ঘোষণা করছি ।

হযরত দাউদ (আ.) ইসরাইলীদেরকে পৌত্তলিকতা ও মুশরিকদের আধিপত্য থেকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বরিক শাসন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহেও বিস্তার লাভ করেছিল । যে সব

জাতি তাঁর শাসনাধীন ছিল তিনি তাদের সাথে এমন সদাচরণ করতেন যে, মহান আল্লাহর পবিত্র কোরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর কণ্ঠে তা বর্ণনা করেছেন । হযরত দাউদ (আ.) আল কুদসে মারীয়া পাহাড়ের ওপর তাঁর শ্রদ্ধেয় প্রপিতামহ হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর ইবাদত- বে গী করার স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু সেখানে আরুনা নামের আল কুদসের ইয়াবূস বংশীয় একজন বাসি ার শস্যক্ষেত্র ছিল । হযরত দাউদ (আ.) ঐ লোকের কাছ থেকে ঐ জমি ৫০ শাকোল (ওজনের পিণ্ড) রূপার বিনিময়ে ক্রয় করেন । বর্তমান তাওরাতের বক্তব্য অনুসারে সেখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ এবং নামায কায়েম করেছিলেন । আর তিনি এর একটি অংশে মহান আল্লাহর জন্য কোরবানীও করতেন ।[৬৮]

হযরত সুলাইমান এর রাজত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী -(.আ) হযরত দাউদ (.আ) হয়েছিলেন । তাঁর হুকুমত ও রাজত্ব ঐ পর্যায়ে বিস্তার লাভ করেছিল যার উল্লেখ পবিত্র কোরআন এবং মহানবী এর সুন্নাহয় বিদ্যমান -(.সা) । তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত দাউদ এবং (.আ) এর মসজিদটিকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ ইমারতে -(.আ) শ্রদ্ধেয় প্রপিতামহ হযরত ইবরাহীম রেছিলেন যারূপান্তরিত ক 'মা'বাদই সুলাইমান -' অর্থাৎ The temple of King Solomon নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে ।

হযরত সুলাইমান (আ.)- এর শাসনামল মহান নবীদের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী যুগ । এ যুগে মহান আল্লাহ্ তাঁর আশ্চর্যজনক ও বিচিত্র নেয়ামতসমূহের কিছু নমুনা মানব জাতির কাছে প্রকাশ করেছিলেন । যদি জাতিসমূহ মহান নবী এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের নেতৃত্বের রাজনৈতিক ধারাটি বহাল রাখত এবং মহান আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যুদ্ধ- বিগ্রহ ও দমন কার্যে ব্যবহার না করত, তাহলে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে এ সব নেয়ামত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রদান করতে থাকতেন । মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

"মহান আল্লাহ্ যদি মানব জাতির জন্য অজস্র জীবিকার ব্যবস্থা করতেন, তাহলে তারা পৃথিবীতে অন্যায়- অত্যাচার করত । কিন্তু মহান আল্লাহ্ যতটুকু চান কেবল ততটুকুই তিনি অবতীর্ণ করেন । আর তিনি তাঁর বা াদের ব্যাপারে জ্ঞাত এবং তাদের সব কিছু দেখেন ।"[৬৯]

হযরত সুলাইমান (আ.) নিজ সিংহাসনের ওপর উপবিষ্টাবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন । ঐতিহাসিকরা তাঁর মৃত্যুর তারিখ খ্রিস্টপূর্ব ৯৩১ সাল বলে উল্লেখ করেছেন ।

হযরত সুলাইমানের মৃত্যুর সাথে সাথেই বনি ইসরাইলের মধ্যে বিচ্যুতি এবং তাদের হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভক্তি দেখা দেয় । আর এ কারণেই মহান আল্লাহ্ তাদের ওপর এমন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বশীল করে দিয়েছিলেন যে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করিয়েছিল ।

বর্তমান তাওরাতের রাজন্যবর্গ ও শাসকদের প্রথম পুস্তিকায় সুলাইমান (আ.)- এর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে এভাবে যে, তিনি মহান আল্লাহর ইবাদত- বন্দেগী বর্জন করে মূর্তি পূজা করতেন । তাওরাতে উল্লিখিত হয়েছে : "তিনি সুলাইমানকে বললেন : এ শাস্তির কারণ তুমি নিজেই । যে সব চুক্তি এবং ওয়াজিব বিধান পালন করার আদেশ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, তুমি সেগুলো সংরক্ষণ কর নি । আমিও তোমার হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে তা টুকরো টুকরো করে ফেলব ।"[৭০]

৪. অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব- সংঘাতের যুগ

তাদের অধঃপতন এতটাই হয়েছিল যে, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য তাদের মধ্যকার পৌত্তলিকরা মিশরের ফিরআউন, আশুরীয় ও ব্যাবেলনীয়দের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল ।

হযরত সুলাইমান (আ.)- এর মৃত্যুর পর ইহুদীরা শেকীম (নাবলুস) নামক স্থানে সমবেত হয়ে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইয়ারবাআম বিন নাবাত- এর হাতে বাইআত করে । উল্লেখ্য যে, এ ইয়ারবাআম বিন নাবাত হযরত সুলাইমানের অন্যতম শত্রু ছিল । সে সুলাইমান (আ.)- এর শাসনামলে মিশরে পালিয়ে যায় এবং ফিরআউনদের কাছে আশ্রয় নেয় । হযরত সুলাইমান (আ.)- এর মৃত্যুর পর সে ফিরে আসলে ইহুদীরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল । সে জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে 'ইসরাইল' নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল যার রাজধানী ছিল শেকীম বা সামেরাহ্ । খুব অল্প সংখ্যক ইহুদী হযরত সুলাইমানের পুত্র রাহাবাআমের হাতে বাইআত করে ।

রাহাবাআমের রাজ্য 'ইয়াহুদা' নামে পরিচিত ছিল । এ রাজ্যের রাজধানী ছিল আল কুদস (জেরুজালেম) ।[৭১]

কিন্তু আসিফ বিন বারখিয়া যিনি ছিলেন হযরত সুলাইমান (আ.)- এর উত্তরাধিকারী, মহান আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলেছেন : (عنده علم من الكتاب) অর্থাৎ তার কাছে কিতাবের কিছু জ্ঞান ছিল । বনি ইসরাইল তাঁর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল । তিনি বনি ইসরাইলের কাছ থেকে মিথ্যা অপবাদ লাভ করা ছাড়া আর কিছুই পান নি ।

তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে : "কুফর ও মূর্তিপূজা ইয়ারাবাআম- এর অনুসারীদের মধ্যে প্রকাশ্যে বিদ্যমান ছিল । সে স্বর্ণ দিয়ে দু'টি গোবৎস মূর্তি বানিয়ে এগুলোর একটি আল কুদসে এবং অপরটি দানে স্থাপন করেছিল । সে প্রতিটি মূর্তির পাশে একটি করে কোরবানী করার জায়গাও নির্মাণ করেছিল এবং তাদেরকে বলেছিল : "তোমাদের খোদারাই তোমাদেরকে মিশর থেকে বের করে শেকীমে এনেছেন । অতএব, তাঁদের সামনে তোমরা কোরবানী করবে এবং ঊরশালিমে যাবে না ।" আর ইহুদী জাতিও তার কথা মেনে নিয়েছিল ।[৭২]

গোবৎস উপাসনা করার পাশাপাশি ইয়ারাবাআম তাদেরকে অন্যান্য দেব- দেবী, যেমন- সাইদূনীদের দেবতা আশতারুত (عشتروت), মুআবীদের দেবতা কামুশ (كموش) এবং আমোনদের দেবতা মাকলুম (مكلوم)- এর উপাসনা করার আদেশ দিয়েছিল ।[৭৩]

আদি রাজা ও শাসকবর্গের কাহিনীসমূহ সংক্রান্ত পুস্তিকার বক্তব্য অনুসারে ইয়াহুদা রাজ্যও তিন বছর পরে এই একই পরিণতি বরণ করেছিল (অর্থাৎ সেখানেও মূর্তিপূজা, পৌত্তলিকতা এবং শিরকের প্রসার হয়েছিল) ।[৭৪]

মিশরের ফিরআউন শীশক (شيشق) এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইয়ারাবাআমকে সাহায্য ও ইয়াহুদা রাজ্যের ধ্বংস সাধন করার জন্য খ্রি.পূ. ৯২৬ সালে হযরত সুলাইমান (আ.)- এর পুত্র রাহাবাআম ও তাঁর অনুসারীদেরকে পরাজিত করে আল কুদস দখল করে এবং বেথ- ঈল (মহান

আল্লাহর গৃহ)- এর ধনভাণ্ডার, শাসনকর্তার সিংহাসন, এমনকি হযরত সুলাইমান (আ.) যে সব স্বর্ণের ঢাল বানিয়েছিলেন সেগুলো নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিল ।

সম্ভবত মিশরের ফিরআউনের নিজ রাজ্যে দুর্বল অবস্থানের কারণে নিজে অথবা তার সহযোগীর (ইয়ারাবাআম) মাধ্যমে ইয়াহুদা রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে পারে নি ।

অতএব, শীশকের পশ্চাদপসরণ করার পর এ ক্ষুদ্র রাজ্যটি নিজ অবস্থান কিছুটা ফিরে পেয়েছিল এবং তারা ইয়ারাবাআমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল । আরামীরা উক্ত রাজ্যদ্বয়ের দুর্বলতার সুযোগ নেয় এবং ইয়াহুদা রাজ্য আক্রমণ করে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ব ী করে নিজেদের রাজধানী দামেশককে নিয়ে যায় । তারা বিজিতদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করে । এ ঘটনা আরামী বিন হুদের রাজত্বকালে (খ্রি.পূ. ৮৭৯- খ্রি.পূ. ৮৪৩) ঘটেছিল ।[৭৫]

অতঃপর আখাব বিন আওমেরীর রাজত্বকালে খ্রি.পূ. ৮৭৪- খ্রি.পূ. ৮৫৩ সালের মধ্যে আরামীয়রা ইয়ারাবাআমের রাজ্যের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করে সে দেশকেও তাদের করদ রাজ্যে পরিণত করেছিল ।

একইভাবে তাওরাতে ইয়েহুরামের শাসনকালে ইয়াহুদা রাজ্যের সাথে কোশেসীয়ীদের যুদ্ধে আরবদের সাথে ফিলিস্তিনীদের যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তারা আল কুদস দখল করে শাসনকর্তার প্রাসাদে সংরক্ষিত ধন- সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ব ী করেছিল ।[৭৬]

তাওরাতে আরো বর্ণিত আছে : "আরামীয় সেনাবাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং সেখানকার সকল নেতাকে হত্যা করতঃ সকল ধন- সম্পদ লুণ্ঠন করে । অতঃপর তারা সে সব লুণ্ঠিত ধন- সম্পদ আরামীয়দের রাজা হাযাঈলের কাছে অর্পণ করে ।"[৭৭]

ঠিক একইভাবে ইসরাইল রাজ্যের শাসনকর্তা ইউআশ ইয়াহুদা রাজ্য আক্রমণ করে নগরীর দুর্গ ধ্বংস করেছিল । সে মহান আল্লাহর ঘরে সংরক্ষিত যাবতীয় স্বর্ণ, রৌপ্য, বাসন- কোসন এবং রাজকীয় কোষাগার লুণ্ঠন করেছিল ।[৭৮]

আশুরীয়দের দখল করার আগ পর্যন্ত বনি ইসরাইলের মধ্যে এ ধরনের দ্বন্দ্ব- সংঘাতময় অবস্থা এবং তাদের ওপর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে ।

৫. আশুরীয়দের আধিপত্য বিস্তারের যুগ

খ্রি. পূ. ৮৫৯ সাল থেকে খ্রি. পূ. ৮২৪ সাল পর্যন্ত আরামীয় রাজ্য ও ইসরাইলে আশুরীয় রাজ তৃতীয় শালমান্নাসরের আক্রমণের মাধ্যমে ইহুদীদের ওপর আশুরীয়দের আধিপত্যের সূত্রপাত ঘটে । পুরো অঞ্চলই তার এবং তার পরবর্তী আশুরীয় রাজন্যদের শাসনাধীনে চলে যায় । তবে সম্ভবত প্রথমে ইসরাইল রাজ্যের পরিবর্তে ইয়াহুদা রাজ্যটি আশুরীয়দের শাসনাধীনে এসেছিল । কারণ তাওরাতের বর্ণনানুসারে সেখানকার শাসনকর্তা আহায বিন ইউসাম আশুর রাজ্যের নৃপতি তাঘলিস ফালাসারকে ইসরাইল ও আরামীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর জন্য আহবান করেছিল; আর আশুর রাজও তার সর্বশেষ আবেদন গ্রহণ করে খ্রি.পূ. ৭৩২ সালে আক্রমণ করার উদ্যোগ নেন । আশুর রাজের উত্তরাধিকারী নৃপতি ৫ম শালমান্নাসরও তাঁর পূর্বসূরির কর্মপন্থা অব্যাহত রাখেন । কিন্তু তিনি ইসরাইলের রাজধানী শেকীম (নাবলুস) অবরোধকালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত নৃপতি দ্বিতীয় সিরজাওন সামেরাহ্ নগরী পুরোপুরি দখল করেছিলেন এবং এভাবে তিনি এ দেশটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন । ইসরাইল আক্রমণ করার মাধ্যমে ইহুদীদেরকে তাদের দেশ ও মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করা হয় । তাঘলিস ফালাসার ইহুদীদেরকে ব ী করে নিজ দেশে নিয়ে আসেন এবং আশুরীয়দেরকে তাদের দেশে আবাসন দেন ।[৭৯]

তারপর সুলতান ফাকাহ্ উক্ত পরিকল্পনা সমাপ্ত করেন এবং তিনি মানসীর বংশধরদের ও ইহুদী জনসংখ্যার অর্ধেকাংশকে ব ী করেছিলেন ।[৮০]

দ্বিতীয় সিরজাওন প্রায় ত্রিশ হাজার ইহুদীকে হাররান, খাবূর নদীর তীর এবং মিডিয়ায় নির্বাসিত করেন এবং তাদের স্থলে আরামীয়দেরকে আবাসন দেন ।[৮১]

হিযকিয়ার শাসনামলে ইয়াহুদা রাজ্য আশুরীয়দের হাত থেকে বের হয়ে আসে । বাহ্যত তিনি মিশরীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করছিলেন । তাঁর এ উদ্যোগে আশুর রাজ্যের নৃপতি সিনহারীব তার ওপর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং খ্রি. পূ. ৭০১ সালে ইয়াহুদা রাজ্যকে বশীভূত করার জন্য এবং আশুরীয়দের সর্বশেষ আক্রমণের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চল নিজ শাসনাধীনে আনেন এবং আল কুদস দখল করেন । হিযকিয়া মহান আল্লাহর গৃহে বিদ্যমান যাবতীয় রৌপ্য এবং শাসনকর্তার প্রাসাদে গচ্ছিত সকল ধন- সম্পদ তাঁর কাছে অর্পণ করেছিলেন ।[৮২]

বর্তমান তাওরাতে আশুর দেশের যে সব নৃপতির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে তাঁরা ব্যতীত আসরহাদ্দুন এবং তাদের সর্বশেষ নৃপতি আশুর বানিবাল সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেছে : "এ দু'জন আশুর রাজ্য থেকে বেশ কিছু সম্প্রদায়কে সামেরাহ্ নগরীতে এনে আবাসন দিয়েছিলেন ।"[৮৩]

৬. বাবেলীয়দের আধিপত্য বিস্তারের যুগ

মাদ ও বাবেলীয়দের (কালদানীদের) হাতে খ্রি.পূ. ৬১২ সালে আশুরীয়দের রাজধানী নেইনাভার পতন ঘটে এবং উক্ত রাজ্যকে বিজয়ীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় । ইরাক, শাম ও ফিলিস্তিন বাবেলীয়দের ভাগে পড়ে । তাদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন বাখতুন নাসর- যিনি শাম ও ফিলিস্তিনকে নিজ শাসনাধীনে আনার জন্য খ্রি.পূ. ৫৯৭ সালে প্রথম বার এবং খ্রি.পূ. ৫৮৬ সালে দ্বিতীয় বার সেখানে আক্রমণ করেছিলেন ।

প্রথম আক্রমণে তিনি আল কুদস অবরোধ ও জয় করেন । তিনি সেখানকার শাসনর্তার প্রাসাদের যাবতীয় ধন- রত্ন ও সম্পদ হস্তগত করেন । বিরাট সংখ্যক ইহুদী, এমনকি সুলতান ইয়াহুভা ইয়াকীন ও তাঁর সমর্থকদেরকে ব ী করেন এবং ধৃত সুলতানের পিতৃব্য সিদিকইয়াকে অবশিষ্ট ইহুদীদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । তিনি ব ীদেরকে বাবিলের (ব্যাবিলনের) খাবূর নদীর কাছে নাইবূর এলাকায় নির্বাসিত করেন ।[৮৪]

দ্বিতীয় আক্রমণ : বাখতুন নাসর ও মিশরের ফিরআউন খোফরার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে । কারণ, ফিরআউন খোফরা শাম ও ফিলিস্তিনের

শাসনকর্তাদের, যেমন আল কুদসের নয়া শাসক সিদিকইয়াকে বাবেলীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে এবং তাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে । তারাও তা মেনে নেয় এবং মিশরের ফিরআউন অত্র অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে । কিন্তু বাখতুন নাসর দ্রুত আরেকটি আক্রমণ পরিচালনা করে মিশরীয়দেরকে পরাজিত করেন এবং সমগ্র অঞ্চল তাঁর করায়ত্তে চলে আসে । ইহুদীদের উপাসনালয়ে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস এবং তাদের ধন-ভাণ্ডারসমূহ লুণ্ঠন করা হয় । তাদের সব ঘর- বাড়ি ধ্বংস এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইহুদীকে ব ী করা হয় । সিদিকইয়ার সন্তানদেরকে বাখতুন নাসরের সামনে জবাই এবং তারপর সিদিকইয়ার দু'চোখ উপড়ে ফেলা হয় । তাকেও পায়ে বেড়ী পড়িয়ে ব ীদের সাথে নিয়ে যাওয়া হয় । আর এভাবেই ইয়াহুদা রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায় ।[৮৫]

৭. ইরানীদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের যুগ

পারস্য- সম্রাট সাইরাস (কোরুশ) বাবেল নগরী ও রাজ্য দখল করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে সেখানকার সরকার ও প্রশাসনের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটান । তিনি শাম ও ফিলিস্তিন আক্রমণ করে সে দেশগুলো নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন । তিনি বাখতুন নাসরের ব ীদেরকে এবং যে সব ইহুদী বাবেলে বসবাস করত তাদেরকে আল কুদসে ফিরে যাওয়ার অনুমতি এবং সুলাইমান (আ.)- এর ইবাদতগাহের ধন- সম্পদসমূহ তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন । তিনি তাদেরকে তাদের উপাসনালয় সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করার অনুমতি দেন এবং যেরবাবেলকে তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করেন ।[৮৬]
সাইরাস কর্তৃক নিযুক্ত ইহুদী শাসনকর্তা, হযরত সুলাইমান (আ.)- এর ইবাদতগাহ্ পুনঃনির্মাণ প্রক্রিয়ায় হাত দিলে তৎসংলগ্ন এলাকার জনগণ ভয় পেয়ে সম্রাট সাইরাসের উত্তরাধিকারী কামবুজিয়ার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে । তিনি ইবাদতগাহ্ নির্মাণ কার্য বন্ধ রাখার নির্দেশ জারী করেন । অতঃপর ১ম দারা (দারায়ূশ) তাদেরকে ইবাদতগাহ্ পুনঃনির্মাণের অনুমতি দিলে খ্রি. পূ. ৫১৫ সালে ইবাদতগাহের ইমারত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ।

খ্রি. পূ. ৫৩৯ সাল থেকে খ্রি. পূ. ৩৩১ সাল পর্যন্ত ইহুদীদের ওপর ইরানী জাতির আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল । এ দীর্ঘ সময় সম্রাট সাইরাস, কামবুজিয়াহ্, প্রথম দারায়ূশ, খেশার ইয়ার্শা এবং হযরত উযাইর (আ.)- এর সমসাময়িক আরদাশীর ইহুদীদের শাসন করেছেন । এদের পর আরো কতিপয় ইরানী সম্রাট, যেমন দ্বিতীয় দারায়ূশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরদাশীর রাজত্ব করেছেন । তৃতীয় আরদাশীর ছিলেন শেষ পারস্য সম্রাট যিনি গ্রীক সম্রাট ইস্কা ারের (আলেকজান্ডার)[৮৭] হাতে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন । বর্তমান তাওরাতে এ সব সম্রাট ও রাজা- বাদশার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ।

৮. গ্রীকদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের যুগ

গ্রীকসম্রাট ইস্কা ার আলেকজান্ডার মিশর, শাম ও ফিলিস্তিনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ঐ সব অঞ্চল পদানত ও নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন । ইরানী সামন্তরা ও আঞ্চলিক শক্তিগুলো তাঁর মুখোমুখি হলে তিনি তাদের পরাজিত করে আল কুদসে প্রবেশ করেন এবং উক্ত অঞ্চল পূর্ণরূপে নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করেন । অতঃপর সম্রাট ইস্কা ার উত্তর ইরাকের আরবীলে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পারস্য সম্রাট তৃতীয় আরদাশীরের শাসনকর্তৃত্ব ও সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ নির্মূল করেন । এরপর তিনি সম্মুখপানে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে পারস্য ও আরো অন্যান্য অঞ্চল দখল করেন । আর এভাবে খ্রি.পূ. ৩৩১ সালে ইহুদীরা গ্রীকদের অধীন হয়ে যায় ।

ইস্কা ারের মৃত্যুর পরে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের ওপর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীর সেনাপতিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় যা ২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল । বাতালিসা (বাতলীমূসীয়রা) মিশর সরকারের অধিকাংশ অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং সেলূকীয়রা (সেলূকূস- এর সাথে সংশ্লিষ্ট) সিরিয়া ও অন্যান্য অংশের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন ।

আর এভাবেই আল কুদস খ্রি.পূ. ৩১২ সালে বাতলীমূসীয়দের নিয়ন্ত্রণে আসে । কিন্তু তৃতীয় সেলূকীয় নৃপতি আনতিয়োকূস খ্রি. পূ. ১৯৮ সালে বাতলীমূসীয়দের নিয়ন্ত্রণ থেকে আল কুদস

মুক্ত করেন । অতঃপর আবারও বাতলীমূসীয়রা আল কুদসের ওপর নিজেদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রি. পূ. ৬৪ সালে রোম কর্তৃক উক্ত অঞ্চল বিজিত হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে নিজেদের শাসনকর্তৃত্ব অব্যাহত রাখে ।

বর্তমান তাওরাত ছয় জন বাতলীমূসীয়কে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে ষষ্ঠ বাতলীমূসীয় পর্যন্ত স্মরণ করে বলেছে : "তাদের মধ্যকার প্রথম ব্যক্তি শনিবার ঊরশালিমে প্রবেশ করে বিপুল সংখ্যক ইহুদীকে ব ী করে মিশরে প্রেরণ করেছিলেন ।"[৮৮]

ঠিক একইভাবে তাওরাত পাঁচ জন সেলূকীয় শাসনকর্তাকে প্রথম, দ্বিতীয় এভাবে পঞ্চম আনতিয়োকূস নামে উল্লেখ করেছে এবং বলেছে : "তাদের মধ্যকার চতুর্থ ব্যক্তি খ্রি.পূ. ১৭৫ সাল থেকে খ্রি.পূ. ১৬৩ সাল পর্যন্ত আল কুদসে সেনাভিযান পরিচালনা করেন এবং হযরত সুলাইমান (আ.)- এর উপাসনালয়ের যাবতীয় মূল্যবান জিনিস লুণ্ঠন করেন এবং দু'বছর পরে আল কুদসের ওপর এক বিরাট আঘাত হানেন । সেখানে যা কিছু ছিল তা লুণ্ঠন এবং উক্ত নগরীর বাড়ি- ঘর ও প্রাচীরসমূহ ধ্বংস করা হয় । আক্রমণকারী চতুর্থ আনতিয়োকূস নারী ও শিশুদেরকে ব ী করেন । তিনি নিজেদের উপাস্য যিউসের প্রতিমা উক্ত ইবাদতগাহে স্থাপন করেন এবং ইহুদীদেরকে উক্ত প্রতিমার উপাসনা করার আহবান জানান । তাদের অনেকেই তাঁর এ আহবানে সাড়া দিয়েছিল । অথচ মেকাবী ইহুদীদের আ ালনের কারণে খ্রি. পূ. ১৬৮ সালে তাদের অনেকেই গোপন স্থান ও গুহাসমূহে আশ্রয় নিয়েছিল ।[৮৯]

ইহুদীরা নিজেদের যে বিপ্লব ও আ ালনের ব্যাপারে গর্ব করে তা গেরিলা গোষ্ঠীসমূহের যুদ্ধের সাথেই বেশি সদৃশ ছিল । ইহুদী ধর্মে বিশ্বাসীরা মূর্তিপূজারী গ্রীকদের বিরুদ্ধে এ সব যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল । তারা বিভিন্ন সময়ে সীমিত সাফল্য লাভ করেছিল এবং এ অবস্থা রোমীয়দের চূড়ান্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব স্থাপন করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ।

৯. রোমীয়দের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের যুগ

রোম- সম্রাট বোম্বেই খ্রি. পূ. ৬৪ সালে সিরিয়া দখল এবং তা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন । পরের বছর তিনি আল কুদস দখল করেন এবং তা সিরিয়াস্থ রোমান শাসনকর্তার অধীন করে দেন । মথির ইঞ্জিলে (মেথিউসের বাইবেল) বর্ণিত হয়েছে : "খ্রি.পূ. ৩৯ সালে রোম- সম্রাট অগাস্ট হিরোডিস আদোমীকে ইহুদীদের প্রশাসক নিযুক্ত করেন । নব নিযুক্ত শাসনকর্তা হযরত সুলাইমান (আ.)- এর ইবাদতগাহের ওপর একটি নতুন ও সু র অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং তিনি খ্রি. পূ. ৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।"[৯০]

ইঞ্জিলসমূহের বিবরণ অনুসারে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হেরোডিস খ্রি.পূ. ৪ সাল থেকে ৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইহুদীদের শাসন করে এবং তার যুগে হযরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন । এ শাসনকর্তাই ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়াকে হত্যা করে তাঁর কর্তিত মস্তক একটি সোনালী পাত্রে রেখে সালূমার কাছে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করে । উল্লেখ্য যে, এ সালূমা ছিল বনি ইসরাইলের এক জঘন্য নারী ।[৯১]

ইঞ্জিলসমূহ ও ঐতিহাসিকরা নেরোনের (নিরো) যুগে ৫৪- ৬৮ খ্রিস্টাব্দে রোমান ও ইহুদীদের মধ্যে যে সব ঘটনা এবং কুদস ও ফিলিস্তিনে যা কিছু ঘটেছে তা উল্লেখ করেছেন । রোমান সম্রাট কাসবেসীয়ান তাঁর পুত্র তিতুসকে ৭০ খ্রিস্টাব্দে উক্ত অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন । তিনি আল কুদসে আক্রমণ চালান । ফলে সেখানকার ইহুদীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদের রসদপত্রও শেষ হয়ে গেলে তারা দুর্বল হয়ে যায় । তিনি তিতুস শহরের প্রাচীর ধ্বংস করেন এবং পুরো শহর তাঁর দখলে চলে আসে । তিনি শহরে প্রবেশ করে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং তাদের বাড়ি- ঘর ধ্বংস করেন । তাদের উপাসনালয় গুঁড়িয়ে ফেলা হয় এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করা হয় । উপাসনালয়টি এমনভাবে ধ্বংস করা হয় যে, এর অস্তিত্বই আর খুঁজে পাওয়া যায় নি । শহরের যে সব অধিবাসী প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তাদেরকে রোমে নিয়ে যাওয়া হয় ।

ঐতিহাসিক আল মাসউদী তাঁর 'আত্ তাম্বীহ্ ওয়াল আশরাফ' গ্রন্থে বলেন : "এ আক্রমণে নিহত ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল তিন মিলিয়ন- যা বাহ্যত অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে । এ সব

ঘটনার পর রোমানরা ইহুদীদের সাথে বেশি কঠোর আচরণ প্রদর্শন করে যা ঐ সময়ে তুঙ্গে পৌঁছে যখন সম্রাট ক টানটাইন এবং তাঁর পরবর্তী কায়সাররা (সম্রাটরা) খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা ইহুদীদেরকে নির্যাতন ও শাস্তির মধ্যে রাখেন। এ কারণেই ৬২০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর যুগে শাম ও ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের সাথে পারস্য সম্রাট খোসরু পারভেযের যে যুদ্ধ হয়েছিল সে যুদ্ধে রোমান বাহিনীর পরাজয় বরণ করার কারণে ইহুদীরা খুব খুশী হয়েছিল। ঠিক একইভাবে হিজাযের ইহুদীরাও আন প্রকাশ করেছিল এবং তারা মুসলমানদের ওপর তাদের বিজয়ী হওয়ার দূরাশা পোষণ করত। তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় :

"আলিফ লাম মীম। এ সব অক্ষরের শপথ রোম পরাজিত হয়েছে। খুব নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং পরাজয় বরণ করার পর তারা অতি শীঘ্রই বিজয়ী হবে, খুব অল্প কয়েক বছরের মধ্যে। অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল বিষয় কেবল মহান আল্লাহরই। আর মহান আল্লাহর সাহায্য ও শক্তির দ্বারা ঈমান আনয়নকারীরা সেদিন আনি ত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করেন। আর তিনিই পরাক্রমশালী বিজয়ী এবং দয়ালু।"[৯২]

ঐতিহাসিকদের অভিমত অনুযায়ী রোমানদের ওপর বিজয় লাভ করার পর বিজয়ী ইরানীদের কাছ থেকে ইহুদীরা নব্বই হাজার খ্রিস্টান যুদ্ধব ী ক্রয় করে তাদের সবাইকে হত্যা করেছিল। কয়েক বছর পর যখন রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস ইরানীদের ওপর বিজয়ী হন তখন তিনি ইহুদীদেরকে শাস্তি দেন এবং আল কুদসে যে ইহুদীই ছিল তাকে তিনি সেখান থেকে বহিষ্কার করেন; আর এভাবে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে এ শহর ইহুদীদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে খ্রিস্টানরা শর্তারোপ করেছিল যে, কোন ইহুদী যেন সেখানে বসবাস না করে এবং তিনিও তাদের ইচ্ছার প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেন এবং এ বিষয়টি তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ করেন। আর তা ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ হিজরী ১৮ সালে যখন আল কুদস ও ফিলিস্তিন ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তখন থেকে ১৩৪৩ হিজরী অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ পাশ্চাত্যের হাতে তুর্কী উসমানী খিলাফতের পতন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এ হচ্ছে ইহুদী জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যা আমাদের কাছে নানাবিধ বিষয়, যেমন ইহুদীদের ব্যাপারে সূরা ইসরা (বনি ইসরাইল) ও অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহের তাফসীরও স্পষ্ট করে দেয় ।... এ সব আয়াতের তাফসীর এবং 'তোমরা পৃথিবীতে দু'বার ফিতনা করবে'- এ আয়াতে মহান আল্লাহর বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে, মহানবী (সা.)- এ নবুওয়াতে অভিষেকের আগে একবার এবং এরপর আরেকবার তোমরা পৃথিবীতে ফিতনা করবে । আর এটিই হচ্ছে তাদের বহু ফিতনা ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পর্যায় ব্যাখ্যাকারী একমাত্র শ্রেণীবিন্যাস । উল্লেখ্য যে, ইহুদী জাতির ইতিহাস এ সব বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ ।

১০ইসলাম ও মুসলমানদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের যুগ .

'আমাদের পক্ষ থেকে এমন সব বা াদেরকে প্রেরণ করব যারা হবে প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী'- মহান আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হচ্ছে মুসলমানরা । কারণ মহান আল্লাহ্ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমাদেরকে তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল করে দিয়েছিলেন । আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তন্নতন্ন করে তল্লাশী করেছেন । এরপর তাঁরা মসজিদে আকসায় প্রবেশ করেন । আবার যখন আমরা পবিত্র ইসলাম ধর্ম থেকে দূরে সরে যাই তখন মহান আল্লাহ্ আমাদের বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে শক্তিশালী করে দেন এবং তাদেরকে ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি (লোকবল) দিয়ে সাহায্য করেন এবং জনশক্তির দিক থেকে তাদেরকে আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধি করে দিয়েছেন । অতঃপর ইমাম মাহদী (আ.)- এর হুকুমতের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী আ ালন এবং তাঁর আবির্ভাব আ ালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল করে দেবেন । আমরা ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ্ ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে প্রত্যক্ষ করি না যাদেরকে মহান আল্লাহ্ ইহুদীদের ওপর বিজয়ী করে অতঃপর ইহুদীদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করেছেন ।

তবে জাতিসমূহের ওপর ইহুদীদের প্রতিশ্রুত শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য অর্জন কেবল একবারই হবে, তা দু'বার হবে না । তাদের এ আধিপত্য লাভ তাদের দ্বিতীয় নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড এবং

ফিতনার সমসাময়িক হবে অথবা তারা তাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও সৃষ্ট ফিতনা- ফাসাদের মাধ্যমেই তা অর্জন করবে । আর আমরা ইহুদীদের এ শ্রেষ্ঠত্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল ব্যতীত তাদের ইতিহাসের আর কোন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ করি না ।

আজ ইহুদীরা তাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের তুঙ্গে অবস্থান করছে । আমরা বর্তমানে আমাদের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের সূচানলগ্নে প্রবেশ করেছি এবং আমরা তাদের কুৎসিত চেহারা উন্মোচন করার পর্যায়ে রয়েছি ঐ সময় যখন মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন । যেমনভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রথমবার মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে পৃথিবীতে তাদের গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারাকে চূর্ণ- বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি আমরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে অথবা তাঁর সাথে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করব এবং তাদের আধিপত্য, গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকামিতার ধ্বংস সাধন করব ।

তবে 'যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন ও তওবা কর তাহলে আমরাও প্রত্যাবর্তন করব, আর আমরা জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য কারাগাররূপে নির্ধারণ করেছি'- মহান আল্লাহর এ বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসরাইল ধ্বংস হওয়ার পর অনেক ইহুদী পৃথিবীতে থেকে যাবে । যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে না ইমাম মাহদী (আ.) তাদেরকে আরব দেশসমূহ থেকে বহিষ্কার করবেন । রেওয়ায়েত অনুসারে তারা আবার নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হবে । আর তা হবে এক চোখ বিশিষ্ট দাজ্জালের ফিতনা চলাকালে । ইমাম মাহদী (আ.) এবং মুসলমানরা এ সব ফিতনা সৃষ্টিকারীদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করবেন এবং মহান আল্লাহ্ তাদের মধ্য থেকে যারা নিহত হবে তাদের জন্য জাহান্নামকে কারাগার করে দেবেন এবং মুসলমানরা তাদের অবশিষ্টদেরকে কারাগারে অন্তরীণ করে তাদের নাশকতামূলক কর্মতৎপরতা ও ফিতনা চিরতরে বন্ধ করে দেবে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরব জাতি ও আবির্ভাবের যুগে তাদের ভূমিকা

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আন্দোলন এবং আবির্ভাবের যুগে আরব জাতি এবং তাদের সার্বিক অবস্থা ও শাসনকর্তাদের প্রসঙ্গে অসংখ্য রেওয়ায়েত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে ইয়েমেনে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হুকুমত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিদ্যমান; এ সব রেওয়ায়েত ও হাদীস সার্বিকভাবে উক্ত হুকুমতের প্রশংসায় বর্ণিত হয়েছে । আমরা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এ সব হাদীস স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করব ।

মিশরীয়দের আন্দোলন সংক্রান্ত রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহও উক্ত রেওয়ায়েত ও হাদীসমূহের মধ্যে বিদ্যমান । এ সব হাদীস ও রেওয়ায়েতে মিশরীয়দের প্রশংসা করা হয়েছে, বিশেষ করে ঐ সব রেওয়ায়েত ও হাদীস যেগুলোয় বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর কতিপয় সঙ্গী- সাথী ও সহকারী মিশরীয় হবেন । আরো কতিপয় হাদীসে বিধৃত আছে যে, মিশর হযরত মাহদী (আ.)- এর মিম্বার অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বের প্রচার ও চিন্তাধারার কেন্দ্রস্থল হবে । মিশরে প্রবেশ করে সে দেশের মিম্বারে আরোহণ করে ইমাম মাহদী (আ.) যে ভাষণ প্রদান করবেন তৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ বিদ্যমান আছে । এ কারণে মিশরীয় আন্দোলন ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী আন্দোলনসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর আবির্ভাবের আন্দোলনের অংশ বলে গণ্য করা হয়েছে । আমরা এ আন্দোলন সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করব ।

ঠিক একইভাবে ইরাকে বিদ্যমান দলসমূহ এবং সেখানকার প্রকৃত মুমিনদের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহও বিদ্যমান । তাদেরকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীদের অন্তর্ভুক্ত বলে রেওয়ায়েতসমূহে স্মরণ করা হয়েছে এবং যথাসময়ে তা আমরা বর্ণনা করব ।

আরব জাতি সংক্রান্ত রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মাগরিবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ যেগুলোয় মিশর, সিরিয়া, জর্ডান এবং ইরাকে মাগরিবী সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এ সব হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে তাদের নিশ্চিত হওয়ার

বিষয়টি প্রতীয়মান হয় । আর শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে আরব দেশসমূহে ইসলামী আন্দোলন এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে এ সেনাবাহিনী প্রেরিত হবে যা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা পালন করবে অথবা আরব জাতীয়তাবাদ সংরক্ষণকারী বাহিনী সদৃশ হবে । আমরা পরে এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করব ।

ঠিক একইভাবে শিয়া ও সুন্নী সূত্রসমূহে সার্বিকভাবে আরব শাসক ও রাজন্যবর্গকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে । যেমন : নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি মুস্তাফীদ[৯৩] রেওয়ায়েত : "আরবদের (অথবা তাগুতীদের) জন্য আক্ষেপ ঐ অনিষ্ট থেকে যা তাদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলবে ।"

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : "মহান আল্লাহর শপথ, আমি যেন তাকে (ইমাম মাহদী) রুকন ও মাকামের মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি যে জনগণ তার সাথে একটি নতুন গ্রন্থ নিয়ে বাইআত করছে অথচ এ বিষয়টি মেনে নেয়া আরবদের কাছে খুবই কঠিন ও কষ্টকর হবে । আরব তাগুতী ও সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য আক্ষেপ ঐ অনিষ্ট থেকে যা অতি সত্বর তাদেরকে আষ্টে- পৃষ্টে বেঁধে ফেলবে ।"[৯৪] আর হাকিমের মুস্তাদরাকে বর্ণিত হয়েছে : "আরবদের জন্য আক্ষেপ ঐ অনিষ্ট থেকে যা শীঘ্রই তাদের কাছে উপস্থিত হবে ।"[৯৫]

এখানে নতুন গ্রন্থ বলতে পবিত্র কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে যা হবে পরিত্যক্ত (অর্থাৎ তদনুসারে আমল করা হবে না) এবং হযরত মাহদী (আ.) আবার নতুন করে তা উপস্থাপন করবেন এবং একে নব জীবন দেবেন ।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "যখন আল কায়েম আল মাহদী কিয়াম করবে (জনসমক্ষে আবির্ভূত হবে ও আন্দোলন করবে) তখন সে জনগণকে নতুন করে ইসলাম ধর্মের দিকে আহবান জানাবে এবং যে বিষয়টি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে এবং যা থেকে সাধারণ জনগণ পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে বিচ্যুতির পথে পা দিয়েছে সে বিষয়টির দিকে পরিচালিত করবে । আর সে এ কারণে

‘মাহদী’ নামে অভিহিত হয়েছে যে, সে জনগণকে একটি হারানো বিষয়ের দিকে দিক নির্দেশনা দেবে। আর তাকে ‘কায়েম’ বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে সত্যসহ কিয়াম করবে।”[৯৬]

ইসলাম ধর্ম শাসকশ্রেণী এবং অধিকাংশ সাধারণ মানুষের কাছে কঠিন ও অপ্রীতিকর হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা এ ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আর এ কারণেই পবিত্র কোরআন ও খাঁটি ইসলাম ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন, হযরত মাহদী (আ.)- এর হাতে বাইআত এবং ইসলামী বিধি- বিধান অনুসারে আমল করা তাদের জন্য কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে যাবে।

নতুন গ্রন্থ বলতে সূরা ও আয়াতসমূহের নতুন বিন্যাস সমেত এ পবিত্র কোরআনকেই বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। রেওয়ায়েত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : “মহানবী (সা.) এবং অন্য সকল নবীর বিদ্যমান জিনিসপত্রসহ উল্লিখিত পবিত্র কোরআন ইমাম মাহদী (আ.)- এর কাছে সংরক্ষিত আছে এবং আমাদের হাতে যে পবিত্র কোরআন বিদ্যমান সেই কোরআনের সাথে উক্ত কোরআনের কোন পার্থক্য নেই, এমনকি তাতে আমাদের কাছে বিদ্যমান কোরআন অপেক্ষা একটি বর্ণও কম- বেশি নেই।

তবে আমাদের কাছে বিদ্যমান কোরআনের সাথে ইমাম মাহদী (আ.)- এর কাছে বিদ্যমান কোরআনের পার্থক্যটা হচ্ছে কেবল সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস সংক্রান্ত। ইমাম মাহদী (আ.)- এর কাছে বিদ্যমান এ কোরআনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক পঠিত এবং হযরত আলী (আ.)- এর হাতে লিখিত। এ দুই অর্থে (অর্থাৎ সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস এবং পবিত্র কোরআনের পরিত্যক্ত বিধি- বিধানসমূহ বাস্তবে বলবৎ করা) পবিত্র কোরআন তাদের কাছে নতুন গ্রন্থ বলে মনে হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু ইয়াফুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “আমি ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : আরব বিদ্রোহীদের জন্য ধ্বংস রয়েছে ঐ অমঙ্গলের মধ্যে যা অতি শীঘ্রই তাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। আমি বললাম : আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হই। হযরত কায়েম আল মাহদীর সাথে কজন আরব থাকবে?

তিনি বললেন : খুব অল্প সংখ্যক । আমি বললাম : মহান আল্লাহর শপথ, যারা তাদের (আরবদের) ব্যাপারে এ কথা বর্ণনা করে তারা সংখ্যায় অনেক । তিনি বললেন : তবে অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করা হবে এবং তাদেরকে পরস্পর থেকে ছেঁকে বের করে আনা হবে । আর অনেক লোকই পরীক্ষার মাধ্যমে (ইসলাম ধর্মের সীমানা থেকে) বের হয়ে যাবে ।”[৯৭]

এ সব রেওয়ায়েতের অন্তর্গত হচ্ছে ঐ সব রেওয়ায়েত যেগুলোয় ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালে আরবদের মধ্যকার মতবিরোধের কথা বর্ণিত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, এ মতবিরোধ (কতিপয়) আরবের মাঝে গৃহযুদ্ধের কারণ হবে ।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “জনগণ এক ধরনের তীব্র ভয়- ভীতি এবং ফিতনা ও বিপদাপদ কবলিত না হওয়া পর্যন্ত আল কায়েম কিয়াম করবে না । আর এর পূর্বে আছে তাদের মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা । এর পরপরই আরবদের মাঝে ধারালো তরবারি কর্তৃত্বশীল ও ফয়সালাকারী হবে । জনগণের মাঝে মতপার্থক্য, ধর্মের ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্তি এবং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হবে । আর তা এমনভাবে হবে যে, মানুষের মাঝে পারস্পরিক হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা প্রত্যক্ষ করে সবাই তখন সকাল- সন্ধ্যায় মৃত্যু কামনা করবে ।”[৯৮]

আর বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত ও হাদীস আছে যেগুলো সঠিক আকীদা- বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে আরবদের দূরে সরে যাওয়া, চিন্তাবিদগণ কর্তৃক তাদের নিজস্ব অভিমত ও ধ্যান- ধারণা ব্যক্ত করা এবং অন্যদেরকে তা গ্রহণ করার জন্য আহবান করার সাথে সংশ্লিষ্ট ।

এ সব রেওয়ায়েত ও হাদীসের মধ্যে ইরানীরা অথবা ইরানের শাসকবর্গ ও আরবদের মধ্যকার মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত হাদীসসমূহও বিদ্যমান । আর এ দ্বন্দ্ব- সংঘাত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে ।

যখন আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী, কালো পতাকাবাহীদের আ োলন এবং কুদস অভিমুখে তাদের অগ্রযাত্রা এবং সুফিয়ানীর শত্রুতামূলক তৎপরতা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত ও হাদীসগুলো প্রত্যক্ষ করি তখন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আরব শাসক ও রাজা- বাদশাহদের মাঝে কালো

পতাকাবাহীদের বিরোধী মনোভাব ও ভূমিকা থাকবে । তবে ইয়েমেনী আ ালন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে । অর্থাৎ তারা এবং অন্যান্য যে সব ইসলামী আ ালন ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীদের মাধ্যমে হবে তারা আরব শাসকদের থেকে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করবে অর্থাৎ আরব দেশসমূহের ঐ সব ইসলামী আ ালন, ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী কালো পতাকাবাহী ইরানীদের সহযোগী হবে । উল্লেখ্য যে, সুফিয়ানী কুদস অভিমুখে অগ্রসরমান ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী কালো পতাকাবাহী ইরানীদের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইবে ।

আরবদের সাথে ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ এবং পবিত্র মক্কা নগরী মুক্ত করার পরপরই সুফিয়ানী বাহিনীর হাত থেকে মদীনা মুক্ত করার পর অথবা মুক্ত করার সময় হিজাযের ক্ষয়িষ্ণু প্রশাসন ও সরকারের অবশিষ্টাংশের সাথে তিনি যে যুদ্ধ করবেন তৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ যেমন বিদ্যমান আছে ঠিক তেমনি (এরপর) ইরাকে সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বেশ কয়েকটি যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিনে সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে ইমামের বৃহৎ যুদ্ধ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে । (এ সব রেওয়ায়েত ও হাদীসের মধ্য থেকে) গুটিকতক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) ইরাকে তাঁর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবেন এবং সেখানকার ৭০টি গোত্রের রক্তপাত হালাল গণ্য করবেন । (ইরাক ও শামদেশের ঘটনাবলী বর্ণনা করার সময় এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব) । এতদপ্রসঙ্গে ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেছেন : "যখন আল কায়েম আবির্ভূত হবে তখন তার, আরব ও কুরাইশদের মাঝে একমাত্র তরবারী ব্যতীত আর কোন ফয়সালাকারী থাকবে না ।"[৯৯]

আরব উপদ্বীপ, শাম, বাগদাদ, বাবিল (ব্যাবিলন) ও বসরায় ভূমিধ্বসসমূহ এবং হিজায অথবা হিজাযের পূর্ব দিকে অগ্নির আবির্ভাব ও তা প্রজ্বলিত হওয়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহও উক্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহের অন্তর্গত । উল্লেখ্য যে, উক্ত অগ্নি তিন দিন অথবা সাত দিন পর্যন্ত

অবিরামভাবে জ্বলতে থাকবে এবং তা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে ।

শাম দেশ ও সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান

ইসলামের ইতিহাস ও হাদীস শাস্ত্রের সূত্র ও গ্রন্থসমূহে বর্তমান সিরিয়া ও লেবানন যা শামের মরুভূমি এবং লেবাননের পার্বত্য অঞ্চল বলেও অভিহিত এবং জর্দান ও অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ড সমবেতভাবে শাম বা বৃহত্তর শামদেশের অন্তর্ভুক্ত (বহুবচন শামাত) । যদিও প্রধানত সমগ্র এ অঞ্চলকে শাম ও ফিলিস্তিন বলা হতো; আর শামদেশের রাজধানী দামেশক 'শাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিল ।

আবির্ভাবের যুগে শামদেশ এবং এর ঘটনাবলী ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্বসংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েত অগণিত । আর এ সব রেওয়ায়েতের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সুফিয়ানীর আ ালন যে শামের ওপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করে সমগ্র দেশকে নিজ শাসনাধীনে নিয়ে আসবে । সুফিয়ানীর সেনাবাহিনী ইমাম মাহদী (আ.)- এর সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে । সে শামে তার শত্রুদেরকে নির্মূল করার পর তুর্কীদের (রুশদের) বিরুদ্ধে কিরকীসীয়ায় এক বৃহৎ যুদ্ধে লিপ্ত হবে । অতঃপর সে ইরাকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর হুকুমতের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে । সে হিজাযেও ভূমিকা রাখবে এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আ ালনকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে হিজাযের শাসনকর্তাকে সাহায্য করার জন্য সেখানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে । কিন্তু মক্কা নগরীর অদূরে প্রতিশ্রুত মুজিযা (ভূগর্ভে তাদের প্রোথিত হওয়া) বাস্তবায়িত হবে ।

সার্বিকভাবে সুফিয়ানীর জন্য সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হবে ফিলিস্তিন বিজয় ও হযরত মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ । ইহুদী ও রোমানরা (পাশ্চাত্য) এ যুদ্ধে সুফিয়ানীকে সাহায্য ও সমর্থন দেবে । আর সুফিয়ানীর পরাজিত ও নিহত হওয়া, ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিজয়, তাঁর মাধ্যমে ফিলিস্তিন

মুক্ত হওয়া এবং আল কুদসে তাঁর প্রবেশের মাধ্যমে এ গোলযোগের পরিসমাপ্তি হবে । আমরা এ বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই ।

সুফিয়ানীর অভ্যুত্থানের আগে শামের ঘটনাবলী

সুফিয়ানীর আ ালনের শুরু থেকে আল কুদস মুক্ত করার যুদ্ধে তার পরাজয় বরণ পর্যন্ত ঘটনাবলী ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীসসমূহ থেকে বের করা তুলনামূলকভাবে সহজ । তবে এর বিপরীতে যে সব ঘটনা সুফিয়ানীর আগে সংঘটিত হবে সেগুলো ঐ রেওয়ায়েতসমূহ থেকে বের করা বেশ কঠিন । কারণ উক্ত ঘটনাবলী সাধারণত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এবং রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহে ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতা আগে- পরে করা হয়েছে । তবে এ সব কিছুর ফলাফল নি রূপ :

১. সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর সর্বগ্রাসী ফিতনা- ফাসাদের প্রাদুর্ভাব এবং তাদের ওপর রোম (পাশ্চাত্য) ও তুর্কীদের (রুশ জাতি) আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া ।

২. শামে একটি বিশেষ ফিতনার উৎপত্তি যা তাদের মাঝে মতবিরোধ, দুর্বলতা ও আর্থিক সংকটের উদ্ভব ঘটাবে ।

৩. শামে মূল শক্তিশালী দু'দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ।

৪. দামেশকে ভূমিকম্প যার ফলে ঐ শহরের মসজিদের পশ্চিম পার্শ্ব এবং এর আরো কিছু এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে ।

৫. শামে ইরানী ও পাশ্চাত্যের (মাগরিবী) সম্মিলিত বাহিনীর আগমন ।

৬. শামে ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণকে কেন্দ্র করে তিন নেতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব : এ তিন নেতা হবে আবকা, আসহাব এবং সুফিয়ানী । বাকী দু'জনের ওপর সুফিয়ানীর বিজয়, সমগ্র সিরিয়া ও জর্দানের ওপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র অঞ্চলটি তার শাসনাধীন হওয়া ।

ঠিক একইভাবে হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহে সুফিয়ানীর আ ালনের আগেকার আরো কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর বিবরণ আগেই দেয়া হয়েছে অথবা এতৎসংক্রান্ত বিশেষ অধ্যায়ে তা দেয়া হবে । যেমন : রোমান ও তুর্কীদের যুদ্ধ এবং এ অঞ্চলে তাদের নিজ নিজ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা, মিশরে মিশরীয় বিপ্লবীর আবির্ভাব ও বিপ্লব, সে দেশে পাশ্চাত্য বাহিনীর আগমন এবং ইরাকে শাইসাবানীর বিদ্রোহ ইত্যাদি ।

তবে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত ইয়েমেনীর আবির্ভাব সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের সমসাময়িক হবে অথবা তিনি সুফিয়ানীর আবির্ভাবের খুব কাছাকাছি সময় আবির্ভূত হবেন । তবে এ কালো পতাকাবাহীরা হবে ইরানী এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের প্রথম ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী এ দলটি সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও উত্থানের বেশ কিছুকাল আগে আবির্ভূত হবে এবং তাদের সেনাবাহিনী সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের আগেই শামে উপস্থিত হবে (পরে বিস্তারিত বর্ণিত হবে) । তাদের নেতা হবেন খোরাসানী সাইয়্যেদ এবং তাদের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবে শুআইব ইবনে সালিহ্; এ দু'ব্যক্তিই প্রতিশ্রুত এবং তাঁরা আবির্ভূত হবেন । কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ দু'জন প্রতিশ্রুত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সুফিয়ানীর আবির্ভাবের কাছাকাছি সময় হবে । তবে আরো কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সুফিয়ানীর আবির্ভাবের ৬ বছর আগে এ দু'জনের আবির্ভাব হবে । মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়েই তা আলোচনা করব ।

বিশ্বব্যাপী ফিতনা ও শামের ফিতনা

বিশ্বব্যাপী ও শামের ফিতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহে শামের এক বিশেষ ফিতনা সম্পর্কিত বর্ণনা এসেছে যা সুফিয়ানীর আবির্ভাবের আগে সে দেশে সংঘটিত হবে । এ ফিতনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কর্তৃক সৃষ্ট ফিতনা হতে ভিন্ন হবে । উল্লেখ্য যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ফিতনা দ্বারা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ আক্রান্ত হবে । আর আমরা এ ব্যাপারে আগেই আলোচনা করেছি । অধিকতর শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলা যায় উল্লিখিত ফিতনা বিশ্বব্যাপী ফিতনার সাথে সংযুক্ত অথবা এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হতে পারে । কখনো কখনো এ সব ফিতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত এবং এগুলোর রাবীদের (রেজালশাস্ত্রগত) অবস্থা একে অপরের সাথে মিশে গেছে ।

শামের ফিতনায় সবচেয়ে স্পষ্ট যে দিক বিদ্যমান তা হচ্ছে, ঐ সব মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব- সংঘাত শত্রুদের সামনে শামের অধিবাসীদের প্রতিরোধ- ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দেবে এবং তা তাদের হুকুমত দুর্বল হওয়ার কারণ হবে । অবস্থা এমন হবে যে, তারা নিজেদের দেশ শাসন ও পরিচালনা করতে অক্ষম হয়ে যাবে । হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) একে দলসমূহের মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের ফিতনা বলে অভিহিত করেছেন যা পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত হয়েছে । কারণ নিে াক্ত আয়াতটির ব্যাপারে ইমাম আলী (আ.)- কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ।

“তাদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী (হযরত ঈসা মসীহর ব্যাপারে) নিজেরাই মতবিরোধ করেছিল, সুতরাং ঐ মহান দিবসে (কিয়ামত দিবসে) এ সব কাফির জনতার জন্য ধ্বংস ।”[১০০]

তিনি বলেছিলেন : “তিনটি নিদর্শনের মধ্যে মহামুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করো ।” তাঁকে তখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : “হে আমীরুল মুমিনীন! ঐ নিদর্শনগুলো কি?” তিনি বলেছিলেন : “শামবাসীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ, খোরাসান থেকে কালো পতাকাসমূহ উত্তোলিত হওয়া এবং রমযান মাসে আসমান থেকে গায়েবী আওয়াজ ।” তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : “রমযান মাসে ঐ আসমানী গায়েবী আওয়াজটি কি?” তখন তিনি বলেছিলেন : “ তোমরা কি পবিত্র কোরআনে ‘যদি আমরা চাই আসমান থেকে তাদের ওপর এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করব যার সামনে

সবাই আ সমর্পণ করবে’[১০১] - এ আয়াতটি সম্পর্কে শুননি? তা হবে এমন এক নিদর্শন যা যুবতীকে তাঁবু থেকে বের করে আনবে, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করবে এবং জাগ্রতকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে ।”[১০২]

অবশ্য উপরিউক্ত নিদর্শনত্রয়ের মধ্য থেকে দু’টি নিদর্শন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে । একটি হচ্ছে শামবাসীদের আন্তঃবিভক্তি ও মতবিরোধ এবং অন্যটি হচ্ছে খোরাসান হতে কালো পতাকাসমূহের আবির্ভাব । তবে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) শামবাসীদের মতবিরোধের সূত্রপাত কবে হবে এবং রমযান মাসে আসমানী গায়েবী আওয়াজ পর্যন্ত কালো পতাকাসমূহের আবির্ভাবের সময়কাল সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি এবং তা বহু বছর দীর্ঘায়িত হতে পারে । রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবির্ভাবের বছরেই আসমানী গায়েবী আহবান জানানো হবে যার পরবর্তী মুহররম মাসে ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন ।

মহানবী (সা.) বলেছেন : “মাহদীর আবির্ভাবের আগে একটি ফিতনার উদ্ভব হবে যা জনগণকে তীব্রভাবে আক্রান্ত করবে । অতঃপর এমন যেন না হয় যে, তোমরা শামবাসীদেরকে গালি দেবে । কারণ ঐ দেশে প্রকৃত মুমিনগণও আছে; বরং তাদের মধ্যকার অত্যাচারীদেরকে অভিশাপ দাও । আর মহান আল্লাহ্ শীঘ্রই আকাশ থেকে এমন ভাগ্য ও ফয়সালা প্রেরণ করবেন যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে (অত্যাচারীদের) এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করে দেবেন যে, শৃগালও তাদের ওপর আক্রমণ করে জয়ী হতে পারবে । তখন মহান আল্লাহ্ মাহদীকে ন্যূনতম বারো হাজার এবং সর্বোচ্চ পনর হাজার ব্যক্তির মাঝে আবির্ভূত করবেন এবং যাদের মুখে উচ্চারিত বাক্য বা সামরিক ে াগান ‘হত্যা করুন’, ‘হত্যা করুন’ হবে তাদের নিদর্শন । তারা পতাকাধারী তিনটি দল হবে যাদের সাথে সাত পতাকার সমর্থকগণ যুদ্ধ করবে । ঐ সাত দলের মধ্যে এমন কোন পতাকাধারী থাকবে না যার মধ্যে শাসনক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভ থাকবে না । তখন মাহদী আবির্ভূত হবে এবং মুসলমানদের কাছে তাদের দয়া-মায়া, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও নেয়ামতসমূহ পুনঃপ্রত্যাবর্তন করাবে ।”[১০৩]

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "মহান আল্লাহ্ শামবাসীদের ওপর এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করবে, এমনকি শৃগালরাও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের ওপর বিজয়ী হবে । এমন সময় আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি পতাকাবাহী তিন গোষ্ঠীসহ আবির্ভূত হবে... ।[১০৪]

আবদাল শব্দের অর্থ প্রকৃত- সত্যবাদী মুমিনরা । এ শব্দটি মহানবী (সা.)- এর হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে । আর এ শব্দের অর্থের বিশদ ব্যাখ্যা ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীদের কথা উল্লেখ করার সময় দেয়া হবে ।

অরেকটি রেওয়ায়েতে 'কাযা ও কদর' অর্থাৎ ভাগ্য ও ফয়সালার পরিবর্তে 'সাবাব' (কারণ) শব্দটি এসেছে । আর এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ্ শামবাসীদের ওপর এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বশীল করে দেবেন যে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করবে অর্থাৎ এমন কিছু লোককে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন যারা তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাবে এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব- সংঘাতের কারণ হবে ।

'হত্যা করুন', 'হত্যা করুন' অথবা 'হে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হত্যা করুন' ইমাম মাহদী (আ.)- এর কতিপয় সঙ্গীর সামরিক শ্লোগান হবে ।

'**পতাকাবাহী তিনটি দল**'- **এর অর্থ** : ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীরা তিনটি দলে বিভক্ত হবেন । সাত নেতার সমর্থকরা ইমাম মাহদী ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে । যেহেতু এদের সকলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভী হবে, সেহেতু তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেবে । তবে এ মতভেদ সুফিয়ানী যে তাদের সকলের নেতা হবে এ ব্যাপারে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না । কারণ ইরাক ও হিজাযে সামরিক আক্রমণ এবং তার সেনাবাহিনীর পরাজয় বরণ করার কারণে তার সরকার ও প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়বে । আর এর ফলে তার ক্ষমতালোভী সঙ্গী- সাথী ও বিরোধীদের জন্য ক্ষমতা দখল করার প্রস্তুতি নেয়ার এক দুর্লভ সুযোগের সৃষ্টি হবে । অথচ তারা তখন ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে ।

শামের ওপর পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ এবং খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে বেশ কিছু রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে। উল্লেখ্য যে, সেখানকার জনগণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য উক্ত দুর্ভিক্ষ, খাদ্য- সংকট ও অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হবে। আর এটিই স্বাভাবিক যে, এ সংকট বহিস্থঃ ও অভ্যন্তরীণ ফিতনার সহযোগী হবে এবং মুসলমানদেরকে চাপের মধ্যে রাখার জন্য এটি হবে একটি হাতিয়ারস্বরূপ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করবে।

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "অনতিবিলম্বে শামের জনগণের (সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ফিলিস্তিন) দীনার (অর্থ- সম্পদ) ও খাদ্যভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এটা কিভাবে ঘটবে? তিনি বললেন : রোমানদের (পাশ্চাত্য) পক্ষ থেকে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন : আখেরী যামানায় একজন খলীফা (শাসক) আসবে যে জনগণকে কম ধন- সম্পদ প্রদান করবে এবং তা গণনায় আনবে না।"[১০৫]

এ অর্থনৈতিক চাপ ও খাদ্য- সংকটের উদগাতা হবে রোমানরা।

জাবির জু'ফী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম বাকির (আ.)- কে 'নিশ্চয়ই আমরা ভয়- ভীতি ও ক্ষুধার মতো বেশ কিছু বিষয় দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করব'- মহান আল্লাহর এ বাণীর ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন : "ক্ষুধা দু'ধরনের। যথা : সাধারণ ও বিশেষ। তবে কুফায় ক্ষুধা হবে বিশেষ ধরনের যা মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বংশধরদের শত্রুদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করবেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করবেন; তবে শামে সাধারণ ব্যাপক ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব হবে। আর তা হবে এমন এক ভয়- ভীতি ও ক্ষুধা যে, ঐ সময় পর্যন্ত তারা কখনই এর শিকার হয় নি। তবে ক্ষুধা কায়েম আল মাহ্দীর উত্থান ও আবির্ভাবের আগে এবং ভয়- ভীতি ও অস্থিরতা তার উত্থান ও আবির্ভাবের পরে হবে।"[১০৬]

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : "আল কায়েম আল মাহ্দীর উত্থান ও আবির্ভাবের আগে নিশ্চিতভাবে এক বছরের জন্য জনগণ দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে এবং তাদের মধ্যে

নিহত হওয়া, জান- মাল, ফল ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির তীব্র ভয়- ভীতি বিরাজ করবে। আর এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। তখন তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন : নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে বেশ কিছু জিনিস, যেমন ভয়- ভীতি, ক্ষুধা, ধন- সম্পদ, প্রাণ, শস্য ও ফল- মূলের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে পরীক্ষা করব এবং ধৈর্যশীলদেরকে আপনি সুসংবাদ দিন'।"[১০৭]

এ রেওয়ায়েত অনুসারে আবির্ভাবের বছরই এ চাপ ও সংকীর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এ সংকট ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বেশ কিছুকাল পূর্ব হতে শুরু হয়ে আবির্ভাবের বছরে অতীতের চেয়ে আরো তীব্র আকার ধারণ করবে এবং এর পরপরই তিনি আবির্ভূত হবেন। তাই পূর্বোক্ত বর্ণনা এ বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

কিন্তু রেওয়ায়েতসমূহে শামে এ ফিতনার সময়কাল দীর্ঘ হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যখনই বলা হবে যে, ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখনই তা দীর্ঘায়িত হবে। 'তারা এ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। পরিত্রান পাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে চাইবে, কিন্তু তা তারা পাবে না।[১০৮]

আর রেওয়ায়েতসমূহ এ ফিতনাকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ফিতনার উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সমেত উল্লেখ করেছে যা সকল আরব ও মুসলমানের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করবে এবং যখনই এক দিক থেকে এর সংস্কার করা হবে তখনই তা অন্য দিক থেকে গোলযোগের উদ্ভব হবে।[১০৯]

যতক্ষণ পর্যন্ত বৃহত্তর ফিতনার কোন একটি ফলাফল বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ এগুলোই হবে পূর্বোক্ত ফিতনার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য; অর্থাৎ উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ এই ফিতনার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যা বহিরারোপিত বৃহত্তর ফিতনাসমূহের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াস্বরূপ... বরং কতিপয় রেওয়ায়েতে এ ফিতনাকে ফিলিস্তিনের ফিতনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : ইতোমধ্যে ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (পৃ. ৬৩) এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

কতিপয় হাদীসে এ ফিতনার সময়কাল ১২ ও ১৮ বছর বলে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময়কাল সম্ভবত ফিতনার সর্বশেষ পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকবে। তবে তা এর সার্বিক সময়কাল হবে না।

আর আমরা আশাবাদী যে, এটি হচ্ছে লেবাননের গৃহযুদ্ধের সর্বশেষ সময়কাল ।[১১০]

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : “শামে একটি ফিতনা সৃষ্টি হবে যা শুরুতে শিশুদের খেলাসদৃশ হবে, কিন্তু এরপর থেকে তাদের সার্বিক অবস্থার কোন উন্নতি হবে না । আকাশ থেকে একজন আহবানকারী উচ্চৈঃস্বরে আহবান ও ঘোষণা না করা পর্যন্ত তাদের আর কোন ক্ষমতা থাকবে না । আহবানকারী ঘোষণা করবে : তোমাদের উচিত অমুকের অনুবর্তী হওয়া এবং ঐ অবস্থায় একটি হাত আসমানে দেখা যাবে এবং ইঙ্গিত করতে থাকবে ।”[১১১]

উল্লিখিত আসমানী আহবান-ধ্বনিতে ইমাম মাহদী (আ.)-এর নাম ঘোষণা করা হবে ঠিক একইভাবে যে হাত আকাশ থেকে ইঙ্গিত করবে সেটিও ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের অন্যতম নিদর্শন হবে ।

মহানবী (সা.) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : “চতুর্থ ফিতনা ১৮ বছর স্থায়ী হবে এবং যথাসময়ে তা সমাপ্ত হবে । ফোরাত নদী থেকে একটি স্বর্ণ-পর্বত নির্গত হবে । এর ফলে মানুষ এমনভাবে এ স্থানের ওপর আক্রমণ চালাবে যে, তাদের প্রতি ৯ জনের মধ্যে ৭ জন নিহত হবে ।”[১১২] আর শীঘ্রই ফোরাতের গুপ্তধনকে কেন্দ্র করে কিরকীসীয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ।

দামেশক ও এর আশেপাশে ভূমিকম্প

এ ভূমিকম্প সংক্রান্ত অগণিত স্পষ্ট রেওয়ায়েত বিদ্যমান । এগুলোর মধ্যে গুটিকতক রেওয়ায়েতে পাশ্চাত্য বাহিনীর আগমনের আগেই যে এ ভূমিকম্প সংঘটিত হবে তা স্পষ্ট বিধৃত হয়েছে । যদিও কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভূমিকম্প সংঘটিত হবার সময় পাশ্চাত্য বাহিনী দামেশকে উপস্থিত থাকবে । ঠিক একইভাবে হাদীসসমূহে এ ভূমিকম্পকে আর-রাজফাহ্, আল খাসাফ এবং আয-যালযালাহ্ অর্থাৎ তীব্র ঝাঁকুনি, ভূমিধ্বস ও ভূ-গর্ভে

প্রোথিত হওয়া এবং কম্পন বলে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ইমাম বাকির (আ.) আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

"যখন শামদেশে দুই সেনাবাহিনী পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে তখন সেখানে মহান আল্লাহর একটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আমীরুল মুমিনীন ঐ নিদর্শনটি কী? তখন তিনি বললেন : শামদেশে একটি ভূমিকম্প হবে যার ফলে এক লক্ষ লোক নিহত হবে এবং এ ভূমিকম্পকে মহান আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য রহমত এবং কাফিরদের জন্য আযাব করে দেবেন। যখন এ ভূমিকম্পের সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তোমরা মাগরিব (মরক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও তিউনিসিয়া) থেকে হলুদ পতাকাবাহী শ্বেত অশ্বারোহী সেনাদলকে শামে প্রবেশ করতে দেখবে। আর ঠিক তখনই আর্তনাদ, ভয়ঙ্কর অশান্তি এবং লাল মৃত্যু (হত্যাকাণ্ড) ঘনিয়ে আসবে। যখন এ অবস্থার উদ্ভব হবে তখন হারশা (অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে খারীশা মারমারাস্তা) নামক দামেশকের একটি গ্রাম্য জনপদ ভূ-গর্ভে প্রোথিত হতে দেখবে। ঠিক এ সময় কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দের বংশধর সুফিয়ানী মরু এলাকা থেকে বিদ্রোহ করবে এবং দামেশকের মিম্বারে আরোহণ করবে। আর এ যুগ সন্ধিক্ষণে তোমরা সবাই মাহদীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।"[১১৩]

এ রেওয়ায়েত ও অন্যান্য রেওয়ায়েতে উল্লিখিত ভূমিকম্পটি দামেশক ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূ-গর্ভে প্রোথিত হওয়া থেকে ভিন্ন হতে পারে এবং ঐ দুই ভূ-গর্ভে প্রোথিত হওয়ার মধ্যে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানও থাকতে পারে। তবে ঐ ভূমিকম্প কেন মুমিনদের জন্য রহমত এবং কাফিরদের জন্য আযাব হবে? এর কারণ এটি হতে পারে যে, নির্যাতিত মুমিনরা নয়; বরং কাফিরদের এবং তাদের অনুসারীদের ঘর-বাড়িসমূহই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথবা এ ভূমিকম্পের বদৌলতে এর পরপরই মুমিনদের অনুকূলে বেশ কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

অন্যান্য রেওয়ায়েতসমূহে দু'টি স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত স্থানদ্বয়ে ভূমিধ্বস সংঘটিত হবে। এ স্থানদ্বয়ের নাম হারাসতা এবং জাবিয়াহ্। তাই মনে হচ্ছে যে, পাশ্চাত্য

সেনাবাহিনীসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে যেমন বর্ণিত হবে ঠিক তদ্রূপ এ রেওয়ায়েতে 'হারাসতা' শব্দটি ভুল উচ্চরিত হয়েছে । আর দামেশকের মসজিদের পশ্চিম দেয়ালটি ধ্বংস হবে ।

'শ্বেত অশ্বসমূহের' অর্থ হচ্ছে পাশ্চাত্যবাসীদের অশ্বসমূহ যেগুলোর কান কর্তিত হবে । আর এ সব অশ্ব হবে পাশ্চাত্য সৈন্যদের বাহন ।

কলিজা ভক্ষণকারিণীর বংশধরদের অর্থ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হি র বংশধর । কারণ সুফিয়ানী মুয়াবিয়ার বংশধর হবে । আর এ বিষয়টি পরে বর্ণিত হবে । একটি রেওয়ায়েতে ওয়াদী ইয়াবিস (শুষ্ক মরু এলাকা বা উপত্যকা) থেকে সুফিয়ানীর উত্থান হবে বলা হয়েছে । আর উক্ত অঞ্চলটি সিরিয়া- জর্দান সীমান্তে আযরুআতের (দিরআ) কাছে হাবওরান এলাকায় অবস্থিত ।

শামে ইরানী ও মাগরিবী সেনাবাহিনীর আগমন

শামে মাগরিবী সেনাবাহিনীসমূহের আগমন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ সুস্পষ্ট । দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র যুদ্ধের পরপরই তাদের আগমন হবে । যেমন পূর্বে বর্ণিত সেই রেওয়ায়েতটি ।

"যখন শামে দু'টি সামরিক গোষ্ঠী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তখন মহান আল্লাহর একটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে । জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আমীরুল মুমিনীন! ঐ নিদর্শনটি কী হবে? তিনি বলেছিলেন : শামে একটি ভূমিকম্প হবে যার ফলে এক লক্ষ লোকের প্রাণহানি হবে । আর মহান আল্লাহ্ এ ভূমিকম্পটি মুমিনদের জন্য রহমত এবং কাফিরদের জন্য আযাব করে দেবেন । যখন ঐ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে তখন তোমরা হলুদ পতাকাবাহী শ্বেত অশ্বারোহীদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা মাগরিব বা পশ্চিম থেকে এসে শামে প্রবেশ করবে ।"

ইবনে হাম্মাদ আবু সাহাব থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তিনি হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের যুগে বলতেন : "তোমাদের কাছে মাগরিবীদের আগমন ব্যতীত তোমরা সুফিয়ানীকে দেখতে

পাবে না । যখনই তোমরা দেখবে যে, সে বিদ্রোহ করেছে এবং (বক্তৃতা দেয়ার জন্য) দামেশকের মিম্বারে আরোহণ করেছ তখন তোমরা অনতিবিলম্বে মাগরিবীদেরকে দেখতে পাবে।” এ ধরনের রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাবেয়ী রাবীদের কাছে এটি প্রসিদ্ধ ছিল যে, সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের আগেই শামে মাগরিবী সেনাবাহিনীর আগমন হবে ।

এ সব হাদীসে মাগরিব ও মাগরিবীর অর্থ হচ্ছে আল মাগরিব নামে মুসলিম বিশ্বের একটি অঞ্চল যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বর্তমান কালের লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো । এর উদ্দেশ্য পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো অথবা মরক্কো নামে পরিচিত মাগরিব সরকারের সেনাবাহিনী নয় । আমাদের এ বক্তব্য যে জিনিসটি সমর্থন করে তা হচ্ছে, কিছু কিছু রেওয়ায়েতে মাগরিবী বাহিনীকে (পশ্চিমাঞ্চলীয়) বার্বার জাতি ও বার্বার বাহিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে ।

আরেকটি রেওয়ায়েতে উক্ত মাগরিবী সেনাবাহিনীর আগমনের সূচনাকাল সুস্পষ্ট করে নির্ধারণ করা হয়েছে । অর্থাৎ মাগরিবী বাহিনীর আগমন ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বসের সমসাময়িক হবে । মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ্ থেকে ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন : “মাগরিবী সেনাবাহিনীর প্রথম দলগুলো দামেশকের মসজিদে আগমন করে যখন এর আশ্চর্যজনক দর্শনীয় বস্তুসমূহ দেখতে থাকবে তখন হঠাৎ ভূমিধ্বস হয়ে দামেশক-মসজিদের পশ্চিমাংশ এবং হারাসতা নামের একটি গ্রাম ভূ-গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে । আর এ সময় সুফিয়ানীর উত্থান হবে এবং সে বিদ্রোহ করবে ।”[১১৪]

তবে এ বাহিনী কেন আসবে এবং তাদের ভূমিকা কী হবে? বহিঃশত্রু অর্থাৎ ইহুদী ও রোমানদের বিরুদ্ধে শামদেশের জনগণকে সাহায্য করার জন্য অথবা শাম দেশস্থ কোন বিবাদমান পক্ষকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে হয়তো বা তাদের আগমন হতে পারে । তবে কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী খোরাসানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা শামে আগমন করবে । উল্লেখ্য যে, খোরাসানী বাহিনী মাগরিবী বাহিনীর আগেই শামে প্রবেশ করবে ।... যেহেতু সকল রেওয়ায়েত অনুযায়ী কালো পতাকাবাহী খোরাসানী সেনাদলের লক্ষ্যই হবে আল কুদস (বাইতুল মুকাদ্দাস) সেহেতু তাদের বিরোধী মাগরিবী

সেনাবাহিনীদের আগমন অনিবার্য হবে এ কারণে যে, তারা খোরাসানী বাহিনীর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে । বিশেষ করে যে রেওয়ায়েতে কুনাইতারায় উক্ত বাহিনীদ্বয়ের মধ্যকার যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই রেওয়ায়েতটি বিবেচনায় আনলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুনাইতারা সিরিয়ার একটি শহর যা ইসরাইলের দখলে রয়েছে ।

যুহরী থেকে ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন : ফিলিস্তিনে প্রবেশ করার জন্য কুনাইতারায় কালো পতাকাবাহী খোরাসানী বাহিনী এবং হলুদ পতাকাবাহী মাগরিবী বাহিনী পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে । আর যখনই মাগরিবীরা জর্দানে আগমন করবে ঠিক তখনই খোরাসানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সুফিয়ানী সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে । মাগরিবী বাহিনীর প্রধান মৃত্যুবরণ করলে তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । এদের একটি দল তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবে । আরেক দল হজ্বব্রত পালন করবে এবং তৃতীয় দলটি শামে থেকে যাবে । সুফিয়ানী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে পরাজিত করে নিজের আজ্ঞাবহ করবে ।”[১১৫]

এ রেওয়ায়েতটি মুরসাল[১১৬] যা একজন তাবেয়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে । এ থেকে বোঝা যায় যে, শামদেশে ফিতনা ও সংঘর্ষ ইরানী সেনাবাহিনীকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অত্র অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপ করার সুযোগ এনে দেবে । তবে রোমীয় (পাশ্চাত্য) ও অরোমীয়রা ইরানীদের মোকাবিলা করার জন্য মাগরিবী সেনাবাহিনীকে অত্র অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করবে । আর এ যুদ্ধের স্থান হবে কুনাইতারা নগরী । অবশেষে ইরানী বাহিনী ফিলিস্তিনে উপস্থিত হয়ে যে মাগরিবী বাহিনী পরাজয় বরণের পরপরই পালিয়ে গিয়ে জর্দানে অবস্থান গ্রহণ করবে তাদেরকে ধ্বংস করবে । ঐ সময় মাগরিবে এ সেনাবাহিনীর প্রধান অথবা মাগরিবী বাহিনীর আশ্রয়দানকারী জর্দানের শাসনকর্তার মৃত্যু হবে । এর ফলে তাদের সকল কর্মতৎপরতা দুর্বল হয়ে পড়বে । আর ঠিক তখনই সুফিয়ানী মাগরিবী বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে বশীভূত করে ফেলবে । যেমন কতিপয় রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে শামে সুফিয়ানীর আবির্ভাবের পর ইরানী সেনাবাহিনী শামদেশ থেকে পশ্চাদপসরণ করবে ।

আমরা একটি ব্যাপারে সম্মানিত পাঠক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । আর তা হলো যে, এ ক্ষেত্রে এবং আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে মাগরিবী সেনাবাহিনী এবং কালো পতাকাবাহী ইরানী সেনাবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ মাগরিবে ফাতিমীয়দের আ ালন এবং আব্বাসীয় কালো পতাকাবাহীদের অভ্যুত্থান ও বিপ্লব সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের সাথে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে । ঠিক একইভাবে রোমানদের (পাশ্চাত্য) সাথে সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ ইউরোপীয় ক্রুসেড যোদ্ধাদের আক্রমণ এবং তাদের সর্বশেষ মূক- বধির ফিতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের সাথে মিশে গেছে । তাই ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব- পূর্ব আ ালন, বিপ্লব অভিযান ও অভ্যুত্থানসমূহ এবং তাঁর আবির্ভাবের সাথে যুক্ত আ ালন, বিপ্লব অভিযান ও অভ্যুত্থানসমূহের মধ্যে পার্থক্য শনাক্তকরণের উপায় হচ্ছে এই যে, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সাথে যে সব ঘটনা যুক্ত তা স্পষ্ট করে রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে । ঠিক একইভাবে আমরা যে সব রেওয়ায়েত সাক্ষ্য- প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছি সে সব রেওয়ায়েতে অথবা আবির্ভাবের যুগ ও এর ঘটনাবলী এবং সে যুগে প্রভাবশালী শক্তিসমূহের তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিদর্শন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহেও এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে ।

এ কারণেই আবির্ভাব সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের মাঝে অগণিত রেওয়ায়েত বিদ্যমান যেগুলো মাগরিবী ফাতিমীয়দের অথবা কালো পতাকাবাহী আব্বাসীয়দের অভ্যুত্থান ও আ ালন অথবা ইউরোপীয় ক্রুসেড যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যবাদী- উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্যের সামরিক অভিযানসমূহের সাথে সম্পর্কিত । আর যে পর্যন্ত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে এ ধরনের অভ্যুত্থান, আ ালন ও অভিযানসমূহের অস্তিত্বের সহায়ক ও প্রমাণস্বরূপ কোন রেওয়ায়েত বা দলিল- প্রমাণ বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বোল্লিখিত ঐ সব হাদীসকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে তাদের অভ্যুত্থান, আ ালন ও অভিযানসমূহ বাতিল করে দেয়ার দলিল বলে গণ্য করা ঠিক হবে না ।

শামদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে আসহাব ও আবকার মধ্যে দ্বন্দ্ব

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "ঐ বছরে পাশ্চাত্যের দিক থেকে সকল দেশ ও অঞ্চলে তীব্র মতভেদ ও বিরোধ দেখা দেবে । সর্বপ্রথম যে দেশ ধ্বংস হবে তা হচ্ছে শাম । সেখানে তিন ধরনের পাতাকার সমর্থকরা অর্থাৎ আসহাব, আবকা এবং সুফিয়ানীর বাহিনী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে ।"[১১৭]

মনে হচ্ছে যে, প্রশাসক আবকা (ঐ ব্যক্তিকে আবকা বলা হয় যার মুখমণ্ডলে সাদা- কালো দাগ আছে) শামদেশ শাসন করার ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আসহাবের (অর্থাৎ হলুদ বর্ণের মুখ- মণ্ডলের অধিকারী) আগেই (সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়) অধিষ্ঠিত থাকতে পারে । কারণ রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা যায় যে, আসহাবের উত্থান ও আন্দোলন রাজধানীর বাইরে থেকে হবে । আর সে রাজধানীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে গিয়ে পরাজিত হবে, অথচ আবকা হবে আসল শক্তিধর বা এমন এক বিপ্লবী যে বেশ খানিকটা বিজয়ী হবে এবং আসহাব তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং রাজধানীর বাইরে থেকে তার ওপর আক্রমণ করবে; কিন্তু আবকা ও আসহাব কেউই তাদের প্রতিপক্ষের ওপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারবে না । আর এ কারণেই সুফিয়ানী এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজধানীর বাইরে বিদ্রোহ করবে এবং তাদের দু'জনকেই পরাস্ত করবে । সম্ভবত আসহাব অমুসলিমও হতে পারে । কারণ কতিপয় রেওয়ায়েতে তাকে 'ইলজ' বলা হয়েছে যে শব্দটি সাধারণত কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

যেমনটি মনে হয় তদনুযায়ী নূমানীর 'গাইবাত' গ্রন্থের মতো প্রথম সারির হাদীস গ্রন্থসমূহে যে মারওয়ানের কথা উল্লিখিত হয়েছে সে- ই হবে আবকা তবে কোন শাসনকর্তাই সুফিয়ানীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য হবে না ।

অবশ্য যে সব রেওয়ায়েতে আবকা ও আসহাবের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে সেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা আসলে ইসলামবিরোধী ও কাফিরদের সমর্থক হবে । পরবর্তী রেওয়ায়েতটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আসহাব রুশদের সমর্থক হবে ।

"যখন ঐ কাফির (আসহাব) আবির্ভূত হবে এবং রাজধানীতে তার অবস্থান তার জন্য কঠিন হবে তখন অনতিবিলম্বে সে নিহত হবে এবং তারপর তুর্কীরা ঐ সরকার ও প্রশাসনের কর্ণধার হয়ে যাবে।"[১১৮]

যদি এ রেওয়ায়েতটি সহীহ হয় তাহলে পাশ্চাত্য সমর্থক আবকার দুর্বল হওয়ার কারণে অল্প সময়ের জন্য জনগণ প্রভাব- প্রতিপত্তি বিস্তার করে তাদের ওপর বিজয়ী হবে। অতঃপর পাশ্চাত্য ও ইহুদীরা মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ ও অঞ্চলের ওপর নিজেদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের মিত্র সুফিয়ানীর পক্ষে ব্যাপক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করবে যা আমরা পরে উল্লেখ করব।

অতএব, রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত শামে দু'টি সামরিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও মতবিরোধের অর্থ রোমান (পাশ্চাত্য) ও তুর্কীদের (রুশদের) প্রতিনিধিত্বকারী দু'নেতার মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ। এর ফলে তাদের মাঝে অত্র অঞ্চলের ওপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতের উদ্ভব হবে। আর তা এভাবে ঘটবে যে, তারা সেখানে নিজ নিজ সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে যার ফলে যুদ্ধ বেধে যাবে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসটিতে তিনি কুফার অধিবাসী জাবির জু'ফীকে বলেছেন: "সবসময় নিজ স্থানে অবস্থান করবে এবং যে সব নিদর্শন আমি তোমার কাছে বর্ণনা করব সেগুলো না দেখা পর্যন্ত হাত- পা নড়াবে না (অর্থাৎ নিজ স্থানের বাইরে যাবে না)। সেগুলো হলো: অমুক বংশের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, আসমান হতে একজন গায়েবী আহবানকারীর আহবান ও বাণী প্রদান- এ বাণী বা ধ্বনি দামেশকের দিক থেকে শোনা যাবে এবং মাহদীর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করবে, শামের একটি জনপদ ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়া যার নাম হবে জাবিয়াহ্, তুর্কীদের সমর্থকদের আগমন ও জাযীরায় তাদের অবতরণ এবং রামাল্লায় রোমের বিদ্রোহীদের অবস্থান গ্রহণ; ঐ বছর পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব- সংঘাতের উদ্ভব হবে। আর সর্বপ্রথম যে, দেশটি ধ্বংস হবে তা 'শাম' এবং সেখানে তিন

সেনাবাহিনী অর্থাৎ আসহাব, আবকা ও সুফিয়ানী বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব- সংঘাতের উদ্ভব হবে ।"[১১৯]

অমুক বংশের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের অর্থ ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে হিজাযে ক্ষমতাসীন রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যকার মতবিরোধ । আর আপনারা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব- আন্দোলনের অধ্যায়ে এ ব্যাপারে অধিক অবগত হবেন ।

দামেশকের দিক থেকে যে আহবানধ্বনি শোনা যাবে তা হবে ঐ আসমানী বাণী যে ব্যাপারে জনগণ মনে করবে যে, তা শাম অথবা পশ্চিম দিক থেকে আসছে ও শোনা যাচ্ছে । অথবা তা ইরাকের জনগণের কাছে ঠিক এমনই মনে হবে । কারণ জাবির আল জু'ফী আল কুফীর সাথে ইমাম বাকির (আ.) এ ব্যাপারেই আলাপ করেছিলেন । তখন তিনি বলেছিলেন : "ঐ ধ্বনি দামেশকের দিক থেকে শোনা যাবে ।"

এ রেওয়ায়েতে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে 'তুর্কীদের সমর্থকরা' এবং 'রোমের ধর্মদ্রোহীরা'- বাক্যাংশের ব্যবহার যা তুর্কীদের অর্থ যে রুশজাতি হয় তা সমর্থন করে ।

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "তুর্কীদের পক্ষ থেকে একদল বিদ্রোহী আত্মপ্রকাশ করবে এবং তাদের পরপরই রোমের ফিতনা দেখা দেবে... ।"[১২০]

এ ধরনের ধর্মত্যাগীরা যে তুর্কদের (রুশজাতি) পক্ষ থেকে বের হবে তা উক্ত রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ।

খুবই স্পষ্ট যে, আবকা ও আসহাবের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এ যুগসন্ধিক্ষণে শামের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে যে সব রেওয়ায়েত আছে সেগুলো এবং সুফিয়ানী ও ঐ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও শামে মাগরিবী ও ইরানী সেনাবাহিনীদ্বয়ের উপস্থিতি সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ যে কেউ অধ্যয়ন করবে সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, পরাশক্তিসমূহের গতিবিধি, কর্মকাণ্ড, তাদের মধ্যকার বিরোধ, তাদের বশংবদ শাসকগোষ্ঠীর মতবিরোধ এবং তাদের মোকাবিলায় মুসলিম উম্মার প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে এ সব ঘটনার একটি শক্তিশালী সম্পর্ক বিদ্যমান ।

এখন আমরা এমন একটি রেওয়ায়েতের দিকে ইঙ্গিত করব যা শামে পরস্পর বিবদমান তিন গোষ্ঠীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে । এ তিনটি গোষ্ঠী হচ্ছে হাসানী বাহিনী, উমাইয়্যা বাহিনী এবং কাইসের বাহিনী । সুফিয়ানী এসে তাদেরকে পরাজিত করবে । ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে নি োক্ত রেওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে :

“হে সুদাইর! বিছানো কার্পেটের মতো সবসময় ঘরে বসে থাকবে এবং রাত-দিন নিজ গৃহে চুপচাপ অবস্থান করবে । যখনই সুফিয়ানী আবির্ভূত হবে তখন এমনকি পায়ে হেঁটে হলেও আমাদের দিকে হিজরত করবে ।” আমি বললাম : আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হই । এ ঘটনার আগে কি আর কিছু আছে?” তিনি বললেন : “হ্যাঁ ।” আর তিনি হাতের তিন আঙ্গুল দিয়ে শামের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : “শামে তিন ধরনের পতাকাবাহী সেনাদল হাসানী সেনাবাহিনী, উমাইয়্যা বাহিনী এবং কাইসের বাহিনী একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থাকবে । হঠাৎ করে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান হবে এবং সে তাদেরকে শস্যক্ষেত্রের ফসল মাড়াই করার মতো কর্তন করবে যার নজীর আমি কখনই দেখিনি ।”

এ রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে । কারণ যে অগণিত রেওয়ায়েতে শামে বিবদমান প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীত্রয়কে আবকা, আসহাব ও সুফিয়ানী সাথে জড়িত করে উল্লেখ করা হয়েছে এটি সেগুলোর পরিপন্থী । অধিকন্তু আল্লামা কুলাইনী ‘আল কাফী’ গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় এ রেওয়ায়েতটি কেবল ‘এমনকি পায়ে হেঁটে হলেও’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন । সর্বশেষ এ অংশটি কতিপয় রাবীর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা অথবা সংযোজিত হয়ে থাকার সম্ভাবনাও বিদ্যমান । আর এ বাড়তি অংশ মূল রেওয়ায়েতের সাথে মিশে গেছে ।

আর রেওয়ায়েতটিকে সহীহ বলে ধরে নিলে হাসানীর পতাকা অবশ্যই হুসাইনীর সাথে ভুল করে লেখা বা বলা হয়েছে যা হবে খোরাসানীদের পতাকা অর্থাৎ কালো পতাকাবাহী সেনাদলের পতাকা । আর যেহেতু আগেই আমরা বলেছি যে, কালো পতাকাবাহী খোরাসানী (ইরানী) সেনাদল শামে মাগরিবী সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে আর আসহাবের পতাকা হবে উমাইয়্যাদের পতাকা এবং কাইসের পতাকা হবে আবকার পতাকা যা বেশ কিছু রেওয়ায়েতে

মিশরীয়দের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লিখিত হয়েছে । বরং কিছু কিছু রেওয়ায়েতে দেখানো হয়েছে যে, আবকা তার আন্দোলন ও অভিযান মিশর থেকে শুরু করবে অথবা সে মিশরীয় এবং কাইস গোত্রভুক্ত হবে । কিছু কিছু রেওয়ায়েত হতে বোঝা যায় যে, সুফিয়ানী মিশরের ওপরও আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে । আর মহান আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন ।

ঠিক একইভাবে আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে :

"বনি হাশিমের এক ব্যক্তি শাসন করবেন ও নেতৃত্ব দেবেন এবং তিনি এমনভাবে বনি উমাইয়্যাকে হত্যা করবেন যে, কেবল অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত তিনি তাদের আর কাউকে জীবিত রাখবেন না । যারা বনি উমাইয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয় তাদেরকে তিনি হত্যা করবেন না । তখন বনি উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করবে এবং প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির বদলে দু'জন করে হত্যা করবে । আর এভাবে কেবল নারীরা ব্যতীত সে আর কোন ব্যক্তিকে জীবিত রাখবে না । আর ঠিক এ সময়ই হযরত মাহদী (আ.) আত্মপ্রকাশ করবেন ।"[১২১]

তবে এ হাশিমী ব্যক্তিটি যিনি সুফিয়ানীর আগে আসবেন তাঁর হুকুমতের আওতাধীন অঞ্চল এ রেওয়ায়েতে নির্দিষ্ট করা হয়নি অর্থাৎ তাঁর শাসনাধীন এলাকা কি হিজায নাকি ইরাক- এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়নি । আর রেওয়ায়েতসমূহে যদি তাঁর শাসনাধীন এলাকা শাম হয়ে থাকে তাহলে তিনি অবশ্যই আবকার আগে আবির্ভূত হবেন । কারণ সকল রেওয়ায়েত একমত যে, সুফিয়ানী আবকা ও আসহাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে । আর হাদীসসমূহ এ দু'ব্যক্তিকে আহলে বাইতের অনুসারীদের শত্রু বলে উল্লেখ করেছে ।

সপ্তম অধ্যায়

সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আন্দোলন ও বিপ্লবে সুফিয়ানী অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব । সে ইমাম মাহদী (আ.)- এর ভয়ঙ্কর শত্রু হবে, যদিও ইমাম প্রকৃতপ্রস্তাবে যে সব কাফির নাস্তিক্যবাদী শক্তি সুফিয়ানীকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করবে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবেন এবং মোকাবিলা করবেন । সামনে আপনারা এ ব্যাপারে অধিক অবগত হবেন ।

রেওয়ায়েতে স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে যে, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও আন্দোলন মহান আল্লাহর অন্যতম অবধারিত অঙ্গীকার । ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন : “আল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাবের বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী । আর সুফিয়ানীর আবির্ভাবও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী । সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও আগমনের পরপরই কেবল মাহদী আত্মপ্রকাশ করবে ।”[১২২]

সুফিয়ানী সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির (تواتر اجمالي)[১২৩] এবং এগুলোর মধ্যে কয়েকটি রেওয়ায়েত শাব্দিকভাবে মুতাওয়াতির[১২৪] । এখন আমরা তার ব্যক্তিত্ব এবং আন্দোলনের প্রকৃতির একটি চিত্র তুলে ধরব । অতঃপর নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা এতদসংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে এখানে উল্লেখ করব ।

সুফিয়ানীর জীবনী

মুসলিম মনীষীরা ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আবু সুফিয়ানের সাথে রক্তসম্পর্ক থাকার কারণে তার নাম হবে সুফিয়ানী । একদিকে সে যেমন আবু সুফিয়ানের একজন বংশধর, তেমনি অন্যদিকে সে কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দেরও সন্তান (বংশধর) । উহুদের যুদ্ধে যখন সাইয়্যেদুশ শুহাদা (শহীদদের নেতা) হযরত হামযাহ্ (রা.) শাহাদাত বরণ করেন তখন এই হিন্দ চরম শত্রুতা ও ঘৃণাবশতঃ হযরত হামযার কলিজা চিবিয়েছিল । আর এ ধরনের নারীর সাথে তার রক্তসম্পর্ক

থাকার কারণেই আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) বলেছেন : “কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দের বংশধর ওয়াদী ইয়াবিস (শুষ্ক উপত্যকা) থেকে আবির্ভূত হবে ও বিদ্রোহ করবে । সে প্রশস্ত কাঁধবিশিষ্ট, কুৎসিত চেহারার অধিকারী এক প্রকাণ্ড মাথা বিশিষ্ট পুরুষ হবে । তার মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ থাকবে । যখন তুমি তাকে দেখবে তখন ভাববে যে, সে এক চোখ বিশিষ্ট । তার নাম হবে ওসমান এবং তার পিতার নাম হবে উয়াইনাহ্ (আরেকটি পাণ্ডুলিপিতে আম্বাসাহ্) । সে হবে আবু সুফিয়ানের বংশধর । শান্ত ও সুমিষ্ট পানির দেশে সে প্রবেশ করবে এবং সেখানকার মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবে ।”[১২৫]

আহলে বাইতের অনুসারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, সে আবু সুফিয়ানের পুত্র আম্বাসার বংশধর । আর এ কারণেই তাকে উয়াইনাহ্ বলে গণ্য করা হয়েছে । কারণ রেওয়ায়েতে ‘উয়াইনাহ্’ শব্দকে আম্বাসা শব্দের সাথে ভুল করা হয়েছে । শেখ তূসী (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে তাকে আবু সুফিয়ানের পুত্র উতবার বংশধর বলা হয়েছে ।[১২৬] উল্লেখ্য যে, আবু সুফিয়ানের পাঁচ পুত্র ছিল । যথা : উতবাহ্, মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ, আম্বাসাহ্ ও হানযালাহ্ ।

মুয়াবিয়ার কাছে আমীরুল মু’মিনীন আলী (আ.)- এর প্রেরিত পত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে যে, সুফিয়ানী মুয়াবিয়ার একজন বংশধর ।

“হে মুয়াবিয়া! তোমার একজন বংশধর বদমেজাজী, অভিশপ্ত, নির্বোধ, অত্যাচারী ও রগচটা স্বভাবের হবে । মহান আল্লাহ্ তার হৃদয় থেকে দয়া- মায়া দূর করে দেবেন । তার মামারা হবে রক্ত পিপাসু কুকুরের ন্যায় । যেন আমি এখনই তাকে দেখতে পাচ্ছি । আমি যদি চাইতাম তাহলে তার নাম বলে দিতাম এবং তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলতাম যে, তার বয়স কত হবে । সে মদীনাভিমুখে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে । তারা মদীনায় প্রবেশ করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে । ঐ সময় একজন পূতঃপবিত্র পরহেজগার ব্যক্তি সেখান থেকে পলায়ন করবে; আর সে- ই হবেন ঐ ব্যক্তি যে অন্যায়- অত্যাচার ও অবিচারে পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সমগ্র পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে ভরে দেবে । আমি তার নাম জানি এবং এও জানি যে, ঐ দিন তার বয়স কত হবে এবং তার নিদর্শনটিও কী হবে ।”

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “সে খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশধর হবে ।”[১২৭]

সুফিয়ানীর পিতামহ আম্বাসাহ্ অথবা উতবাহ্ অথবা উয়াইনাহ্ অথবা ইয়াযীদ হতে পারে যে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশধর, তাহলে সব ভুল দূর হয়ে যাবে ।

আহলে সুন্নাহর আলেম ও পণ্ডিতদের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে যে, সুফিয়ানীর নাম হবে আবদুল্লাহ্ । আর ইবনে হাম্মাদের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির ৭৪ পৃষ্ঠায় তার নাম ‘আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । আর আহলে বাইতের অনুসারীদের হাদীস সূত্রগুলোতে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতেও তার নাম ‘আবদুল্লাহ্’ বলা হয়েছে ।[১২৮] তবে আমরা যেমন ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি তদনুযায়ী প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে যে, তার নাম হবে ওসমান ।

সুফিয়ানীর পাপাচার ও অপরাধ

হাদীসের রাবীরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সুফিয়ানী হবে মুনাফিক, চারিত্রিকভাবে ভ্রষ্ট এবং মহান আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা.) ও হযরত মাহদী (আ.)- এর ভয়ঙ্কর শত্রু । তার স্বভাব-চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শিয়া- সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহে যে সব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে সেগুলো একই ধরনের অথবা খুবই নিকটবর্তী ও সদৃশ । যেমন : এ ধরনের একটি রেওয়ায়েত নি রূপ : “সুফিয়ানী সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসনকর্তা হবে । সে আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করবে । অসৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে । আর যে তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে তাকে সে হত্যা করবে ।”[১২৯]

অন্যত্র আরতাত থেকে বর্ণিত : “সুফিয়ানী ছয় মাসের মধ্যে যারা তার বিরোধিতা করবে তাদেরকে হত্যা করবে, করাত দিয়ে মাথা কর্তন করবে এবং সেগুলো পাতিলের মধ্যে সিদ্ধ করবে ।”[১৩০]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : "সুফিয়ানীর আবির্ভাব হবে । সে বিদ্রোহ করবে, হত্যাযজ্ঞ ঘটাবে এবং রক্ত ঝরাবে । এমনকি গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিড়ে গর্ভস্থ সন্তান বের করে এনে বড় বড় পাতিলের মধ্যে ফুটাবে ।"[১৩১]

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "যদি সুফিয়ানীকে দেখে থাক তাহলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকটিকেই দেখে থাকবে । তার দেহের রং হবে লাল, নীল ও কালোর সংমিশ্রণ । সে কখনই আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের জন্য মাথা নত করবে না । সে কখনই পবিত্র মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারাহ্ দেখবে না (অর্থাৎ হজ্ব ও যিয়ারত করার জন্য কখনই মক্কা- মদীনা সফর করবে না) । সে বলবে : হে প্রভু! আগুনের মাধ্যমে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব ।"[১৩২]

সুফিয়ানীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ

রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ানী পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছায়ায় প্রতিপালিত ও তা দ্বারা প্রভাবিত হবে । হয়তোবা সে পাশ্চাত্যেই প্রতিপালিত ও বড় হবে । শেখ তূসীর 'গাইবাত' গ্রন্থে বাশার বিন গালিব থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

"সুফিয়ানী যখন একটি গোষ্ঠী বা দলের নেতৃত্ব দেবে তখন তার গলায় খ্রিস্টানদের মতো ক্রুশ থাকবে । সে পাশ্চাত্য (রোমানদের ভূমি) থেকে শামে আসবে ।"

রেওয়ায়েতটিতে 'মুনতাসির' (مُنْتَصِرْ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । কিন্তু তা অবশ্যই মূলে 'মুতানাসসির' (مُتَنَصِّرْ) ছিল যার অর্থ হচ্ছে ঐ মুসলমান যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে । এ ধরনের রেওয়ায়েত বিহারের ৫২তম খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে । আর 'সে রোমানদের ভূমি থেকে আসবে'- এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে রোম (পাশ্চাত্য) থেকে শামে আসবে এবং বিদ্রোহ করবে । আর রেওয়ায়েতটি থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, সে পাশ্চাত্যপন্থী ও ইহুদীদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করবে এবং রোম অর্থাৎ পাশ্চাত্যের শত্রু ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে । সে তুর্কীদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে । আর আমাদের দৃষ্টিতে

তুর্কীরা হবে রুশ জাতি । ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালীন ঘটনাবলী ঘটার সময় এবং ইমাম মাহদী (আ.) তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার আগেই সুফিয়ানী দামেশক থেকে তার রাজধানী ফিলিস্তিনের রামাল্লায় (বর্তমানে ইসরাইলের দখলে) স্থানান্তর করবে । আর রেওয়ায়েত অনুসারে বিদ্রোহীরা ঐ স্থানেই অবতরণ করবে ।

বরং রেওয়ায়েতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুফিয়ানী ইহুদী ও রোমানদের স্বার্থে তাদের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে । যে রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহ সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন সেগুলোয় ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে তার পরাজয় বরণের কথা বর্ণিত হয়েছে । আর তার পরাজয় মানেই ইহুদীদের পরাজয় ।

ঠিক একইভাবে সুফিয়ানীর পাশ্চাত্যপন্থী হওয়ার আরেকটি দলিল হচ্ছে এই যে, তার পরাজয় ও নিহত হওয়ার পর তার সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশ পাশ্চাত্যে পলায়ন করবে । অতঃপর ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীরা তাদেরকে পাশ্চাত্য থেকে ফিরিয়ে এনে হত্যা করবে ।

ইবনে খলীল আযদী বলেছেন : 'যখন তারা আমাদের ক্রোধ ও শাস্তি অনুভব করল, তখন তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল । তোমরা পলায়ন করো না; বরং তোমরা যেখানে বিলাসিতায় মত্ত ছিলে সেখানে এবং তোমাদের নিজ নিজ বাড়ি- ঘরে ফিরে এসো । আশা করা যায় যে, তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে'[১৩৩]- এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর আল বাকির (আ.)- কে বলতে শুনেছি : যখন আল কায়েম আল মাহদী আ লন ও বিপ্লব শুরু করবে এবং বনি উমাইয়্যার বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে তখন তারা রোমের দিকে পালিয়ে যাবে । আর রোমানরা তাদেরকে বলবে : তোমরা যে পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের গলায় ক্রুশ না ঝুলাবে সে পর্যন্ত আমাদের দেশে তোমাদের ঢুকতে দেব না । তখন তারা গলায় ক্রুশ ঝুলাবে এবং রোমানরা তাদেরকে তাদের দেশে প্রবেশ করতে দেবে । যখন আল কায়েম আল মাহদীর সঙ্গী- সাথীরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখানে যাবে তখন রোমানরা তাদের কাছে সন্ধির আবেদন করবে । কিন্তু আল কায়েমের সঙ্গী- সাথীরা বলবে : যে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের কাছে আমাদের দেশের যে সব ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে ফেরত

না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেব না । অতঃপর রোমানরা তাদেরকে আল কায়েমের সঙ্গী- সাথীদের কাছে হস্তান্তর করবে । আর এটিই হচ্ছে ‘পলায়ন করো না এবং তোমরা যেখানে বিলাসিতায় মত্ত ছিলে সেখানে এবং নিজেদের বাড়ি- ঘরে ফিরে এসো । আশা করা যায় যে, তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে’- এ আয়াতের অর্থ । এরপর তিনি বলেছিলেন : সে তাদেরকে গুপ্তধনসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে । অথচ সে অন্য সকলের চেয়ে এ ব্যাপারে অধিক অবগত । তারা বলবে : আমাদের জন্য দুর্ভোগ যে, আমরা অত্যন্ত জালিম ছিলাম । তাদেরকে হত্যা করা পর্যন্ত তাদের কণ্ঠে অনবরত এ হতাশাব্যাঞ্জক স্বীকারোক্তি ধ্বনিত হতে থাকবে ।”[১৩৪]

‘যখন আল কায়েম আল মাহদীর সঙ্গী- সাথীরা তাদের (পাশ্চাত্যের) মুখোমুখি হবে তখন তারা নিরাপত্তা চাইবে’- এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, ইমাম মাহদীর সঙ্গী- সাথীরা তাদের বিশাল সেনাবাহিনীকে রোমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ ও মোতায়েন করবে এবং তাদেরকে যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকবে ।

আর বনি উমাইয়্যার অর্থ সুফিয়ানীর সঙ্গী- সাথীরা । আর এ বিষয়টি অন্য একটি রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে । সম্ভবত তারা (পলাতক ব্যক্তিরা) হবে সুফিয়ানীর উপদেষ্টা ও সেনাবাহিনীর সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যারা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক পদমর্যাদার অধিকারী হবে । এ কারণেই ঘটনাটি এতদূর গড়াবে যে, ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সঙ্গী- সাথীরা এ সব ব্যক্তিকে তাদের কাছে হস্তান্তর করা না হলে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেবেন ।

সুফিয়ানী তার আন্দোলনকে ধর্মীয় রূপ দেয়ার চেষ্টা করবে

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের প্রসার ও মর্যাদাকর অবস্থান লাভ এবং কালো পতাকাবাহী ইরানীদের উত্থানের বিপরীতে অর্থাৎ তা মোকাবিলা করার জন্য সুফিয়ানীর আ লন যে একটি পাশ্চাত্য- ইহুদী পরিকল্পনা হবে- এ ব্যাপারে সুফিয়ানী সংক্রান্ত

রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করলে যে কোন গবেষক সুফিয়ানী যে তার আ   ালনকে ধর্মীয় রূপ দেবার চেষ্টা করবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সাক্ষ্য- প্রমাণ পাবেন । এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে এ রেওয়ায়েত বিদ্যমান যা ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (পৃ. ৭৫) বর্ণিত হয়েছে : “ইবাদতের কারণে সুফিয়ানীর বর্ণ হলুদাভ হয়ে যাবে বা সুফিয়ানীকে হলুদ দেখাবে ।” এ রেওয়ায়েত থেকে মনে হচ্ছে সে নিজেকে বাহ্যত দীনদার দেখাতে চাইবে । তবে অন্য একটি রেওয়ায়েতের ভাষ্য অনুযায়ী তার এ অবস্থা কেবল তার আ   ালন এবং প্রশাসনের শুরুতে দেখা যাবে ।

সুফিয়ানীর ধার্মিক হওয়া এবং তার খ্রিস্টান হওয়া, গলায় ক্রুশ ঝুলানো ও পাশ্চাত্য থেকে শামে আগমন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কখনো কখনো দুঃসাধ্য ও জটিল হতে পারে । তবে আমরা পাশ্চাত্যের এজেন্ট- রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে যা জানি তা হয়তো রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে জটিলতা ও অসুবিধা দূর করতে পারে । এ সব রাজনৈতিক নেতা (পাশ্চাত্যের) খ্রিস্টানদের সাথে এমনভাবে ওঠা- বসা ও জীবন যাপন করে যে, তাদের ও খ্রিস্টানদের মাঝে আর কোন পার্থক্যই লক্ষ্য করা যায় না । এরা তাদের এতটা ঘনিষ্ট হয় যে, সোনালী ক্রুশ গলায় ঝুলায় বা ঘড়িতে বাঁধে, এমনকি ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠান পালন করার জন্য গীর্জায়ও উপস্থিত হয় ।

যে পর্যন্ত পাশ্চাত্য সুফিয়ানীকে বাহ্যত নামাযী ও দীনদার প্রদর্শন করে সাধারণ মুসলমানকে ধোঁকা দেবার জন্য মুসলমানদের নেতা ও প্রশাসক নিযুক্ত না করবে সে পর্যন্ত তার এ অবস্থা (পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান রীতিনীতি মেনে চলা) অব্যাহত থাকবে । বরং ‘সে আলেম ও জ্ঞানী- পণ্ডিতদের হত্যা করবে এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তাদের কাছে সাহায্য চাইবে; আর যে তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে তাকে সে হত্যা বা ধ্বংস করবে’- এ হাদীসটির মূল ভাষ্য থেকে এটিই প্রতিভাত হয় যে, সুফিয়ানী ভীষণভাবে তার আ   ালন ও প্রশাসনের ওপর ইসলামী রং ও লেবেল এঁটে দিতে চাইবে । এ কারণেই সে আলেমদেরকে এ

ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। রেওয়ায়েতে ‘সে তাদেরকে পরীক্ষা করবে’- এ বাক্যের স্থলে ‘সে তাদেরকে ধ্বংস করবে’- এ বাক্যটি সম্ভবত ভুলক্রমে উল্লিখিত হয়ে থাকতে পারে।

আহলে বাইত ও তাঁদের অনুসারীদের প্রতি সুফিয়ানীর শত্রুতা ও বিদ্বেষ

সুফিয়ানীর অন্যতম প্রকট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ- যা তার সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহেও উল্লেখ করা হয়েছে। বরং ঐ সব রেওয়ায়েত থেকে এমনই প্রতীয়মান হয় যে, তার আসল কাজই হবে মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবী (সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক) ফিতনা উস্কে দেয়া এবং আহলে সুন্নাতকে সাহায্য করার ধূঁয়ো তুলে শিয়াদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা। অথচ সে প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহুদী ও পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী- বস্তুবাদী নেতাদের বেতনভুক এজেন্ট ও সমর্থক হবে।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : “আমরা (মহানবীর আহলে বাইত) এবং আবু সুফিয়ানীর বংশধররা এমন দু’টি বংশ যারা মহান আল্লাহর কারণে একে অপরের শত্রু। আমরা বলি : মহান আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং তারা বলে : মহান আল্লাহ্ মিথ্যা বলেছেন। আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। আর মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ হুসাইন ইবনে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। আর সুফিয়ানী আল কায়েম আল মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।”[১৩৫]

ঠিক একইভাবে ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “আমি যেন সুফিয়ানীকে (অথবা তার বন্ধুকে) দেখতে পাচ্ছি যে, সে কুফায় তোমাদের সবুজ- শ্যামল জমিগুলোর ওপর অবস্থান নিয়েছে এবং তার পক্ষ থেকে আহবানকারী আহবান করছে : যে কেউ আলীর অনুসারীদের মধ্য থেকে কারো মাথা কেটে আনবে তাকে এক হাজার দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে। ঐ সময় প্রতিবেশী প্রতিবেশীর ওপর আক্রমণ চালাবে এবং বলবে যে, এ ব্যক্তি তাদেই একজন। তার মাথা কর্তন করে এক হাজার দিরহাম সে নিয়ে যাবে। তোমরা জেনে রাখ যে, ঐ দিন জারজদের হাতে তোমাদের শাসনকর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে। আর আমি যেন একজন মুখোশ পরিহিত ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ঐ নেকাব পরিহিত লোকটি কে? তিনি

বললেন : সে তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি হবে যে তোমাদের অনুরোধেই বক্তৃতা দেবে । সে মুখোশ পরিহিত থাকবে, সে তোমাদেরকে জড়ো করবে এবং চিনবে; কিন্তু তোমরা তাকে চিনবে না । সে তোমাদের দোষ অন্বেষণ করে তোমাদের দুর্নাম করবে । তোমরা জেনে রাখ যে, সে জারজ ব্যতীত আর কেউ নয় ।"[১৩৬]

আমরা অবশ্য লেবাননে এ সব মুখোশ পরিহিত ব্যক্তির কতিপয় নমুনা দেখেছি যারা ইহুদী, ফ্যালাঞ্জিস্ট এবং অন্যদের এজেন্ট । আমরা দেখেছি যে, তারা তাদের কুৎসিত চেহারাকে কালো বা অন্যান্য রঙের মুখোশে ঢেকে একত্রে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহে প্রবেশ এবং মুমিনদেরকে চিহ্নিত করে তাদের সহযোগীদের কাছে তাদের পরিচিতি তুলে ধরে । তখন তারা বিপ্লবী মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে এবং ব ী করে কারাগারে নিয়ে যায় অথবা তাদেরকে হত্যা করে । সুফিয়ানী এ সব শত্রুর হাতে প্রশিক্ষিত হবে । আর তার মুখোশ পরিহিত চরেরা এ গোষ্ঠীরই মুখোশ পরিহিত সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত হবে ।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "সুফিয়ানীর অশ্বারোহী সৈন্যরা খোরাসানবাসীদের খোঁজ করতে থাকবে এবং কুফায় মহানবীর আহলে বাইতের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে । তখন খোরাসানবাসীরা হযরত মাহদী (আ.)- এর খোঁজে বের হবে ।

শামে শিয়াদের ব্যাপারে সুফিয়ানীর গৃহীত নীতি সম্পর্কে ওয়াদী ইয়াবিস (শুষ্ক উপত্যকা) থেকে তার উত্থান ও আে ালনের সূত্রপাত সংক্রান্ত হাদীসসমূহে উল্লেখ করা হবে ।

সুফিয়ানীর লাল পতাকা

কতিপয় রেওয়ায়েতে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে । যেমন বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে আরেকটি দীর্ঘ রেওয়ায়েতের মাঝে বর্ণিত এই রেওয়ায়েতটি :

"এর বেশ কিছু নিদর্শন আছে । লাল পতাকাসহ সুফিয়ানী আবির্ভূত হবে এবং বনি কালব গোত্রের এক লোক তার সেনাপতি হবে ।"[১৩৭]

আসলে এ লাল পতাকা সুফিয়ানীর শ্রেষ্ঠত্বকামী ও তার রক্তপিপাসু রাজনীতির প্রতীক হবে ।

সুফিয়ানীর সংখ্যা

নিঃসন্দেহে শিয়া ও সুন্নী হাদীসসমূহে যে প্রতিশ্রুত সুফিয়ানীর কথা বর্ণিত হয়েছে আসলে সে হবে এক ব্যক্তি। তবে কতিপয় রেওয়ায়েতে, যেমন ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে দু'জন সুফিয়ানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে : প্রথম সুফিয়ানী এবং দ্বিতীয় সুফিয়ানী। কিছু কিছু রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ানীদের সংখ্যা হবে তিনজন। তবে যে সুফিয়ানী নিন্দিত ও ধিকৃত হয়েছে এবং ফিতনা ও এ ধরনের অন্যায় কাজ করবে সে হবে দ্বিতীয় সুফিয়ানী। কারণ প্রথম সুফিয়ানী শামের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং কিরকীসীয়ার যুদ্ধের পর ইরাক যুদ্ধে ইরানী বাহিনী ও কালো পতাকাবাহীদের হাতে পরাজিত হবে এবং যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে শামে ফেরার পথে মৃত্যুবরণ করবে। তখন দ্বিতীয় সুফিয়ানী তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তার মূল কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখবে।

যদি এ সব রেওয়ায়েত সহীহ হয় তাহলে যেমন ইয়েমেনী ও খোরাসানীরা (কালো পতাকাবাহীরা) ইমাম মাহদী (আ.)- এর ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হবেন ঠিক তেমনি প্রথম সুফিয়ানী হবে একজন আনাড়ি শাসনকর্তা যে প্রকৃত প্রতিশ্রুত সুফিয়ানীর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হবে। ইবনে হাম্মাদ বলেছেন : "ওয়ালীদ বলেন : সুফিয়ানী বনি হাশেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সে তিন পতাকাবাহী সেনাদল এবং যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং সকলের ওপর বিজয়ী হবে। তখন সে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হবে এবং বনি হাশেম ইরাকের দিকে হিজরত করবে। অতঃপর সুফিয়ানী কুফা থেকে ফেরার পথে শামের অদূরে নিহত হবে এবং মৃত্যুর আগে সে আবু সুফিয়ানের এক বংশধরকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করবে যে সবার ওপর বিজয়ী হবে... এবং সে- ই হবে কাঙ্ক্ষিত সুফিয়ানী।"[১৩৮]

সুফিয়ানী একাধিক হওয়া সংক্রান্ত এ ধরনের হাদীস ইবনে হাম্মাদ তাঁর পাণ্ডুলিপির ৬০ ও ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

রেওয়ায়েতসমূহে চিত্রিত অবস্থা ও পরিস্থিতিসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, সুফিয়ানীর আন্দোলন ও উত্থান হবে অত্যন্ত দ্রুত ও বর্বরোচিত। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় তার উত্থান ও

আে ালনকে 'নাটকীয়' ও 'রক্তক্ষয়ী' বলে অভিহিত করা যায় । কারণ, বিশ্ব- পরিস্থিতি ও পরাশক্তিসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এতটা তীব্র আকার ধারণ করবে যে, তা অবশেষে যুদ্ধের রূপ নেবে । শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) ফিলিস্তিনের ফিতনা দ্বারা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে । মশকের মধ্যে পানি যেভাবে আে ালিত হয় তেমনিভাবে দুর্বল ও টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কারণে এ দেশটি অবর্ণনীয় দুঃখ- কষ্ট ও অশান্তির শিকার হবে ।... পাশ্চাত্য ও ইহুদীদের দৃষ্টিতে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হবে ফিলিস্তিন সীমান্তে ও আল কুদসের দ্বারপ্রান্তে ইসলামী ও ইরানী সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিষয়টি । তখন শামসহ মুসলিম বিশ্বে রুশদের প্রভাব- প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এ কারণেই তারা ক্ষমতাবান এক শাসক নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে । এটি এ উদ্দেশ্যে করবে যে, একদিকে এর মাধ্যমে ইসরাইলের আশেপাশের অঞ্চলগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যাবে, অন্যদিকে ইসরাইল ও আরবদের সাধারণ প্রতিরক্ষা সীমাটি দখলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে । এর মাধ্যমে তারা ইরাক দখলের যুদ্ধে সুফিয়ানীকে সহযোগিতা করা ছাড়াও ইরানী ও কালো পতাকাধারীদের প্রতিহত করার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করবে ।

একইভাবে পাশ্চাত্য ও ইসরাইল হিজাযের দুর্বল প্রশাসনকে সাহায্য করতে এবং পবিত্র মক্কা নগরীতে সংঘটিত মৌলিক ও নতুন আে ালনকে দমন করতে সুফিয়ানীকে সুযোগ করে দেবে । অবশ্য ঐ আে ালন ইমাম মাহদী (আ.)- এর আে ালনের সাথে সংশ্লিষ্ট আে ালনের অংশ নয়। হাদীসসমূহে যে সব দিক স্পষ্টভাবে অথবা ইশারা- ইঙ্গিতে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো সুফিয়ানীর আে ালনের তীব্রতা ও দ্রুততার বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করবে।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : "সুফিয়ানী ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের অবশ্যম্ভাবী নিদর্শনসমূহের অন্যতম এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার আবির্ভাব ও আে ালন পনের মাস স্থায়ী হবে । সে ছয় মাস যুদ্ধ করবে । যখনই সে পাঁচটি শহরের ওপর কর্তৃত্ব ও

আধিপত্য কায়েম করবে তখন থেকে সে পুরো নয় মাস শাসন করবে । তার শাসন এর থেকে একদিনও বেশি হবে না ।”[১৩৯]

পাঁচটি শহর হচ্ছে দামেশক, জর্ডান, হিমস, হালাব (আলেপ্পো) ও কিন্নাসরীন । এ শহরগুলো সিরিয়া, জর্দান ও লেবাননের প্রশাসনিক কেন্দ্র । রেওয়ায়েতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জর্দানও এর অন্তর্ভুক্ত হবে । তবে লেবানন যা বৃহত্তর শাম এবং ঐ পাঁচ শহরের অন্তর্গত সেটাও সুফিয়ানীর সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । তবে কতিপয় রেওয়ায়েতে কয়েকটি গোষ্ঠী যে সুফিয়ানীর আধিপত্যের বাইরে থাকবে তা উল্লেখ করা হয়েছে । তারা হবে সত্যপন্থী যাদেরকে মহান আল্লাহ্ সুফিয়ানীর আে ালনে অংশগ্রহণ করার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন । আর এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা পরে দেয়া হবে । উল্লেখ্য যে, লেবাননের জনগণ ঐ ব্যতিক্রমী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ।

রেওয়ায়েতসমূহে সুফিয়ানীর উত্থান ও আে ালনের সময় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তা রজব মাসে সংঘটিত হবে ।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : “ইমাম মাহদীর আর্বিভাবের অন্যতম অবশ্যম্ভাবী নির্দশন হচ্ছে রজব মাসে সুফিযানীর উত্থান ও আে ালন ।”[১৪০]

সুফিয়ানীর উত্থান ও আে ালন ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ছয় মাস পূর্বে হবে । কারণ, ইমাম মাহদী ঐ বছরেরই মুহররম মাসের দশম রাতে (আশুরার রাতে) অথবা দশম দিনে (আশুরার দিনে) পবিত্র মক্কায় আবির্ভূত হবেন; আর শামের ওপর সুফিয়ানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে সে প্রথমে ইরাক দখল করে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিজয় এবং তাঁর আে ালন ও বিপ্লব দমন করার জন্য হিজাযে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে ।

সুফিয়ানীর উত্থান ও আন্দোলন তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে । যথা :

প্রথম পর্যায় : দৃঢ়ীকরণের পর্যায় অর্থাৎ প্রথম ছ’মাস হবে তার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তারকাল;

দ্বিতীয় পর্যায় : ইরাক ও হিজায আক্রমণ ও যুদ্ধ পরিচালনা;

তৃতীয় পর্যায় : সুফিয়ানীর ইরাক ও হিজাযে আগ্রাসন থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার মোকাবিলায় শাম, ইসরাইল ও কুদসসহ তার অধিকৃত অবশিষ্ট অঞ্চলসমূহ রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ ।

এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন । আর তা হলো : সুফিয়ানীর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ তার প্রথম ছ'মাসের যুদ্ধসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অংকন করেছে । প্রথমে আসহাব ও আবকায়ের সাথে এবং এরপর তার বিরোধী সকল ইসলামী ও অনৈসলামিক শক্তির সাথে তার গৃহযুদ্ধসমূহ সংঘটিত হবে যার ফলে সম্পূর্ণ শামের ওপর তার আধিপত্য কায়েম হবে। কিন্তু তার আে ালনের গতিবিধির দিকে দৃকপাত করলে আমরা স্বভাবতই বুঝতে পারব যে, পুরো এ ছয় মাসে বড় বড় সামরিক অভিযান পরিচালিত হবে; সে এমনভাবে নিজ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব দৃঢ় করবে যে, এর ফলে সে পরবর্তী নয় মাসে ব্যাপক ও বৃহৎ যুদ্ধ ও সামরিক অভিযানসমূহের জন্য বহু সেনা প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে । প্রথম ছয় মাসের যুদ্ধগুলোর পাশাপাশি সুফিয়ানী আসহাব ও আবকা ছাড়াও জর্দান ও লেবাননের শাসকদের এবং অন্যান্য বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত হবে ।

একটি হাদীসে আবকা ও আসহাবের সাথে সুফিয়ানীর যুদ্ধসমূহের তীব্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । আর এ যুদ্ধগুলোই শাম ধ্বংসের কারণ হবে । ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন :

"ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের চিহ্ন ও নির্দশনসমূহের মধ্যে রয়েছে 'জাবিয়া' নামক শামের একটি গ্রাম ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়া ও জাযীরায় তুর্কীদের (রুশদের) এবং রামাল্লায় রোমানদের (পাশ্চাত্য) আগমন । এ সময় সমগ্র বিশ্বে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হবে যার ফলশ্রুতিতে শাম ধ্বংস হয়ে যাবে । অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যে দেশ বা ভূ- খণ্ড ধবংস হবে তা হচ্ছে শাম । আর এ দেশটি ধবংস হবার কারণ হচ্ছে সেদেশে আবকা বাহিনী, আসহাবের সেনাবাহিনী এবং সুফিয়ানীর সেনাদল- এ তিন বাহিনীর সমাবেশ (ও তাদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ) ।[১৪১]

দামেশকের ধবংস সংক্রান্ত ইমাম আলী (আ.)- এর হাদীস । তিনি বলেছেন : "আমি অবশ্যই দামেশক ধবংস করব... এ কাজ আমার বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি করবে ।" বাহ্যত এ ধ্বংস হচ্ছে ঐ ধবংসযজ্ঞ যা সুফিযানী, ইহুদী (ইসরাইল) ও রোমীয়দের (পাশ্চাত্য) বিরুদ্ধে ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক পরিচালিত আল কুদস মুক্ত করার মহাযুদ্ধের সময় সংঘটিত হবে ।

তবে সুফিয়ানী তার শাসনামলের শেষ নয় মাসে বেশ কয়েকটি বড় যুদ্ধ বাঁধাবে যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিরকীসীয়ায় তুর্কী (রুশজাতি) এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ, যা 'কিরকীসীয়ার মহাসমর' বলে রেওয়ায়েতে আখ্যায়িত হয়েছে । অতঃপর সে ইরাকে ইয়েমেনী ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ক্ষেত্রপ্রস্তুতকারী ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে । উল্লেখ্য যে, কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে ইয়েমেনী ইরানীদের সাথে থাকবেন ।

পবিত্র মদীনা- ই মুনাওওয়ারায় সম্ভবত সুফিয়ানীর সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক সৈন্য থাকবে যারা হিজায সরকারের সেনাবাহিনীর পক্ষে মদীনা মুক্ত করার জন্য ইমাম মাহদী (আ.)- এর নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে ।

সুফিয়ানী হিজায ও ইরাকে পরাজয় বরণ করার পর ইমাম মাহদী (আ.)- এর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র আল কুদস বিজয়ের মহাযুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শাম অথবা ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করবে ।

ওয়াদী ইয়াবিস (শুষ্ক উপত্যকা) থেকে দামেশক পর্যন্ত

সুফিয়ানী যে তার আ ালন দামেশকের বাইরে সিরিয়া- জর্দান সীমান্তে অবস্থিত হাওরান বা দিরআ অঞ্চল থেকে শুরু করবে এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ প্রায় একই; অবশ্য রেওয়ায়েতসমূহে তার আর্বিভাব ও অভ্যুত্থানের স্থানের নাম 'ওয়াদী ইয়াবিস ওয়া আসওয়াদ' (শুষ্ক ও কালো উপত্যকা) বলা হয়েছে ।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "কলিজা ভক্ষণকারিণী হি - তনয় (হি র বংশধর) ওয়াদী ইয়াবিস থেকে বিদ্রোহ করবে এবং সে হবে প্রশস্ত কাঁধের অধিকারী

পুরুষ; তার চেহারা হবে ভয়ঙ্কর এবং তার মাথা হবে প্রকাণ্ড । তার মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ থাকবে । তার মুখাবয়বের দিকে তাকালে মনে হবে যেন সে এক চক্ষুবিশিষ্ট । তার নাম হবে উসমান । তার পিতার নাম হবে আম্বাসাহ্ (উয়াইনাহ্)) । আর সে হবে আবু সুফিয়ানের বংশধর ।... সে অবশেষে নিরাপদ ও সুপেয় পানির দেশে পৌঁছে যাবে । অতঃপর সে ভাষণ দেয়ার জন্য সেখানকার মসজিদের মিম্বরে দণ্ডায়মান হবে ।”[১৪২]

পবিত্র কোরআনের কোন কোন তাফসীরে ‘নিরাপদ ও সুপেয় পানির অঞ্চল’ বলতে ‘দামেশক’ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে : “সুফিয়ানী আবু সুফিয়ানের পুত্র ইয়াযীদের পুত্র খালেদের বংশধর হবে । সুফিয়ানী এমন এক ব্যক্তি যার মাথা হবে বৃহদাকার এবং তার মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ থাকবে । তার চোখের মধ্যে একটি সাদা বিন্দু থাকবে এবং দামেশক নগরীর অন্তর্গত একটি অঞ্চল যার নাম হবে ‘ওয়াদী ইয়াবিস’ সেখান থেকে সাত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহ করবে । এ সাত ব্যক্তির একজনের হাতে একটি পেঁচানো পতাকা থাকবে ।”[১৪৩]

এ পাণ্ডুলিপির ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, শামের পশ্চিমে ‘আনাদারা’ নামক একটি গ্রাম থেকে সাত জন সহযোগীসহ সুফিয়ানী বিদ্রোহ করবে । আর এ গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় আরতাত বিন মুনযির থেকে বর্ণিত হয়েছে : “কুৎসিত চেহারার অধিকারী ও অভিশপ্ত এক ব্যক্তি বীসানের পূর্ব দিকে মা ারুন থেকে একটি লাল রংয়ের উটের ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় মাথায় একটি মুকুট পরে বিদ্রোহ করবে ।”

ইবনে হাম্মাদ তাবেয়ীদের কাছ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যেগুলো মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের হতে বর্ণিত বলা হয় নি । এসব রেওয়ায়েতে সুফিয়ানী ও তার আে ালন ও বিদ্রোহের সূচনা বা সূত্রপাত হিসাবে যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আসলে কল্প- কাহিনী ও রূপকথার সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ । যেমন : তাকে স্বপ্নজগতে দেখা

যাবে, তখন তাকে বলা হবে যে, ‘দাঁড়াও এবং সংগ্রাম কর’। তার হাতে কাঠের তৈরি তিনটি লাঠি থাকবে। যে ব্যক্তিকেই সে তা দিয়ে আঘাত করবে তার মৃত্যু হবে অনিবার্য।[১৪৪]

তবে অতিরঞ্জিত ও অস্বাভাবিক বিষয়াদি বর্ণনাকারী রেওয়ায়েতসমূহ বাদ দিলেও আরো এমন কিছু রেওয়ায়েত আছে যেগুলোয় সুফিয়ানীর আ ালন প্রচণ্ড ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তার আক্রমণের প্রচণ্ডতা শিয়া রাবীদের (হাদীস বর্ণনাকারীদের) নিকট একটি স্বীকৃত বিষয়। সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও উত্থানের সময় শিয়াদের করণীয় কি হবে- এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে একজন রাবী ইমাম সাদিক (আ.)- কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

হুসাইন ইবনে আবিল আলা হাদরামী থেকে বর্ণিত : “আবু আবদিল্লাহকে (ইমাম সাদিক) আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : যখন সুফিয়ানী আবির্ভূত হবে তখন আমরা শিয়ারা কী করব? তিনি বলেছিলেন : তখন শিয়া পুরুষরা তার কাছে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে, সে শিয়া নারী ও শিশুদের কোন ক্ষতি করবে না। আর যখন সে পাঁচ শহর অর্থাৎ শাম দেশের নগরীসমূহের ওপর নিজ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে তখন তোমরা তোমাদের নেতার (ইমাম মাহদীর) দিকে হিজরত করবে (মুখ ফিরাবে)।”[১৪৫]

মনে হয় যে, সবচেয়ে পাষণ্ড সুফিয়ানী হবে আবকা ও তার সমর্থকরা; ইবনে হাম্মাদের বর্ণনায় উল্লিখিত বনি মারওয়ান বলতে এদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

ইবনে হাম্মাদ বলেছেন : “সে মারওয়ানের ওপর বিজয়ী হয়ে তাকে হত্যা করবে; অতঃপর সে মারওয়ানের বংশধরদেরকে তিন মাস ধরে হত্যা করবে। এরপর সে প্রাচ্যবাসীর (ইরানীদের) মোকাবিলা করার লক্ষ্যে কুফায় প্রবেশ করবে।”

কতিপয় রেওয়ায়েত হতে জানা যায় যে, সুফিয়ানীর আবির্ভাবকালের প্রথম দিকে শিয়ারা তার প্রধান শত্রু বলে গণ্য হবে না; বরং আবকা ও আসহাবের সমর্থকরা সুফিয়ানী ও শিয়া উভয়েরই শত্রু বলে গণ্য হবে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “তোমাদের শত্রুদের থেকে তোমাদের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুফিয়ানীই যথেষ্ট হবে। সে তোমাদের জন্য অন্যতম নিদর্শন হবে। ঐ ফাসেক

আবির্ভূত হওয়ার দু' মাসের মধ্যে অন্যদের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না ।"

ইমাম বাকির (আ.)- এর কতিপয় সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : "ঐ সময় আমাদের নারী ও সন্তানদের ব্যাপারে আমাদে দায়িত্ব কী হবে?" ইমাম বললেন : "তোমাদের পুরুষরা আ গোপন করবে । কারণ, আমাদের অনুসারী শিয়ারা তাদের ওপর আক্রমণের আশংকা করবে । তবে তাদের নারীরা ইনশাল্লাহ্ তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে ।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : "শিয়া পুরুষরা তার থেকে বাঁচতে কোথায় পলায়ন করবে?" ইমাম বললেন : "যে কেউ তাদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচতে চাইবে সে যেন মদীনা, মক্কা বা অন্য কোন শহরের দিকে পালিয়ে যায়... তোমরা বিশেষভাবে মক্কা অভিমুখে যাবে যা হবে তোমাদের একত্রিত হবার স্থান । আর এ ফিতনা নয় মাস অর্থাৎ নারীদের গর্ভধারণ কাল পরিমাণ স্থায়ী হবে এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তা এর চেয়ে অধিক কাল স্থায়ী হবে না ।"[১৪৬]

এ রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রমযান মাসে শামে শিয়াদের ওপর সুফিয়ানীর আক্রমণ সংঘটিত হবে । একইভাবে রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ অঞ্চলের ওপর তার কর্তৃত্ব এতটা শক্তিশালী ও নিরঙ্কুশ হবে যে, সে সব অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলায় সক্ষম হবে ।

"কেবল সত্যান্বেষীরা ব্যতীত শামের জনগণ তার আনুগত্য করবে... । মহান আল্লাহ্ সত্যপন্থীদেরকে সুফিয়ানীর সাথে যুদ্ধ ও সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন ।"[১৪৭]

কতিপয় রাবী এ রেওয়ায়েত থেকে এটিই বুঝেছেন যে, লেবানন ও শামের শিয়ারা সুফিয়ানীর শাসনাধীন থাকবে না এবং তার আনুগত্যও করবে না । অবশ্য এটি সম্ভব হতে পারে এবং এতৎসংক্রান্ত ন্যূনতম দলিল হচ্ছে সুফিয়ানীর আদেশ মান্য করা থেকে শামের বেশ কিছু দল বা গোষ্ঠীর মুক্ত থাকা । কারণ, শিয়া ও অশিয়া জনগোষ্ঠীসমূহ যারা মহান আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে তারা ইরাক ও হিজাযে সুফিয়ানী কর্তৃক পরিচালিত সামরিক অভিযান ও আ লনে

যোগদান করা থেকে বিরত থাকবে । সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে থাকার কারণেই সুফিয়ানীর শাসনাধীন অন্যান্য জনতার সাথে তাদের পার্থক্য থাকবে । বর্তমানে সিরিয়ার সাথে লেবাননের সম্পর্ক যেরূপ তদ্রূপ অবস্থার কারণে তারা এতটা স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকতে পারে ।

যা হোক সুফিয়ানী এ এলাকার ওপর তার আধিপত্য ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পরপরই সীমান্তের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানসমূহ পরিচালনা করবে । যেমন ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সুফিয়ানী এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করবে ।

"সুফিয়ানী তার সার্বিক চেষ্টা- প্রচেষ্টা এবং সেনাশক্তি কেবল ইরাকের দিকেই নিয়োজিত করবে এবং তার সেনাবাহিনী কিরকীসীয়ার রণাঙ্গনে প্রবেশ করে সেখানে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হবে ।"[১৪৮]

কিরকীসীয়ার মহাসমর

সুফিয়ানী সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে সিরিয়া- ইরাক- তুরস্ক সীমান্তে অবস্থিত কিরকীসীয়ার প্রান্তরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে তা সুফিয়ানীর আন্দোলনের মূল ধারার বহির্ভূত অর্থাৎ আবির্ভাবের যুগের ঘটনাবলীর বাইরের একটি ঘটনা বলেই মনে হয় । এ কারণেই যদিও সুফিয়ানীর ইরাক যুদ্ধের মূল লক্ষ্য হলো সিরিয়া ও কুদস অভিমুখে ইরাকের ওপর দিয়ে অগ্রসরমান ইমাম মাহদী (আ.)- এর ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং ইরাকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু ইরাক যাওয়ার পথে এক অদ্ভুত ঘটনার কারণে কিরকীসীয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং সে ঘটনাটি হচ্ছে ফোরাত নদীর গতিপথে অথবা এর নিকট একটি গুপ্তধন (বা খনি) আবিষ্কৃত হওয়া । একদল লোক এ গুপ্তধন কুক্ষিগত করার জন্য চেষ্টা করবে এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হবে । তাদের মধ্য থেকে এক লক্ষ লোক নিহত হবে । তবে যুদ্ধরত কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হবে না এবং ঐ গুপ্তধন বা খনির ওপর একক কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না; বরং সকল পক্ষই এ থেকে হতাশ হয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে ।

মুজামুল বুলদান গ্রন্থের বর্ণনানুসারে কিরকীসীয়া অঞ্চল হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র নগরী যা ফোরাত ও খাবূর নদীর সঙ্গমস্থলের অদূরে অবস্থিত এবং এ শহরের ধ্বংসাবশেষ সিরিয়ার 'দাইর যূর' শহরের কাছে অবস্থিত । এ শহরটি সিরিয়া- ইরাক সীমান্তের কাছে এবং সিরিয়া- তুরস্ক সীমান্তের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত ।

কিরকীসীয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য, সুফিয়ানী ছাড়াও এ যুদ্ধের বিবদমান পক্ষসমূহ কে হবে এবং এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কীভাবে ঘটবে এরূপ কতিপয় দিক অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হওয়া সত্ত্বেও রেওয়ায়েতসমূহে এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে । সমুদয় বৈশিষ্ট্যসমেত এ যুদ্ধের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা সংক্রান্ত বিবরণও ঐ সব রেওয়ায়েতে এসেছে । যেমন নি োক্ত রেওয়ায়েতটি যা ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেছেন : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ কিরকীসীয়ায় (মাংসভুক পশু ও পাখিদের জন্য) খাদ্যে পরিপূর্ণ একটি দস্তরখান পাতবেন যার ঘোষণা আসমানী ফেরেশতা প্রদান করবেন এবং তিনি এ বলে আহবান জানাবেন : হে আকাশের পক্ষীকূল এবং পৃথিবীর জীবজন্তুকূল! অত্যাচারীদের মাংস ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য দ্রুত ছুটে এসো ।"

কিরকীসীয়ার যুদ্ধক্ষেত্রকে মহান আল্লাহর দস্তরখান বলে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, অত্যাচারীদের পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং পরস্পর কর্তৃক দুর্বল হওয়ার বিষয়টি মহান আল্লাহর অন্যতম নির্ধারিত বিষয় যা ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে তাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করবে । আর এ কারণেই সে ইরাকে প্রবেশ করার আগেই কিরকীসীয়ার যুদ্ধে তার অনেক সৈন্যকে হারাবে । ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীরা তাকে পরাজিত করবে । অতঃপর কিরকীসীয়ার যুদ্ধে সুফিয়ানীর পরাজয় বরণের পর ইমাম মাহদী (আ.) ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তুর্কীদের (রুশজাতি) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন ।

রেওয়ায়েতের ভাষ্য অনুযায়ী কিরকীসীয়ার যুদ্ধক্ষেত্র হবে পানি, উদ্ভিদ ও বৃক্ষবিহীন শুষ্ক মরুপ্রান্তর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈন্যদের লাশ দাফন করা হবে না অথবা লাশ দাফন করা সম্ভব হবে না । এ কারণেই আকাশের পাখি এবং ভূ- পৃষ্ঠের হিংস্র জীব- জন্তু উদরপূর্তি করে নিহত

সৈন্যদের লাশ ভক্ষণ করবে । আর নিহত সৈন্যরাও হবে অত্যাচারী । কারণ তারা হবে অত্যাচারীদের অনুগত সৈন্য । অথবা তাদের মধ্যে উভয় পক্ষের অনেক অত্যাচারী সামরিক কর্মকর্তা এবং সমরনায়ক থাকবে ।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "অতঃপর সুফিয়ানী আবকার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে । সুফিয়ানী তাকে, তার সঙ্গী- সাথীদের এবং আসহাবকে হত্যা করবে । তখন ইরাকে আক্রমণ করা ব্যতীত তার অন্য কোন লক্ষ্য থাকবে না । সে তার সেনাবাহিনীকে কিরকীসীয়ায় মোতায়েন করবে এবং সেখানে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে । এ যুদ্ধে এক লক্ষ লোক প্রাণ হারাবে এবং সুফিয়ানী প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য কুফায় প্রেরণ করবে ।"[১৪৯]

কতিপয় রেওয়ায়েতে নিহতদের সংখ্যা এক লক্ষ ষাট হাজার এবং আরো কতিপয় রেওয়ায়েতে নিহতদের সংখ্যা এর চেয়েও বেশি উল্লিখিত হয়েছে । কারণ নিহতদের এক লক্ষ হবে অত্যাচারী সৈনিক আর এ বিষয়টি উপরিউক্ত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে । তবে অবশিষ্ট লাশ হবে সাধারণ সৈনিক, এজেন্ট ও বঞ্চিত লোকদের ।

তবে বিতর্কিত গুপ্তধন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হচ্ছে ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি । মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বত নির্গত হবে এবং একে কেন্দ্র করে এত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেঁধে যাবে যে, প্রতি নয় ব্যক্তির মধ্যে সাত জনই নিহত হবে । অতঃপর যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে তখন এর নিকটবর্তী হয়ো না ।"[১৫০]

এই একই পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে : "চতুর্থ ফিতনা আঠার বছর স্থায়ী হবে; অতঃপর তা শেষ হবে এবং ঐ সময় ফোরাত নদী থেকে স্বর্ণের পর্বত নির্গত হবে এবং জনগণ তা দখল করার জন্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে । এ যুদ্ধে প্রতি নয় জনের মধ্যে সাত জনই নিহত হবে ।"

এ রেওয়ায়েতে বর্ণিত চতুর্থ ফিতনার অর্থ যদি মুসলমানদের ওপর পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতির কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করা হয়, তাহলে ঐ ফিতনা দীর্ঘস্থায়ী হবে । আর আজ প্রায় এক শতাব্দী গত হতে চলেছে । আর যদি এর লক্ষ্য শামের অভ্যন্তরীণ ফিতনা ও গোলযোগ হয়ে থাকে

যা ফিলিস্তিনের ফিতনা থেকে উৎপত্তি লাভ করবে, তাহলে এ দিক থেকে লেবাননের গৃহযুদ্ধ এ ১৮ বছরব্যাপী ফিতনার সূচনা হতে পারে ।

আর উল্লিখিত গুপ্তধন স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি হতে পারে যা সেখানে আবিষ্কৃত হবে এবং তিন রাষ্ট্র ও তাদের সমর্থকদের মধ্যে মতবিরোধ ও গোলযোগের কারণ হবে । অথবা ঐ গুপ্তধন বা সম্পদ তেল বা অন্যান্য খনিজ দ্রব্যও হতে পারে । আমি শুনেছি যে, কিরকীসীয়া অঞ্চল তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ, এমনকি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ অঞ্চল হতে পারে । বর্তমানে কূপ খনন ও আনুষাঙ্গিক সন্ধান কার্য চালানো হচ্ছে এবং বেশ কিছু ইতিবাচক ফলাফলও পাওয়া গেছে ।... ঐ আল্লাহ্ই হচ্ছেন পবিত্র যাঁর হাতে আছে সকল বস্তুনিচয়ের সূক্ষ্ম পরিমাপ ও মালিকানা ।

তবে অধিকাংশ রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে এ যুদ্ধে সুফিয়ানীর প্রতিপক্ষ হবে তুর্কীরা । কিন্তু এ ক্ষেত্রে তুর্কীরা বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? এ ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক এবং বাস্তবতার অধিক নিকটবর্তী বলে মনে হয় তা হচ্ছে এই যে, যারা কিরকীসীয়ার যুদ্ধে সুফিয়ানীর প্রতিপক্ষ হবে তারা হবে তুর্কী ভাষাভাষী সেনাবাহিনী । কারণ এমন সম্পদকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হবে যা সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে অবস্থিত । তবে তৃতীয় পক্ষ যারা ইরাকে থাকবে তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং তাদের মধ্যে দু'দলের উদ্ভব হবে; এ দু'দলের একটি হবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইয়েমেনী ও ইরানীদের সমর্থক এবং অপর দলটি হবে সুফিয়ানীর সমর্থক । তবে এ ক্ষেত্রে এত বেশি দলিল- প্রমাণ বিদ্যমান যেগুলো এ ক্ষেত্রে তুর্কী অর্থ রুশজাতি হওয়ার সম্ভাবনাকেই বেশি সমর্থন করে । বিশেষ করে ঐ সব রেওয়ায়েত যেগুলো স্পষ্ট স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও উত্থানের আগে কিরকীসীয়ার কাছে রবীয়াহ্ দ্বীপ অথবা দিয়ার বাকরে রুশজাতির আগমন হবে । আর ঐ সব রেওয়ায়েত যেগুলোয় উল্লিখিত হয়েছে যে, সুফিয়ানী তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং এরপর হযরত মাহদী (আ.)- এর হাতে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে । উল্লেখ্য যে, ইমাম মাহদী (আ.) প্রথম যে সেনাবাহিনীটি তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করবেন তাদের হাতেই তুর্কীদের ধ্বংস সাধিত হবে । আর বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত 'জাযীরাহ্' বলতে বাহ্যত ঐ অঞ্চলকেই বোঝায় যা এ নামেই

অভিহিত । উল্লেখ্য যে, এ জাযীরায় সুফিয়ানীর আগেই তুর্কী ভাষাভাষী সেনাবাহিনীর আগমন হবে । আর ‘জাযীরাহ্’ শব্দটি অন্য কোন শব্দের সাথে যুক্ত না হয়েই রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে (যেমন তা জাযীরাতুল আরব ‘আরব উপদ্বীপ’ নামে উল্লিখিত হয়নি) । ঠিক একইভাবে রেওয়ায়েতসমূহের বিবরণ অনুসারে রামাল্লায় রোমান বাহিনীর আগমন বলতে ফিলিস্তিনের রামাল্লাকেই বোঝানো হয়েছে ।

হ্যাঁ, খনি বা গুপ্তধনের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ যাতে মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে উক্ত সম্পদকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হবে তাতে জড়াতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন তা করতলগত করার জন্য আগতরা একে অপরকে হত্যা করবে, তা থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্তধনকে কেন্দ্র করে বিবদমান পক্ষগুলো হবে মুসলমান; তবে এ বিষয়টি যুদ্ধে তুরস্ক-সরকারের জড়িত থাকার বিষয়টি নাকচ করে না এবং রুশীয় তুর্কী অথবা তুর্কীদের সমর্থক কর্তৃক উক্ত সরকারকে সাহায্য করার সম্ভাবনাকেও বাতিল করে না । কারণ, তুর্কীদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভাষ্য জাযীরায় তাদের সেনাবাহিনীর আগমন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে । তবে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে যে সব রোমান ও মাগরিবীর (পাশ্চাত্য বা পশ্চিমাঞ্চলীয় অধিবাসীদের) কথা উল্লিখিত হয়েছে তারা কিরকীসীয়া যুদ্ধের অন্যতম বিবদমান পক্ষ হবে । আর ঐ সব নিদর্শনও হবে খুব অল্প ও দুর্বল । তবে অন্যদের বিরুদ্ধে সুফিয়ানীকে সাহায্য করার জন্য সম্ভবত রোমান ও মাগরিবীরা সেখানে উপস্থিত হবে ।

তবে সুফিয়ানীর বিরোধী প্রকৃত শক্তিগুলো যারা ইমাম মাহদী (আ.)- এর সমর্থক (ইয়েমেনী ও ইরানীরা) তারা কিরকীসীয়ার যুদ্ধে মোটেও অংশগ্রহণ করবে না । কারণ, এ যুদ্ধ তাদের শত্রুদের মধ্যে সংঘটিত হবে । তবে রেওয়ায়েত হতে বাহ্যত বোঝা যায়, তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হবে হিজাযে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাদের সাথে সম্পর্ক, যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য চেষ্টা চালানো । উল্লেখ্য যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আ ালনের শুভ সূত্রপাত পবিত্র মক্কা নগরীতে হবে । তবে তাদের অংশগ্রহণ না করার কারণ সম্ভবত বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়াও হতে

পারে । আমাদের দৃষ্টিতে এ পর্যায়ে (কিরকীসীয়ার যুদ্ধে) এ বিশ্বযুদ্ধের একটি অংশ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি । (আমরা এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব) ।

হযরত আলী (আ.) থেকে ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন : "যখন সুফিয়ানীর সাঁজোয়া বাহিনী কুফার দিকে অগ্রসর হবে তখন সে একদল সৈন্যকে খোরাসানী বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে এবং তখন খোরাসানীরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর সন্ধানে বের হবে ।"[১৫১]

সুফিয়ানী কর্তৃক ইরাক জবরদখল

রেওয়ায়েতসমূহের বক্তব্য অনুসারে সুফিয়ানীর জন্য ইরাক দখল একটি কৌশলগত ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে । তবে সে কিরকীসীয়ার যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে । এ যুদ্ধের পর সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে । ইরাক আক্রমণ করার ক্ষেত্রে তার কোন প্রতিপক্ষ থাকবে না, এমনকি এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোও তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না, যেহেতু যে তুর্কীদের বিরুদ্ধে কিরকীসীয়ায় সুফিয়ানী যুদ্ধ করবে তাদের মূল লক্ষ্যই হবে কিরকীসীয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ করায়ত্ত করা সেহেতু ইরাকে তাদের তেমন কোন প্রয়োজনই থাকবে না ।

সুফিয়ানীর একমাত্র বিরোধী শক্তি হবে ইয়েমেনী ও খোরাসানীরা অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীরা । এ বিষয়টি থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইরাকে সুফিয়ানীর যুদ্ধ মূলত ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে ।

রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে ইরাকের জনগণ দু' অথবা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের সমর্থক, সুফিয়ানীর সমর্থক এবং তৃতীয় গোষ্ঠী হবে শাইসাবানীর নেতৃত্বাধীন । জাবির ইবনে জুফী থেকে বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেছেন : "আমি ইমাম বাকির (আ.)- কে সুফিয়ানীর ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম । তখন তিনি বলেছিলেন : ইরাকে শাইসাবানীর আবির্ভাবের আগে সুফিয়ানী আবির্ভূত হবে না । মাটি থেকে ঝরনার পানি যেভাবে ফেটে বের হয় ঠিক সেভাবেই সে আবির্ভূত হবে এবং তোমাদের দূতদেরকে হত্যা করবে । এর

পরই তোমরা সুফিয়ানীর উত্থান এবং আল কায়েম আল মাহ্দীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকবে।"[১৫২]

শাইসাবানী বলতে আব্বাসীয় বংশোদ্ভূত কোন ব্যক্তি অথবা আহলে বাইতের কোন শত্রুকে বোঝানো হয়েছে। কারণ ইমামরা আব্বাসীয়দেরকে 'বনী শাইসাবান' বলেছেন।

শাইসাবানী একজন অপরাধী বা অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম হবে যা আহলে বাইতের ইমামরা তাঁদের শত্রুকে ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝানোর জন্য উল্লেখ করতেন। তবে অভিধানে 'শাইসাবান' হচ্ছে ইবলীসের অন্যতম নাম। ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী খোরাসানী এবং তাদের সমর্থকদের হাতে ইরাকের শাসনকর্তৃত্ব চলে যাবার পর শাইসাবানী ইরাকে বিদ্রোহ করবে। এখানে স্মর্তব্য যে, পূর্ববর্তী কোন এক পর্যায়ে ইরাকে খোরাসানীদের প্রবেশের বিষয়টি রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

যাহোক, ইরাকে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এমনই হবে যে, তা সেদেশে সুফিয়ানী বাহিনীর প্রবেশের উপযোগী ও অনুকূল হবে এবং সে ইরাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে না। আর তখন ইয়ামানী ও খোরাসানীরা হিজাযে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর শুভ আবির্ভাবের ঘটনাবলী নিয়ে মশগুল থাকবে। আর তাদের সেনাবাহিনী ও সেনাশক্তিসমূহের (প্রবেশের) অল্প আগেই সুফিয়ানী বাহিনী ইরাকে প্রবেশ করবে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "নিঃসন্দেহে অমুক রাজবংশ রাজত্ব করতে থাকবে এবং যখন তারা শাসনক্ষমতা লাভ করবে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেবে এবং তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষমতা লোপ পাবে। অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে খোরাসানী ও সুফিয়ানী যুদ্ধ করবে- একজন পূর্ব থেকে এবং আরেকজন পশ্চিম থেকে। তারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় কুফা অভিমুখে অগ্রসর হবে। এ দু'জনের হাতে অমুক রাজবংশ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। আর তারা তাদের কাউকেই জীবিত রাখবে না।"[১৫৩]

‘অমুকের বংশধররা’ বলতে এখানে সম্ভবত ইরাকের ওপর কর্তৃত্বশীল শাইসাবানীর বংশ অথবা অন্য কোন শাইসাবানের বংশধরও বুঝানো হতে পারে ।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত : “আমি যেন সুফিয়ানীকে (অথবা তার বন্ধুকে) দেখতে পাচ্ছি যে, সে কুফায় তোমাদের শ্যামল সবুজ জমিগুলোয় অবস্থান নিয়েছে এবং তার পক্ষ থেকে এক আহবানকারী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে যে, যে কেউ আলীর অনুসারীদের মাথা এনে উপস্থিত করবে তাকেই এক হাজার দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে । এ সময় প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে আক্রমণ করবে এবং বলবে যে, এ ব্যক্তি তাদেরই একজন । এভাবে মস্তক বিচ্ছিন্ন করা শুরু হবে এবং হাজার দিরহামের পুরস্কার দেযা হবে । কিন্তু সেসময়ে কেবল জারজরা ব্যতীত আর কেউ তোমাদের ওপর শাসন করবে না ।... আমি যেন একজন নিকাব পরিহিত ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি ।” আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : “ঐ নিকাব পরিহিত লোকটি কে?” ইমাম বলেছিলেন : “সে তোমাদের মধ্যকারই এক ব্যক্তি হবে যে তোমাদের মতোই কথা বলবে । সে তার মুখমণ্ডল নিকাব দিয়ে ঢেকে রাখবে এবং তোমাদের যাবতীয় বিষয় ও তথ্য তার নখদর্পনে থাকবে এবং সে তোমাদের ভালোভাবে চিনবে অথচ তোমরা তাকে চিনবে না । সে তোমাদের প্রত্যেকের দোষ- ত্রুটি খুঁজে বের করে তোমাদের দুর্নাম করবে । তবে সে হবে জারজ ।”[১৫৪]

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতেও বর্ণিত আছে :

কুফায় প্রবেশ করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পবিত্র বংশধরদের অনুসারীদের হত্যা করা পর্যন্ত সুফিয়ানীর সাঁজোয়া বাহিনী আঁধার রাত এবং প্রলয়ঙ্কারী প্লাবনের মতো যা কিছু পাবে তা ধ্বংস করে ফেলবে । অতঃপর তারা চতুর্দিকে খোরাসানীদেরকে খুঁজতে থাকবে অথচ খোরাসানীরা তখন ইমাম মাহদী (আ.)- এর সন্ধান করতে থাকবে, তাঁকে ডাকতে থাকবে এবং তাঁর সাহায্যার্থে দ্রুত অগ্রসর হবে ।[১৫৫]

সুফিয়ানী বাহিনী ইরাক যুদ্ধে বিশেষ করে শিয়াদের ওপর যে সব জঘন্য অপরাধ করবে সেগুলো বিস্তারিত বিবরণ এ সব রেওয়ায়েতে এসেছে । ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন : “সুফিয়ানী যখন ফোরাত নদী অতিক্রম করে হাকার কুফা নামক একটি স্থানে এসে

পৌঁছবে তখন মহান আল্লাহ্ তার ঈমান পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেবেন । তখন সে অস্ত্রধারী সত্তর হাজার সৈন্যসমেত 'দুজাইল' (ছোট দজলা) নামক একটি নদী অভিমুখে যাত্রা করবে । এদের চেয়েও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি থাকবে যারা সোনালী প্রাসাদ পদানত করবে । তারা প্রতিরোধকারীদেরকে হত্যা করবে এবং গর্ভে পুত্রসন্তান থাকতে পারে- এ ধারণার বশবর্তী হয়ে গর্ভবতী নারীদের পেট চিড়ে ফেলবে । একদল কুরাইশ বংশীয়া রমণী দজলা নদীর তীরে জাহাজের যাত্রী ও পথিকদের কাছে আবেদন করবে যাতে করে তারা তাদেরকে তাদের সাথে সওয়ারী পশুগুলোর ওপর বসিয়ে নিয়ে যায় এবং আ ীয়- স্বজনদের কাছে পৌঁছে দেয় । তবে বনি হাশিমের সাথে তাদের শত্রুতা থাকার কারণে তারা তাদেরকে নিজেদের সাথে নেবে না ।"[১৫৬]

'অস্ত্রধারী সত্তর হাজার সৈন্যসমেত'- এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদের অস্ত্র ও হাতিয়ারসমূহের ধরণ অন্যান্য সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও হাতিয়ার থেকে ভিন্ন হবে এবং যে সোনালী প্রাসাদের ওপর তারা কর্তৃত্ব স্থাপন করবে মনে হচ্ছে যে, তা হবে গুপ্তধন বা খনির স্থান অথবা এমন কোন প্রাসাদ যা দজলা বা দুজাইল নদীর পাশে অবস্থিত হবে । আর কুরাইশ রমণীরা বলতে আহলে বাইতের বংশধর নারীরা হবে ।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন : "সুফিয়ানীর সেনাবাহিনী কুফায় প্রবেশ করে কাউকে জীবিত রাখবে না বরং হত্যা করবে; তাদের মধ্যে হত্যা করার প্রবণতা এতটা বিদ্যমান থাকবে যে, যখন তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি অতি মূল্যবান ও বিশাল ধনরত্ন খুঁজে পাবে তখনও সে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করবে না । অথচ কোন শিশু দেখলেও তাকে হত্যা করবে ।"[১৫৭]

যে সব স্থানের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ছাড়াও রেওয়ায়েতসমূহে আরো কিছু স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সুফিয়ানী বাহিনী বিপুল সংখ্যায় সমবেত হবে । যেমন যাওরা (বাগদাদ), আনবার, সারাত, ফারুক ও রাওহা । ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "সে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্যকে কুফা অভিমুখে প্রেরণ করবে এবং তারা রাওহা এবং ফারুক নামক স্থানে আগমন করবে । সেখান থেকে ষাট হাজার সৈন্য কুফা অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং নুখাইলাস্থ হযরত হুদ (আ.)- এর সমাধিস্থলে এসে উপস্থিত হবে ।"[১৫৮]

সাফায়েরীনী হাম্বলী প্রণীত 'লাওয়ায়েহুল আনওয়ার আল বাহীআহ্' নামক গ্রন্থে সুফিয়ানীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে : "সে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদের ওপর জয়ী হবে । তখন সে পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে এবং বাগদাদে প্রবেশ করে সেখানকার একদল অধিবাসীকে হত্যা করবে ।"

সুফিয়ানীর ইরাক আক্রমণ হবে ব্যাপক ধ্বংসা ক এবং সে ইমাম মাহদী (আ.)- এর অনুসারীদের হত্যা করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সফল হবে । সে ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে না, এমনকি শিয়াদের পক্ষ থেকেও কোন প্রতিরোধ পরিলক্ষিত হবে না । তবে হাদীসে একজন অনারব ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, সে ক্ষুদ্র ও নিরস্ত্র একদল লোক নিয়ে সুফিয়ানী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং সুফিয়ানী বাহিনী তাকে হত্যা করবে : "তখন কুফার অধিবাসী অনারব এক ব্যক্তি একটি দুর্বল দল সাথে নিয়ে সুফিয়ানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং সুফিয়ানী বাহিনীর সেনাপতি তাকে হীরা ও কুফার মাঝখানে হত্যা করবে।"[১৫৯]

আমরা শীঘ্রই ইবনে হাম্মাদের যে রেওয়ায়েতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে যে, 'তারা নিরস্ত্র মুষ্টিমেয় লোক হবে' সে রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করব । তবে সুফিয়ানীর ইরাক আক্রমণ তার দ্বিতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইরাকে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে বাস্তবায়ন করতে পারবে না । বরং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরাক অভিমুখে দ্রুত অগ্রসরমান খোরাসানী ও ইয়ামেনী (ইমাম মাহদীর আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী) সেনাবাহিনীদ্বয়ের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ সুফিয়ানী বাহিনীর কাছে এসে পৌঁছবে । এ সংবাদ পাওয়ার পর তারা ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং খোরাসানী ও ইয়েমেনী বাহিনীদ্বয়ের মোকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করবে এবং তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে । তবে ইরাকের গুটিকতক স্থানে খোরাসানী ও ইয়ামানী বাহিনীদ্বয়ের সাথে তাদের সংঘর্ষ হবে এবং তারা সেগুলোয় পরাজিত হবে ।

অধিকতর শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সুফিয়ানী তার এ সেনাশক্তি ইরাক থেকে প্রত্যাহার করবে এবং সে তার ধারণা মোতাবেক পবিত্র মক্কা নগরীতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর

উত্থান ও আন্দোলনের অবসান ঘটাতে তার সেনাবাহিনীর পুরোটিকেই অথবা একটি বড় অংশকে হিজাযে মোতায়েন করবে। কারণ, কতিপয় রেওয়ায়েতে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেবার জন্য সুফিয়ানী হিজাযে যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে তা হবে ইরাক থেকে প্রত্যাহারকৃত তার সেনাবাহিনী। আরো কিছু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে ঐ সেনাবাহিনী শাম থেকে হিজাযে প্রেরণ করবে। তবে উক্ত সেনাবাহিনীর এক অংশ শাম থেকে এবং আরেক অংশ ইরাক থেকেও প্রেরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত : "সুফিয়ানী সত্তর হাজার সৈন্য কুফায় প্রেরণ করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে বা বন্দী করে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন করবে। আর তখনই খোরাসান থেকে কালো পতাকাধারী সেনাদল ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং দ্রুতগতিতে একের পর এক গন্তব্যসমূহ অতিক্রম করবে এবং তাদের সাথে আল কায়েম আল মাহদীর বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষ সঙ্গীও থাকবে।"[১৬০]

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে : “সুফিয়ানী কুফায় প্রবেশ করবে এবং তিন দিন সেখানে লুটতরাজ চালাবে । সে সেখানকার ষাট হাজার অধিবাসীকে হত্যা করবে । অতঃপর সে সেখানে আঠার রাত অবস্থান করবে ।... তখন কালো পতাকাবাহীরা কুফা অভিমুখে যাত্রা করবে এবং পানির পাশে অবস্থান গ্রহণ করবে । তাদের আগমনের সংবাদ শোনামাত্রই সুফিয়ানীর সঙ্গী- সাথীরা পলায়ন করবে । তাদের একটি দল কুফার খেজুর বাগানসমূহের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যাবে অথচ তাদের মধ্য থেকে গুটিকতক ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই সশস্ত্র থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বসরার অধিবাসী হবে ।.কালো পতাকাবাহীরা সুফিয়ানীর সঙ্গী- সাথীদের নাগাল পাবে এবং কুফার ব ী অধিবাসীদেরকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করবে । এরপর কালো পতাকাবাহীরা বাইআত করার জন্য গুটিকতক ব্যক্তিকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর কাছে প্রেরণ করবে ।”[১৬১]

পরবর্তী রেওয়ায়েত যা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) থেকে বর্ণিত তাতে সুফিয়ানী বাহিনী কর্তৃক ইরাক জবরদখল এবং খোরাসানী ও ইয়েমেনী ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী সেনাবাহিনীদ্বয়ের সেদেশে আগমনের একটি অংশ বর্ণিত হয়েছে : “সে (সুফিয়ানী) এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য কুফায় প্রেরণ করবে এবং তারা রাওহা ও ফারুকে অবতরণ করবে । সেখান থেকে ষাট হাজার সৈন্য কুফার উদ্দেশে প্রেরণ করা হবে এবং তারা নুখাইলায় হযরত হুদ (আ.)- এর সমাধিস্থলে অবস্থান নেবে এবং ঈদের দিন কুফাবাসীদের ওপর আক্রমণ চালাবে । ইরাকের জনগণের শাসনকর্তা হবে একজন অত্যাচারী ও শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি যাকে ‘ভবিষ্যদ্বক্তা ও যাদুকর’ বলে অভিহিত করা হবে । এক ব্যক্তি সেনা কমান্ডার হিসাবে পাঁচ হাজার জ্যোতিষীকে সাথে নিয়ে বাগদাদ থেকে তাদের দিকে গমন করবে । ঐ শহরের সেতুর ওপর সত্তর হাজার লোককে এমনভাবে হত্যা করবে যে, জনগণ রক্ত ও লাশের দুর্গন্ধে তিন দিন পর্যন্ত ফোরাত নদীর তীরে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে । সে ঐ সব সত্তর হাজার কুমারী মেয়েকে ব ী করবে যাদের চেহারা কখনই দেখা যায়নি এবং তাদেরকে হাওদায় বসিয়ে নাজাফের একটি অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হবে । আর তখন কুফা থেকে দশ হাজার মুশরিক ও মুনাফিক বের হয়ে আসবে এবং তারা দামেশকে প্রবেশ

করবে । কোন প্রতিবন্ধকতাই তাদেরকে বিরত রাখতে পারবে না । আর ঐ শহরটি হবে উঁচু ভবন বিশিষ্ট ।

তুলা ও রেশম নির্মিত নয় এমন চিহ্নবিহীন পতাকাসমূহ পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হবে যেগুলোর লাঠির ওপরে একটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে । ইমাম আলী (আ.)- এর বংশধর এক ব্যক্তি ঐ পতাকাগুলোকে চালনা করবেন । তিনি পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হবেন এবং এর সুবাস মেশকে আম্বরের মতো পাশ্চাত্যেও অনুভূত হবে । তাদের পৌঁছানোর এক মাস আগেই শত্রুদের অন্তরে ভয়- ভীতি ঢুকে যাবে । অবশেষে তিনি তার পিতৃপুরুষদের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কুফায় প্রবেশ করবেন ।

এই সময় ইয়েমেনী ও খোরাসানী অশ্বারোহীরা, এলোকেশে ধূলা ধূসরিত দ্রুতগতিসম্পন্ন মাঝারি পাতলা গড়নের অশ্বসমূহের ন্যায় কুফা অভিমুখে দ্রুত ছুটে আসতে থাকবে । আর যখন তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার পায়ের নিচে তাকাবে তখন বলবে : আজ থেকে আমাদের জন্য বসে থাকার মধ্যে কোন কল্যাণ ও সৌভাগ্য নেই । হে আল্লাহ্! আমরা অনুশোচনা করছি, অথচ ঐ অবস্থায় তারা হবে সর্বোত্তম ধার্মিক । আর মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে তাদের এবং মহানবী (সা.)- এর বংশধরদের হতে যারা তাদের সদৃশ হবে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তওবাকারী ও সচ্চরিত্রের অধিকারীদেরকে ভালোবাসেন ।" একজন নজরানবাসী বের হয়ে এসে ইমামের আহবানে সাড়া দেবে । সে হবে প্রথম খ্রিস্টান যে ইমামের দাওয়াত কবুল করবে এবং নিজ উপাসনালয় ধ্বংস করবে, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে, দাস ও দুর্বল লোকদের সাথে বের হবে এবং হেদায়েতের পতাকাসমূহের সাথে নুখাইলার উদ্দেশে রওয়ানা হবে ।... পৃথিবীর সকল অধিবাসীর সমবেত হবার স্থল হবে ফারুক । সেদিন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ (তিন মিলিয়ন) লোক নিহত হবে । যারা সেদিন নিহত হবে তারা পরস্পরকে হত্যা করবে । আর তখনই নি োক্ত আয়াতের প্রকৃত অর্থ সবার কাছে উন্মোচিত হবে । আয়াতটি হলো : "যে পর্যন্ত আমরা তাদেরকে কর্তিত ফসলের মতো ও নিশ্চুপ করে না দেব সে পর্যন্ত সর্বদা তাদের ঐ আহবান ও দাবিটি অব্যাহত ছিল ।"[১৬২]

এ রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপিসমূহে ভ্রম বিদ্যমান । আরেকটি রেওয়ায়েত যা এ রেওয়ায়েত অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম তা বিহার গ্রন্থে হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেছেন : “হে জনতা! ফিতনা- ফ্যাসাদ তোমাদের দেশকে এর জীবন- মৃত্যুর পরে লণ্ড- ভণ্ড ও ধ্বংস ও এর অশুভ ছায়া তোমাদের দেশ ও জনপদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা অথবা পশ্চিম দিক থেকে আগুন শুষ্ক ও বিশাল জ্বালানি কাঠে লেগে যাওয়া ও এর লেলিহান শিখার তীব্র গর্জন শ্রুত হবার আগেই (যা জিজ্ঞাসা করে জানা দরকার সে ব্যাপারে) আমাকে তোমরা প্রশ্ন কর । তখন তার জন্য আক্ষেপ প্রতিশোধ ও রক্তের বদলা ইত্যাদি নেয়ার জন্য যখন সময় ও কালের চাকার আবর্তন দীর্ঘ হবে (ইমাম মাহদীর আগমন বিলম্বিত ও দীর্ঘ হবে) এবং তোমরা বলবে যে, সে মরে গেছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে (যদি সে জীবিত থাকে তাহলে সে কোথায় আছে বা বসবাস করছে?) । এ সময় ‘অতঃপর তোমাদের বিজয়ের চাকা আমরা ঘুরিয়ে দেব, তোমাদেরকে ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করব এবং তোমাদের জনসংখ্যাকে তাদের চেয়ে বেশি করে দেব’- এ আয়াতের অর্থ বাস্তবায়িত হবে । তার আবির্ভাবের বেশ কিছু নিদর্শন আছে । এগুলো হলো : ওঁৎ পেতে থেকে ও পাথর নিক্ষেপ করে কুফার প্রাচীরের বিভিন্ন কোণে ফাটল ধরিয়ে ঐ নগরী অবরোধ করা, চল্লিশ রাত মসজিদসমূহ বন্ধ থাকা, মি র আবিষ্কার, বড় মসজিদের আশেপাশে বেশ কিছু সংখ্যক পতাকা পতপত করে উড়া যেগুলো হেদায়েতের পতাকাসদৃশ হবে, হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই দোযখের আগুনে থাকবে, ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, ত্বরিত মৃত্যু, সত্তর জন সৎ মানুষের সাথে একজন পবিত্র আ ার অধিকারী ব্যক্তিকে (নাফসে যাকিয়াহ্) হত্যা করা । উল্লেখ্য যে, তাকে রুকন ও মাকামের মাঝখানে জবাই করা হবে । শয়তানী চরিত্রের অধিকারী প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তিসমেত প্রতিমালয়ে আসবাগ্ মুযাফফারকে হত্যা, সবুজ (অথবা হলুদ) রংয়ের পতাকা এবং সোনালী ক্রুশসমেত সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান ও বিপ্লব । এ বাহিনীর সেনাপতি হবে কালব গোত্রের এক ব্যক্তি এবং বারো হাজার আরোহী সৈন্য সুফিয়ানীর সাথে পবিত্র মক্কা ও মদীনা অভিমুখে যাত্রা করবে এবং এ সেনাবাহিনীর সেনাপতি হবে বনি উমাইয়্যার এক ব্যক্তি যার নাম হবে খুযাইমাহ্ এবং বলা হবে যে, তার বাম চোখ কানা এবং

তার ডান চোখে এক বিন্দু রক্ত আছে । সে হবে দুনিয়াপূজারী । মদীনা পৌঁছানোর আগে তার থেকে কোন পতাকাবাহীই ফিরে যাবে না । সে (মদীনায় প্রবেশ করেই) হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বংশের বেশ কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলাকে জড়ো করে আবুল হাসান উমাভীর গৃহে ব ী করবে । সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর একজন বংশধরের সন্ধানে কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্যকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করবে যে ব্যক্তির চারপাশে গাতফান গোত্রীয় এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বেশ কিছু সংখ্যক নির্যাতিত লোক সমবেত হবে । ঐ সেনাদল মরুভূমিতে বিস্তৃত ও শ্বেত- শুভ্র পাথর খণ্ডসমূহের মাঝে (ঐ ব্যক্তিকে খুঁজতে খুঁজতে) চলে আসবে এবং ভূ- গর্ভে প্রোথিত হবে । এক ব্যক্তি ব্যতীত তাদের মধ্য থেকে আর কেউ বাঁচবে না । মহান আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডলকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন যাতে করে তিনি তাদেরকে ভয় দেখাতে পারেন এবং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয় । ঐ দিন “আর যদি আপনি ঐ মুহূর্তে দেখতেন যে, তারা ভয় পেয়েছে এবং নিকটবর্তী একটি অবস্থান থেকে ধৃত হয়েছে...- এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রকাশ পাবে । সুফিয়ানী কুফায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করবে । তারা রাওহা, ফারুক এবং কাদিসিয়ায় হযরত মরিয়ম (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)- এর স্থানে অবতরণ করবে এবং তাদের মধ্য থেকে আশি হাজার সৈন্য কুফার পথে রওয়ানা হবে এবং নুখাইলাস্থ হযরত হুদ (আ.)- এর সমাধিস্থলে পৌঁছবে । তারা ঈদ ও আলোকসজ্জার দিবসে তার ওপর আক্রমণ চালাবে । আর জনগণের নেতা হবে একজন অত্যাচারী প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি যাকে যাদুকর ও জ্যোতিষী বলা হবে । সে যাওরাহ্ অর্থাৎ বাগদাদ থেকে পাঁচ হাজার জ্যোতিষী সহ বের হবে এবং ঐ শহরের সেতুর ওপর সত্তর হাজার লোককে হত্যা করবে যে, এর ফলে জনগণ ঐ সব রক্ত ও নিহতের পচা গলিত লাশের দুর্গন্ধে ফোরাত নদীর ধারে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে । যে সব কুমারী মেয়ের হাত ও মুখ অনাবৃত দেখা যেত না তাদেরকে ব ী করে হাওদার ওপর বসিয়ে নাজাফের একটি (অজ্ঞাত) স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে ।

তখন কুফা থেকে এক লক্ষ মুশরিক ও মুনাফিক বের হবে এবং বিনা বাঁধায় তারা দামেশকে প্রবেশ করবে । আর তা হবে উঁচু ইমারত ও ভবনবিশিষ্ট পার্থিব স্বর্গস্বরূপ ।

প্রাচ্য (ইরান) থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পতাকা যেগুলো তূলা ও রেশম দ্বারা নির্মিত হবে না সেগুলো এমতাবস্থায় প্রকাশ পাবে । এগুলোর দণ্ডসমূহের ওপর বেশ কিছু চিহ্ন উৎকীর্ণ থাকবে । হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর এক বংশধর সেগুলো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন । যেদিন তিনি প্রাচ্যে প্রকাশিত হবেন সেদিন তাঁর সুঘ্রাণ মেশকে আম্বরের মতো পশ্চিমে অনুভূত হবে । তাদের আবির্ভাবের এক মাস আগেই শত্রুদের অন্তরে ভয়- ভীতি ঢুকে পড়বে ।

বনি সা'দ কুফায় তাদের নিজ নিজ পিতার মৃত্যুর বদলা নেয়ার জন্য রুখে দাঁড়াবে এবং তারা সবাই হবে ফাসেকদের (ভ্রষ্টদের) সন্তান । ঐ সময় পর্যন্ত তাদের ফিতনা চলতে থাকবে যখন পর্যন্ত না হুসাইনের অশ্বারোহীরা এলোমেলো ও ধূলিধূসরিত কেশর ও শ্বেত- শুভ্র কপালবিশিষ্ট অশ্বসমূহের ন্যায় অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে । তখন হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি অশ্রু বিসর্জনরত অবস্থায় যমীনের ওপর পদাঘাত করে বলতে থাকবে : 'আজকের পর থেকে বসে থাকার মধ্যে কোন কল্যাণ ও বরকত নেই । হে আমাদের প্রভু! আমরা অনুশোচনা করছি এবং ভগ্ন হৃদয়ে আপনার সামনে আমাদের মাথা অবনত করছি এবং আমাদের কপাল মাটির ওপর রাখছি' । তাঁরা হবেন ঐ সব মহান পুণ্যা া যাঁদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : "মহান আল্লাহ্ অনুশোচনাকারী এবং পবিত্র ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসেন ।" তাঁদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তিও থাকবেন যাঁরা হবেন মহানবী (সা.)- এর চরিত্রবান, নিষ্কলঙ্ক ও পুতঃপবিত্র স্বভাবের অধিকারী বংশধর ।

নাজরান থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে ইমামের আহবানে সাড়া দেবে । সেই হবে প্রথম খ্রিস্টান যে ইতিবাচক সাড়া দেবে । সে তার উপাসনালয় ধ্বংস করবে এবং নিজের ক্রুশটি ভেঙে ফেলবে । সে দাস ও দুর্বল ব্যক্তি এবং অশ্বারোহীদের নিয়ে বের হবে এবং হিদায়েতের পতাকাসমূহের সাথে নুখাইলার দিকে অগ্রসর হবে ।

ফারুক হবে পৃথিবীর সকল মানুষের সমবেত হওয়ার স্থান । আর এটিই হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- এর হজ্বযাত্রার পথ । এরপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তিন মিলিয়ন ইহুদী ও খ্রিস্টান নিহত হবে । তারা পরস্পরকে হত্যা করবে । নি োক্ত আয়াতটির অর্থের বাস্তব নমুনা ও

ব্যাখ্যা সেদিন প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হবে । আয়াতটি হচ্ছে : যে পর্যন্ত আমরা তাদেরকে তরবারির মাধ্যমে এবং তরবারির ছত্রছায়ায় কর্তিত শস্য ও খড়- কুটার ন্যায় ছিন্নভিন্ন ও নিশ্চুপ করিয়ে দিয়েছি সে পর্যন্ত এটিই ছিল তাদের সার্বক্ষণিক দাবি ।”

এ রেওয়ায়েতের প্রথম ও শেষাংশ একটি বিশ্বযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যার ধ্বংসা ক প্রভাব সমগ্র পাশ্চাত্য বিশ্বের ওপর পড়বে । আর এ যুদ্ধে তিন মিলিয়ন লোক নিহত হবে এবং আমরা যথাস্থানে এতৎসংক্রান্ত আলোচনার অবতারণা করব ।

কুফার অলি- গলির কোণায় কোণায় ফাটল সৃষ্টি করার’ অর্থ সম্ভবত সুফিয়ানীর আক্রমণের মোকাবিলায় সড়ক যুদ্ধের বাংকার ও আশ্রয়স্থল নির্মাণও হতে পারে । আর ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের একটু আগে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব- সংঘাতের সৃষ্টি হবে সে দিকে লক্ষ্য রেখে পবিত্র মক্কার মসজিদুল হারাম এবং হিজাযের চারপাশে সমবেত তিন পতাকাবাহী দল ও গোষ্ঠী সংক্রান্ত বিবরণ শীঘ্রই পেশ করা হবে ।

সম্ভবত সত্তর জন এবং আরেকটি রেওয়ায়েতে সত্তর জন সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি সমেত নাজাফে এক পবিত্র আ ার অধিকারী ব্যক্তির নিহত হওয়ার বিষয়টি মহান শহীদ আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকির আস সাদর- এর শাহাদাতের ঘটনার সাথে মিলে যায় । কারণ তিনি সত্তর জন সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে শাহাদাত বরণ করেছেন । আর কুফার পেছনের অংশ হচ্ছে বর্তমান কালের পবিত্র নাজাফ নগরী ।

ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের একটু আগে যে পবিত্র পুণ্যা া ব্যক্তি পবিত্র মক্কা নগরীর মসজিদুল হারামের রুকন ও মাকাম- ই ইবরাহীমের মাঝখানে শাহাদাত বরণ করবেন তিনি মক্কাবাসীদের কাছে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর প্রেরিত দূত হবেন ।

এ রেওয়ায়েতে কতিপয় নাম এবং শব্দ বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট নয়, যেমন আসবাগ মুযাফফার যে শয়তানী চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারী বহু ব্যক্তির সাথে প্রতিমালয়ে নিহত হবে এবং সা’দের পুত্ররা প্রমুখ ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হযরত মরিয়ম (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) যখন ইরাক ভ্রমণ করেছিলেন তখন তাঁরা কাদেসিয়ায় যাত্রাবিরতি করেছিলেন এবং বাগদাদের কাছে বারাসা মসজিদে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন । আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন ।

তবে নুখাইলায় হযরত হুদ (আ.)- এর সমাধিস্থলটি বেশ প্রসিদ্ধ যা পবিত্র নাজাফ নগরীর অদূরে ওয়াদিউস্ সালামে অবস্থিত । জনগণের নেতা হবে এক যাদুকর ও জ্যোতিষী । সম্ভবত সে রেওয়ায়েতে বর্ণিত শাইসাবানীই হবে এবং সুফিয়ানীর আবির্ভাবের আগে ইরাকে বিদ্রোহ করবে । 'প্রাচ্য দেশের পতাকাসমূহ' বলতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী খোরাসানী পতাকাবাহীদেরকেই বোঝানো হয়েছে এবং পতাকাসমূহে উৎকীর্ণ মোহর ও চিহ্নের অর্থ الله বা আল্লাহ্ খচিত মনোগ্রামও হতে পারে যা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় প্রতীক- যা ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.) কর্তৃক মনোনীত । দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে উল্লিখিত ফারুক অবশ্য কোন রাবী কর্তৃক একটি ব্যাখ্যা ও পাদটীকাই হবে যা রেওয়ায়েতের মূল ভাষ্যে ঢুকে গেছে এবং তা আমীরুল মুমিনীন (আ.) কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ হওয়া অসম্ভব । তবে ফারুক শব্দটি সম্ভবত এতদর্থে উক্ত স্থানে জনগণের সমবেত হওয়ার স্থল হতে পারে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর সৈন্যরা সেখানে একত্রিত হবে এবং তখনই মুসলমান ও বিধর্মীদের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবে যা রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে ।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর এ সব রেওয়ায়েত ও এতদসদৃশ অন্যান্য রেওয়ায়েতের সনদ এবং মূল ভাষ্য ও শব্দসমূহ নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন । ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব ও আে ালনের নিদর্শনসমূহ সংক্রান্ত অনেক ভাষণ ও রেওয়ায়েত বাহ্যত কিছু সংখ্যক রাবী (বর্ণনাকারী) ও আলেমের ভাষণ ও প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত যা তাঁরা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) এবং ইমামদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত হতে গ্রহণ ও সংকলন করেছেন এবং তা ইমামদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন । অতএব, এগুলোর তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত মূল্য এতটা যে, তা হচ্ছে ঐ সব রাবী ও আলেমের বক্তব্য, হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে

আমাদের চেয়ে যাঁদের জ্ঞান ও পরিচিতি অনেক বেশি এবং তাঁরা আমাদের চেয়ে ইমামদের নিকট থেকে হাদীসসমূহ যে যুগে বর্ণিত হয়েছে সে যুগের অধিক নিকটবর্তী ।... আর এখানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনারও অবকাশ নেই ।

হিজাযের দিকে সুফিয়ানী বাহিনীর অগ্রসরমান যে দলটি ভূ- গর্ভে প্রোথিত হবে

ইমাম মাহদী (আ.)- এর পবিত্র আবির্ভাব ও আে ালনের ব্যাপারে (মহান আল্লাহর ইচ্ছায়) শীঘ্রই আমরা আলোচনা করব এবং আমরা হিজাযের রাজনৈতিক টানাপড়েন পর্যালোচনা করব যে রেওয়ায়েতসমূহের ভাষ্য অনুযায়ী হিজাযের শাসক আবদুল্লাহ্ নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁর পরবর্তী শাসনকর্তা কে হবে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে হিজাযের গোত্রসমূহের মধ্যকার অন্তঃদ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের উদ্ভব হবে ।... আর এ সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব- সংঘাতসমূহ হিজায সরকারকে এতটা দুর্বল করবে যে, এর ফলে ইমাম মাহদী (আ.) পবিত্র মক্কায় সহজে তার আে ালন শুরু করবেন এবং পবিত্র মক্কা নগরীকে অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত করে সেখানে তাঁর শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করবেন ।

এ যুগসন্ধিক্ষণে হিজায- সরকার নিজেদেরকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আে ালনকে পরাস্ত ও ধ্বংস করার ব্যাপারে অক্ষম ও দুর্বল দেখতে পাবে; তাই এ সরকার ও অন্যান্য বড় বড় রাষ্ট্র সুফিয়ানীকে গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে হাত দেয়ার জন্য প্ররোচিত করবে । সুফিয়ানী প্রথমে তার সেনাবাহিনীকে মদীনা মুনাওওয়ারায় এবং এরপর পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রেরণ করবে । এ সময় ইমাম মাহদী (আ.) সমগ্র মুসলমান ও বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করবেন যে, তিনি এমন এক মুজিযা সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় আছেন যার প্রতিশ্রুতি মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন । আর ঐ মুজিযাটি হবে মক্কার অদূরে একটি মরুপ্রান্তরে সুফিয়ানী বাহিনীর ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়া । এ মুজিযা সংঘটিত হবার পর হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর আে ালন অব্যাহত রাখবেন ।

বরং এ বিষয়টি যা কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব । আর তা হলো ইমাম মাহদী (আ.)- এর আে ালন শুরু হওয়ার আগেই মদীনায় সুফিয়ানী বাহিনীকে

আমন্ত্রণ জানানো হবে । সুফিয়ানী বাহিনী ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীদের খোঁজে মদীনায় প্রবেশ করবে এবং সেখানে বেশ কিছু জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করবে । এ সময় ইমাম মাহদী (আ.) মদীনায় বসবাস করতে থাকবেন এবং সুফিয়ানী কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানী অভিযানের সময় তিনি হযরত মূসা (আ.)- এর মতো অস্থিরতা ও উদ্বেগ- উৎকণ্ঠা সহকারে মদীনা থেকে বের হয়ে পবিত্র মক্কার দিকে চলে যাবেন । এর পরপরই মহান আল্লাহ্ তাঁকে আবির্ভূত হবার অনুমতি দেবেন ।

শিয়া ও সুন্নী হাদীসসমূহে পবিত্র মদীনা নগরীতে ইরাক ও শামদেশের দিক থেকে সুফিয়ানী বাহিনীর প্রবেশ অত্যন্ত কঠিন ও ধ্বংসকারী অভিযান বলে গণ্য করা হয়েছে যে, তা কোন প্রতিরোধেরই সম্মুখীন হবে না । সে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথী এবং আহলে বাইতের অনুসারীদের সাথে নারী- পুরুষ, আবাল- বৃদ্ধ- বণিতাকে হত্যা ও ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ঐ একই আচরণ করবে যেরূপ সে ইরাকে করেছিল; বরং রেওয়ায়েতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মদীনায় সুফিয়ানীর আক্রমণ হবে অপেক্ষাকৃত কঠোর ।

ইবনে শিহাব থেকে ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে : “অশ্বারোহীদের সাথে যে সেনাপতি কুফায় প্রবেশ করবে ঐ শহর ধ্বংস করার পর সুফিয়ানী তাকে সম্বোধন করে লিখবে এবং তাকে হিজায অভিমুখে রওয়ানা হবার নির্দেশ দেবে । আদিষ্ট হবার পর সে ঐ দেশ অর্থাৎ হিজায অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাবে এবং কুরাইশদেরকে হত্যা করবে । সে তাদের এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীদের মধ্য থেকে চারশ’ ব্যক্তিকে হত্যা করবে । সে গর্ভবতী নারীদের পেট চিড়ে গর্ভস্থ সন্তানদেরকে বের করে এনে হত্যা করবে । সে কুরাইশ বংশীয় দু’ভাইকে হত্যা করবে এবং মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তিকে ফাতিমা নামের তার বোনসহ মদীনার মসজিদের নববীর প্রবেশ পথের ওপর ফাঁসীতে ঝুলাবে ।[১৬৩]

আরো কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে : “ঐ ব্যক্তি ও তার বোন নাফসে যাকীয়ার (পবিত্র আ ার অধিকারী) পিতৃব্যপুত্র ও কন্যাদের অন্তর্ভুক্ত হবে । উল্লেখ্য যে, এই নাফসে যাকীয়াকেই ইমাম মাহদী (আ.) পবিত্র মক্কায় প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করবেন । তাঁকে ইমাম মাহদী (আ.)-

এর আবির্ভাবের পনর দিন পূর্বে মসজিদুল হারামে হত্যা করা হবে । আর উক্ত ভাই- বোন (যাঁরা নাফসে যাকীয়ার চাচাতো ভাই- বোন এবং যাঁদেরকে মসজিদে নববীর প্রবেশ পথে ফাঁসীতে ঝুলানো হবে) ইরাকে সুফিয়ানী বাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসবেন এবং ইরাক থেকে যে গুপ্তচর তাঁদের পিছে পিছে আসবে সে- ই শত্রুদের কাছে তাঁদের পরিচিতি তুলে ধরবে । নি াক্ত রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সুফিয়ানী মদীনায় বনি হাশিম এবং তাদের অনুসারীদেরকে গণহত্যা করার বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবে যে, ইরাকে খোরাসানীদের হাতে তার সৈন্যদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে এ ধরনের কাজে হাত দিয়েছে ।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে আবু কুবাইল থেকে বর্ণিত হয়েছে : "সুফিয়ানী তার সেনাবাহিনীকে মদীনায় প্রেরণ করবে এবং তাদেরকে নির্দেশ দেবে যে, তারা বনি হাশিমের যে কেউ সেখানে থাকবে তাকে, এমনকি গর্ভবতী মহিলাদেরকেও যেন হত্যা করে । এ হত্যাকাণ্ড একজন হাশিমীর তৎপরতার জবাবে সংঘটিত হবে যিনি প্রাচ্য (ইরান) থেকে নিজ সঙ্গী- সাথীদেরকে নিয়ে অভ্যুত্থান করবেন । সুফিয়ানী বলবে : এ সব বিপদাপদ ও আমার সঙ্গী- সাথীদের নিহত হওয়ার জন্য বনি হাশিম- ই দায়ী । অতঃপর সে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করার আদেশ দেবে যে, এর ফলে তাদের কাউকেই আর মদীনায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমনকি তাদের নারীরাও মরুভূমি ও পাহাড়- পর্বতে আশ্রয় নেবে এবং পবিত্র মক্কার দিকে পালিয়ে যাবে । অতঃপর তারা হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবে । পবিত্র মক্কায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আ ালন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে পাওয়া যাবে সে ভীত- সন্ত্রস্ত থাকবে । আর যারাই সেখানে (মক্কায়) আসবে তারাই তার চারপাশে জড়ো হবে ।"[১৬৪]

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত : "সুফিয়ানী ও তার সঙ্গী- সাথীরা আবির্ভূত হবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইত এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর বিজয়ী হওয়া ব্যতীত তার আর কোন চিন্তা থাকবে না । এ কারণেই সে একদল সৈন্যকে কুফায় প্রেরণ করবে এবং তারা সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর একদল অনুসারীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে যে, হয় তাদেরকে হত্যা

করবে অথবা ফাঁসীতে ঝুলাবে । আর তখন খোরাসান থেকে একটি সেনাবাহিনী বের হবে এবং দজলা অববাহিকায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তারা অব্যাহতভাবে অগ্রসর হতে থাকবে । স্বীয় সঙ্গী- সাথী সমেত এক দুর্বল অনারব ব্যক্তি বের হয়ে নাজাফে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে । সুফিয়ানী আরেকটি সেনাদলকে মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করবে । আর তারা সেখানে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে এবং মাহদী (আ.) ও মানসূর সেখান থেকে পালিয়ে যাবেন; সুফিয়ানী বাহিনী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বংশধরদের ছোট- বড় সবাইকে ব ী করবে । তাদের মধ্য থেকে এমন কোন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে না যাকে ব ী করা হবে না । সুফিয়ানী বাহিনী ইমাম মাহদী ও তাঁর সঙ্গীর সন্ধানে তল্লাশী চালাতে থাকবে । আর ইমাম মাহদী (আ.) হযরত মূসা (আ.)- এর মতো উদ্বেগ- উৎকণ্ঠার সাথে মদীনার বাইরে চলে আসবেন এবং মক্কায় এসে আশ্রয় নেবেন ।”[১৬৫]

বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠায় সুফিয়ানীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, সুফিয়ানী এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করবে এবং হাকিম সংকলিত আল মুস্তাদরাক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, সুফিয়ানীর আক্রমণের আগেই মদীনার অধিবাসীরা শহর থেকে বের হয়ে যাবে ।

সম্ভবত রেওয়ায়েতে বর্ণিত মানসূর যিনি হযরত মাহদী (আ.)- এর সাথে মদীনা থেকে বের হবেন তিনি হবেন ‘নাফসে যাকীয়াহ্’ । হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁকে মসজিদুল হারামে পাঠাবেন যাতে তিনি তাঁর বাণী বিশ্ববাসীর কানে পৌঁছে দেন; তবে তাঁকে হত্যা করা হবে । তবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর একজন সঙ্গী নাফসে যাকীয়াহ্ ছাড়াও ভিন্ন এক ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনাও আছে ।

এগুলো হচ্ছে মদীনায় সুফিয়ানীর যুদ্ধ এবং সেখানে তার ধ্বংসযজ্ঞ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের কতিপয় নমুনা । মদীনা ব্যতীত হিজাযের অন্যান্য স্থানে সুফিয়ানী বাহিনীর প্রবেশ এবং এরপর মক্কায় প্রবেশের জন্য তাদের চেষ্টা সংক্রান্ত কোন কথা রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়নি ।... আর এগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পবিত্র মক্কা নগরীতে তার সকল সৈন্য অথবা সেনাবাহিনীর অংশবিশেষ প্রেরণ করা পর্যন্ত মদীনা নগরী জবরদখল করার সময়কাল বেশি স্থায়ী হবে না । আর

তখনই প্রতিশ্রুত মোজেযা দেখা দেবে এবং মক্কা নগরীর অদূরে তাদের সবাই ভূমিতে প্রোথিত হবে । কতিপয় রেওয়ায়েতে মদীনায় সুফিয়ানী বাহিনী ও সৈন্যদের বিদ্যমান থাকাটা কেবল গুটিকতক দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তবে বাহ্যত এর অর্থ হচ্ছে মদীনায় সুফিয়ানী বাহিনীর প্রবেশ এবং সেখানে তার অপকর্মসমূহের সময়কাল- মদীনা বা এর অদূরে সুফিয়ানী বাহিনীর অবস্থানকাল নয় ।

সুফিয়ানীর সেনাবাহিনীর ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়ার ব্যাপারে রেওয়ায়েতসমূহ মুসলমানদের সূত্রসমূহে অনেক ও মুতাওয়াতির এবং আহলে সুন্নাতের সূত্রসমূহে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত সম্ভবত উম্মে সালামাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে ।

তিনি বলেছেন : "মহান আল্লাহর নবী (সা.) বলেছেন : মহান আল্লাহর ঘরে একজন আশ্রয়গ্রহণকারী আশ্রয় গ্রহণ করবে । তখন একটি সেনাদল তার কাছে প্রেরণ করা হবে; যখন ঐ সেনাদল মদীনার মরুপ্রান্তরে পৌঁছবে তখন সেখানে তারা ভূ- গর্ভে প্রোথিত হবে ।"[১৬৬]

আল কাশশাফ তাফসীর প্রণেতা জামাখশারী 'আর যদি আপনি ঐ মুহূর্তে দেখতেন যে, তারা ভীত হয়ে গেছে এবং নিকটবর্তী একটি স্থান হতে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে'- এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরিউক্ত আয়াতটি বাইদা নামক মরুভূমির মাটিতে প্রোথিত হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে ।

আল্লামা তাবারসী তাঁর মাজমাউল বায়ান গ্রন্থে বলেন : "আবু হামযাহ্ সুমালী বলেছেন : আলী ইবনুল হুসাইন এবং হুসাইন ইবনে আলী (আ.) থেকে শুনেছি যে, ঐ দু'জন মহা া ইমাম বলতেন : উপরিউক্ত আয়াতটির কাঙ্ক্ষিত অর্থ মরুভূমির সেনাবাহিনী যারা পায়ের নিচ থেকে মহান আল্লাহর শাস্তি কবলিত হবে অর্থাৎ যমীন তাদেরকে গ্রাস করবে ।"[১৬৭]

আল হুযাইফা ইয়েমেনী থেকে বর্ণিত হয়েছে : "মহানবী (সা.) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে যে ফিতনার উদ্ভব হবে তা স্মরণ করে বললেন : তারা যখন এ ধরনের ফিতনা কবলিত হবে তখন সুফিয়ানী ওয়াদি- ই ইয়াবিস থেকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং সে দামেশকে প্রবেশ করবে । তখন সে দু'সেনাদলের একটি পূর্ব (ইরান) দিকে এবং অন্যটিকে মদীনার দিকে প্রেরণ

করবে । প্রথম সেনাদলটি বাবেল ভূ- খণ্ড এবং অভিশপ্ত নগরীতে (বাগদাদে) অবতরণ করবে এবং তিন হাজারেরও অধিক লোক হত্যা করবে এবং একশ'র বেশি মহিলাকে জোর করে অপহরণ করবে । অতঃপর সে সেখান থেকে বের হয়ে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবে । আর ঠিক এ সময়ই হেদায়েতের সেনাদল বের হবে এবং সুফিয়ানী কর্তৃক প্রেরিত সেনাদলের কাছে পৌঁছবে এবং তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে যে, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও জীবিত থাকবে না যে সবার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাতে পারে । তাদের হাতে যারা ব ী ছিল তাদেরকে মুক্ত করা হবে এবং যে সব ধন- সম্পদ তারা গনীমত হিসাবে নিয়েছিল সেগুলো নিয়ে নেয়া হবে ।

তবে দ্বিতীয় দলটি মদীনায় প্রবেশ করে সেখানে তিন দিন ও তিন রাত লুটতরাজে লিপ্ত হবে । এরপর তারা সেখান থেকে বের হয়ে এসে পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা হবে । যখন তারা মরু- প্রান্তরে পৌঁছবে তখন মহান আল্লাহ্ জিব্রাইল (আ.)- কে আদেশ দিয়ে বলবেন : জিব্রাইল যাও এবং এদেরকে ধ্বংস করে দাও । অতঃপর জিব্রাইল (আ.) তাঁর পা দিয়ে ঐ ভূ- খণ্ডের ওপর আঘাত করবেন এবং ভূ- পৃষ্ঠ তাদেরকে গ্রাস করবে । জুহাইনা গোত্রের দু'ব্যক্তি ব্যতীত তাদের মধ্য থেকে আর কেউ মুক্তি পাবে না ।"[১৬৮]

"কোঁকড়ানো চুল ও গালে তিল বিশিষ্ট মাহদী (আ.) অগ্রসর হবেন । পূর্বদিক থেকে তাঁর আ োলন শুরু হবে । আর যখন এ বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে তখন সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান হবে এবং সে দিগ্বিজয়ে বের হবে এবং নারীর গর্ভধারণ কাল পরিমাণ সময় অর্থাৎ নয় মাস সে রাজত্ব করবে । সে শামে বিদ্রোহ করবে । সেখানকার সত্যপন্থী গোত্রসমূহ ব্যতীত শামবাসীরা তাদের আনুগত্য করবে । মহান আল্লাহ্ যে সব সত্যপন্থী গোত্র সুফিয়ানীর আনুগত্য করবে না তাদেরকে সুফিয়ানীর সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবেন । সে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা নগরীতে প্রবেশ করবে । অবশেষে যখন তার বাহিনী মদীনার মরুপ্রান্তরে গিয়ে পৌঁছবে তখন মহান আল্লাহ্ তাকে (তার সেনাবাহিনীকে) ভূ- গর্ভে প্রোথিত করবেন । আর এটিই হচ্ছে মহান আল্লাহর নি োক্ত বাণীর অর্থ : "আর আপনি যদি ঐ মুহূর্তে

দেখতেন যে, তারা ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং নিকটবর্তী একটি স্থান হতে তারা ধৃত হয়েছে (অর্থাৎ তারা ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়ার মতো আযাবে পতিত হয়েছে) ।”[১৬৯]

হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর বাণী, ‘অগ্রসরমান অর্থাৎ যখন হাঁটবে’- এর অর্থ যেন তিনি সমগ্র দেহ ও অস্তিত্ব নিয়ে অগ্রসর হবেন । আর পূর্ব দিক থেকে তার আে ালনের সূত্রপাত হবে’- এ কথার অর্থ এই যে, তাঁর বিপ্লব তাঁর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সরকার দ্বারা শুরু হবে । ‘আর যখন এ বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে’- এ বাক্যটির অর্থ যখন তাঁর আে ালন শুরু অথবা প্রকাশিত হবে এবং তাদের (ইরানীদের) সরকার ও রাষ্ট্র কায়েম হবে তখনই সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান হবে এবং সে সামরিক অভিযানে বের হবে । এ রেওয়ায়েতে সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান ও তৎকর্তৃক পরিচালিত সামরিক অভিযানের সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, তা কি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের রাষ্ট্র ও প্রশাসন কায়েম হবার পরপরই হবে অথবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু বছর পরে হবে... তবে রেওয়ায়েতটির বর্ণনারীতি ও প্রকাশভঙ্গি ইরানীদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসন এবং সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান ও সামরিক অভিযানের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে । আর তার সামরিক তৎপরতা ও অভিযান আসলে ইরানীদের বিরুদ্ধে তার একটি পদক্ষেপ বলেই গণ্য হয় যা আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমদিকে তার আে ালনের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে আলোচনা করেছি ।

হান্নান ইবনে সুদাইর থেকে বর্ণিত : “আবু আবদিল্লাহ্ (ইমাম সাদিক)- কে মরুভূমিতে ভূমিগ্রাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন : এটি আমাসেহরার ডাকবাহকের রাস্তার ওপর যা ‘যাতুল জাইশ’ হতে বারো মাইল দূরে অবস্থিত ।”

‘যাতুল জাইশ’ হচ্ছে পবিত্র মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত একটি এলাকা । আর আমাসেহরা ঐ এলাকায় অবস্থিত ।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “শীঘ্রই একজন আশ্রয়গ্রহণকারী পবিত্র মক্কায় আসবে । তখন কাইস গোত্রীয় এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সত্তর

হাজার সৈন্য সেখানে প্রেরিত হবে । যখনই তারা সানীয়াহ্ এলাকায় পৌঁছবে তখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি সেখান থেকে বের হবে না । তখন হযরত জিবরাইল (আ.) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেবেন যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পৌঁছে যাবে : হে মরুভূমি! হে মরুভূমি! এদেরকে গ্রাস কর । এদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই । একমাত্র ঐ রাখাল যে পার্বত্য ভূমি থেকে তাদেরকে ধ্বংস হয়ে যাবার সময় প্রত্যক্ষ করবে কেবল সে ব্যতীত আর কেউই তাদের ধ্বংস সম্পর্কে অবগত হবে না এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কে সে- ই খবর দেবে । অতঃপর যখন পবিত্র কাবায় আশ্রয়গ্রহণকারী তাদের ধ্বংস প্রাপ্তির ঘটনা শুনবেন তখন তিনি বাইরে বের হবেন ।”[১৭০]

এই একই গ্রন্থে আবু কুবাইল থেকে বর্ণিত : “একজন সুসংবাদ প্রদানকারী ও একজন ভয়প্রদর্শনকারী ব্যতীত তাদের মধ্যে আর কেউ জীবিত থাকবে না; তবে সুসংবাদ প্রদানকারী ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদের কাছে আসবে এবং যা যা ঘটেছে সে ব্যাপারে খবর দেবে । ঘটনার সাক্ষী যে হবে সে যে সত্য কথা বলছে তা তার মুখাবয়বের মধ্যে প্রকাশিত হবে । অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে তার মাথার পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন এবং এভাবে তার মুখমণ্ডলকে মাথার পিছনের দিকে ঘুরানো দেখতে পেয়ে সবাই তার কথা বিশ্বাস করবে এবং জানতে পারবে যে, সুফিয়ানীর প্রেরিত সেনাদলটি ভূমিগ্রাসের মাধ্যমে ধ্বংস হয়েছে । আর বেঁচে যাওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখমণ্ডলও প্রথম ব্যক্তির মতো মহান আল্লাহ্ পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন । সে সুফিয়ানীর কাছে এসে তার সঙ্গী- সাথীদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা বর্ণনা করবে । সুফিয়ানীও ঐ ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তার কথা বিশ্বাস করবে । আর এ দু’ব্যক্তি কালব গোত্রীয় হবে ।”[১৭১]

এই একই গ্রন্থে হাফসা থেকে বর্ণিত হয়েছে : “আমি মহানবী (সা.)- কে বলতে শুনেছি যে, মাগরিব (পশ্চিম দিক) থেকে একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হবে এবং তারা কাবা গৃহকে ধ্বংস করতে চাইবে । কিন্তু যখনই তারা মরুপ্রান্তরে পৌঁছবে এবং ভূমি তাদেরকে গ্রাস করবে তখন যে সব ব্যক্তি তাদের সামনে থাকবে তারা ঐ সেনাদলের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য

ভূমিধ্বসের স্থলে ফিরে যাবে; আর তারাও ঠিক ঐ একই বিপদের সম্মুখীন হবে। তখনই মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অন্তরের নিয়ত অনুসারে পরকালে পুনরুত্থিত করবেন।”[১৭২]

তাই যে ব্যক্তি সুফিয়ানীর সেনাদলে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিল যদিও সে আখেরাতে সুফিয়ানী বাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগদানকারী ব্যক্তির মতো গণ্য হবে না তবুও সেও ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস হবে।

মহানবী (সা.) বলেছেন: “ঐ কওমের ব্যাপারে আমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি যে, তারা একত্রে এক জায়গায় মৃত্যুবরণ করবে অথবা নিহত হবে। তবে তাদের অবস্থা ও স্থান বিভিন্ন ধরনের হবে।” তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: “হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! এটি কিভাবে সম্ভব? তখন তিনি বলেছিলেন: “এটি এ কারণে হবে যে, তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যোগদান করতে বাধ্য হবে অর্থাৎ যে সব ব্যক্তি একত্রে একই স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাদের নিয়্যত অনুসারে কিয়ামত দিবসে তাদের বিচার ও প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রী-সন্তানদের জন্য ভীত হয়ে সুফিয়ানীর সেনাদলে যোগদান করবে। আবার কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে যোগদান করতে বাধ্য করা হবে। আবার আরো কিছু সংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঐ সেনাদলে যোগদান করবে।

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সুফিয়ানী বাহিনীর যে সব সৈন্য ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ভূ-গর্ভে প্রোথিত হবে ও প্রাণ হারাবে তাদের সংখ্যা বারো হাজার হবে। তাদের সংখ্যা সত্তর হাজার হবে না। আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সুফিয়ানী বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমিধ্বসের মাধ্যমে নিহত হবে, এক-তৃতীয়াংশের মুখমণ্ডল পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে এবং অবশিষ্টাংশ অক্ষত থাকবে।[১৭৩]

সুফিয়ানীর পশ্চাদপসরণের সূচনা

মক্কা যাওয়ার পথে সুফিয়ানী বাহিনী ভূ-গর্ভে প্রোথিত হবার মুজিযা সংঘটিত হবার পর মাধ্যমে সুফিয়ানীর ভাগ্য-তারকা অস্তমিত হওয়া শুরু হবে। অপরদিকে ঐ সময় হযরত মাহদী (আ.)-এর ভাগ্য-তারকা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর এবং সৌভাগ্যের শীর্ষে উন্নীত হতে থাকবে।

সুফিয়ানী বাহিনীর ভূমিধ্বসে ধ্বংস হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর হিজাযে তার আর কোন সামরিক তৎপরতার কথা রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত হয়নি । এ ঘটনা হিজাযে সুফিয়ানীর তৎপরতার অবসান ঘটাবে । তবে তখনও মদীনায় তার সেনাদল বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা থেকে যায় । যারা (অমুক বংশের) সরকারী সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবে এবং রেওয়ায়েতসমূহ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শত্রু সেনাদলের ভূমিধ্বসে ধ্বংস হয়ে যাবার মুজিযা সংঘটিত হবার পর হযরত মাহদী (আ.) মদীনা মুক্ত করার জন্য কয়েক হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করবেন এবং সেখানে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন ।

যাহোক, ইমাম মাহদী (আ.) মদীনা বিজয় ও হিজায মুক্ত এবং তাঁর শত্রুদেরকে দমন করবেন । হিজায থেকে ইরাক ও শাম পর্যন্ত যেখানেই সুফিয়ানী বাহিনী তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে সেখানেই তারা পরাজিত হবে । রেওয়ায়েতসমূহে এক বা একাধিক যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে, ইরাকে সুফিয়ানী বাহিনী ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর সৈন্য ও তাঁর খোরাসানী সঙ্গী- সাথীদের মাঝে ঐ সব যুদ্ধ সংঘটিত হবে ।

আহ্ওয়াযের যুদ্ধ

ইরানী ও ইয়েমেনী ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের হাতে সুফিয়ানী বাহিনীর পরাজিত হবার পর ইরাক ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদের প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসাই হবে স্বাভাবিক । আর হিজাযে সুফিয়ানীর অলৌকিকভাবে উত্তরোত্তর পরাজয় বরণ ইরাকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথী ও সমর্থকদের শক্তি দৃঢ়ীকরণে সহায়তা করবে । রেওয়ায়েতসমূহ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী শক্তিসমূহ সুফিয়ানী বাহিনীর পরাজয় বরণ করার পর ইরাকে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে বাইআত করার জন্য হিজাযে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করবে । ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন :

“খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহীরা যারা কুফায় আগমন করবে তারা সেখানে অবতরণ এবং অবস্থান গ্রহণ করবে । আর মাহদী আবির্ভূত হবে তখন তারা একটি প্রতিনিধি দলকে বাইআত করার জন্য তার কাছে পাঠাবে ।”[১৭৪]

কিন্তু ইরাকে সুফিয়ানী পূর্ণ পরাজয় বরণ করার কারণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু রেওয়ায়েতে ইরাকে সুফিয়ানী বাহিনীর সঙ্গে স্বতন্ত্র যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কথাও বর্ণিত হয়েছে । আর তাতে সুফিয়ানী কেবল ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর সাথেই সংঘর্ষে লিপ্ত হবে । এ সময় ইমাম মাহদী (আ.) ইরানী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক শুআইব ইবনে সালিহকে তাঁর নিজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করবেন । ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশ ইরানী, ইয়েমেনী এবং অন্যান্য ইসলামী দেশের অধিবাসী হবে ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে কেবল ইস্তাখরের ফটকের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ যুদ্ধটি সুফিয়ানী বাহিনী ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর মধ্যে হবে যা ভয়াবহ হবে বলে বর্ণিত হয়েছে ।

আর ইস্তাখর দক্ষিণ ইরানের একটি প্রাচীন নগরী এবং আহ্ওয়ায অঞ্চলে অবস্থিত যা ইসলামের প্রথম যুগে উন্নত বসতি ছিল । আর এ শহরের ধ্বংসাবশেষ তেলসমৃদ্ধ নগরী মসজিদে সুলাইমানের অদূরে আজও বিদ্যমান । বর্ণিত আছে যে, ইস্তাখর নগরী হযরত সুলাইমান (আ.) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং তিনি শীতকালে সেখান থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন অর্থাৎ এ নগরী ছিল তাঁর শীতকালীন রাজধানী । আর মসজিদে সুলাইমান ছিল একটি মসজিদ যা হযরত সুলাইমান (আ.) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল ।

আরো দু’টি রেওয়ায়েত আছে যেগুলোয় ইরানী সেনাবাহিনীর সমবেত হওয়ার স্থান ‘বাইযা- ই ইস্তাখর’ অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ বাইযা- ই ইস্তাখর হচ্ছে ইস্তাখর নগরীস্থ একটি শ্বেতাঞ্চল এবং সম্ভবত তা মসজিদে সুলাইমানের নিকটবর্তী উচ্চ চূড়াসমূহ যা ‘কূহে সেফীদ’ (শ্বেতপর্বত) বলে প্রসিদ্ধ । একইভাবে দু’টি অথবা তিনটি রেওয়ায়েত থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, যখন ইমাম মাহদী (আ.) পবিত্র মদীনা থেকে ইরাকের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন তখন তিনি

সর্বপ্রথম বাইযা-ই ইস্তাখর এলাকায় অবতরণ করবেন এবং সেখানে ইরানীরা তাঁর হাতে বাইআত করবে এবং তাঁর নেতৃত্বে সেখানে তারা সুফিয়ানী বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং সুফিয়ানীকে পরাজিত করবে। এ যুদ্ধের পর ইমাম মাহদী (আ.) আলোর সাত হাওদা সহকারে ইরাকে প্রবেশ করবেন। জনগণ বুঝতে পারবে না যে, তিনি কোন্ হাওদার মধ্যে আছেন। আমরা এতৎসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাঁর আন্দোলনের অধ্যায়ে প্রদান করব।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন : "যখন সুফিয়ানীর অশ্বারোহী সৈন্যরা কুফার দিকে যাবে তখন সে তার একদল সৈন্যকে খোরাসানীদের সন্ধানে প্রেরণ করবে। আর ঐ সময় খোরাসানবাসীরা ইমাম মাহদীর সন্ধানে বের হবে। তখন কালো পতাকাসমেত হাশেমী মাহদীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। আর তখন ইরানী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক শুআইব ইবনে সালিহ্ ইমাম বাহিনীর সম্মুখভাগে থাকবে। আর এভাবেই মাহদী ইস্তাখর নগরীর ফটকের কাছে সুফিয়ানীর সঙ্গী-সাথীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তাদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এ সময় কালো পতাকাসমূহ স্পষ্ট দেখা যাবে এবং সুফিয়ানীর অশ্বারোহীরা পলায়ন করা শুরু করবে।"[১৭৫] [এ সময় জনগণ ইমাম মাহদীর সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা করবে এবং তাঁকে সন্ধান করতে থাকবে।]

'হাশেমী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে'- এ বাক্যটির অর্থ হলো হযরত মাহদী (আ.) ও হাশেমী খোরাসানী (ইরানী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক) একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। আর পরবর্তী রেওয়ায়েতে স্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়টি বর্ণিতও হয়েছে। ইমাম মাহদী (আ.)-এর সন্ধানে ইরানী দলগুলো তার হাতে বাইআত করে তাঁর পাশে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এ কারণেই তিনি বসরার পাশ দিয়ে হিজাযের স্থল সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে দক্ষিণ ইরানের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। এ সময়ই ইরানী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হাশেমী খোরাসানী ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এভাবে যে, ইমাম মাহদী (আ.) হিজায মুক্ত করে দক্ষিণ ইরান অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং তাদের (ইরানী সেনাবাহিনী) সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তখন

সুফিয়ানী বাহিনীর সাথে উল্লিখিত যুদ্ধ সংঘটিত হবে । আর রেওয়ায়েতেও উল্লিখিত হয়েছে যে, সুফিয়ানীর সৈন্যরা যখন দক্ষিণ ইরান ও ইরাকে প্রবেশ করবে তখন এ যুদ্ধ সংঘটিত হবে । আর সম্ভবত এবারে সুফিয়ানী বাহিনী পারস্য উপসাগর ও বসরা হয়ে পাশ্চাত্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধে যোগদান করবে যা রেওয়ায়েতেও উল্লিখিত হয়েছে ।

"সুফিয়ানী ইরাকে যুদ্ধ করার সময় তার সেনাবাহিনীকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ করবে ।"[১৭৬]

এ বিষয়টি ইরাক এবং ইরান-ইরাক সীমান্তসমূহে সুফিয়ানী বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি ও অবস্থানের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে । আর পারস্যোপসাগরে সুফিয়ানীর নৌবাহিনী ও তার পাশ্চাত্য মিত্র শক্তিসমূহের উপস্থিতির বিষয়টি রেওয়ায়েত কর্তৃকও সমর্থিত হয়েছে ।

নি াক্ত রেওয়ায়েতে দক্ষিণ ইরানে ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রবেশ এবং ইস্তাখর নগরীর ফটক অথবা শ্বেতপর্বতের যুদ্ধের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে । তবে দুঃখজনকভাবে রেওয়ায়েতের মূল ভাষ্যে এক ধরনের বিভ্রাট বিদ্যমান ।

"কুফা ও বাগদাদে প্রবেশ করার পর সুফিয়ানী তার সেনাবাহিনীকে বিশ্বের সর্বত্র মোতায়েন করবে । মধ্য এশিয়ার দিক থেকে খোরাসানবাসীদের পক্ষ থেকে সুফিয়ানী ভয়-ভীতি ও হুমকির সম্মুখীন হবে । তখন প্রাচ্যের সেনাদল সুফিয়ানী বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে । যখন এ সংবাদ তার কাছে পৌঁছবে তখন সে এক বিশাল সেনাবাহিনী ইস্তাখরে প্রেরণ করবে । আর এ সময় সুফিয়ানী ও তার সৈন্যরা এবং হযরত মাহদী (আ.) ও হাশেমী শ্বেতপর্বতে পরস্পর যুদ্ধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে । আর সেখানেই তাদের মধ্যে এতটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাঁধবে এবং অশ্বারোহী সৈন্যরা এতটা হত্যাযজ্ঞ চালাবে যে, অশ্বসমূহের পায়ের নলা (গোছা) পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হবে ।

প্রথম রেওয়ায়েতে আহ্ওয়ায যুদ্ধে সুফিয়ানী বাহিনীর পরাজয় বরণের ফলে যে আশ্চর্যজনক প্রভাব সৃষ্টি হবে তা বর্ণিত হয়েছে । এর ফলে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে যোগ দেয়া ও তাঁর হাতে বাইআত করার জন্য তখন মুসলিম জাতিসমূহের মাঝে এক গণজোয়ারের সৃষ্টি হবে ।

"এ সময় জনগণ (বিশ্ববাসী) ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে এবং তাঁকে সন্ধান করতে থাকবে ।"

যাহোক, হিজায অঞ্চলে ভূমিধ্বসে সুফিয়ানী বাহিনীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ইরাকে সুফিয়ানীর সংঘটিতব্য যুদ্ধসমূহ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ যেমনই হোক না কেন যতটুকু ক্ষেত্রে কোন স হ নেই তা হচ্ছে এই যে, এ ঘটনার পর সুফিয়ানী পশ্চাদপসরণ করবে ও তার পরাজয়ের পর্যায় শুরু হয়ে যাবে । এরপর থেকে তার সকল চেষ্টা- প্রচেষ্টা তার শাসনাধীন অঞ্চল অর্থাৎ শামদেশ রক্ষা, ফিলিস্তিন ও বাইতুল মাকাদ্দাসের সর্বশেষ প্রতিরক্ষা ব্যূহ শক্তিশালীকরণ এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সার্বিকভাবে নিয়োজিত করবে ।

ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদের বিরুদ্ধে সুফিয়ানীর যুদ্ধসমূহ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে মহান বিজয় ও সাফল্যের যুদ্ধ অর্থাৎ কুদস্ বিজয় ও ফিলিস্তিন মুক্ত করার যুদ্ধের কথাই কেবল উল্লিখিত হয়েছে । আর এ যুদ্ধই হবে সুফিয়ানীর সর্বশেষ যুদ্ধ । আর এ যুদ্ধে তার মিত্রদের অর্থাৎ ইহুদীদের এবং পাশ্চাত্যেরও পরাজয় হবে ।

কুদস বিজয়ের যুদ্ধে সুফিয়ানী

এ মহাসমর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সৌভাগ্যবশত সুফিয়ানী অনেক সংকটের মুখোমুখি হতে থাকবে । প্রথম সংকট : শামদেশে তার জনসমর্থন ও গণভিত্তি দুর্বল হওয়া । কারণ তার শাসন, ক্ষমতা ও অবস্থান যতই তার অনুকূলে থাকুক না কেন শামের জনগণ তো মুসলিম এবং তারা ইমাম মাহদী (আ.)- এর মুজিযা ও কারামতসমূহ এবং তাদের যুগের অত্যাচারী সুফিয়ানীর পরাজয় বরণ ও মুসলমানদের শত্রুদের স্বার্থানুকূলে তার ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে । এ কারণেই শামবাসীদের মধ্যে ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি ভালোবাসা ও ঝোঁক প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং সুফিয়ানী ও তার রাজনীতির ব্যাপারে তাদের বিতৃষ্ণা ও অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকবে । তাই তারা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ।

বরং আমার বিশ্বাস মতে সিরিয়া, লোবানন, জর্দান ও ফিলিস্তিনে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সমর্থকদের ব্যাপক ও জনপ্রিয় আ লন পরিচালিত হতে থাকবে । কারণ রেওয়ায়েতসমূহ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইমাম মাহদী (আ.) শামে সেনা অভিযান পরিচালনা করবেন এবং দামেশক থেকে ৩০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত 'মারজ আযরা' নামক অঞ্চলে সেনাছাউনী স্থাপন করবেন । এ থেকে ন্যূনপক্ষে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ানী তার রাজত্বের সীমান্ত রক্ষা এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না । এমনকি রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুফিয়ানী নিজ রাজধানী দামেশক ত্যাগ করে ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে গমন করবে এবং রামাল্লা অঞ্চলে তার রাজধানী ও সেনাসদর দপ্তর স্থাপন করবে । উল্লেখ্য যে, এই রামাল্লা শহরেই রোমীয় বিদ্রোহীরা অবতরণ করবে ।

একইভাবে রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে দেরী করবেন এবং বেশ কিছুকাল দামেশকের শহরতলীতে অবস্থান করতে থাকবেন যাতে করে শামের মুমিন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যারা তখনও ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে যোগদান করেননি তারা তাঁর সাথে যোগ দিতে পারে । অতঃপর তিনি সুফিয়ানীর কাছে প্রস্তাব দেবেন যাতে করে সে আলোচনা করার জন্য সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে । সে ইমাম মাহদী (আ.)- এর মহান ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে এবং তাঁর হাতে বাইআত করবে । সে তখন যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেবে এবং অত্র এলাকাটির নিয়ন্ত্রণভার ইমাম মাহদী (আ.)- এর কাছে অর্পণ করবে । কিন্তু সুফিয়ানীর ঘনিষ্ট ব্যক্তিরা ও পৃষ্ঠপোষকরা এ কারণে তাকে ভর্ৎসনা করবে এবং তাকে তার গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করবে ।

এ সব ঘটনা কুদস বিজয় ও ফিলিস্তিন মুক্ত করার কিছু পূর্বে সংঘটিত হবে এবং আমরা এটি মাহদী (আ.) সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে অধ্যয়ন করব । শামে সুফিয়ানীর গণভিত্তি ও জনসমর্থন দুর্বল হয়ে পড়া এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর সমর্থনে গণজোয়ার সৃষ্টি হওয়া ব্যতীত প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক মাপকাঠিসমূহের আলোকে এ সব ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না; বরং কতিপয়

রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, সুফিয়ানীর বাহিনীর একটি অংশ ইমাম মাহ্‌দী (আ.)- এর হাতে বাইআত এবং তাঁর সেনাদলে যোগদান করবে ।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "তখন সে (ইমাম মাহ্‌দী) কুফায় আসবে এবং আবির্ভূত হওয়া পর্যন্ত যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন সেখানেই থাকবে । এরপর সে ও তার সঙ্গী- সাথীরা মারজ আযরায় যাবে এবং অধিকাংশ জনগণই তার সাথে যোগ দেবে ।... আর তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করা ও যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সুফিয়ানী রামাল্লা নগরীতে অবস্থান করতে থাকবে । আর ঐ দিবসটি হবে প্রকৃত মুমিনকে শনাক্ত করার দিবস । যে সব লোক সুফিয়ানীর সাথে থাকবে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বংশধরদের অনুসরণ করবে না এবং জনগণের একটি অংশ যারা মহানবী (সা.)- এর বংশধরদের সাথে থাকবে তাদের অনেকেই সুফিয়ানীপন্থী হয়ে যাবে । ঐ দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ পতাকার দিকে দ্রুত ধাবিত হবে । আর ঐ দিন হবে প্রকৃত মুমিনদেরকে চেনার দিবস ।"[১৭৭]

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "যখন সুফিয়ানী মাহ্‌দীর দিকে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে তখন তারা বাইদার মরুপ্রান্তরে ধ্বংস হবে । আর এ সংবাদ শামবাসীদের কাছে পৌঁছবে । তারা তাদের খলীফাকে বলবে : মাহ্‌দী আবির্ভূত হয়েছে । তাঁর হাতে বাইআত করুন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য করুন । আর যদি তা না করেন তাহলে আমরা আপনাকে হত্যা করব । সে বাইআত করার জন্য কতিপয় ব্যক্তিকে মাহ্‌দীর কাছে প্রেরণ করবে । আবার অন্যদিকে মাহ্‌দীও তাঁর সেনাদল নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছবে।"[১৭৮]

নি াক্ত এ রেওয়ায়েতে ব্যাপক গণজাগরণ, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)- এর বন্ধু এবং সুফিয়ানীবিরোধীদের ব্যাপকভিত্তিক আ ালন ও কর্মকাণ্ডের কথা উল্লিখিত হয়েছে । বর্ণিত হয়েছে যে, "হযরত মাহ্‌দী (আ.) বলবেন : আমার পিতৃব্যপুত্রকে আমার কাছে নিয়ে এসো যাতে করে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি । অতঃপর সে (সুফিয়ানী) তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর সাথে আলোচনা করবে । সে তার সকল কর্তৃত্ব ইমাম মাহ্‌দী (আ.)- এর কাছে অর্পণ করবে এবং

তাঁর হাতে বাইআত করবে । এরপর যখন সুফিয়ানী তার বন্ধুদের কাছে ফিরে যাবে তখন বনি কালব গোত্র তাকে অনুতাপ করাবে । এ কারণেই সে ইমামের কাছে ফিরে গিয়ে চুক্তি বাতিল করার অনুরোধ করবে এবং ইমামও তার বাইআত বাতিল করে দেবেন । তখন সুফিয়ানী তার বাহিনীকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মোতায়েন করবে । কিন্তু ইমাম মাহদী (আ.) তাকে পরাজিত করবেন এবং মহান আল্লাহ্ তাঁর হাতে রোমীয়দেরকে ধ্বংস করবেন ।”[১৭৯]

বনি কালব গোত্র তাকে অনুতাপ করাবে- এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে তাকে হযরত মাহদী (আ.)- এর হাতে বাইআত করার জন্য অনুতাপ করাবে । কালব সুফিয়ানীর মাতুলদের গোত্রের নাম ।

আসলে যারা সুফিয়ানীর পৃষ্ঠপোষকতা দান করবে এবং তার হুকুমতকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সমর্থনকারী গণআ লন ও বিপ্লবের বরাবরে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবে তারা হবে তার ইহুদী ও রোমীয় পৃষ্ঠপোষক । যেমন পূর্বোক্ত রেওয়ায়েত ও অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও এ অর্থটি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা আল কুদস বিজয়ের মহাসমর সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব ।

যাহোক, সুফিয়ানী এ গণজোয়ারে একটি পক্ষকেও তার দিকে টানতে এবং ইমাম মাহদী (আ.) তাকে যে সুযোগ দেবেন তার সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না । আর শামের মুসলমানরাও সুফিয়ানী সরকার ও তার সেনাশক্তির পতন ঘটাতে সক্ষম হবে না । এ কারণেই সুফিয়ানী এবং তার মিত্ররা নিজেদেরকে এ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকবে যা রেওয়ায়েতসমূহের ভাষ্য অনুসারে আক্কা থেকে সূর, সেখান থেকে সমুদ্র সৈকতস্থ আনতাকিয়া এবং দামেশক থেকে তাবারীয়াহ্ ও আল কুদসের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে ।

এ সময় মহান আল্লাহর অভিশাপ এবং ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সেনাবাহিনীর ক্রোধ সুফিয়ানী ও তার মিত্রদের ওপর আপতিত হবে । ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে ঐশ্বরিক মুজিযা ও নিদর্শনাদি বাস্তবায়িত হবে । সুফিয়ানী এবং তার ইহুদী ও পাশ্চাত্য মিত্র ও পৃষ্ঠপোষকদের ওপর দুঃখ- কষ্ট ও দুর্ভাগ্য আপতিত হবে এবং তারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করবে । আর পরিণামে সুফিয়ানী ইমাম মাহদী (আ.)- এর একজন সৈনিকের হাতে ব ী হবে এবং

রেওয়ায়েতসমূহ অনুযায়ী তাকে তাবারীয়াহ্ হ্রদের পাশে অথবা আল কুদসে প্রবেশ অঞ্চলের কাছে হত্যা করা হবে । আর এভাবেই সেই খোদাদ্রোহী নাস্তিক যে পনর মাসব্যাপী এমন সব জঘন্য অপরাধ করেছে যা অন্য কারো পক্ষে এর থেকে দীর্ঘ সময়েও করা সম্ভব নয়, তার পাপপূর্ণ কালো জীবনের চির অবসান হবে ।

অষ্টম অধ্যায়

আবির্ভাবের যুগে ইয়েমেনের ভূমিকা

ইয়েমেনে ইসলামী বিপ্লব ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী বিপ্লব সম্পর্কে আহলে বাইত থেকে বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রেওয়ায়েত সহীহ সনদ বিশিষ্ট । এ সব সহীহ রেওয়ায়েতে এ বিপ্লবের বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী তা স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে । এ বিপ্লবকে হেদায়েতের প্রতীক এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আে ালনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ও সহায়তা দানকারী বলে এ সব রেওয়ায়েতে স্পষ্ট উল্লখ করা হয়েছে । এমনকি কতিপয় রেওয়ায়েতে আবির্ভাবের যুগে ইয়েমেনের ইসলামী বিপ্লবকে সবচেয়ে অধিক হেদায়েতকারী বিপ্লব হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে । প্রাচ্য অর্থাৎ ইরানের বিপ্লবকে সাহায্য করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার চেয়েও ইয়েমেনের ইসলামী বিপ্লবকে সাহায্য করার ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । রজব মাসে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও বিদ্রোহের সমসাময়িক হবে ইয়েমেনের বিপ্লব । অর্থাৎ হযরত মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কয়েক মাস আগে এ বিপ্লব বিজয় লাভ করবে এবং এর কেন্দ্রস্থল হবে ইয়েমেনের রাজধানী সানআ ।

তবে রেওয়ায়েতসমূহে এ বিপ্লবের নেতা 'ইয়েমেনী' নামে প্রসিদ্ধ । একটি রেওয়ায়েতে তাঁর নাম হাসান অথবা হুসাইন বলা হয়েছে এবং তিনি হযরত যাইদ ইবনে আলীর বংশধর হবেন । তবে মাতন (মূল ভাষ্য) এবং সনদের দিক থেকে রেওয়ায়েতটি নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

ইয়েমেনী বিপ্লব সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেওয়ায়েতসমূহ

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "আল কায়েম আল মাহদীর আে ালনের আগে পাঁচটি নিদর্শন অবশ্যম্ভাবী : ১. ইয়েমেনী ২. সুফিয়ানী ৩. আকাশ থেকে গায়েবী আওয়াজ ৪. এক পবিত্র আ ার অধিকারী ব্যক্তির (নাফসে যাকিয়াহ্) হত্যাকাণ্ড এবং ৫. মরুপ্রান্তরে ভূমিধ্বস ও ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়া ।"[১৮০]

তিনি আরো বলেছেন : “ইয়েমেনী, সুফিয়ানী ও খোরাসানী একই বছরে, একই মাসে এবং একই দিনে আবির্ভূত হবে । তাদের ধারাক্রম হবে একের পর এক সাজানো মেরুদণ্ডের অস্থিসমূহের ন্যায় । সবদিক থেকে অস্থিরতা, উদ্বেগ- উৎকণ্ঠা এবং দুঃখ- দুর্দশা প্রকাশ পাবে । ঐ ব্যক্তির জন্য আক্ষেপ যে তাদের সাথে বিরোধিতা ও শত্রুতা পোষণ করবে । পতাকাসমূহের (আন্দোলনসমূহের) মধ্যে ইয়েমেনী পতাকা ব্যতীত আর কোন পতাকাই অধিকতর হেদায়েতকারী হবে না । কারণ তা হবে সত্যের পতাকা এবং তোমাদেরকে তা তোমাদের নেতার (ইমাম মাহ্দীর) দিকে আহবান করবে । যখন ইয়েমেনী বিপ্লব করবে তখন জনগণের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা হারাম হয়ে যাবে । আর যখন সে অগ্রযাত্রা শুরু করবে তখন তার দিকে ছুটে যাবে; কারণ তার পতাকা হবে হেদায়েতের পতাকা । তার বিরুদ্ধাচরণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হবে না । আর যদি কেউ এমন করে তাহলে সে জাহান্নামী হবে । কারণ সে জনগণকে সত্য এবং সরল- সঠিক পথের দিকে আহবান করবে ।”[১৮১]

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেন : “এ ঘটনার (ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের) আগে সুফিয়ানী, মারওয়ানী এবং শুআইব ইবনে সালিহ্ আসবে; অতএব, মানুষ কিভাবে (ইমাম মাহ্দীর আগমনের ব্যাপারে) এ কথা, সে কথা বলবে?”[১৮২]

আল্লামা মাজলিসী বলেছেন : মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বা অন্য কোন ব্যক্তি যে বিদ্রোহ করবে সে কিভাবে দাবী করে বলবে : ‘আমিই আল কায়েম আল মাহ্দী’? আর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত মারওয়ানীর অর্থ আবকা অথবা ঐ ব্যক্তিও হতে পারে যে মূলত হবে খোরাসানী । উল্লেখ্য যে, লিপিকাররা ভুলবশত খোরাসানীর স্থলে মারওয়ানী লিখে থাকতে পারেন ।”

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : “খোরাসানী, সুফিয়ানী ও ইয়েমেনী- এ তিন ব্যক্তির আবির্ভাব একই বছরে, একই মাসে এবং একই দিনে সংঘটিত হবে । ইয়েমেনী পতাকা সব কিছুর চেয়ে অধিকতর হেদায়েতকারী হবে । কারণ সে সত্যের দিকে আহবান করবে ।”[১৮৩]

হিশাম ইবনে হাকাম বলেন : “‘যখন সত্যান্বেষী ব্যক্তি বিপ্লব করবে... তখন আবু আবদিল্লাহ্ (ইমাম সাদিক)- কে বলা হলো : আপনি কি আশাবাদী যে, এ ব্যক্তি ইয়েমেনী হতে পারে?”

হযরত সাদিক (আ.) বললেন, “না, ইয়েমেনী আলী (আ.)- এর প্রেমিক, আর এ ব্যক্তিটি (সুফিয়ানী) তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।”[১৮৪]

এ রেওয়ায়েতেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়েমেনী ও সুফিয়ানী যেন দু’টি প্রতিযোগী অশ্বের ন্যায় যার একটি অন্যটির চেয়ে অগ্রগামী হতে চায়।

ইমাম মাহদী (আ.)- এর ব্যাপারে কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, “তিনি ইয়েমেন এবং কারআহ্ না ী একটি জনপদ থেকে আবির্ভূত হবেন।”

রেওয়ায়েতে উল্লিখিত ব্যক্তিই যে ইয়েমেনী হতে পারে তা অসম্ভব নয়। তিনি এ অঞ্চল (ইয়েমেনের কারাআহ্) থেকে বিপ্লব শুরু করবেন। কারণ রেওয়ায়েতসমূহে যা কিছু মুতাওয়াতির (বহু সূত্রে বর্ণিত ও অকাট্য) তা হচ্ছে এই যে, পবিত্র মক্কা ও মসজিদুল হারাম থেকে মাহদী (আ.) বিপ্লব করবেন।

‘বিশারাতুল ইসলাম’ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে : “যখন হুসাইন অথবা হাসান নামক এক শাসনকর্তা (নেতা) সানআ থেকে বিপ্লব করবেন এবং তাঁর বিপ্লবের মাধ্যমে সকল ফিতনার অবসান হবে তখন পবিত্র ও কল্যাণময় ব্যক্তি (মাহদী) আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর ছত্রছায়ায় আঁধার দূরীভূত হয়ে যাবে এবং গোপন থাকার পর সত্য তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত হবে।”[১৮৫]

ইয়েমেনীর বিপ্লবে ব্যাপারে কতিপয় পর্যালোচনা

এ বিপ্লবের ভূমিকা : স্বাভাবিকভাবেই ইয়েমেনে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী বিপ্লব- যা তাঁর আে ালনকে সহায়তা প্রদান এবং হিজায বিপ্লবকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা রাখবে- রেওয়ায়েতসমূহে এ ভূমিকার কথা উল্লিখিত না হওয়া এ ভূমিকার অস্তিত্বের সাথে মোটেও সাংঘর্ষিক নয়। বরং যাতে করে এ ভূমিকা বা বিপ্লব সংরক্ষিত থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয সেজন্য রেওয়ায়েতে তা গোপন রাখা হতে পারে। আর আমরা শীঘ্রই ইমাম মাহদী (আ.)- এর আে ালন সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করর যে, মক্কা ও হিজাযে যে

জনশক্তি আ ালন ও বিপ্লব করবে এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনী গঠন করবে তারা মূলত তাঁর হিজাযী ও ইয়েমেনী সঙ্গী- সাথী হবে ।

ইরাকে ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইয়েমেনীদের ভূমিকা : রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আছে : ইয়েমেনীর বিরুদ্ধে সুফিয়ানীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইয়েমেনী ইরাকে প্রবেশ করবেন । সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য ইয়েমেনী ও ইরানী বাহিনীসমূহ ময়দানে অবতীর্ণ হবে । আর রেওয়ায়েতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইয়েমেনের সেনাবাহিনীর ভূমিকা হবে ইরানী সেনাবাহিনীকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদান । কারণ রেওয়ায়েতসমূহের ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পক্ষ হবে প্রাচ্যদেশীয় জনগণ অর্থাৎ খোরাসানী ও শুআইবের সঙ্গী- সাথীরা । সম্ভবত ইরানী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার পর ইয়েমেনীরা ইয়েমেনে প্রত্যাবর্তন করবে ।

তবে হিজায ছাড়াও পারস্যোপসাগরীয় অঞ্চলে ইয়েমেনীদের প্রধান ও মৌলিক ভূমিকা থাকবে । যদিও রেওয়ায়েতসমূহে এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি । তবে স্বাভাবিকভাবে আবির্ভাবের ঘটনাপ্রবাহ এবং অত্র অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে ইয়েমেন, হিজায এবং পারস্যোপসাগরীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবে ইয়েমেনী বাহিনীর হাতে ন্যস্ত থাকবে যারা হবে হযরত মাহদী (আ.)- এর অনুসারী ।

ইয়েমেনী পতাকা খোরাসানী পতাকা অপেক্ষা অধিকতর হেদায়েতকারী হওয়ার কারণ

খোরাসানী পতাকা ও প্রাচ্যবাসীদের পতাকাকে সার্বিকভাবে হেদায়েতের পতাকা বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাদের নিহতদেরকে শহীদ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহ্ তাদের মাধ্যমে স্বীয় ধর্মকে সাহায্য করবেন । ইমাম মাহদী (আ.)- এর বহু মন্ত্রী ও উপদেষ্টা এবং বিশেষ বিশেষ সঙ্গী- সাথী হবেন ইরানী । তাদের মধ্যে ইরানী সেনাবহিনী প্রধান শুআইব ইবনে সালিহ্ থাকবেন যাঁকে ইমাম মাহদী (আ.) নিজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করবেন । ইমাম

মাহদী (আ.)- এর আন্দোলন ও বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের সার্বিক পর্যায়ে ইরানীদের এক ব্যাপক ভূমিকা থাকবে ।

যখন তারা তাদের বিপ্লব ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আন্দোলনের শুভ সূচনা করবে তখন স্বভাবতই তাদের এক বিশেষ ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে । আর আমরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে তাদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করব । অতএব, কিভাবে ইয়েমেনী বিপ্লব ও তাঁর পতাকা ইরানী জাতি এবং তাদের পতাকা অপেক্ষা অধিকতর হেদায়েতকারী হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর এটি হতে পারে যে, ইয়েমেনী ইয়েমেনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন তা অধিকতর সঠিক এবং সরলত্ব ও অকাট্যতার দিক থেকে ইসলাম ধর্মের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির অধিকতর নিকটবর্তী হবে । অথচ ইরানীদের রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা জটিলতা, একই কাজের পুনরাবৃত্তিকরণ এবং দোষ-ক্রুটি হতে মুক্ত নয় । অতএব, প্রশাসন পরিচালনা সংক্রান্ত এ দুই অভিজ্ঞতার মধ্যকার পার্থক্য ইয়েমেনী সমাজের সরল ও গোত্রীয় প্রকৃতি এবং ইরানী সমাজের জটিল গঠন প্রকৃতি ও এর ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ।

ইয়েমেনী বিপ্লব অধিকতর হেদায়েতকারী হতে পারে এ দিক থেকে যে, এর রাজনীতি ও নির্বাহী ব্যবস্থা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট এবং তাঁর অধীনে থাকবে একান্ত নিষ্ঠাবান ও আনুগত্যশীল বাহিনী । তিনি তাদের ব্যাপারে সব সময় জোরালো তদারকী করবেন । অবশ্য এটিই হচ্ছে ঐ দিক নির্দেশনা যা ইসলাম ধর্ম মুসলিম উম্মাহর সার্বিক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়কদেরকে প্রদান করেছে যার ভিত্তিতে তাঁরা তাদের অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে প্রশাসনিক আচরণ করে থাকেন । আর মিশরের শাসনকর্তা এবং সে দেশস্থ ইমামের প্রতিনিধি মালিক আশতারের কাছে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- এর লেখা প্রশাসনিক চিঠিতে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় । আর ঠিক একইভাবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর গুণাবলী সংক্রান্ত বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে : "তিনি তাঁর অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং দুঃস্থ- নিঃস্বদের ব্যাপারে

অত্যন্ত দয়ালু হবেন ।" অথচ ইরানীরা এ ধরনের নীতির আলোকে কাজ করে না । তারা দোষী অথবা মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে অন্য সকলের শিক্ষা নেবার জন্য প্রকাশ্যে শাস্তি দান করে না । কারণ তারা ভয় পায় যে, এ কাজ ইসলামী রাষ্ট্র- যা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তাকে দুর্বল করে দেবে ।

ইসলাম ধর্মের বিশ্ব- পরিকল্পনা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রচুর অপ্রধান বিষয়, সমসাময়িক ধ্যান- ধারণা এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা মেনে না চলার দিক থেকে ইয়েমেনী পতাকার (বিপ্লবের) অধিকতর হেদায়েতকারী হবার সম্ভাবনা আছে । অথচ ইরানের ইসলামী বিপ্লব (বর্তমান বিশ্ব- পরিস্থিতির কারণেই) ঐ সব আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও আধুনিক ধ্যান- ধারণা মেনে চলতে বাধ্য ।

তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও পছ নীয় দলিল হচ্ছে এই যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় এ বিপ্লব পরিচালিত ও সফল হবে এবং তা তাঁর আ োলনের প্রভাববলয় বা অঞ্চলের মধ্যেই সংঘটিত হবে । আর এ বিপ্লবের পথিকৃৎ নেতা ইয়েমেনী ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাক্ষাৎ লাভ করবেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিনি সরাসরি প্রয়োজনীয় দিক- নির্দেশনা ও আদেশ- নির্দেশ লাভ করবেন । এ বক্তব্যের দলিল হচ্ছে ইয়েমেনীদের বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ যেগুলোয় ইয়েমেন- বিপ্লবের নেতা ইয়েমেনীর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর ব্যাপারে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'তিনি সত্যের দিকে হেদায়েত করবেন', 'তোমাদেরকে তোমাদের নেতার দিকে পরিচালিত করবেন', 'তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হবে না এবং যে কেউ এ কাজ করবে সে জাহান্নামী হবে'; তবে ইরানীদের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী বিপ্লবের রেওয়ায়েতসমূহে এ বিপ্লবের নেতাদের চেয়ে এ বিপ্লবের সাধারণ কর্মীদের অধিক প্রশংসা করা হয়েছে, যেমন কালো পতাকাবাহীরা, প্রাচ্যবাসীরা এবং প্রাচ্যের একটি জাতি । তবে রেওয়ায়েতসমূহে ইরানী নেতৃবৃ র মধ্যে কালো পতাকাবাহীদের অন্য সকল ইরানী নেতার চেয়ে শুআইব ইবনে সালিহ্- এর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে । এরপর খোরাসানী সাইয়্যেদ এবং কোমের এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছে ।

রেওয়ায়েতসমূহ থেকে যে বিষয়টির সমর্থন মেলে তা হচ্ছে যে, ইরানীদের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী বিপ্লবের চেয়ে ইয়েমেনী বিপ্লব ইমাম মাহদী (আ.)- এর আন্দোলনের অধিকতর নিকটবর্তী হবে। এমনকি যদি আমরা ধারণাও করি যে, সুফিয়ানীর আগে ইয়েমেনী বিপ্লব করবেন অথবা প্রতিশ্রুত ইয়েমেনীর ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হবে আরেকজন ইয়েমেনী। অথচ কোমের এক ব্যক্তির হাতে ইরানীদের বিপ্লব- যা হবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিপ্লব ও আন্দোলনের শুভ সূচনাস্বরূপ (যার সূত্রপাত হবে পূর্ব দিক থেকে) এবং তাদের এ বিপ্লবের সূচনা এবং খোরাসানী ও শুআইব ইবনে সালিহের মাঝে বিশ অথবা পঞ্চাশ বছর অথবা মহান আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন কেবল ততখানি সময়গত ব্যবধান বিদ্যমান থাকবে। ফকীহ্- মুজতাহিদদের ইজতিহাদ এবং তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের দ্বারা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের শুভ সূচনা হবে। তাই যেমনভাবে ইয়েমেনের ইসলামী বিপ্লব সরাসরি ইমাম মাহদী (আ.)- এর পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা প্রাপ্ত হবে ইরানের ইসলামী বিপ্লব ঠিক তদ্রূপ পবিত্র ও বিশুদ্ধ অবস্থান ও পরিস্থিতির অধিকারী হবে না।

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আর তা হলো যে, ইয়েমেনী একাধিক হতে পারেন এবং তাঁদের মধ্যকার দ্বিতীয় ইয়েমেনীরই প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত ইয়েমেনী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতসমূহে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের সমসাময়িক হবে প্রতিশ্রুত ইয়ামানীর আবির্ভাব ও বিপ্লব। অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরেই তিনি বিপ্লব করবেন। এতদপ্রসঙ্গে ইমাম জাফর আস সাদিক (আ.) থেকে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত বিদ্যমান। যেমন তিনি বলেছেন: "সুফিয়ানীর আগেই মিশরী ও ইয়েমেনী বিপ্লব করবেন।"[১৮৬]

যেমনভাবে কোমের এক ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রাচ্যবাসী প্রতিশ্রুত খোরাসানী ও শুআইবের আবির্ভাব ও আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হবেন এ ক্ষেত্রেও এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ ব্যক্তিটি (যে ইয়েমেনী সুফিয়ানীর আগে বিপ্লব করবেন) অবশ্যই প্রথম ইয়েমেনী হবেন যিনি প্রতিশ্রুত ইয়েমেনীর (আবির্ভাব ও বিপ্লবের) ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হবেন।

তবে কেবল এ রেওয়ায়েতের মাধ্যমেই প্রথম ইয়েমেনীর আবির্ভাব ও আন্দোলনের সময়কাল যে সুফিয়ানীর আবির্ভাবের আগে হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায় । অবশ্য এ বিপ্লব সুফিয়ানীর কিছুকাল অথবা বহু বছর আগেও সংঘটিত হওয়া সম্ভব । আর মহান আল্লাহ্ই একমাত্র জ্ঞাত ।

আরেকটি বিষয় আছে । আর তা হলো সানআস্থ কাসিরু আইনেহি[১৮৭] (كاسر عينه) সম্পর্কিত হাদীস যা উবাইদ ইবনে যুরারাহ্ ইমাম জাফর আস সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন : "আবু আবদিল্লাহ্ (ইমাম সাদিক)- এর সামনে সুফিয়ানীর ব্যাপারে আলোচনা হলো । তিনি বলেছেন : সে কিভাবে বিপ্লব করবে অথচ তখনও সানআয় কাসিরু আইনেহি বিপ্লব করেনি?"[১৮৮]

রেওয়ায়েতসমূহের মাঝে এ হাদীসটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী । কারণ তা নূমানীর 'গাইবাত' গ্রন্থের মতো প্রথম সারির গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে উল্লিখিত হয়েছে এবং সম্ভবত এ হাদীসের সনদ সহীহ। যে ব্যক্তি সুফিয়ানীর আগে ইয়েমেনে বিপ্লব করবেন তাঁর প্রথম ইয়েমেনী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । আর এখানে প্রথম ইয়েমেনী হবেন প্রতিশ্রুত ইয়েমেনীর আবির্ভাব ও আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী । আমরা ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি । কাসিরু আইনেহি- এর সম্ভাব্য কয়েকটি ব্যাখ্যা ও অর্থ থাকতে পারে । এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে ইমাম জাফর আস সাদিক (আ.)- এর পক্ষ থেকে একটি রূপক ব্যাখ্যা যার অর্থ যথাসময়ে পরিষ্কার হবে ।

নবম অধ্যায়

আবির্ভাবের যুগে মিশরের ঘটনাপ্রবাহ

মিশরের ঘটনাবলী সংক্রান্ত বেশ কিছু সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান । এতৎসংক্রান্ত প্রথম রেওয়ায়েতসমূহ হচ্ছে মুসলমানদের হাতে মিশর বিজয় সংক্রান্ত মহানবী (সা.)- এর সুসংবাদ সম্বলিত রেওয়ায়েতসমূহ । এরপর ফাতেমীয় বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহে মিশরের ওপর মাগরিবীদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ এবং সবশেষে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালীন ঘটনাবলী সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ ।

কিন্তু ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালীন ঘটনাবলী মিশরে ফাতেমীয় রাষ্ট্র ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ঘটনাবলীর সাথে মিশ্রিত হয়ে হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে । কারণ ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে মিশরে মাগরিবী সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে ।

আর তা স্পষ্ট করে চিহ্নিতকরণের পন্থা হচ্ছে ঐ রেওয়ায়েত যা আবির্ভাবের যুগের সাথে মিশরে মাগরিবী সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের বিষয়টির সংশ্লিষ্টতা নির্দেশক অথবা মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালীন কোন ঘটনা, যেমন সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান ও অভিযান এবং এ ধরনের ঘটনার সাথেও সংশ্লিষ্টতা নির্দেশ করে ।

সূক্ষ্ম আলোচনা- পর্যালোচনা করে আমরা কতিপয় রেওয়ায়েতের সন্ধান পাই যেগুলোয় মিশরে এমন সব ঘটনার কথা উল্লিখিত হয়েছে যেগুলো নিঃসন্দেহে অথবা শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালীন ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারে ।

এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে মিশরের জনগণের হাতে সে দেশের শাসনকর্তার নিহত হওয়া সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ বিদ্যমান । এ ঘটনাটি যা বিশারাতুল ইসলাম গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায় শেখ মুফীদের কিতাব আল ইরশাদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের একটি নিদর্শন হিসাবে বর্ণিত ও গণ্য ।

একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা যা আমাদের সমসাময়িক যুগে জনগণের মাঝে বহুল প্রচলিত হয়ে গেছে এবং তা হলো যে, 'মিশরবাসীরা তাদের নেতাদেরকে হত্যা করবে' এবং 'নেতাদের (সাদাতের) দেশের ওপর দাসদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে'।[১৮৯]

আর জনগণ এ কথাকে আনওয়ার সাদাতের হত্যাকাণ্ডের সাথে মিলিয়ে ফেলে যা আসলেই ভুল। কারণ এ সব রেওয়ায়েতে সাদাত শব্দের অর্থ নেতৃবর্গ এবং তা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। আর মিশরীয় শাসনকর্তার হত্যা- যা হবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের অন্যতম নিদর্শন তার পরপরই ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন। ঠিক তেমনি এ রেওয়ায়েত মিশরে এক বা একাধিক সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের বিষয়টিও নিশ্চিত করে। আর অনুপ্রবেশকারী সেনাবাহিনী পাশ্চাত্য সামরিক বাহিনী অথবা মাগরিবী বাহিনীও হতে পারে যা আমরা শীঘ্র বর্ণনা করব। কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : মিশরের শাসনকর্তার নিহত হওয়া শামবাসীদের হাতে সে দেশের শাসনকর্তার হত্যাকাণ্ডেরই সমসাময়িক হবে। আর ঠিক একইভাবে বিশারাতুল ইসলাম গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় ইবনে হাজর প্রণীত আল কওলুল মুখতাসার গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ বর্ণিত হয়েছে : ষোলতম বিষয় : তাঁর (ইমাম মাহদীর) আগে শামদেশের শাসনকর্তা এবং মিশরের রাষ্ট্রনায়ক নিহত হবে।

মিশরের শাসনকর্তা বা রাষ্ট্রনায়কের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত রেওয়ায়েত এবং যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মিশর থেকে একজন বিপ্লবী নেতা সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান ও অভিযানের আগে আবির্ভূত হবেন সেই রেওয়ায়েতের মাঝে এক ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে।

বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : "সুফিয়ানীর আগে মিশরী ও ইয়েমেনী আন্দোলন ও বিপ্লব করবেন।"[১৯০]

আর এ মিশরীয় ব্যক্তি সামরিক কর্মকর্তাদের নেতা অর্থাৎ সেনাপ্রধান হতে পারেন যিনি কতিপয় রেওয়ায়েত মোতাবেক মিশরে একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করবেন এবং যুদ্ধের ঘোষণা দেবেন।"

“মিশরে সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের অধিনায়ক অর্থাৎ সেনাপ্রধান বিপ্লব ও অভ্যুত্থান ঘটাবেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে সমরাভিযানে প্রেরণ করবেন ।”

আরেকটি রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, পাশ্চাত্য বাহিনীর অনুপ্রবেশের আগে তিনি জনগণকে মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের দিকে আহবান জানাবেন ।

“পাশ্চাত্য মিশরে আক্রমণ ও আগ্রাসন চালাবে । যখনই তাদের আগমন হবে তখনই সুফিয়ানীর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে । আর এর আগে এক ব্যক্তি জনগণকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইতের দিকে আহবান জানাবেন ।”[১৯১]

তবে মিশরীয় ব্যক্তিটি সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের অধিনায়ক এবং যে ব্যক্তি জনগণকে মহানবীর আহলে বাইতের দিকে আহবান জানাবেন তাঁরা একজন না হয়ে তিন ব্যক্তি হবেন ।

যাহোক এ সব রেওয়ায়েতে মোটামুটিভাবে মিশরে একটি ইসলামী গণ- আে ালন ও ইসলামী বিপ্লবের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায় যা হবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী । অথবা মিশরে ন্যূনতম হলেও শক্তিশালী ইসলামী পরিবেশের কথাও এ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে । এ সময় মিশরে একটি অভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে যা বহির্বিশ্বে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ ও সন্ধির সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকবে ।

আবির্ভাবকালীন ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে মিশরের চারিদিক ও বিভিন্ন এলাকার ওপর কিবতীদের (দাসদের) আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে । কারণ আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিদর্শনাদি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : “মিশরের চারপাশে কিবতীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে ।”[১৯২]

এর অর্থ এও হতে পারে যা ইবনে হাম্মাদ তাঁর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে হযরত আবু যার (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন : “মিশর থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিদায় নেবে ।” খারিজাহ্ বলেন : “আমি হযরত আবু যারকে বললাম : ঐ সময় যখন মিশর থেকে নিরাপত্তা বিদায় নেবে তখন এমন কোন নেতা নেই যে, সে তা সেদেশে আবার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে?” তিনি বললেন

: “না । বরং মিশরের সার্বিক (প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক) ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে ।”[১৯৩]
আর কা’ব থেকে বর্ণিত হাদীসটি নি রূপ : “মিশর উটের বিষ্ঠার মতো ভেঙে যাবে ।”

মোটকথা, মিশরের কিবতীরা বিদ্রোহ করবে এবং সে দেশে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে । তারা মিশর সরকারকে অমান্য করে সে দেশের বেশ কিছু অঞ্চলের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে । আর এ কারণেই মিশরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে । আর স্বভাবতই এ কিবতী সম্প্রদায়ের এ বিদ্রোহ বাইরে থেকে মুসলমানদের শত্রুদের প্ররোচনায়ই সংঘটিত হবে । কারণ বিদেশী শক্তির সাহায্য ও উস্কানি ব্যতীত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিবতী সম্প্রদায়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ ও আ লন পরিচালিত হওয়ার পূর্ব নজীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না । যেমন বহিঃশক্তির সাহায্য ও উস্কানিতেই ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালে অথবা বিগত শতাব্দীগুলোতে কিবতীদের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী বিদ্রোহ ও অপতৎপরতার নজীর পাওয়া যায় । কিন্তু উল্লিখিত রেওয়ায়েতে কিবতী সম্প্রদায়ের উপরিউক্ত বিদ্রোহের সময়কালের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না । তবে হযরত হুযাইফাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত কতিপয় রেওয়ায়েত বিদ্যমান । যেমন : “বসরা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মিশর বিরান ও ধ্বংস হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে ।”[১৯৪]

আর বাহ্যত আবির্ভাবের যুগে বসরা নগরীর প্রতিশ্রুত ধ্বংস, ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের রাষ্ট্র ও প্রশাসন কায়েম হওয়ার পরে অথবা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে সুফিয়ানী কর্তৃক ইরাক দখল করার পরপরই সংঘটিত হবে ।

রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে মিশরে মাগরিবী সেনাবাহিনীর প্রবেশ সংক্রান্ত হাদীস বিদ্যমান । মুহাদ্দিস ও লেখকরা সাধারণত এ ঘটনাকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন । এ রেওয়ায়েত ও অন্যান্য রেওয়ায়েতে ‘মাগরিব’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলামী আল মাগরিব অঞ্চল যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মরক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও তিউনিসিয়া । তবে আমি যতদূর সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহ নিয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছি সেগুলোর মধ্যে কোন রেওয়ায়েত পাইনি যা স্পষ্টভঅবে এ অর্থ নির্দেশ করে ।

বরং আমি দেখতে পেয়েছি যে, মিশরে ফাতেমীয়দের বিপ্লবের সময় সে দেশে মাগরিবী বাহিনীসমূহের অনুপ্রবেশের ঘটনার সাথেই এ সব রেওয়ায়েত মিলে যায় । তবে শেখ তূসীর গাইবাত গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠায় একটি রেওয়ায়েত পেয়েছি । উক্ত রেওয়ায়েতে মাগরিববাসী নয়, বরং পাশ্চাত্যবাসীদের কথা উল্লেখ আছে । আর এখানে উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি (গাইবাত) সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ও সূত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত । 'বিহারুল আনওয়ার' ও 'বিশারাতুল ইসলাম' নামক গ্রন্থদ্বয়ের লেখকরাও তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন । তবে এ দু'জন ছাড়া অন্যরা ভুলক্রমে গারব (পাশ্চাত্য)- এর স্থলে মাগরিব (উপরিউক্ত চারটি দেশ) শব্দ উল্লেখ করেছেন ।

দামেশকে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও বিপ্লবের অল্প কিছু আগে মিশরে পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশের সময়কাল এ রেওয়ায়েতে স্পষ্ট করা হয়েছে । আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি রেওয়ায়েতের এক অংশে বলা হয়েছে : "সর্বশেষ যুগে তোমাদের নবী (সা.)- এর আহলে বাইতের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যার কতগুলো নিদর্শন থাকবে... পাশ্চাত্য মিশরের দিকে অগ্রসর হবে (সে দেশ দখল করার জন্য) । যখনই তারা মিশরে প্রবেশ করবে তখনই দামেশকে সুফিয়ানীর প্রশাসন ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে ।"

এটি অসম্ভব নয় যে, শেখ তূসী (রহ.) [মৃত্যু ৪৬০ হি.]- এর রেওয়ায়েতটি এমন রেওয়ায়েতের উৎসমূল যা তাঁর পরবর্তী রাবীরা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা 'গারব' (পাশ্চাত্য)- কে ভুলবশত 'মাগরিব' বলে থাকতে পারেন । তবে আমরা একটি ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্বারোপ করছি, আর তা হলো যে, মিশরে পাশ্চাত্য বা মাগরিবী বাহিনীসমূহের অনুপ্রবেশ এমন এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হবে যা মিশরে সংঘটিত হবে এবং তা সে দেশে পাশ্চাত্য বা মাগরিবী বাহিনীসমূহের সামরিক অভিযান চালানোর কারণ হবে । তাই মনে হচ্ছে যে, এ সব সেনাবাহিনী ইসলামবিরোধী হবে এবং মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে । তাই তারা মিশরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে এবং তারা যদি মিশরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় তাহলে তা হবে দামেশকে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান এবং সে দেশের ওপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ ।

যেহেতু ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কয়েক মাস আগে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও উত্থান হবে তাই ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে অথবা এর কাছাকাছি সময়ে মিশরে পাশ্চাত্য বা মাগরিবী বাহিনীসমূহের আগমন হবে ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুফিয়ানী মিশরবাসীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং সে মিশরে প্রবেশ করবে । সেখানে সে চার মাস জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করবে । তবে সুফিয়ানীর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে এ রেওয়ায়েতের সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকতর সম্ভাবনা বিদ্যমান । কারণ প্রথম সারির হাদীসগ্রন্থ ও সূত্রসমূহে এ ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত নেই । কতিপয় রেওয়ায়েতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তদনুযায়ী সুফিয়ানী দামেশকে যে ব্যক্তিকে হত্যা করবে সে হবে আবকা । এ আবকা হবে মিশরের অধিবাসী অথবা মিশরের সাথে তার (রাজনৈতিক) সম্পর্ক থাকবে । তবে মহান আল্লাহ্ই (এ সব ব্যাপারে) জ্ঞাত ।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে : হযরত মাহদী (আ.) মিশরকে তাঁর মিম্বার (প্রচারকেন্দ্র) হিসাবে মনোনীত করবেন । আর হযরত আলী (আ.) থেকে আবায়াহ্ আল আসাদী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে । তিনি বলেছেন : "আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- কে অভিযোগ করে বলতে শুনেছি আর আমি তখন তাঁর কাছেই দণ্ডায়মান ছিলাম : আমি মিশরে একটি মিম্বার স্থাপন করব এবং দামেশককে ধ্বংস করব । আমি আরবীয় নগর থেকে ইহুদী ও নাসারাদেরকে বিতাড়িত করব এবং এ লাঠি দিয়ে আরবদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব ।" আবায়াহ্ বলেন : "আমি বললাম : আপনি এমনভাবে এ সব কথা বলছেন যেন আপনি মৃত্যুর পর জীবিত হবেন?" তিনি বলেছিলেন : "হে আবায়াহ্! এটি অসম্ভব । তুমি ভুল বলছ । আমার বংশধর এক ব্যক্তি (ইমাম মাহদী) এ ধরনের কাজ করবে ।"[১৯৫]

তখন (ইমাম মাহদী ও তাঁর সঙ্গী- সাথীরা) মিশরের উদ্দেশে যাত্রা করবে এবং তিনি সে দেশের মিম্বারে আরোহণ করে মিশরবাসীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন । পৃথিবী ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের দ্বারা আন ও সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে এবং সবুজ- শ্যামল হয়ে যাবে । আকাশ থেকে মহান আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে এবং গাছপালা ফল দান করবে । ভূ- পৃষ্ঠের

ওপর বৃক্ষ ও উদ্ভিদসমূহ জন্মাবে । বিশ্ববাসীর সামনে পৃথিবী পুষ্প ও উদ্ভিদ দিয়ে নিজেকে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করবে । বন্য পশুগুলো নিরাপদে বিচরণ করবে এমনভাবে যে, সেগুলো ভূ- পৃষ্ঠের ওপর সড়ক ও পথসমূহে গৃহপালিত পশুর মতো চড়ে বেড়াবে । মুমিনদের অন্তঃকরণসমূহে জ্ঞানের আলো এমনভাবে প্রতিফলিত হবে যে, কোন মুমিনই তার জ্ঞানী ভাইয়ের কাছে জ্ঞান আহরণের জন্য মুখাপেক্ষী হবে না । আর সেদিন নি োক্ত আয়াতটির অর্থ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে । আয়াতটি হলো : "মহান আল্লাহ্ অবারিত দানের মাধ্যমে সবাইকে অমুখাপেক্ষী ও নিরভাব করবেন ।"[১৯৬]

এ দু' রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক পরিচালিত বিশ্ব- ইসলামী সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রসার ও ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে মিশরের স্বীকৃত অবস্থান থাকবে । বিশেষ করে 'আমি মিশরে একটি মিম্বার স্থাপন করব' এবং 'তখন তারা মিশরের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন এবং তিনি সে দেশের মিম্বারে আরোহণ করবেন' অর্থাৎ হযরত মাহদী (আ.) ও তাঁর সঙ্গী- সাথীরা মিশরে যাবেন, তবে তা সে দেশ দখল বা সে দেশে তাঁর শাসনকর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়; বরং মিশরের জনগণই ইমাম ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে । এ কারণেই তিনি মিশরকে তাঁর বক্তৃতার মিম্বার হিসাবে মনোনীত করবেন যাতে করে তিনি মিশরের জনগণ ও সমগ্র বিশ্বাবাসীর কাছে তাঁর বাণী প্রেরণ করতে সক্ষম হন । আর তাঁর প্রপিতামহ আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ঠিক এ বিষয়েরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । আর যেহেতু মিশর বিশ্বে জ্ঞান- বিজ্ঞান ও তাঁর বাণী প্রচারের কেন্দ্রস্থল হবে তাই এ বিষয়টি মুসলমানদের জ্ঞানগত পর্যায়ের সাথে মোটেও অসঙ্গতিপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক হবে না- যা তারা ঐ যুগে অর্জন করবে । আর উক্ত রেওয়ায়েত এ বিষয়টিই নির্দেশ করে । কারণ জ্ঞান হচ্ছে আপেক্ষিক ব্যাপার ।

এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে এ হাদীসটিও অন্তর্ভুক্ত যাতে বলা হয়েছে যে, মিশরের দু'টি পিরামিডের মধ্যে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বেশ কিছু গুপ্তধন এবং জ্ঞান- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য পুঞ্জিভূত আছে । এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েত শেখ সাদূক (রহ.)- এর 'কামালুদ্দীন'

নামক গ্রন্থের (পৃ. ৫- ৫২৪) মতো প্রথম সারির গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের বংশধর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ শারানী থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম মিশরী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আহমাদ ইবনে তোলূনের পুত্র এক বছরের জন্য এক হাজার শ্রমিককে পিরামিডের দরজা খুঁজে বের করার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। তারা অবশেষে একটি মর্মর পাথরের সন্ধান পেয়েছিল যার পিছনে একটি ইমারত ছিল। তারা ঐ পাথরটি নষ্ট করতে পারেনি। তবে হাবাশার একজন খ্রিস্টান পাদ্রী মিশরের এক ফিরআউনের ভাষায় পাথরের ওপর লেখাগুলো পড়েছিলেন। পাথরে লেখা ছিল : আমি কয়েকটি পিরামিড ও ... নির্মাণ করেছি এবং এ দু'টি পিরামিডও আমি নির্মাণ করে আমার ধন- সম্পদ এর ভিতরে গচ্ছিত রেখেছি। ইবনে তোলূন তখন বলেছিলেন : "কেবল মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইতের কায়েম (আল মাহদী) ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই এ গুপ্ত ও গচ্ছিত সম্পদ খুঁজে বের করার পথ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। এরপর ঐ প্রস্তর নির্মিত ঢ্যাবটি এর পূর্ব স্থানে রেখে দেয়া হলো। এ রেওয়ায়েতে বেশ কিছু দুর্বল দিক বিদ্যমান যেগুলো কতিপয় রাবী কর্তৃক রেওয়ায়েতের মূল ভাষ্যের সাথে সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। এতদসত্ত্বেও এ রেওয়ায়েতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী দিকও পরিলক্ষিত হয়। আর একমাত্র মহান আল্লাহ্ই সবকিছু জানেন।

এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে মিশরের আখনাসের রেওয়ায়েতটিও বিদ্যমান যা 'কানযুল উম্মাল' হাদীসগ্রন্থের সংকলক 'বুরহান' নামক একটি গ্রন্থে (পৃ. ২০০, তারিখ- ই ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত) মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন : "আখনাস নামে কুরাইশ বংশীয় (মানাভীর ফয়যুল কাদীর গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় : উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত) এক ব্যক্তি মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবে। তখন মিশরবাসীরা তার ওপর বিজয়ী হবে অথবা তার কাছ থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেবে। সে তখন রোমে (পাশ্চাত্যে) পালিয়ে যাবে এবং রোমানদেরকে (পাশ্চাত্য সেনাবাহিনী) ইস্কানদারীয়ায় আনয়ন করবে এবং সেখানে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর এটি হবে প্রথম ঘটনা।" ঘটনাসমূহ বলতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ঘটনাবলী এবং বনি উমাইয়্যা (উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত)

বলতে তাদের গৃহীত নীতিকে বোঝানো হয়েছে (সম্ভবত সে উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত নাও হতে পারে, তবে বনি উমাইয়্যার নীতি ও ভাবধারার সমর্থক হবে)।

দশম অধ্যায়

মুসলিম মাগরিব ভূ- খণ্ড এবং আবির্ভাবকালীন ঘটনাবলী

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মাগরিবীদের উল্লেখ আছে (মাগরিবীদের কথা বর্ণিত হয়েছে) । তবে এ সব রেওয়ায়েত যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে ফাতেমীয়দের আন্দোলন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের সাথে সেগুলো মিলে- মিশে গেছে । উল্লেখ্য যে, মুসলমানরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগেই ফাতেমীয়দের আন্দোলন ও বিপ্লব সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলো বর্ণনা করেছেন । আর এ সব রেওয়ায়েত, আরো অন্যান্য ভবিষ্যৎ ঘটনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত এবং মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতের প্রমাণপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য ।

তবে কতিপয় রেওয়ায়েতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে মাগরিবীদের আন্দোলন ও তৎপরতা সম্পর্কে স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান এবং ফাতেমীয়দের আন্দোলন ও বিপ্লবের সাথে এ সব রেওয়ায়েতের কোন সম্পর্ক নেই । এমনকি এতৎসংক্রান্ত এবং এ ছাড়াও আরো সাক্ষ্য- প্রমাণ বিদ্যমান যেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাগরিবীদের এ আন্দোলন ও তৎপরতা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগেই সংঘটিত হবে । এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হচ্ছে সিরিয়া ও জর্দানে মাগরিবী বাহিনীর আগমন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ । এখানে উল্লেখ্য যে, সুফিয়ানীর আন্দোলন ও বিপ্লবের একটু আগেই সিরিয়া ও জর্দানে মাগরিবী বাহিনী অনুপ্রবেশ করবে । আর ইতোমধ্যে আমরা যথাস্থানে এ বিষয়টি আলোচনা করেছি ।

সমগ্র শাম, ইরাক- তুরস্ক সীমান্তে অবস্থিত কিরকীসীয়ার যুদ্ধ এবং ইরাকে মাগরিব হতে (আগত) অথবা মাগরিবী আরোহীরা (অর্থাৎ সাঁজোয়া বাহিনী) অথবা হলুদ পতাকাসমূহের ভূমিকার কথা রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে । যেমন ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত: "যখন হলুদ ও কালো পতাকাসমূহ (পতাকাবাহী সেনাবাহিনীসমূহ) শামের অভ্যন্তরে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের জন্য আক্ষেপ যারা সামরিক বাহিনীর হাতে পর্যদূস্ত হবে । অতঃপর বিজয়ী সেনাবাহিনীর হাতে

থেকে শামের জন্য আক্ষেপ এবং অভিশপ্ত কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট লোকটির থেকে তাদের জন্য আক্ষেপ ।”[১৯৭]

অভিশপ্ত কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট হওয়া হচ্ছে সুফিয়ানীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যেরই অন্তর্ভুক্ত । এ পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত হয়েছে : “কালো পতাকাবাহী এবং হলুদ পতাকার সমর্থকরা কুনাইতারা শহরে পরস্পরের মুখোমুখী হবে এবং ফিলিস্তিনে (ইসরাইলে) প্রবেশ করা পর্যন্ত একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হবে । এ সময় সুফিয়ানী প্রাচ্যবাসীদের (ইরানী সেনাবাহিনী) বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে । আর যখন মাগরিবী সেনাবহিনী জর্দানে অবতরণ করবে তখন তাদের অধিনায়ক মৃত্যুবরণ করবে এবং তারা তখন তিন দলে বিভক্ত হয়ে একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাবে । একটি দল যে স্থান থেকে এসেছিল সে স্থানেই প্রত্যাবর্তন করবে । আরেকটি দল সেখানে থেকে যাবে এবং সুফিয়ানী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদেরকে পরাস্ত করে নিজের অনুগত করবে ।[১৯৮]

এতে আরো উল্লিখিত হয়েছে : “নিশ্চয়ই মাগরিবীদের সেনাপতি, বনি মারওয়ান ও বনি কুযাআহ্ শামের রাজধানীতে (দামেশকে) কালো পতাকাবাহীদের (ইরানী সেনাবাহিনী) সাথে যুদ্ধ করার জন্য পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হবে ।”[১৯৯]

আবির্ভাবের যুগে মাগরিবী সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানসমূহ সংক্রান্ত সমুদয় রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের অভিযান আরব অথবা আন্তর্জাতিক বাঁধাদানকারী বাহিনীসমূহের সাথেই বেশি সদৃশ হবে । এ বাহিনী ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী বিপ্লব ও আে ালনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে । তারা শামে প্রাচ্যবাসীদের পতাকাবাহী সেনাদল অর্থাৎ আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তাদের হাতে পরাজিত হবে । পরাজয় বরণ করার পর তারা জর্দানের দিকে পশ্চাদপসরণ করবে । আমরা শামের ঘটনাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । আরো কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে বোঝা যায় যে, ইরাকেও তাদের ভূমিকা থাকবে ।

তবে কিরকীসীয়ার যুদ্ধে মাগরিবী সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ইসলামের স্বার্থে তাদের ভূমিকার কথা নির্দেশ করে না । চাই তাদেরকে সুফিয়ানীর বিপরীতে তুর্কীদের সমর্থনকারী বা সুফিয়ানীর মিত্রপক্ষ বলে গণ্য করি না কেন । কারণ, রেওয়ায়েতসমূহে কিরকীসীয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষকেই নি া এবং তাদেরকে অত্যাচারী বলে গণ্য করা হয়েছে ।

রেওয়ায়েতসমূহ সঠিক হওয়ার ভিত্তিতে কেবল বাকী থাকে মিশরে মাগরিবী বাহিনীর ভূমিকা । আর তাদের ভূমিকা ইসলাম ও মিশরবাসীদের অনুকূলে থাকবে কি- এ ব্যাপারে কোন দলিল আমাদের হাতে নেই । বরং আমাদের এ কথা বলাই উত্তম হবে যে, ঐ সময় তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হবে ইসরাইল- সীমান্ত রক্ষা করা যখন মিশর সরকার ইহুদীদের বিরুদ্ধে সে দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীর প্রাণোৎসর্গকারী অভিযানসমূহ প্রতিহত ও বাধাদান করতে অপারগ হবে । অথবা তাদের প্রধান ভূমিকা মিশরে কিবতী সম্প্রদায়ের উল্লিখিত অপকর্ম ও অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে সে দেশের মুসলমানদের তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকে এ সম্প্রদায়কে (কিবতী) রক্ষা করা হবে । অথবা ঐ সময় মাগরিবী বাহিনী আরব প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসাবে গণ্য হবে যখন মিশর সরকার দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে মিশরে হযরত মাহদী (আ.)- এর সমর্থনকারী ইসলামী আ ালন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মিশরের সরকারী বাহিনী উদ্বিগ্ন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে । তখন মিশর সরকার মাগরিবী বাহিনীকে সে দেশে অনুপ্রবেশ ও সামরিক হস্তক্ষেপ করার আহবান জানাবে ।

আর মহান আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন ।

একাদশ অধ্যায়

আবির্ভাবের যুগে ইরাকের ভূমিকা

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে ইরাকের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী সংক্রান্ত বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ সব রেওয়ায়েত থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ইরাক বিভিন্ন সামরিক শক্তি ও বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব- সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত হবে এবং অশান্তই থেকে যাবে । এ দেশ বাস্তবে চারটি পর্যায় অতিক্রম করবে । পর্যায়গুলো হলো :

প্রথম পর্যায় : ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের পূর্বের যুগ । অত্যাচারী শাসকরা দীর্ঘকাল ইরাক শাসন করবে এবং সেদেশে হত্যাযজ্ঞ, ত্রাস ও ভয়- ভীতি এমনভাবে বিস্তার লাভ করবে যে, জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলবে । আর এ অবস্থা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী কালো পতাকাবাহীদের দ্বারা সেদেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ।

দ্বিতীয় পর্যায় : সেদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সেই প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করার জন্য ইমাম মাহদী (আ.)- এর ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী খোরাসানীদের সমর্থক ও শামের শাসনকর্তা সুফিয়ানীর সমর্থকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব- সংঘাত ।

তৃতীয় পর্যায় : সুফিয়ানী কর্তৃক ইরাক দখল ও সেদেশের জনগণের ওপর তার অত্যাচার ও উৎপীড়ন; এরপর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইয়েমেনী ও ইরানী সেনাবাহিনীসমূহের ইরাকে প্রবেশ যারা সুফিয়ানীর সেনাবাহিনীকে পর্যদুস্ত করবে এবং তাদেরকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করবে ।

চতুর্থ পর্যায় :ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক ইরাক মুক্ত করা, সেখান থেকে সুফিয়ানীর সমর্থকদের ও বিভিন্ন বিদ্রোহী দলের অস্তিত্ব বিলোপ করা এবং ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক সে দেশটিকে তাঁর আবাসস্থল এবং সরকার ও প্রশাসনের কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করা ।

এ চার পর্যায়ে ইরাকের অভ্যন্তরে যে সব ঘটনা সংঘটিত হবে সেগুলো সংক্রান্ত আরো কিছু রেওয়ায়েত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে । যেমন সুফিয়ানীর আবির্ভাবের আগে শাইসাবানীর আবির্ভাব

যে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত হবে । কুফার পেছনে (নাজাফে) ৭০ জন পুণ্যবান সৎকর্মশীল ব্যক্তিসহ একজন পবিত্র আ ার অধিকারী ব্যক্তির শাহাদাত, জাযীরাহ্ অথবা তিকরীত থেকে আওফ সালামীর আবির্ভাব এবং তিন বছর ইরাকবাসীদেরকে হজ্ব পালন থেকে বিরত রাখা; ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কিছু দিন আগে বসরা নগরীর দেবে যাওয়া ও ধ্বংস হওয়া, বাগদাদ ও হিল্লায় আরো ভূমিধ্বস; ইরাকে মাগরিবী অথবা পাশ্চাত্য সেনাবাহিনীর প্রবেশ এবং সুফিয়ানী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য একটি দলসহ এক সৎকর্মশীল ও যোগ্য ব্যক্তির আ ালন ও উত্থান; ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে কতিপয় শিয়া ও সুন্নী দলের বিদ্রোহ; আর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিদ্রোহী দলটি হবে রুমাইলা- ই দাসকারার দল; উল্লেখ্য যে, রুমাইলা- ই দাসকারাহ্ দিয়ালা প্রদেশের বান শহরের অদূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল ।

এখন উপরিউক্ত পর্যায়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিচে পেশ করা হলো :

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়

এ পর্যায় সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে ইরাকের অত্যাচারী শাসকবর্গ কর্তৃক সে দেশের জনগণের চরম দুর্ভোগ এবং কালো পতাকাবাহী ইরানীদের সাথে এ সব অত্যাচারী শাসকের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত : "অচিরেই ইরাকে জনগণের কাছে খাদ্য- শস্য ও অর্থ পৌঁছবে না । আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম : কাদের পক্ষ থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হবে? তিনি বললেন : আজমের (ইরানীদের) পক্ষ থেকে যারা খাদ্য ও অর্থ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে ।"[২০০]

অতএব, এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, এ সব শাসক ইরানীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে লিপ্ত হবে সে যুদ্ধই ইরাকের জনগণের কাছে খাদ্য- সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে । আর এটিই হচ্ছে ঐ অর্থনৈতিক সংকট, ক্ষুধা ও ভীতি যা জাবির জুফীর রেওয়ায়েতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে । জাবির বলেছেন :

و لنبلونّكم بشيء مّن الخوف و الجوع

“আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সামান্য ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ ও প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব- এ আয়াতের ব্যাপারে ইমাম বাকির (আ.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন : হে জাবির! এ ভীতি ও দুর্ভিক্ষের দু’টি দিক আছে যার একটি বিশেষ এবং অপরটি সর্বজনীন ও ব্যাপক। তবে কুফায় বিশেষ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হবে। মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আহলে বাইতের শত্রুদেরকে এ দুর্ভিক্ষে ফেলবেন এবং এভাবেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। তবে যে দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক সংকট ব্যাপক ও সর্বজনীন হবে তা হচ্ছে ঐ দুর্ভিক্ষ যা শামে বিস্তার লাভ করবে এবং শামবাসীরা তাতে আক্রান্ত হবে। উল্লেখ্য যে, তারা কখনোই এ অবস্থার শিকার হয় নি। এ মহাদুর্ভিক্ষের সময়কাল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাব ও বিপ্লবের আগে এবং ভয়-ভীতি ও ত্রাসের সময়কালটি তার আবির্ভাব বা বিপ্লবের পরে হবে।”[২০১]

অবশ্য যে দুর্ভিক্ষের কথা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে তা যে আহলে বাইতের শত্রুদেরকে বিশেষভাবে জর্জরিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে এতৎসংক্রান্ত কোন দলিল আমি পাই নি। তবে ইরাকে অত্যাচারী শাসকদের প্রশাসন অর্থনৈতিক সংকটে জড়িয়ে পড়বে এবং তীব্র দুর্ভোগ পোহাবে।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের পরে যে ভয়-ভীতি সমগ্র শামকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে তা তাঁর আবির্ভাবের আগে থেকেও সেখানে বিরাজমান থাকতে পারে। পরবর্তী রেওয়ায়েতে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের আগে এই ভয়-ভীতি, অস্থিরতা ও অশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “আল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাব ও আন্দোলনের আগে জনগণের পাপের কারণে আকাশ থেকে যে আগুন তাদের ওপর আপতিত হবে তার দ্বারা তারা যন্ত্রণা পেতে থাকবে। লাল রঙের চিহ্ন সমগ্র আকাশ জুড়ে বিস্তার লাভ করবে, বাগদাদ ও বসরায় ভূমিধ্বস হবে, সেখানে প্রচুর রক্ত ঝরবে এবং অসংখ্য ঘর-বাড়ি ধ্বংপ্রাপ্ত হবে, মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের আচ্ছন্ন করবে। এমন অশান্তি ও অস্থিরতা ইরাকবাসীদেরকে আক্রান্ত করবে যে, তা তাদের থেকে স্বস্তি কেড়ে নেবে।”

তবে রেওয়ায়েতে এ সব নিদর্শন যে ধারাক্রম সহকারে বর্ণিত হয়েছে তদনুসারেই যে ঘটবে তা আবশ্যক নয় । বরং অশান্তি, ভীতি, ভূমিধ্বস ও দেবে যাওয়া আসমানী নিদর্শনসমূহের প্রকাশিত হওয়ার আগে সংঘটিত হবে এবং বাহ্যত আকাশের আগুন এবং তা লাল বর্ণ ধারণ করাটা অলৌকিক নিদর্শন হতে পারে, অবশ্যই তা বিস্ফোরণসমূহ থেকে উদ্ভূত আগুন হবে না । পরবর্তী রেওয়ায়েত যা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে যে সব ঘটনা সুফিয়ানী এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের পূর্বে অত্যাচারী শাসকদের শাসনামলে ইরাকে সংঘটিত হবে সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে ।

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত : "যখন আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) নাহরাওয়ানের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি বুরাসা নামক একটি অঞ্চলে অবতরণ করেন । ঐ অঞ্চলে হুবাব নামের এক সন্ন্যাসী নিজ আশ্রমে বসবাস করতেন । যখন তিনি সেনাদলের শোরগোল শুনতে পেলেন তখন তাঁর আশ্রম থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর সেনাবাহিনীকে দেখতে পেলেন । তিনি এ অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে আশ্রম থেকে বাইরে আসলেন এবং প্রশ্ন করলেন : এ ব্যক্তিটি কে? আর এ সেনাদলের অধিনায়ক কে? তাঁকে বলা হলো : আমীরুল মুমিনীন আলী, যিনি নাহরাওয়ানের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন । হুবাব দ্রুত গতিতে আলী (আ.)- এর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং কথা বলতে শুরু করলেন । তিনি বললেন : হে মুমিনদের নেতা! আপনার ওপর সালাম । আপনি সত্যিকার অর্থেই 'আমীরুল মুমিনীন' । হযরত আলী বললেন : তুমি কীভাবে জেনেছ যে, আমি সত্যিকার অর্থেই 'আমীরুল মুমিনীন'? তিনি বললেন : আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাদের এ কথাই শিখিয়েছেন । তখন হযরত আলী বললেন : হে হুবাব! সন্ন্যাসী বললেন : আপনি কীভাবে আমার নাম জানেন? আলী (আ.) বললেন : আমার বন্ধু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাকে শিখিয়েছেন । তখনই হুবাব আলী (আ.)- কে বললেন : আপনার হাত বাড়িয়ে দিন । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক- অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত পুরুষ । আর আপনি আলী ইবনে আবি তালিব তাঁর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত । হযরত আলী (আ.)

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কোথায় বাস কর? তিনি বলল : আমার নিজের আশ্রমে । হযরত আলী বললেন : আজকের পর থেকে আর কোন দিন সেখানে বাস করো না । তবে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিপতির নামে এর নামকরণ করবে (হুবাব সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এর নাম রাখলেন বুরাসা) । এরপর আলী (আ.) তাঁকে বললেন : হে হুবাব! কোথা থেকে পানি পান কর? তিনি বললেন : এখান (দজলা নদী) থেকে । তিনি বললেন : তুমি কেন কূপ খনন করছ না? তিনি বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন! যখনই আমি কূপ খনন করেছি তখনই আমি কূপের পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদময় পেয়েছি । তখন আলী (আ.) বললেন : এখানে একটি কূপ খনন কর । তিনি খনন করলেন এবং একটি পাথরখণ্ড পাওয়া গেল যা কোন ব্যক্তিই সেখান থেকে সরাতে পারছিল না । আলী (আ.) ঐ পাথরটি সেখানে থেকে উঠিয়ে ফেললেন এবং সেখান থেকে একটি ঝরনা বের হলো যার পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মাখনের চেয়েও সুস্বাদু । হযরত আলী তাঁকে বললেন : হে হুবাব! এ ঝরনা থেকে তোমার পানীয় জল সংগ্রহ করবে । কিন্তু অচিরেই তোমার এ মসজিদের পাশে একটি নগরীর গোড়াপত্তন হবে যেখানে জালিমরা বাড়াবাড়ি করবে এবং বড় বড় বিপদ আনয়ন করবে । অবস্থা এতদূর গড়াবে যে, প্রতি জুমার রাতে সত্তর হাজার অশালীন কাজ আঞ্জাম দেয়া হবে । যখন তাদের ওপর বিপদ আপতিত হবে তখন তারা তোমার মসজিদে আক্রমণ চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেবে । তখন তুমি পুনরায় নির্মাণ করার মতো (মজবুত) করে তা নির্মাণ করবে যে কাফির ব্যতীত অন্য কেউ তা ধ্বংস করবে না । তখন তুমি সেখানে একটি বাড়ি নির্মাণ করবে । যখন এ ধরনের কাজে হাত দেবে তখন তিন বছর হজ্বে যাওয়া থেকে নিষেধ করা হবে ও বাধা দেয়া হবে । তাদের কৃষিপণ্যসমূহ দাবানলে পুড়ে যাবে এবং মহান আল্লাহ্ পার্বত্য অঞ্চলের এক অধিবাসীকে তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল করে দেবেন । সে যে শহরেই প্রবেশ করবে তা ধ্বংস করবে এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করবে । আবার সে তাদের কাছে ফিরে আসবে । এরপর তারা তিন বছর শক্তি নাশকারী দুর্ভিক্ষ ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির শিকার হবে । তবু সে তাদেরকে ছাড়বে না । এরপর সে কুফায় প্রবেশ করবে এবং যা কিছু তার সামনে থাকবে, যেমন গাছ, ইমারত,

এমনকি মানুষ সবকিছুকে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ধ্বংস করতে থাকবে । সেখানকার বাসি াদেরকে হত্যা করা হবে । এ সব ঘটনা ঐ সময় ঘটবে যখন বসরা উন্নত হতে থাকবে এবং সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হবে । আর এ সময়ই বসরার ধ্বংস হওয়ার মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে । অতঃপর সে ওয়াসিত নামের আরেকটি শহরে প্রবেশ করবে যা হাজ্জাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবে । এ শহরেও সে অন্য সব স্থানের মতো কাজ করবে । এরপর সে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং ক্ষমা সহকারে ঐ শহরে প্রবেশ করবে । এরপর জনগণ কুফায় আশ্রয় নেবে । কুফার এমন কোন স্থান থাকবে না যেখানে এ ঘটনা গোপন থেকে যাবে । তখন এ লোকটি যে ব্যক্তি তাকে বাগদাদে প্রবেশ করিয়েছিল তার সাথে কবর খোঁড়ার জন্য শহর থেকে বের হয়ে যাবে । ঠিক ঐ সময় সুফিয়ানী তাদের মুখোমুখি হবে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদেরকে হত্যা করবে । সে একটি সেনাদলকে কুফার দিকে প্রেরণ করবে যারা সেখানকার কতিপয় অধিবাসীকে দাস হিসাবে ব ী করবে । কুফা থেকে এক ব্যক্তি এসে তাদেরকে একটি দুর্গে আশ্রয় দেবে । সেখানে যে কেউ আশ্রয় নেবে সে- ই নিরাপদ থাকবে । সুফিয়ানীর সৈন্যরা কুফায় প্রবেশ করে যাকে ডেকে আনবে তাকে এমনভাবে হত্যা করবে যে, এ সেনাবাহিনীর কোন সৈনিক মাটির ওপর পড়ে থাকা বড় একটি মনি- মুক্তার টুকরার পাশ দিয়ে গমন করলেও তা স্পর্শ করবে না অথচ সে ব্যক্তিই কোন শিশুকে দেখলেও তার পিছু নিয়ে তাকে হত্যা করবে । হে হুবাব! ঐ সময় এ সব ঘটনার পর কতই না দূরে, তা কতই না দূরে! অবশ্যই বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং রাতের অংশের মতো ফিতনা ও গোলযোগসমূহের প্রতীক্ষা করতে হবে । হে হুবাব! আমি তোমাকে যা বলছি তা স্মরণে রাখবে ।”[২০২]

অবশ্য এ রেওয়ায়েতের ভাষা ও প্রকাশরীতিতে বিশৃঙ্খলা ও অগোছালোভাব পরিলক্ষিত হয় । আর মরহুম মাজলিসীও এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার পর বলেছেন : “জেনে রাখ, এ রেওয়ায়েতের অনুলিপি ত্রুটিযুক্ত এবং আমি হাদীসটি যেভাবে পেয়েছি ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করলাম ।” এ কারণেই এ রেওয়ায়েতের সনদ ও ভাষ্যের ব্যাপারে সমালোচনা ও বিতর্ক করার অবকাশ আছে । এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যা কিছু বলা হোক না কেন, এ হাদীসটি

ইরাকবাসীরা অত্যাচারী শাসকদের পক্ষ থেকে যে সব বিপদাপদ ও কঠিন অবস্থার শিকার হবে সেগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । তারা অত্যাচারী শাসকদের অন্যায়- অত্যাচার এবং বৈষম্যের শিকার হয়ে প্রভূত কষ্ট ভোগ করবে । অন্যান্য হাদীসেও প্রায় এ হাদীসের মূল বিষয় ও বক্তব্যের অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, এ সব হাদীসের মধ্যে গুটিকতক হাদীসের সনদ সহীহ । রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহে যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে বা সেগুলোর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । যেমন বুরাসার মসজিদের ধ্বংস সাধন, বাগদাদে ফিতনা এবং ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা; কুর্দিস্তান অথবা ইরানের পাহাড়িয়া অঞ্চলসমূহ থেকে আগত সামরিক কর্মকর্তা ও সেনাপতিদের ক্ষমতাগ্রহণ ও বাগদাদে তাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘটনা ইত্যাদি । আর এ ধরনের ঘটনার অপর কিছু অংশ, যেমন সুফিয়ানীর উত্থান এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এখনও সংঘটিত হয় নি ।

মরহুম শেখ মুফীদ (রহ.) বলেছেন : "হযরত কায়েম আল মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব ও বিপ্লবের নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর আবির্ভাবের আগে যে সব ঘটনা ঘটবে সেগুলো রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে । যেমন সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও সামরিক অভিযান, হাসানীর নিহত হওয়া, পার্থিব পদ দখল করাকে কেন্দ্র করে বনি আব্বাসের মধ্যকার মতবিরোধ, সাধারণ নিয়মের বাইরে রমযান মাসের মাঝামাঝিতে সূর্যগ্রহণ এবং ঐ একই মাসের শেষের দিকে চন্দ্রগ্রহণ, বাইদার মরুপ্রান্তরে ভূমিধ্বস, পূর্ব- পশ্চিমে আরো ভূমিধ্বস, (আকাশে) দুপুর থেকে অপরাহ্ণ পর্যন্ত সূর্যের স্থির হয়ে থাকা, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, কুফার পশ্চাতে (নাজাফে) সত্তর জন সৎকর্মশীল বা ার সাথে একজন পবিত্র আ ার অধিকারী ব্যক্তিকে হত্যা, পবিত্র রুকন ও মাকামের মাঝখানে পবিত্র কাবা ঘরের পাশে বনি হাশিমের এক ব্যক্তিকে হত্যা, কুফার মসজিদের প্রাচীরের ধ্বংসসাধন, খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাসমূহের আবির্ভাব, ইয়েমেনীর আবির্ভাব ও উত্থান, মিশরে মাগরিবীর আবির্ভাব এবং শামের ওপর তার আধিপত্য বিস্তার, জাযীরায় তুর্কীদের (রুশজাতি) আগমন, রামাল্লায় রোমানদের আগমন, পূর্ব দিক থেকে একটি তারার উদয় যা চাঁদের মতো আলোর বিচ্ছুরণ করবে এবং এরপর তা এতটা ঋজু

হবে যে, এর দু'প্রান্ত পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাবে, আকাশে লাল বর্ণের আলোকবৃত্তের আবির্ভাব, অতঃপর সমগ্র আকাশ জুড়ে তার বিস্তৃতি লাভ, আগুনের আবির্ভাব যা পূর্ব দিক থেকে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে আসবে এবং তিন দিন অথবা সাত দিন বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান থাকবে, আরবদের অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়া, নিজেদের দেশ ও অঞ্চলসমূহের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অনারবদের (তুর্কীদের) আধিপত্য ও শাসনকর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে আসা, মিশরীয় জনগণ কর্তৃক সেদেশের শাসককে হত্যা, শামের ধ্বংস ও সেদেশে তিন পতাকার সমর্থক বাহিনীসমূহের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব, মিশরে কাইস গোত্র ও আরবদের পতাকাসমূহের আগমন, খোরাসান শহরে কি াহ্ গোত্রের পতাকাসমূহের আগমন, পাশ্চাত্য থেকে অশ্বারোহী বাহিনী (সাঁজোয়া) সমূহের আগমন যারা কুফার নিকট অবস্থান গ্রহণ করবে এবং এ অঞ্চলে পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকাবাহীদের (ইরানী অথবা খোরাসানী) আগমন, ফুরাত নদীতে এমনভাবে ফাটলের উৎপত্তি যার ফলে পানি কুফা শহরের অলি- গলি ও রাস্তা- ঘাট প্লাবিত করবে এবং ষাট ব্যক্তির আবির্ভাব যাদের প্রত্যেকেই নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করবে ।

একইভাবে (ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত হচ্ছে) আবু তালিবের বংশধরদের মধ্য থেকে আরো বারো ব্যক্তির আবির্ভাব যাদের প্রত্যেকেই ইমামতের মিথ্যা দাবি করবে, জালূলা ও খানাকীনের মধ্যবর্তী স্থানে বনি আব্বাসভুক্ত এক সম্মানিত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে হত্যা, কারখ ও সালাম শহরের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী সেতু নির্মাণ, ঐ একই অঞ্চলে কালো বায়ুর উত্থান যা ঐ দিনের প্রভাতের প্রথম দিকে আরম্ভ হবে, ভূমিকম্প যার ফলে এলাকার একটি বিরাট অংশ ভূ- গর্ভে দেবে যাবে, ভয়- ভীতি ও ত্রাস যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং ইরাকের অধিবাসীদের বিশেষ করে বাগদাদবাসীদের ভীত- সন্ত্রস্ত করে তুলবে, ইরাকবাসীদের মধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব, জান- মালের ক্ষয়- ক্ষতি এবং ফসলাদির উৎপাদন হ্রাস, যখন- তখন পঙ্গপালের আবির্ভাব যেগুলো শস্যক্ষেত্রসমূহে হানা দেবে যার ফলে শস্য ও কৃষি পণ্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হবে ও হ্রাস পাবে, অনারব দু'দলের মধ্যে মতবিরোধ যা তাদের মধ্যে ব্যাপক রক্তপাতের কারণ হবে, দাসগণ কর্তৃক মালিকদেরকে অবমাননা ও তাদের

বিরুদ্ধাচরণ এবং নিজেদের প্রভুদেরকে হত্যা, কতিপয় বিদআতপন্থীর বানর ও শুকরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া, প্রভু ও মালিকের রাজ্যসমূহের ওপর দাসদের বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা (ফরাসী বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব, চীন ও অন্যান্য দেশে কমিউনিস্টদের বিপ্লব বা মুসলিম বিশ্বে মধ্যযুগে দাসদের বিপ্লব ও সাম্রাজ্য স্থাপন, যেমন মিশরের মামলুক সাম্রাজ্য), আসমানী আহবানধ্বনী যা সকল বিশ্ববাসী নিজ মাতৃভাষায় শুনতে পাবে, মুখমণ্ডল ও বুকের ছবি যা সূর্যের ভিতর প্রকাশিত হবে (সবাই তা দেখতে পাবে), কতিপয় মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়া যা পৃথিবীর জীবনে পুনরাগমনের (রাজাআত) জন্য সংঘটিত হবে, আর তারা একে অপরকে চিনতে পারবে ও পরস্পর সাক্ষাৎ করবে ।

যে সব নিদর্শন ওপরে বর্ণনা করা হলো সেগুলোর সবই চব্বিশ দিন অবিরাম বৃষ্টিবর্ষণের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হবে । এ বৃষ্টিবর্ষণের ফলে মৃত জমি প্রাণ ফিরে পাবে এবং এর বরকতসমূহ স্পষ্ট হয়ে যাবে । এ ঘটনার পর সব ধরনের শারীরিক ব্যাধি মাহদী (আ.)- এর সত্যিকার অনুসারী ও অন্বেষণকারীদের মধ্য থেকে বিদায় নেবে । আর রেওয়ায়েতসমূহের বক্তব্য অনুযায়ী এ শুভক্ষণেই ইমাম মাহদীর সঙ্গী- সাথীরা পবিত্র মক্কা থেকে তাঁর আবির্ভূত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর দিকে দ্রুত ছুটে যাবে ।

উল্লিখিত এ সব ঘটনার মধ্যে কতিপয় ঘটনা নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী এবং কতিপয় ঘটনা কতগুলো শর্তসাপেক্ষে সংঘটিত হবে । আর মহান আল্লাহ্ই এ সব ঘটনার সংঘটন পদ্ধতি ও ধরন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত । এ সব ঘটনা যেভাবে ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে সেভাবেই আমরা উল্লেখ করলাম এবং মহান আল্লাহর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।[২০৩]

শেখ মুফীদ যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা আসলে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী নিদর্শনসমূহের সারাংশ । যেমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তদনুযায়ী এ সব ঘটনার যে একের পর এক ক্রমান্বয়ে ঘটবে তিনি তা বোঝান নি । কারণ, এ সব ঘটনার মধ্যে গুটিকতক ঘটনা, যেমন পবিত্র আ ার অধিকারী ব্যক্তির নিহত হওয়া, রুকন ও মাকামের মধ্যবর্তী স্থানে

হাশিম বংশীয় এক ব্যক্তির শিরচ্ছেদ এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের মধ্যে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি ব্যবধান থাকবে না । বরং হাশিম ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড হবে ইমাম মাহদীর আ ালনেরই একটি অংশ মাত্র । কারণ, তিনি ইমাম মাহদীর প্রেরিত দূত হবেন । আবার এ সব নিদর্শনের মধ্যে কতিপয় নিদর্শন এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের মাঝে বহু শতাব্দীর ব্যবধান বিদ্যমান, যেমন আব্বাসীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ এবং ফাতিমীয়দের আ ালনের গতিধারায় মাগরিবীদের উত্থান এবং শামের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ।

যে সব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে গুটিকতক ঘটনার অবশ্যম্ভাবী হওয়া এবং অন্যান্য ঘটনা শর্তসাপেক্ষে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মরহুম শেখ মুফীদ যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, এ সব নিদর্শনের মধ্যে গুটিকতক নিদর্শন অবশ্যই সংঘটিত হবে । বিশেষ করে কতিপয় নিদর্শন যে অবশ্যই ঘটবে সে ব্যাপারে হাদীসসমূহে স্পষ্ট উক্তি করা হয়েছে । যেমন সুফিয়ানী, ইয়েমেনী, নাফসে যাকীয়ার নিহত হওয়া, আসমানী গায়েবী আহবান, সুফিয়ানী বাহিনীর ভূ- গর্ভে প্রোথিত হয়ে ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি । আর এ সব ঘটনার মধ্যে আরো কিছু ঘটনার সংঘটিত হওয়া অন্যান্য ঘটনা ঘটার শর্তে মহান আল্লাহর জ্ঞানে এবং তাকদীরের মধ্যে নিহিত রয়েছে । কারণ, তিনিই কেবল অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং এ সব ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ।

বাহ্যত হাসানী বলতে পবিত্র মক্কায় নাফসে যাকীয়াহ্ অথবা মদীনায় যে যুবক ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের খুব কাছাকাছি সময় সুফিয়ানী বাহিনীর হাতে নিহত হবেন তিনিও হতে পারেন যদিও তাঁর হাসানী সাইয়্যেদ এবং ইরাকের ইসলামী আ ালনের নেতা হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে । কারণ, কতিপয় রেওয়ায়েতে تحرّك الحسنيّ (হাসানী আ ালন করবে)- এ বাক্যটি বিদ্যমান ।

তবে সত্তর জন সৎকর্মশীল ব্যক্তির সাথে নাফসে যাকীয়ার নিহত হওয়ার ঘটনা মহান শহীদ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকির আস সাদর (রহ.) এবং একদল সম্মানিত বুযুর্গ আলেম ও মুমিনের সাথে খাপ খায় যাঁরা তাঁর সাথে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন

সত্তর জন। এ হাদীসে উল্লিখিত কুফার পশ্চাদ্ভাগ বলতে নাজাফকে বোঝানো হয়েছে যা কতিপয় রেওয়ায়েতে 'নাজাফ-ই কুফা' (অর্থাৎ ঐ শহরের পাহাড় ও উচ্চভূমিসমূহ) বলে অভিহিত হয়েছে। এ কারণেই নাজাফকে 'গাররা' অথবা 'গারায়াইন' বলে অভিহিত করা হয়। এ 'গাররা' হচ্ছে দু'টি স্মৃতিস্তম্ভের নাম যা হীরার বাদশাহ্ নুমান ইবনে মুনযির সেখানে নির্মাণ করেছিলেন এবং সেগুলোর ওপর সাদা রং দেয়া হয়েছে। অবশ্য কুফার পশ্চাতেই যে তাঁরা শাহাদাত বরণ করবেন এমনটি অত্যাবশ্যক নয়। সম্ভবত 'কুফার পশ্চাতে নাফসে যাকীয়ার নিহত হওয়া'- এ বাক্যটির অর্থ হতে পারে যে, তিনি নাজাফ শহরের অধিবাসী হবেন এবং সেখানে বসবাস করবেন। তবে যে সত্তর জন সৎকর্মশীল বা । তাঁর সাথে শাহাদাত বরণ করবেন তাঁদের পবিত্র নাজাফ নগরীর অধিবাসী হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের সংক্রান্ত হাদীস এবং শেখ মুফীদের বক্তব্যেও কোন ইঙ্গিত নেই। বরং তাঁরা নাফসে যাকীয়াহ্ যিনি নাজাফের অধিবাসী হবেন তাঁর সাথে শাহাদাত বরণ করবেন।

কুফার অদূরে অবস্থান গ্রহণকারী মাগরিবী (পাশ্চাত্য) অশ্বারোহী বাহিনী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, এ ঘটনাটি সুফিয়ানীর যুগে অথবা এর কাছাকাছি সময় সংঘটিত হবে।

তবে 'পাশ্চাত্যের দিক থেকে অশ্বারোহী বাহিনীর আগমন, যারা কুফার অদূরে অবস্থান গ্রহণ করবে'- মরহুম শেখ মুফীদের এ কথার মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, স্বয়ং এ কথাটি উক্ত রেওয়ায়েতের ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিবেচনা ও গবেষণার পথ উন্মুক্তকারী। রেওয়ায়েতটির শব্দটি কি غرب (পাশ্চাত্য) না مغرب (ইসলামী বিশ্বের সুদূর পশ্চিমাঞ্চল যা মাগরিব বা মরক্কো) আর তা এ সম্ভাবনাও ব্যক্ত করে যে, তারা (উক্ত অশ্বারোহীরা) পাশ্চাত্য সেনাবাহিনীই হবে যারা সুফিয়ানীকে সাহায্য করার জন্য অথবা কালো পতাকাসমূহের সমর্থকদেরকে (ইরানী সেনাবাহিনী) মোকাবিলা করার জন্য ইরাকে অনুপ্রবেশ করবে অথবা সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও উত্থানের আগেই সেখানে উপস্থিত থাকবে; বরং যে রেওয়ায়েতসমূহে মাগরিবের সেনাবাহিনী এবং মাগরিববাসীরা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে গবেষণা করাই হচ্ছে উপযুক্ত পদক্ষেপ। কারণ, হাদীসশাস্ত্রের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহে মূল শব্দটি হচ্ছে উক্ত পাশ্চাত্য বাহিনী ও

পাশ্চাত্য অধিবাসী । প্রাচ্যের পতাকাসমূহের অর্থ খোরাসানী সেনাবাহিনীর পতাকা । আর এই খোরাসানী সেনাবাহিনী সদ্য ইরাকে অনুপ্রবেশকারী সুফিয়ানী বাহিনীকে দমন করার জন্য ইয়েমেনী সেনাবাহিনীর সাথে সে দেশে প্রবেশ করবে ।

তবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরেই ফোরাত নদীতে ভাঙ্গন ধরবে এবং এর পানি কুফার ভিতরে প্রবাহিত হবে । আর এ বিষয়টি এভাবেই হাদীসসমূহে, যেমন ইমাম জাফর সাদিক (আ.)- এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । উক্ত হাদীসে ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "বিজয়ের বছরে ফোরাত নদী এমনভাবে ভাঙ্গবে যে, পানি কুফা শহরের অলি- গলি ও রাস্তাগুলোয় ঢুকে যাবে ।"[২০৪]

আরেক দিক থেকে মরহুম শেখ মুফীদের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থাদিতে এ সব নিদর্শন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে । আর তা এ সব রেওয়ায়েতের জন্য উচ্চ মাত্রার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আনয়ন করেছে । বরং বলা যেতে পারে যে, তিনি যে সব হাদীস ও রেওয়ায়েতকে সহীহ বলে গণ্য করেন সেগুলোর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোন স হ নেই । কারণ, তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অবস্থান ও মর্যাদার অধিকারী আলেম । তাবেয়ীদের ও আহলে বাইতের নিষ্পাপ ইমামদের যুগে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহের উৎস ও সূত্রসমূহের নিকটবর্তী হিসাবে এগুলোর ওপর তাঁর পূর্ণ দখল ছিল । কারণ, তিনি ৪১৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন ।

তবে যে সব রেওয়ায়েতে সুফিয়ানীর আগে ইরাকে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেগুলো প্রধানত ঐ সব রেওয়ায়েত যেগুলো ইরাকের অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের বিজয়ের দিকেই ইঙ্গিত দেয় । যেমন ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত এ রেওয়ায়েতটি :

"যেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, একদল প্রাচ্য (ইরান) থেকে বের হয়েছে যারা বিরোধীদের কাছে নিজেদের ন্যায্য অধিকার দাবি করছে । কিন্তু তাদের অধিকার আদায় করা হবে না । তারা পুনরায় তাদের বৈধ অধিকার দাবি করবে । এরপরও তাদের সে অধিকার আদায় করা হবে না । তারা এ পর্যায়ে কাঁধে তরবারি (অস্ত্র) তুলে নেবে এবং তীব্রভাবে প্রতিরোধ করবে; তাদের এ

অবস্থা দেখে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পূর্বের দাবি পূরণ করে দেবে । কিন্তু তারাই এবার তা মেনে নেবে না; তারা আবারও রুখে দাঁড়াবে এবং তোমাদের নেতা (ইমাম মাহ্দী) ব্যতীত আর কারো হাতে তারা হেদায়েতের পতাকা অর্পণ করবে না । তাদের নিহতরা শহীদ এবং আমি যদি ঐ সময় জীবিত থাকতাম, তাহলে আমি তাকে সাহায্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতাম ।”[২০৫]

একইভাবে এ রেওয়ায়েতটিতে বর্ণিত হয়েছে : “কালো পাতাকাসমূহ খোরাসান থেকে বের হয়ে বাইতুল মাকাদ্দাসে (জেরুজালেম) পতপত করে উড়া পর্যন্ত কোন কিছুই তাদেরকে পরাস্ত করতে ও পিছনে ফিরিয়ে দিতে (প্রতিহত করতে) পারবে না ।[২০৬]

শিয়া ও সুন্নী সূত্রে বর্ণিত একটি মুস্তাফীয[২০৭] রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “প্রাচ্য (ইরান) থেকে কতিপয় জনতার উত্থান হবে যারা মাহ্দীর হুকুমত ও কর্তৃত্বের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে ।”[২০৮]

উল্লেখ্য যে, এ রেওয়ায়েতটি সহীহ গ্রন্থসমূহের সংকলকরাও তাঁদের গ্রন্থসমূহে রেওয়ায়েত করেছেন ।

যাহোক, এ রেওয়ায়েত এবং এতদসদৃশ অন্যান্য রেওয়ায়েতে যদিও ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে ইরাকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই তবুও এগুলোয় ইরানীদের দু’ পর্যায়ভিত্তিক বিজয়ের ইঙ্গিত বিদ্যমান । আর আমরা যথাস্থানে তা বর্ণনা করবে । যা অধিকতর উত্তম মনে হয় তা হচ্ছে ইরানীদের লক্ষ্য হবে ইরাকে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীদের হুকুমতের পতন ঘটানো এবং সেদেশে একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা ।

অন্যান্য রেওয়ায়েতেও ইরাক ও সেদেশের বড় বড় নগরীতে খানাকীন ও বসরার পথে ইরানী সেনাবাহিনীর আগমন এবং সেখানে অত্যাচারী সরকার ও প্রশাসন কর্তৃক তাদেরকে বাধাদানের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু ঐ রেওয়ায়েতসমূহ হয় মুরসাল (বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত), না হয় দুর্বল[২০৯], যেমন বুরাসার রেওয়ায়েত যা আগে বর্ণিত হয়েছে এবং খুতবাতুল বায়ানের রেওয়ায়েতটি । এতে বর্ণিত হয়েছে :

"তোমরা জেনে রাখ, রাইবাসীদের কারণে বাগদাদের জন্য আক্ষেপ; ইরাকবাসীদেরকে যে মৃত্যু, হত্যাযজ্ঞ ও ভয়- ভীতি ঘিরে ফেলবে সেজন্য আক্ষেপ; যখন তাদের মধ্যে তরবারি রাখা হবে (তাদেরকে অস্ত্র- শস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হবে) তখন মহান আল্লাহ্ যতটুকু চাইবেন সেই পরিমাণ হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকবে... । এ সময়ই অনারব (ইরান) আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং বসরা দখল করে নেবে ।"[২১০]

একইভাবে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত মীর লৌহীর হাদীসটিও পূর্বোক্ত হাদীসটির সাথে সম্পর্কিত । ইমাম সাদিক বলেছেন : "অতঃপর আরব ও অনারব সেনাবাহিনীর সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিরোধ দেখা দেবে । আর আবু সুফিয়ানের এক বংশধরের হাতে নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে ।"[২১১]

تحرّك الحسني (তাহাররাকাল হাসানী বা হাসানী আ‌ে ালন করবেন এবং অগ্রসর হবেন)- এর রেওয়ায়েতটিও বর্ণিত হয়েছে । বিদ্যমান সাক্ষ্য- প্রমাণের ভিত্তিতে এ রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইরাকে থাকবেন এবং ক্ষমতা গ্রহণের পর নিহত হবেন ।

যে সব হাদীস থেকে ইরাকে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর বিপরীতে আরো কিছু রেওয়ায়েত বিদ্যমান যেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব পর্যন্ত ইরাকে স্বৈরাচারী জালিমদের সরকার অব্যাহত থাকবে ।

কারণ, এ প্রসঙ্গে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "কুফা মসজিদের পিছনে দেয়ালটি যা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত তা যখন ধ্বংস হবে তখন (অমুকের বংশের) শাসনকর্তৃত্বের অবসান হবে । আর এর পরই আল কায়েম আল মাহদী আবির্ভূত হবে ।"[২১২]

শেখ তূসীর 'গাইবাত' গ্রন্থে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি হচ্ছে 'প্রাচীর ধ্বংসকারী তা মেরামত করবে না' । এ রেওয়ায়েতের অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি মসজিদের দেয়াল বা প্রাচীর ধ্বংস করবে হয় সে নিহত হবে অথবা তা মেরামত ও পুনঃনির্মাণ করার আগেই সেখান থেকে চলে যাবে । অবশ্য মসজিদের প্রাচীর ধ্বংস করার ঘটনাটি কেবল সামরিক দিকসম্পন্নও হতে পারে । কারণ, যে

সব বিরোধী আন্দোলনকারী মসজিদে আশ্রয় নেবে ও অবস্থান করতে থাকবে তাদের আন্দোলন নিশ্চিহ্ন ও নস্যাৎ করে দেবার জন্য ঐ শহরের শাসনকর্তা তা ধ্বংস করবে।

কখনো কখনো কুফার মসজিদের পাশে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েত থেকেও এ অর্থটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আবু বসীর ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেছেন : "তোমাদের মসজিদের (কুফার মসজিদের) পাশে অমুকের সন্তানদের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট দিনে এক যুদ্ধের সূত্রপাত হবে। এ যুদ্ধে হাতির ফটক থেকে সাবানওয়ালাদের মহল্লা (কুফার একটি মহল্লা) পর্যন্ত চার হাজার লোক নিহত হবে।"[২১৩]

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "কোন এক শুক্রবারে জনগণকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাদের রাজত্ব ও শাসন ধ্বংস হবে না। মসজিদে ও সাবানওয়ালাদের মহল্লার মাঝখানে যেন আমি দেহচ্যুত মস্তকসমূহ দেখতে পাচ্ছি।"[২১৪]

ঠিক একইভাবে উপরিউক্ত হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থের খুব কাছাকাছি অর্থ সম্বলিত বেশ কিছু রেওয়ায়েত বিদ্যমান যেগুলোয় বিশেষ করে ইরাকে সুফিয়ানী কর্তৃক পরিচালিত সেনা অভিযানের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এ সব হাদীস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, (ইরাকে) যে দুর্বল সরকার যা শুধু অনৈসলামীই নয়; বরং ইসলাম ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরোধী হবে সেই সরকারের বিরুদ্ধে সুফিয়ানী যুদ্ধ করবে। সুফিয়ানীর অভিযান প্রসঙ্গে যে রেওয়ায়েতটি বিহার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছি সেই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "সেদিন জনগণের শাসনকর্তা হবে ভয়ানক অত্যাচারী, স্বৈরাচারী ও ভীষণ একগুঁয়ে যাকে ভবিষ্যদ্বক্তা ও যাদুকর বলে অভিহিত করা হবে।"[২১৫]

তবে এ সব রেওয়ায়েত সহীহ হলেও পূর্বোল্লিখিত যে সব রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের আগে ইরাকে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার বিষয়টি প্রতীয়মান হয় সে সব রেওয়ায়েতের সাথে এ সব রেওয়ায়েতের কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, এ সব রেওয়ায়েতে ঐ পর্যায়ের কথা ব্যক্ত হয়েছে যার সাথে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কোন সম্পর্ক আছে কি নেই তা জানা নেই অথবা তা তাঁর আবির্ভাবের সাথে সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত একটি পর্যায়ও হতে পারে। যাহোক, ইমাম

মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের বিজয় হওয়ার পর ইরাকে একটি ইসলামী সরকার ও শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে । যতদিন মহান আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন তা টিকে থাকবে । এ সরকারের মধ্যে বিচ্যুতি দেখা দিলে তা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে অথবা তাঁর আবির্ভাবের অল্প আগে অত্যাচারীদের হাতে চলে যাবে । আর একমাত্র মহান আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে ভালো জানেন ।

হাসান, শাহ্সাবানী ও আওফ সালামী

কতিপয় রেওয়ায়েতে হাসানী সংক্রান্ত বিবরণ এসেছে । তিনি ইরাকে তাঁর আ ালন শুরু করবেন । কিন্তু এ সব রেওয়ায়েতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন; কারণ, এগুলোয় তিন ব্যক্তির নাম মদীনার হাসানী, মক্কার হাসানী এবং ইরাকের হাসানীর নাম উল্লিখিত হয়েছে । একইভাবে খোরাসানী হুসাইনীর বিবরণ আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহে এসেছে এবং কতিপয় শিয়া হাদীস গ্রন্থে তাঁকে 'হাসানী' বলে অভিহিত করা হয়েছে । তিনিই ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সময় তাঁর সেনাদল নিয়ে ইরাকে প্রবেশ করবেন । অতএব, ইরাকে হাসানীর আ ালন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের কাঙ্ক্ষিত অর্থ উল্লিখিত হাসানীর আ ালনও হতে পারে । আবার তাঁর পূর্বে আরেক জন হাসানীও থাকতে পারেন ।

তবে শাইসাবানী সংক্রান্ত রেওয়ায়েত নুমানীর গাইবাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যা হাদীসশাস্ত্রের প্রথম সারির গ্রন্থসমূহের একটি । জাবির বিন আবদুল্লাহ্ আল জুফী থেকে বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেছেন : "ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : শাইসাবানী ভূমি ফেটে পানি বের হওয়ার মতো ইরাকে আবির্ভূত হওয়ার আগে তোমরা সুফিয়ানীর দেখা পাবে না । সে হঠাৎ আবির্ভূত হবে এবং বিদ্রোহ করবে । সে তোমাদের প্রতিনিধিদের হত্যা করবে এবং এ ঘটনার পর তোমরা সুফিয়ানীর অপেক্ষায় থাকবে । আর তখনই কায়েম আল মাহদীও আবির্ভূত হবে ও কিয়াম করবে ।"[২১৬]

আমি যদিও শাইসাবানী সংক্রান্ত আর কোন রেওয়ায়েত খুঁজে পাই নি তবুও এ হাদীসে এ ব্যক্তি সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় বিদ্যমান । যেমন :

১. সে শাইসাবানী বলে অভিহিত হয়েছে। কারণ, শাইসাবানের সাথে তার সম্পর্ক আছে। আর এটি হচ্ছে এমন এক উপাধি যা ইমামরা তাগুত ও দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিদেরকে প্রদান করতেন। যুবাইরীর অভিধানের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অনুসারে, শাইসাবান আসলে ইবলীসের একটি নাম এবং তা দ্বারা কখনো কখনো পুরুষ পিপীলিকাকে বোঝানো হয়ে থাকে।

২. সে যে সুফিয়ানীর আগে বের হবে তা হাদীসের এ অংশ 'তারপর তোমরা সুফিয়ানীর অপেক্ষায় থাকবে' থেকে বোঝা যায়। ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত এ হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায় যে, তার ও সুফিয়ানীর মাঝে তেমন ব্যবধান থাকবে না অর্থাৎ সুফিয়ানীর পরপরই সে আবির্ভূত হবে।

৩. তার আবির্ভূত হবার স্থান হচ্ছে ইরাক; আর এ স্থানকে 'কুফান'ও বলা হয়। অথবা তা কুফার কোন একটি স্থান হতে পারে। যাহোক, যেমনভাবে ভূমি ফেটে পানি বের হয় তেমনি তার আবির্ভাব, বিপ্লব ও সরকার প্রতিষ্ঠাও হবে আকস্মিক ও অনভিপ্রেত। সে হবে সীমা ল নকারী ও রক্তপাতকারী যে মুমিনদেরকে হত্যা করবে। আর 'সে তোমাদের প্রতিনিধিদেরকে হত্যা করবে'- ইমাম বাকির (আ.)- এর এ বাণীর বাহ্য অর্থ হচ্ছে সে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী মুমিনদেরকে হত্যা করবে যাঁরা সামনাসামনি নেতৃত্ব দেবেন এবং জন- প্রতিনিধি দলের শীর্ষে অবস্থান করবেন। নগরের প্রতিনিধিবৃ বলতে নগরের বড় বড় পদমর্যাদার অধিকারী মুমিনদেরকে বোঝানো হতে পারে। আবার গোত্র- প্রতিনিধি দল অথবা শহরের প্রতিনিধি দল বিশেষ পদমর্যাদার ব্যক্তিত্ব অর্থেও হতে পারে। অবশ্য এ অর্থেরও সম্ভাবনা আছে যে, যে দলসমূহ বাইতুল্লাহ্ (কাবাঘর) যিয়ারত করার জন্য যাবে তাদেরকে সে হত্যা করবে।

আমরা সুফিয়ানীর আ োলন ও ইরাকে তার সেনা অভিযানের পক্ষে অধিকতর গুরুত্বারোপ করে বলেছি যে, ইরাকে শাইসাবানীর শাসনকর্তৃত্ব সুফিয়ানীর আবির্ভাবের আগে এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ও তাদের অনুসারীদের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার পরপরই বাস্তবায়িত হবে। অবশ্য কতিপয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ইরাকের বর্তমান শাসক সাদ্দামের সাথে খাপ খায়। যেহেতু তার মধ্যেই এ সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সেহেতু সুফিয়ানী যদি

তার পরে শামে আবির্ভূত হয়, তাহলে দাবি করা যেতে পারে যে, সাদ্দামই হচ্ছে ইরাকের উক্ত শাইসাবানী যার কথা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ।

কিন্তু শেখ তূসী প্রণীত 'গাইবাত' নামক গ্রন্থে আওফ সালামী সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি হাদীসশাস্ত্রের প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাদির অন্তর্ভুক্ত । ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) থেকে হাযলাম ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেছেন : "আমি ইমাম যযনুল আবেদীন (আ.)- কে অনুরোধ করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের প্রক্রিয়াটি আমাকে বর্ণনা করে শুনান এবং তাঁর আবির্ভাবের দলিল ও নিদর্শনসমূহের সাথে আমাকে পরিচিত করান । তিনি তখন বলেছিলেন : তার আবির্ভাবের আগে জাযীরায় আওফ সালামী নামের এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে যার মাতৃভূমি তিকরীত এবং তার নিহত হবার স্থান হবে দামেশকের মসজিদ । তারপর সমরক থেকে শুআইব ইবনে সালিহ্ আবির্ভূত হবে । আর তখনই অভিশপ্ত সুফিয়ানী ওয়াদী ইয়াবিস (শুষ্ক উপত্যকা) এলাকা থেকে বের হবে । উল্লেখ্য যে, এই সুফিয়ানী আবু সুফিয়ানের ছেলে উতবার বংশধর হবে । তার আবির্ভাব ও উত্থানকালে মাহদী লুক্কায়িত থাকবে এবং এর পরপরই সে আবির্ভূত হবে ।"[২১৭]

অবশ্য এ ব্যক্তির ব্যাপারে (আওফ সালামী) আর কোন রেওয়ায়েত আমি খুঁজে পাই নি । তবে শুআইব ইবনে সালিহ্ সংক্রান্ত এ রেওয়ায়েতটির মূল ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সমরকে র অধিবাসী হবেন । আর এ বিষয়টি শিয়া হাদীস সূত্র ও গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রসিদ্ধ বিষয়সমূহের পরিপন্থী । শুআইব ইবনে সালিহ্ যে রাই শহরের অধিবাসী হবেন তা শিয়া হাদীস গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । তবে আমরা এও বলতে পারি যে, তাঁর পূর্বপুরুষ মূলত সমরকে র অধিবাসী, তবে তিনি রাই শহরেই বড় হবেন । আর একইভাবে আমরা সুফিয়ানীর আগে তাঁর আবির্ভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি ।

বাহ্যত আওফ সালামী সিরীয় সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, ইরাকের হুকুমতের বিরুদ্ধে নয় এবং সুফিয়ানীর অল্প আগে সে আবির্ভূত হবে । তবে যে জাযীরাহ্ এলাকা তার আ ালন ও বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হবে তা ইরাক- সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত । আর যখনই

‘জাযীরাহ্’ শব্দটি অন্য কোন শব্দের সাথে সম্বন্ধিত না হয়ে ব্যবহৃত হবে তখন এ শব্দ থেকে এতদর্থই বুঝে নিতে হবে যে, জাযীরাহ্ ইরাক- সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত একটি এলাকার নাম । আর ইতিহাস ও হাদীসশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহেও তা এভাবেই বর্ণিত হয়েছে । অবশ্য এ জাযীরাহ্ ‘জাযীরাহ্- ই রবীআহ্’ এবং ‘জাযীরাহ্- ই দিয়ার বাকর’ নামেও অভিহিত । অতএব, জাযীরাকে জাযীরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) অথবা অন্য কোন জাযীরাহ্ বলে গণ্য করা যাবে না । তবে জাযীরার সাথে এ শব্দটি সম্বন্ধিত করলে তা হবে ভিন্ন কথা । বাহ্যত ‘আর তার অবস্থান স্থল হবে তিকরীত’- এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তার আ ালন ও উত্থানের আগে এবং একইভাবে তার পরাজয় ও পলায়নের স্থল হবে তিকরীত, যা আধুনিক ইরাকের অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর । আর যা কিছু এ বিষয়টি সমর্থন করে তা হচ্ছে, তিকরীত তার আ ালন ও উত্থান স্থলের অদূরে অর্থাৎ জাযীরার কাছে অবস্থিত । কতিপয় হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে ‘তার অবস্থান স্থল হবে বিকরীত অথবা বাকভীত’- এ বাক্যটি তিকরীতের স্থলে ভুলক্রমে লেখা হয়েছে । আর আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থন করে বিহার ও শেখ তূসীর গাইবাত গ্রন্থে বর্ণিত রেওয়ায়েতে বিদ্যমান ‘তিকরীত’ শব্দটি । রেওয়ায়েতে এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে (আওফ সালামী) দামেশকের মসজিদে নিহত হবে অর্থাৎ সেখানে সে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হবে অথবা ঐ স্থানে ধৃত ও নিহত হবে । সুতরাং তার আবির্ভাবের বিষয়টি শামের ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত যা ইরাকের ঘটনাবলীর সাথেও সংশ্লিষ্ট ।

তৃতীয় পর্যায় : সুফিয়ানীর সেনাভিযান ও বসরার ধ্বংসসাধন

এতদপ্রসঙ্গে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোয় ইরাকে সুফিয়ানীর সেনাভিযান, সেদেশ দখল এবং সে দেশের জনগণ বিশেষ করে ইমাম মাহদী (আ.) ও আহলে বাইতের অনুসারীদের ওপর নির্যাতন ও অত্যাচারের কথা বর্ণিত হয়েছে যা আমরা সুফিয়ানীর আ ালন ও অভ্যুত্থান সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । তবে এ সব রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়ের ইরাক সরকার এতটা দুর্বল ও অপারগ হবে যে, তা নিজ সেনাবাহিনী এবং গণবাহিনীর

সাহায্য নিয়েও সুফিয়ানীর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না । আর এরপর ইরাক সরকার ইয়েমেনী ও ইরানী সেনাবাহিনীকে সেদেশে অনুপ্রবেশ করা থেকেও বিরত রাখতে পারবে না । উল্লেখ্য যে, ইয়েমেনী ও ইরানী বাহিনীসমূহ সুফিয়ানীর সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য ইরাকে প্রবেশ করবে । সুফিয়ানীর সেনাবাহিনী খুব সম্ভবত দুর্বল ইরাক সরকারের আহবানে সাড়া দিয়েই সেদেশে অনুপ্রবেশ করবে । দুজাইল, বাগদাদ ও ইরাকের অন্যান্য স্থানে সুফিয়ানী বাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত হবার কথা রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, সুফিয়ানী ইরাকে বিরোধী দলসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে ।

কিন্তু উক্ত রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহের অর্থ এটিই যে, ইরানী ও ইয়েমেনী সেনাবাহিনী ইরাক জাতির গণসমর্থন লাভ করবে এবং নির্যাতিত ইরাকী জনগণ হাসিমুখে ইরানী ও ইয়েমেনী সেনাবাহিনীকে বরণ করে নেবে । তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুফিয়ানী বাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন ও দমন করার জন্য ইরানী ও ইয়েমেনী বাহিনীকে সাহায্য করবে ।

বসরা ধ্বংস হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত রেওয়ায়তসমূহ তিন প্রকার । যথা- ১ । সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস, ২ । কৃষ্ণাঙ্গদের (যাংগীদের) বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মাধ্যমে ধ্বংস এবং ৩ । ভূমিধ্বস ও ভূ- গর্ভে দেবে যাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস ।

নাহজুল বালাগাহ্ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর খুতবাসমূহে বসরা ধ্বংসের যে কথা বলা হয়েছে তা হলো বসরা নগরীর প্রথম দু'টি ধবংস যা আব্বাসী খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছে । আর সকল ঐতিহাসিকও তা উল্লেখ করেছেন । হযরত আলীর বাণীসমূহের অপরাংশ হতে বোঝা যায় তৃতীয় বারের মতো বসরা ধ্বংস হবে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে এবং তা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের অন্যতম নিদর্শন ।

হযরত আলী (আ.) নাহজুল বালাগার একটি খুতবায় বসরাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : "তোমরা ঐ নারীর (আয়েশার) সৈনিক এবং ঐ জন্তুর (আয়েশার উষ্ট্রীর) সমর্থক । যখন ঐ পশুটা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করেছিল তখন তোমরা পলায়ন করেছ... তোমরা খুব তাড়াতাড়ি দুঃখভারাক্রান্ত হও এবং তোমাদের প্রতিজ্ঞা আসলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করারই প্রতিজ্ঞা । তোমাদের ধর্ম হলো নিফাক

(কপটতা) এবং তোমাদের পানীয়জল অত্যন্ত তিক্ত ও অব্যবহারযোগ্য । সে তোমাদের মাঝে এসে বসবাস করতে থাকবে সে এ নগরীর পাপাচারের দ্বারা আক্রান্ত হবে । আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে ত্যাগ করবে সে মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার মাঝে স্থান লাভ করবে । যেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের মসজিদ (বসরার মসজিদ) পানিতে ভাসমান জাহাজের বক্ষদেশের মত দাঁড়িয়ে আছে । মহান আল্লাহর আজাব ওপর ও নিচ থেকে এ নগরীর ওপর আপতিত হচ্ছে । আর যে কেউই এর ভেতরে অবস্থান করবে সে- ই নিমজ্জিত হবে ।[২১৮]

ইবনে আবীল হাদীদ এ খুতবায় আলী (আ.)- এর বাণীসমূহ সম্পর্কে বলেছেন : "আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বসরা নগরীর নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এ নগরীর জামে মসজিদ ব্যতীত বাকী সকল অংশ পানিতে নিমজ্জিত হবে । একদল ব্যক্তিকে দেখেছি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সংক্রান্ত বই- পুস্তকে যা লিপিবদ্ধ আছে সে সম্পর্কে এ মত পোষণ করে বলেছে তা এ অর্থকেই নির্দেশ করে যে, বসরা নগরী ও এর বাসি ারা যমীন ফেটে যে কালো পানি বের হবে তার দ্বারা নিমজ্জিত ও ধ্বংস হবে । আমার দৃষ্টিতে মনে হয় যা কিছু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা সংঘটিত হয়েছে । কারণ, বসরা দু'বার নিমজ্জিত হয়েছিল । আব্বাসী খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহর শাসনামলে জামে মসজিদ ব্যতীত সম্পূর্ণ অংশ নিমজ্জিত হয়েছিল । উল্লেখ্য যে, এ জামে মসজিদ পাখির বক্ষদেশের মতো পানির ওপর দৃশ্যমান ছিল । এ ছাড়া আর কিছুই সেখানে ছিল না । যেমনভাবে আলী (আ.) বসরা ধ্বংস হওয়ার ধরন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তদনুযায়ী পারস্য উপসাগর থেকে পানি আজ ফার্সী দ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ একটি অঞ্চল দিয়ে এবং সান্নাম নামের একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়ের দিক থেকে বসরা নগরীকে প্লাবিত করেছিল । এর ফলে শহরের ঘরবাড়ী এবং যারা সেখানে ছিল তাদের সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল । এভাবে সেখানে এক বিরাট সংখ্যক অধিবাসী ধ্বংস হয়ে যায় এবং নিমজ্জিত হবার এ দু'টি ঘটনার একটি বসরাবাসীদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বর্ণনা করে থাকে ।

কিন্তু যাঙ্গীদের (কৃষ্ণাঙ্গদের) বিদ্রোহের ফলে যে ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছিল তা আব্বাসীদের যুগে অর্থাৎ চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝিতে সংঘটিত হয়েছিল । আলী (আ.) বারবার এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন । যেমন তিনি একটি খুতবায় বলেছেন : "হে আহনাফ! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি একটি সেনাদল অগ্রসর হচ্ছে যাদের পদচারণায় না ধুলোবালি উড়ছে, না যোদ্ধাদের গুঞ্জন, না তাদের বাহক পশুদের লাগামের ঝনঝন শব্দ আর না তাদের অশ্বসমূহের হ্রেষাধ্বনি শোনা যাচ্ছে; উট পাখির পা ফেলার মতো পা ফেলে ফেলে তারা যমীনকে কর্ষিত ভূমির মতো করছে ।"[২১৯]

মরহুম সাইয়্যেদ রাযী বলেছেন, হযরত আলী (আ.) এ সব বাক্য ব্যবহার করে যাঙ্গীদের নেতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন । এরপর তিনি বলতে থাকেন : "তোমাদের আবাদকৃত সড়ক ও জনপদসমূহের জন্য আক্ষেপ এবং তোমাদের সু র সু র ঘরবাড়ির জন্য আক্ষেপ যেগুলোতে শকুনের ডানার মতো বারা া এবং তার খুঁটিগুলো হাতীর শুঁড়ের মতো হবে । সেগুলো ঐ সব ব্যক্তির হাতে ধ্বংস হবে যাদের নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ ও ক্র ন করা হবে না এবং যাদের অনুপস্থিত ব্যক্তিরা নিখোঁজ বলে গণ্য হবে না ।"

কিরমিতীর নেতৃত্বে যাঙ্গীদের বিদ্রোহ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধ ঘটনা বলে গণ্য । আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাদের যে সব অবস্থার বিবরণ প্রদান করেছেন সেগুলো তাদের সাথে হুবহু মিলে যায় । আর এ বিদ্রোহ আসলে খলীফাদের আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকা এবং দাস ও সাধারণ জনগণের সাথে তারা যে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিল তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সংঘটিত হয়েছিল । এ কারণেই তার সকল সৈন্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের অন্তর্ভুক্ত যাদের কোন সওয়ারী পশু ছিল না অর্থাৎ তারা সবাই ছিল পদাতিক ।

তবে বসরার যে ধ্বংসের ঘটনা ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন হবে তা অনেক রেওয়ায়েতেই বর্ণিত হয়েছে । বসরা ঐ সব নগরীর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো উল্টে দেয়া হবে । আর পবিত্র কোরআনেও এতৎসংক্রান্ত বিবরণ বিদ্যমান । অর্থাৎ যে সব শহর ভূ-গর্ভে প্রোথিত এবং মহান আল্লাহর আযাবের কারণে ধ্বংস হবে সেগুলোকেই মুতাফিকাহ্ (উল্টানো) বলা হয়েছে । এ

সব শহরের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বসরা যা তিনবার উল্টে দেয়া হয়েছে এবং চতুর্থ পর্যায় এখনও বাস্তবায়িত হয় নি ।

ইবনে মাইসাম বাহরানীর শারহু নাহজিল বালাগায় (নাহজুল বালাগার ব্যাখ্যাগ্রন্থ) বর্ণিত হয়েছে : যখন আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) উষ্ট্রের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একজন আহবানকারীকে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেন যে, জনগণ যেন আগামী তিন দিন জামায়াতের নামাযে উপস্থিত হয় এবং শরীয়তসঙ্গত কারণ ব্যতীত এ নির্দেশ অমান্য না করে । তারা যেন এমন কোন কাজ না করে যাতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে যায় । নির্দিষ্ট দিনে যখন সকলে জমায়েত হলো তখন আলী (আ.) জামে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামায়াতে ফজরের নামায আদায় করলেন । নামাযের পর তিনি কিবলা পেছনে রেখে মুসাল্লার ডান পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন এবং জনগণের উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন । তিনি যেভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত সেভাবে তাঁর প্রশংসা করলেন, মহানবী (সা.)- এর ওপর দরুদ প্রেরণ করলেন এবং সকল মুমিন নর- নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন । এরপর তিনি তাঁর বক্তব্য এভাবে শুরু করলেন : "হে বসরাবাসী! যে শহর তার নিজ অধিবাসীদেরকে এখন পর্যন্ত তিনবার মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে সেই শহরের অধিবাসী! মহান আল্লাহ্ চতুর্থ পর্যায়টিও বাস্তবায়িত ও পূর্ণ করবেন । হে নারীর (আয়েশা) সৈন্যরা এবং ঐ সওয়ারী পশুর (উষ্ট্রী) সমর্থকরা! তা যখন উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি তুলেছে তখনই তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ । আর যে সময় তা ধরাশায়ী হয়েছে তখন তোমরা পরাজিত হয়েছ (এবং পলায়ন করেছ); তোমরা খুব দ্রুত দুঃখভারাক্রান্ত হও; তোমাদের ধর্ম হচ্ছে কপটতা (নিফাক) এবং তোমাদের পানীয় জল তিক্ত ও ব্যবহারের অযোগ্য; তোমাদের শহরের মাটি মহান আল্লাহর শহরগুলোর মধ্যে নিকৃষ্ট গন্ধের অধিকারী এবং ঐশী দয়া ও করুণা হতে তা সবচেয়ে দূরে রয়েছে । এ শহরের প্রতি দশ জনের নয় জনই দুষ্টু প্রকৃতির এবং ধ্বংসা ক কর্ম সম্পাদনকারী; যে ব্যক্তি এ নগরীতে বসবাস করবে সে এ নগরীর পাপাচারের প্রভাবাধীন থাকবে । আর যে ব্যক্তি এ থেকে বের হয়ে যাবে সে মহান আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত হবে । যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের শহরকে পানি এমনভাবে ঢেকে

ফেলেছে যে, কেবল মসজিদের স্তম্ভ ব্যতীত আর কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না । মসজিদটি যেন একটি পাখির বক্ষের মতো সমুদ্রের মাঝখানে স্পষ্ট ভাসমান ও দৃশ্যমান ।” এই সময় আহনাফ ইবনে কাইস দাঁড়িয়ে আরজ করলেন : “হে আমীরুল মুমিনীন! এ ঘটনা কখন সংঘটিত হবে?” তিনি বললেন : “হে আবু বাহর! তুমি সেই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবে না; তোমার ও ঐ সময়ের মধ্যে বহু শতাব্দী ব্যবধান থাকবে । তবে তোমাদের মধ্যকার উপস্থিত ব্যক্তিরা যারা অনুপস্থিত আছে তাদেরকে এবং তারাও তাদের দীনী ভাইদেরকে জানাবে । কারণ, যখনই তারা দেখতে পারে যে, তাদের নলখাগড়ার ঝাঁড়সমূহ ঘরবাড়ি ও গগণচুম্বী অট্টালিকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে তখনই তোমরা সেখান থেকে পলায়ন করবে । সে দিন তোমাদের জন্য কোন বসরা- ই আর বিদ্যমান থাকবে না ।”

আলী (আ.) তাঁর ডান দিকে তাকিয়ে বললেন : “তোমাদের ও আবুল্লার মাঝখানে কতটুকু ব্যবধান আছে?” তখন মুনযির ইবনে জারুদ দাঁড়িয়ে বললেন : “আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, ব্যবধান চার ফারসাখের ।” তিনি বললেন : “ঐ খোদার শপথ যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে নবুওয়াতসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁকে সম্মান দিয়েছেন, তাঁর বিশেষ রিসালাতের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করেছেন এবং তাঁর পবিত্র আ াকে চিরস্থায়ী বেহেশতে স্থান দিয়েছেন । তোমরা যেভাবে আমার কাছ থেকে এখন শুনতে পাচ্ছ তেমনি আমিও তাঁকে বলতে শুনেছি : হে আলী! যে স্থানের নাম বসরা, সেই স্থান ও যে স্থানকে আবুল্লা বলা হয় সেই স্থানের মাঝখানে ব্যবধান হচ্ছে চার ফারসাখ । আর শীঘ্রই এ স্থান কর আদায়কারীদের আড্ডায় পরিণত হবে । সেখানে আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার ব্যক্তি শহীদ হবে যারা বদর যুদ্ধের শহীদদের সমমর্যাদার অধিকারী হবে ।”

মুনযির তখন বললেন : “হে আমীরুল মুমিনীন! আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক । কারা তাদেরকে হত্যা করবে?” তখন আলী (আ.) বললেন : “তারা শয়তানের ন্যায় কুৎসিত চেহারা ও উৎকট গন্ধযুক্ত ব্যক্তিদের (দাসদের) হাতে নিহত হবে । এ সব হত্যাকারী হবে খুবই লোভী কিন্তু তারা লুটপাট করে খুব সামান্যই লাভ করতে পারবে । ঐ সব লোকের

অবস্থা কতই না উত্তম! যারা এদের হাতে নিহত হবে । তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একদল লোক অগ্রগামী হবে যারা ঐ সময়ের দাম্ভিক প্রকৃতির ব্যক্তিদের কাছে হীন- নীচ বলে গণ্য; যদিও তারা পৃথিবীতে অখ্যাত কিন্তু ঊর্ধ্বজগতে তারা পরিচিত ও খ্যাতির অধিকারী । আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাদের জন্য ক্র ন করবে । অতঃপর মহানবী (সা.)- এর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং তিনি বললেন : হায় বসরা! তোমার জন্য আক্ষেপ ঐ সেনাদলের ধ্বংসযজ্ঞ করার কারণে, যাদের না শব্দ আছে আর না পথ চলার সময় তারা ধুলো- বালি উড়ায় ।"

মুনযির পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : "আপনি যে বললেন তা বেপরোয়া একদল লোকের দ্বারা সংঘটিত হবে এবং তারা বসরাবাসীদের ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটাবে সেটি কী?" তখন আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বললেন : "এ শব্দটির (ওয়া অর্থাৎ আক্ষেপ) দু'টি দিক আছে, যেগুলোর একটি করুণার দিক এবং অপরটি আযাবের দিক । হ্যাঁ, হে জারুদ তনয়! বড় বড় রক্তপাতকারী যাদের এক অংশ অপর অংশকে হত্যা করবে এবং এর মধ্যে আছে ঐ ফিতনা ও গোলযোগ যার ফলে মানুষের ঘরবাড়ি ও শহর ধ্বংস এবং সম্পদ লুটপাট করা হবে এবং ঐ সব নারীর বি ত্ব যাদের মস্তক অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় কর্তন করা হবে । হায় আফসোস! হায় আফসোস! তাদের কাহিনী কতই না আশ্চর্যজনক!"

ঐ সব নিদর্শনের অন্তর্গত হচ্ছে এক চোখা ভয়ঙ্কর দাজ্জাল যার ডান চোখ কানা এবং তার অপর চোখে রক্তমিশ্রিত চর্বিত মাংসের ন্যায় কিছু একটা থাকবে । তার চোখ হবে আঙ্গুরের বীচির মতো যা পানির ওপর ঘুরছে এবং যেন তা কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে । বসরার একদল অধিবাসী যাদের সংখ্যা আবুল্লার শহীদদের সমান এবং যাদের ইঞ্জিলসমূহ বহন করার উপযোগী কাপড়ের তৈরি বেল্ট আছে তারা তার অনুসরণ করবে । তাদের আক্রমণে একদল নিহত হবে এবং একদল পলায়ন করবে । এরপর ভূমিকম্প শুরু হবে, সব কিছু নিক্ষিপ্ত হবে, ভূমিধ্বস সংঘটিত হবে, চেহারাসমূহ পরিবর্তন হবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, অতঃপর মহাপ্লাবন হবে ।

হে মুনযির! বসরা নগরীর কথা যা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহেও বর্ণিত আছে তাতে বসরা ছাড়াও আরো তিনটি নাম রয়েছে। ঐ সব গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞাত আলেমরা ছাড়া আর কেউ সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। আর ঐ নাম তিনটি হলো : খারীবাহ্, তাদমুর এবং মুতাফাকাহ্।” অবশেষে তিনি বললেন : “হে বসরাবাসী! মহান আল্লাহ্ মুসলমানদের সব শহর ও নগরের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিদেরকে তোমাদের মাঝেই স্থান দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে অন্য সকলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, কিবলার দিক থেকে অন্য সকলের ওপর তোমরা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, কারণ, তোমাদের কিবলা মাকাম-ই ইবরাহীমের উল্টো দিকে অবস্থিত। আর তা এমন এক জায়গা যেখানে পবিত্র মক্কাস্থ জামায়াতের নামাযের ইমাম দাঁড়ান; তোমাদের কারীরা সর্বোত্তম কারী; তোমাদের পরহেজগাররা জনগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরহেজগার। তোমাদের ইবাদতকারীরা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী। তোমাদের ব্যবসায়ীরা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সত্যবাদী। তোমাদের দানশীলরা এ কারণে জনগণের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রিয়। তোমাদের ধনবানরা মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ও নম্র। তোমাদের যোগ্য ব্যক্তিরা সচ্চরিত্রের দিক থেকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তোমরা জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় দানকারী; যা তোমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তা নিয়ে তোমরা কষ্ট কর না; জামায়াতের নামাযে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে তোমাদের আগ্রহ অন্য সকলের চেয়ে বেশি। তোমাদের ফলগুলো সর্বোত্তম ফল। তোমাদের ধন-সম্পদ সবচেয়ে বেশি এবং তোমাদের সন্তানরা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সতর্ক, তোমাদের নারীরা সবচেয়ে সতী এবং সবচেয়ে পতিভক্ত। মহান আল্লাহ্ তোমাদের হাতের মুঠোয় পানি দিয়েছেন যা তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের জীবন ধারণের জন্য ব্যবহার করে থাক। তিনি সমুদ্রকে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির কারণ করে দিয়েছেন; যদি তোমরা ধৈর্যশীল ও দৃঢ়পদ হও তাহলে বেহেশতের তূবা বৃক্ষ তোমাদের ওপর ডাল-পালা মেলে ছায়া দেবে। তবে মহান আল্লাহর ইচ্ছা এমনই এবং তাঁর ফয়সালা বাস্তবায়িত হবেই; আর মহান আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী কোন কাজ করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির নেই। তিনিই তাঁর বা াদের দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

এমন কোন অঞ্চল নেই যার অধিবাসীদেরকে কিয়ামত দিবসের আগে ধ্বংস অথবা শাস্তি প্রদান করব না। (সূরা ইসরা : ১০) আর এ সত্য পবিত্র কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে।"

তিনি আরো বললেন : "একদিন মহানবী (সা.) একটি বিষয় সম্পর্কে আমাকে বললেন এবং আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি সেখানে তাঁর সাথে ছিল না। তিনি বলেছিলেন : রুহুল আমীন হযরত জিবরাইল (আ.) আমাকে তাঁর ডান কাঁধে বসিয়ে ভ্রমণ করতে নিয়ে গেলেন যাতে আমি যমীন (পৃথিবী) এবং এর ওপর যা কিছু আছে তা প্রত্যক্ষ করি। তিনি আমার কাছে যমীনের চাবি অর্পণ করলেন এবং ভূ- পৃষ্ঠে যা কিছু ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু থাকবে সব কিছু সম্পর্কে আমাকে অবগত করলেন। যেমনভাবে আমার পিতা আদম (আ.)- এর পক্ষে এ সব বিষয় জানা কঠিন ছিল না তেমনি এ সব বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়া এবং এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমার জন্য কঠিন হয় নি। হযরত আদমকে মহান আল্লাহ্ সব নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতারা সেগুলো জানত না। অতঃপর আমি সমুদ্রের তীরে একটি নগর যা 'বসরা' নামে পরিচিত তা দেখতে পেলাম। ঐ নগরটি আকাশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে দূরবর্তী এবং সমুদ্রের পানির সবচেয়ে নিকটবর্তী নগরী ছিল। ঐ অঞ্চলটি অন্য সকল অঞ্চল অপেক্ষা দ্রুত ধ্বংস হবে। এ শহরটির মাটি সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তা সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। এ শহরটি বিগত শতাব্দীগুলোতে কয়েক দফা ভূ- গর্ভে প্রোথিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। আবারও তা ধ্বংস হবে। হে বসরাবাসী! এ নগরীর আশে- পাশের গ্রামগুলোর জন্য আফসোস! যেদিন সেখানে (সমুদ্রের) পানি প্রবেশ করে প্লাবিত করবে সেদিনটি তোমাদের জন্য এক বিরাট বিপদের দিন বলে গণ্য হবে। আমি তোমাদের শহরের যে স্থান থেকে পানি ভূমি ফেটে ফোয়ারা আকারে বের হবে সে স্থানটি চিনি। এর আগে তোমাদের ওপর বেশ কতগুলো বড় ও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে যেগুলো তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আছে। তবে আমরা এগুলোর সাথে পরিচিত। যে ব্যক্তি এ নগরীর সমুদ্র- গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার সময় তা ত্যাগ করবে সে মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার মাঝে স্থান লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এ শহরে অবস্থান করবে সে

অপরাধ ও পাপের মধ্যে জড়িয়ে যাবে । আর মহান আল্লাহ্ তাঁর বা াদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করেন না ।”[২২০]

আমরা এ হাদীসের সাথে নাহজুস সাআদাহ্ গ্রন্থ এবং মুস্তাদরাক নাহজিল বালাগাহ্ গ্রন্থ থেকে একটি অনুচ্ছেদ যোগ করেছি । ইবনে কুতাইবাহ্ প্রণীত উয়ূন আখবারির রিযা নামক গ্রন্থ থেকে এ ভাষণের আরেকটি অনুচ্ছেদ হাসান বাসরীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে । অনুচ্ছেদটি নি রূপ : “মহানবী (সা.) থেকে আমি শুনেছি যে, বসরা নামক একটি অঞ্চল জয় করা হবে যা কিবলার দিক থেকে সবচেয়ে প্রামাণ্য ভূমি বলে গণ্য হবে । এ নগরীর কারীরা সর্বশ্রেষ্ঠ কারী, এ নগরীর ইবাদতকারীরা সর্বোত্তম ইবাদতকারী, এ নগরীর আলেমরা সবচেয়ে জ্ঞানী, এ নগরীর দানশীল ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী; এ নগরী থেকে আবুল্লা নামের অঞ্চলটির মধ্যকার দূরত্ব চার ফারসাখ । এ শহরের জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে চল্লিশ হাজার ব্যক্তিকে শহীদ করা হবে । তাদের শহীদরা আমার সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদদের মতো হবে ।”

ঐতিহাসিক সূত্র ও গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, ভবিতব্য বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর খুতবাহ্ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । তবে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় ।

যে দু’টি রেওয়ায়েত এখানে আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলোয় কেবল ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়া এবং পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে বসরা নগরীর ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে । আর এটি হবে এমন এক ঘটনা যা পূর্ববর্তী দু’টি পর্যায়ে অর্থাৎ বসরা নিমজ্জিত হওয়া ও যাঙ্গীদের বিদ্রোহের সময় সংঘটিত হয়নি । আর বাহ্যত এটিই হচ্ছে বসরা নগরীর ঐ ভূমিধ্বস এবং ধ্বংসের ঘটনা যা ইমামদের রেওয়ায়েতসমূহে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে । সম্ভবত এ ঘটনাটি সুফিয়ানী কর্তৃক ইরাক দখল হওয়ার আগে সে দেশটির অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কালো পতাকাবাহী (ইরানী) সেনাবাহিনীর যুদ্ধ চলাকালে অথবা সুফিয়ানী কর্তৃক ইরাক দখল হওয়ার পর সংঘটিত হবে । আর যেভাবে এ

রেওয়ায়েতদ্বয়ে বসরার শহীদদের সংখ্যা (সত্তর অথবা চল্লিশ হাজার), বদর যুদ্ধের শহীদদের মতো তাঁদের মর্যাদা এবং তাঁদের জন্য আলী (আ.)- এর অশ্রুপাত বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সেভাবে আরেকটি রেওয়ায়েতেও বসরার শহীদদের জন্য মহানবীর অশ্রুপাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে । প্রথম রেওয়ায়েতে তাঁদের শাহাদাতের স্থানটি বসরা ও আবুল্লার মাঝখানে বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা আজ রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে অবস্থিত বসরার একটি মহল্লা । অথচ ইবনে কুতাইবার রেওয়ায়েতে তাঁদের শাহাদাতবরণের স্থান জামে মসজিদের পাশে বলে উল্লিখিত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, জামে মসজিদের অর্থ হচ্ছে বসরার মসজিদ ।

সুতরাং নিরুপায় হয়ে বলতেই হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগেই অবশ্য তাদের শাহাদাতবরণের ঘটনা সংঘটিত হবে । কারণ, তাঁর আবির্ভাবের পর এমন কোন অত্যাচারী থাকবে না যাদের দ্বারা শহীদরা হীন ও অপদস্থ হতে পারে । আর রেওয়ায়েত থেকেও এমনই প্রতীয়মান হয় । তবে তাঁদের শাহাদতবরণের সময়কাল নির্দিষ্ট করা সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত বিদ্যমান নেই । আর একইভাবে রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি যে, তাঁরা কাদের হাতে নিহত হবেন এবং সম্ভবত হাদীসটিতে ‘ভাইয়েরা- সমর্থকরা’ শব্দ দু’টি ভুলক্রমে অন্য শব্দের স্থলে লেখা হয়েছে ।

যে দাজ্জালের কথা বলা হয়েছে তার আগমন তাদের পরে হবে । সত্তর হাজারের অধিক ইঞ্জিলের অনুসারী খ্রিস্টান তার সমর্থক হবে । তবে এ দাজ্জাল প্রতিশ্রুত যে দাজ্জাল ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের পর আবির্ভূত হবে সে নাও হতে পারে । কারণ, ইবনে কুতাইবার রেওয়ায়েতটিতে কেবল আবুল্লার শহীদদের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং তাতে দাজ্জালের নাম উল্লেখ করা হয় নি । অপরদিকে, ইবনে মাইসাম এ রেওয়ায়েতের সূত্র উল্লেখ করেন নি । ফলে এ রেওয়ায়েত সম্পর্কে আরো গবেষণা করা প্রয়োজন । আর মহান আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে কেবল জ্ঞাত আছেন ।

جاء فرعون و من قبله و المؤتفكات بالخاطئة

আর ফিরআউন এবং তার পূর্বে যারা ছিল তারা এবং পাপের কারণে ওলট- পালট করে দেয়া নগরসমূহ পাপাচারে লিপ্ত ছিল’ ।[২২১] - এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে নুরুস সাকালাইনে বর্ণিত হয়েছে যে, ওলট- পালট করে দেয়া নগরসমূহ বলতে বসরাকে বোঝানো হয়েছে । আর একইভাবে ওলট- পালট করা ভূমিসমূহকে ভূ- গর্ভে তিনি প্রোথিত করবেন (সূরা নাজম : ৫৩)- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ওলট- পালটকৃত ভূমি বা শহরসমূহ বলতে বসরার অধিবাসীদের সহ স্বয়ং এ নগরীকে বোঝানো হয়েছে যা ইতোমধ্যে ওলট- পালট করা হয়েছে । ‘আর ইবরাহীমের অনুসারীরা, মাদায়েনের অধিবাসীরা (হযরত শুআইবের অনুসারীদের নগরী হচ্ছে মাদায়েন) এবং ওটল- পালটকৃত নগরীসমূহ’ । (সূরা তাওবাহ্ : ৭০)- মহান আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা লুতের সম্প্রদায় এবং তাদের নগরী ওলট- পালট করে ধ্বংস করা হয়েছে ।
মান লা ইয়াহদারুহুল ফাকীহ্ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে জুওয়াইরিয়াহ্ ইবনে মুসহির আবদী থেকে একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেছেন : “আমরা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর সাথে খারেজীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম । (পথিমধ্যে) আসর নামাযের সময় হলে বাবিলে (ব্যাবিলনে) পৌঁছলাম । আলী (আ.) জনগণের সাথে যাত্রাবিরতি করলেন । অতঃপর তিনি জনগণের দিকে তাকিয়ে বললেন : হে লোকসকল! এটি একটি অভিশপ্ত ভূ- খণ্ড এবং এ পর্যন্ত তিনবার (আরেকটি রেওয়ায়েতে দু’বার) এখানে মহান আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে । আর বর্তমানে এ অঞ্চল ঐশী শাস্তির তৃতীয় পর্যায় বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান । আর এ ভূ- খণ্ড ঐ সব ভূ- খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো ওলট- পালট করা হয়েছে ।”

চতুর্থ পর্যায় : হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক ইরাক মুক্তকরণ

ইমাম মাহদী (আ.)- এর ইরাক আগমন, সুফিয়ানী বাহিনীর অবশিষ্টাংশ এবং বিভিন্ন খারেজী দল- উপদলের হাত থেকে সেদেশ মুক্তকরণ এবং সেদেশকে তাঁর প্রশাসন ও সরকারের রাজধানী ও কেন্দ্রস্থল নির্বাচিত করার ব্যাপারে অগণিত হাদীস বিদ্যমান ।

ইমাম মাহদী (আ.)এর ইরাক আগমনের সুনির্দিষ্ট সময় সংক্রান্ত কোন বিষয় আমাদের হস্তগত হয় নি । তবে তাঁর আবির্ভাব আে ালনের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হবে যে, আবির্ভাব ও হিজায মুক্ত করার কয়েক মাস পরে আহ্ওয়াযের অদূরে ইস্তাখরের বাইদা অঞ্চলে (কুহে সেফীদ) বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে তাঁর সঙ্গী- সাথীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হবে । এ যুদ্ধে সুফিয়ানী বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করবে । অতঃপর ইমাম মাহদী আকাশ পথে এক স্কোয়ার্ড্রন বিমান সহযোগে ইরাকে প্রবেশ করবেন । কারণ, 'হে জিন ও মানব জাতি! যদি তোমরা আকাশ ও স্থল পথে দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হও তাহলে অতিক্রম করো তো দেখি । তবে মহান আল্লাহর শক্তি ও আধিপত্য ব্যতীত তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না' (সূরা রাহমান : ৩২)- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাকির (আ.)- এর হাদীস থেকে উপরিউক্ত বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যায় । তিনি বলেছেন : "আল কায়েম আল মাহদী ভূমিকম্পের দিবসে আলোর হাওদা সহকারে এমনভাবে ভূমিতে অবতরণ করবে যে, কোন ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম হবে না যে, সে হাওদাসমূহের কোনটিতে আছে । অবশেষে সে কুফা নগরীতে অবতরণ করবে ।"

যদি এ রেওয়ায়েতটি সহীহ হয়ে থাকে তাহলে মুজিযাগত দিক ছাড়াও এ রেওয়ায়েত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদীর জীবন রক্ষা করার জন্য এ ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ও সতর্কতা গ্রহণ করা তখন অপরিহার্য হয়ে যাবে ।

তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশ বজায় থাকার পাশাপাশি ইরাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন যতটা হওয়া উচিত ততটা শত্রুমুক্ত থাকবে না । 'অবতরণ করবে' এবং 'অবশেষে সে কুফায় অবতরণ করবে'- এ বাক্যদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সরাসরি কুফা বা নাজাফে প্রবেশ করবেন না; বরং কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি প্রথমে (ইরাকের) রাজধানীতে অথবা কোন এক সামরিক ঘাঁটিতে অথবা কারবালায় অবতরণ করবেন ।

রেওয়ায়েতসমূহে ইরাকে তাঁর কর্মতৎপরতা ও মুজিযাসমূহের এক বিরাট অংশের বিবরণ এসেছে। এতদপ্রসঙ্গে আমরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আে ালন সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এ অধ্যায়ে যে সব বিষয় ইরাকের সার্বিক পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট

সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করব । এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইরাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুকূলে আনা এবং বিরাট সংখ্যক বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করা । কারণ, রেওয়ায়েতসমূহে এমনটিই বণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) ঐ সময় কুফায় (ইরাকে) প্রবেশ করবেন যখন সেখানে তিনটি দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব- সংঘাত চলতে থাকবে । বাহ্যত এ দলসমূহের প্রথম দলটি হবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সমর্থক, দ্বিতীয়টি হবে সুফিয়ানীর অনুসারী এবং তৃতীয়টি বিদ্রোহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট । ইমাম বাকির (আ.) থেকে আমর ইবনে শিমর বর্ণনা করেছেন : "ইমাম বাকির (আ.) মাহদী (আ.)- কে স্মরণ করলেন, অতঃপর বললেন : সে যখন কুফায় প্রবেশ করবে তখন তিনটি পতাকাবাহী দল কুফাকে অশান্ত ও গোলযোগপূর্ণ করে রাখবে । আর কুফায় মাহদীর প্রবেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং কুফা ইমামকে বরণ করার জন্য পূর্ণরূপে উপযোগী হবার পরপরই সে সেখানে প্রবেশ করবে এবং মিম্বারে আরোহণ করে এমনভাবে বক্তৃতা করবে যে, এতে জনগণ তীব্রভাবে ক্র ন করবে এবং এ কারণে তারা তার কোন কথাই শুনতে পারবে না ।"[২২২]

এ হাদীস এবং এতাদৃশ্য অন্যান্য হাদীসে 'কুফা' বলতে সমগ্র ইরাককে বোঝানো হয়েছে । সুতরাং ইরাকে পতাকাবাহী তিন দলের অস্তিত্ব, যে রেওয়ায়েতসমূহে সুফিয়ানীর পরাজিত হবার পর ইরাকে ইরানীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর পরিপন্থী নয় । যেমন পরবর্তী মুস্তাফীদ রেওয়ায়েতটি যা শিয়া- সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ও ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে ।

ইমাম বাকির বলেছেন : "কালো পতাকাসমূহ খোরাসান থেকে কুফায় অবতরণ করবে এবং যখন মাহদী আবির্ভূত হবে তখন তারা তার হাতে বাইআত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ (নবায়ন) করার জন্য তার কাছে উপস্থিত হবে ।"[২২৩]

সুতরাং ইরাকে সামরিক প্রাধান্য ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানী সেনাবাহিনীর হাতেই থাকবে । তবে ইরাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও জনগণ ইতোমধ্যে আমরা যা উল্লেখ করেছি তদনুযায়ী ইরাকে বিদ্যমান তিন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের টানাপড়েন ও দ্বন্দ্বের শিকার হবে ।

যে সব রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে শত্রু মনোভাবাপন্ন দল ও বিদ্রোহী দলগুলো ধ্বংস ও বিলুপ্ত হবে সে সব রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিরোধী আন্দোলনসমূহ সংখ্যায় অনেক হবে । এগুলো হতে পারে খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা সুফিয়ানী সমর্থক অথবা অন্যান্য বিরোধী গোষ্ঠীভুক্ত ।

ইমাম মাহদী তাঁর প্রপিতামহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে যে অঙ্গীকার লাভ করেছেন তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করার জন্য কঠোরতা প্রদর্শন করবেন এবং যে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবে তাকেই তিনি হত্যা করবেন । ইমাম বাকির (আ.) থেকে এতদপ্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে : "নিজ উম্মতের সাথে মহানবী (সা.)- এর আচরণ ছিল কোমল; তিনি জনগণের সাথে নম্র ব্যবহার করতেন, তাদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল দয়ার্দ্র; কিন্তু কায়েমের (আল মাহদী) নীতি হবে বিরোধী এবং অনিষ্টকামীদের হত্যা; মহানবী (সা.) থেকে এ ব্যাপারে যে লিখিত সনদ তার সাথে আছে সেই লিখিত সনদ বলে তার ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে । সে এভাবে সামনে এগিয়ে যাবে এবং কাউকে তওবা করতে বলবে না । ঐ ব্যক্তির জন্য আফসোস যে তার আদেশ অমান্য করবে ।"[২২৪]

যে সনদটি তাঁর সাথে আছে তা হচ্ছে এমন এক অঙ্গীকার পত্র যা তাঁর প্রপিতামহ মহানবী (সা.)- এর কণ্ঠে এবং হযরত আলী (আ.)- এর হাতে লিখিত । এ সনদে উল্লিখিত হয়েছে : "তাদেরকে হত্যা কর; আবারও হত্যা কর এবং কাউকে তওবা করতে বলো না ।"

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত : "আমাদের কায়েম (আল মাহদী) নতুন দায়িত্ব ও নতুন বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আবির্ভূত হবে এবং বিপ্লব করবে । আরবদের সাথে সে কঠোর আচরণ করবে এবং তরবারি ব্যতীত তার আর কোন কাজ নেই । সে কাউকে তওবা করতে বলবে না এবং মহান আল্লাহর পথে সে কোন ভর্ৎসনা ও তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়াও করবে না ।"[২২৫]

নতুন বিষয় যা উপরিউক্ত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ হচ্ছে ঐ ইসলাম ধর্ম যা অত্যাচারীদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং মুসলমানরাও যা থেকে দূরে সরে গেছে । ইসলাম ধর্ম ও পবিত্র কোরআন তাঁর মাধ্যমে পুনর্জীবন লাভ করবে; আর এ বিষয়টি যে সব আরব তাদের বিদ্রোহী তাগুতী শাসকশ্রেণীর আনুগত্য করে এসেছে তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে । এ

কারণেই তারা ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে ।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত : “কায়েম (আল মাহদী) সংগ্রাম ও যুদ্ধ চলাকালে এমন সব সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হবে মহানবীও যেগুলোর মোকাবিলা করেন নি । যখন মাহনবী (সা.) মানবমণ্ডলীর কাছে প্রেরিত হলেন তখন তারা খোঁদাইকৃত পাথর ও কাঠের প্রতিমা উপাসনা করত; তবে কায়েম আল মাহদীর যুগে জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং তারা মহান আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা ও এর মনগড়া তাফসীর করবে । আর এর বশবর্তী হয়েই তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ।”[২২৬]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাদের অসৎ ও দরবারী আলেমরা এবং লম্পট শাসকশ্রেণী কিভাবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের প্রশাসন ও সরকারের সাথে শত্রুতাকে বৈধতা দানের জন্য মহান আল্লাহর আয়াতসমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা দেবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে ।

কতিপয় রেওয়ায়েতের ভাষ্য অনুসারে মাহদী (আ.)- এর প্রচণ্ড আক্রমণ মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে যারা ইসলামের লেবাসে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবে । এমনকি তাদের কতিপয় ব্যক্তি নিজেদেরকে মাহদী (আ.)- এর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী- সাথীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার চেষ্টা চালাবে । কিন্তু তিনি ঐ নূর (আলো) ও হিকমাত (প্রজ্ঞা) যা মহান আল্লাহ্ তাঁর হৃদয়ে দান করেছেন তা দিয়ে তিনি তাদেরকে শনাক্ত করবেন ।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : যখন ঐ লোকটি কায়েম আল মাহদীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ- নিষেধ করতে থাকবে তখন মাহদী আদেশ দিয়ে বলবে যে, তাকে এ কাজ হতে বিরত কর । অতঃপর মাহদী ঐ লোকটির মস্তক কর্তন করার আদেশ দেবে । আর ঐ সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে (কাফের ও মুনাফিকদের) অন্তঃকরণসমূহে মাহদীর ভয় ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না ।”[২২৭]

কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কখনো কখনো শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার অভিযান প্রক্রিয়া এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যে, তিনি বিরোধী একদলকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "যে সময় কায়েম আল মাহ্দী কিয়াম করবে তখন সে কুফার দিকে অগ্রসর হবে। প্রায় বারো হাজার লোকের সমন্বয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী যাদেরকে 'বাতারীয়াহ্' বলে অভিহিত করা হবে তারা শহর থেকে বের হয়ে মাহ্দীর (কুফা আগমনের) পথ রুদ্ধ করে দেবে এবং তাকে বলবে : আপনি যে পথে এসেছেন সে পথেই ফিরে যান। ফাতেমার বংশধরদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর সে তার তরবারির কোষ উন্মুক্ত করবে এবং তাদের একজনকেও জীবিত রাখবে না। অতঃপর সে কুফায় প্রবেশ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানসমূহ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সে সেখানকার স হপোষণকারী সকল মুনাফিককে হত্যা করবে।"[২২৮]

পরবর্তী হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সত্তর জন অসৎ আলেমকে হত্যা করবেন। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ ও তাদের সমর্থকরা কুফায় বিশৃঙ্খলা ও শিয়াদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। মালিক বিন দামারা আলী (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : "হে মালিক ইবনে দামারা! এ বিষয়টি কেমন হবে যখন শিয়ারা পরস্পর বিভেদ করবে? অতঃপর তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোকে জালের ন্যায় একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করালেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন! ঐ সময় কোন্ কোন্ কল্যাণকর বিষয় বাস্তবায়িত হবে? তখন তিনি বললেন : ঐ যুগেই রয়েছে সকল কল্যাণ। হে মালিক! ঐ সময়ই আমাদের কায়েম আল মাহ্দী কিয়াম করবে এবং প্রায় সত্তর ব্যক্তি যারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যা বলবে তাদেরকে সে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে। অতঃপর মহান আল্লাহ্ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।"[২২৯]

পরবর্তী রেওয়ায়েতটিতে হিজায অঞ্চলে সকল সৈন্য ভূমিধ্বসে ধ্বংস হওয়া এবং ইরাকে পরাজয় বরণ করার নিদর্শন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেখানে সুফিয়ানীর সেনাবাহিনীর অবস্থান করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে ।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "অতঃপর সে অগ্রসর হবে; অবশেষে সে কাদিসিয়ায় পৌঁছবে, অথচ ঐ সময় জনগণ কুফায় সমবেত হয়ে সুফিয়ানীর হাতে বাইআত করবে ।"[২৩০]

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "অতঃপর সে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং সেখানে অবতরণ করবে । সেখানে সে সত্তরটি আরব গোত্রের রক্তপাত বৈধ বলে গণ্য করবে।"[২৩১] অর্থাৎ এ সব গোত্রের মধ্য থেকে যে সব ব্যক্তি ইমাম মাহদী (আ.)- এর শত্রু ও বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেবে তাদের রক্তকে মূল্যহীন (বৈধ) বলে গণ্য করবে ।"

ইবনে আবি ইয়াফুর ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেছেন : "সে আমাদের আহলে বাইতের মধ্যে প্রথম কায়েম (উত্থানকারী) হবে । সে তোমাদের সাথে এমন কথা বলবে যা তোমরা সহ্য করতে পারবে না এবং রুমাইলা- ই দাসকারায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে ও যুদ্ধে লিপ্ত হবে । সেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের সবাইকে হত্যা করবে । আর এটিই হবে সর্বশেষ বিদ্রোহী দল ।"[২৩২]

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "যখন এ নির্দেশের অধিপতি (ইমাম মাহদী) কতিপয় বিধান ও সুন্নাহ্ পালন করার আদেশ দেবে এবং এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখবে তখন একদল লোক মসজিদ থেকে বের হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে । সে তখন তার সাথীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেবে এবং তারা তার নির্দেশ পেয়ে বিদ্রোহীদের দিকে অগ্রসর হবে এবং কুফার খেজুর বিক্রেতাদের মহল্লায় তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে । তারা তাদেরকে ব ী করবে; তখন তারা মাহদীর নির্দেশে তাদেরকে হত্যা করবে । আর এটিই হবে সর্বশেষ দল যারা কায়েমে আলে মুহাম্মদ (ইমাম মাহদী)- এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে ।"[২৩৩]

এ দু'রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রুমাইলা- ই দাসকারার খারেজীরা হবে সর্বশেষ সশস্ত্র গোষ্ঠী যারা ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং কুফার মসজিদের খারেজীরা হবে সর্বশেষ দল যারা ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করবে । আর রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রুমাইলা- ই দাসকারার খারেজীরা হবে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গোষ্ঠী । এ গোষ্ঠীর দলপতি হবে ফিরআউন ও ইবলীসের সমকক্ষ ।

আবু বাসীর থেকে বর্ণিত : "রুমাইলা- ই দাসকারায় অনারব বিদ্রোহীরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পর্যন্ত তিনি অল্প সময়ের জন্য কুফায় অবস্থান করবেন । রুমাইলা- ই দাসকারার বিদ্রোহীদের সংখ্যা হবে দশ হাজার এবং তাদের শ্লোগান হবে : 'হে ওসমান! হে ওসমান!' তখন ইমাম মাহদী আজমের (অনারব) এক ব্যক্তিকে ডেকে তার হাতে তরবারি অর্পণ করে তাঁকে ঐ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দিকে প্রেরণ করবেন । ঐ অনারব ব্যক্তি তাদের সকলকে এমনভাবে হত্যা করবেন যে, তাদের মধ্য থেকে একজনকেও জীবিত রাখবেন না ।"[২৩৪]

পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতে রুমাইলা- ই দাসকারাহ্ স্থানটিকে রাজকীয় দাসকারাহ্ (রাজা- বাদশাদের বসবাস ও আমোদ- প্রমোদ করার অট্টালিকা) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে । আর মুজামুল বুলদান নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, রুমাইলা- ই দাসকারাহ্ আবান শহরের অদূরে ইরাকে দিয়ালা প্রদেশের বাকুবার অন্তর্গত একটি গ্রাম ।

তবে রেওয়ায়েতে এ সব ব্যক্তি অনারব বিদ্রোহী গোষ্ঠী বলে উল্লিখিত হয়েছে এ কারণে যে, তারা আরব নয় অথবা তাদের নেতা হবে অনারব ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে আরেক ধরনের বড় শুদ্ধি অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি বারো হাজার আরব- অনারব সৈন্যকে ডেকে তাদের সবাইকে বিশেষ ধরনের পোশাক পড়াবেন । অতঃপর তিনি সবাইকে শহরের ভিতর প্রবেশ করে যারা ঐ ধরনের পোশাক পরিহিত থাকবে না তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেবেন । আর তারাও তাঁর নির্দেশ পালন করবে ।

মনে হচ্ছে যে, এ ধরনের শহর অবশ্যই ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিরোধী মুনাফিক ও কাফিরদের দ্বারা পূর্ণ থাকবে । আর এ কারণেই তিনি ঐ শহরের অধিবাসীদেরকে হত্যা করার জন্য এ ধরনের আদেশ দেবেন অথবা শহরের মধ্যে যে সব মুমিন ব্যক্তি বসবাস করছে তাদেরকে তিনি আগেই কোন একভাবে জানাবেন যে, যখন সেখানে আক্রমণ চালানো হবে তখন যেন তারা বাড়ি- ঘর থেকে বের না হয় অথবা তাদের নিরাপদ থাকার জন্য তিনি তাদের কাছে সেনাবাহিনীর বিশেষ পোশাক প্রেরণ করবেন ।

অবশ্য এ ধরনের ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান ইরাকসহ সমগ্র বিশ্বে ভীতি ও সে হের সৃষ্টি করবে । কারণ, কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন বিশ্ববাসী ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক শত্রুদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা বলতে থাকবে, এ ব্যক্তি ফাতিমা (আ.)- এর বংশধর নয় । সে যদি প্রকৃতই হযরত ফাতিমার বংশধর হতো তাহলে সে জনগণের প্রতি দয়া করত । বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক শত্রুদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করার কারণে তাঁর কতিপয় বিশেষ সাহাবী স হান হয়ে পড়বে । অবস্থা এতদূর গড়াবে যে, তাদের একজন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে এবং ইমাম মাহদীর কাছে প্রতিবাদও করে বসবে ।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত আছে : "মাহদী আল কায়েম বের হয়ে বাজারে পৌঁছবে । তার পিতার বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি তাকে বলবে : আপনি জনগণকে দুম্বার পালের মতো ভয় দেখাচ্ছেন... এ ব্যাপারে মহানবী (সা.)- এর কাছ থেকে আপনার কি কোন অঙ্গীকারপত্র বা অন্য কোন প্রমাণ আছে?" ইমাম সাদিক বলেন : "জনগণের মাঝে ঐ ব্যক্তির চেয়ে সাহসী কেউ থাকবে না । ঐ সময় একজন অনারব তার উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে বলবে : চুপ কর! নইলে গর্দান উড়িয়ে দেব । আর তখন আল কায়েম মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারপত্রটি বের করে (জনসমক্ষে) প্রদর্শন করবে ।"[২৩৫]

'তার পিতার বংশোদ্ভূত'- এ বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, ঐ প্রতিবাদকারী ব্যক্তি আলী (আ.)- এর বংশোদ্ভূত হবে । 'বাজারে পৌঁছবে'- এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তিনি এমন এক স্থানে পৌঁছবেন

যার নাম سوق অর্থাৎ 'বাজার' হবে । আর এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, ইমাম মাহদী (আ.) বিরোধীদের হত্যা করতে করতে বাজারের কতিপয় ব্যবসায়ীকেও হত্যা করবেন । আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে চুপ থাকতে বলবে সে ইরানী হবে এবং সে জনগণ থেকে ইমাম মাহদীর আনুগত্যের শপথ আদায় করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে ।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত আছে : "যখন সে সালাবীয়াহ্ (হিজাযের দিক থেকে ইরাকের একটি স্থানের নাম) পৌঁছবে তখন তার পিতার বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি যে এ নির্দেশের অধিপতি মাহদী ব্যতীত অন্য সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও সাহসী হবে, সে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে : হে অমুক! আপনি এ কী করছেন? যে ইরানী ব্যক্তি বাইআত গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে সে তখন ঐ ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে বলবে : মহান আল্লাহর শপথ, চুপ কর নইলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব । তখন কায়েম আল মাহদী তাকে (প্রতিবাদকারীকে) বলবে : হে অমুক! চুপ কর । হ্যাঁ, মহান আল্লাহর শপথ, মহানবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি অঙ্গীকারপত্র আছে । অতঃপর সে একটি বাক্স অথবা একটি বিশেষ ধরনের ছোট সিন্দুক আনার আদেশ দেবে এবং (তা আনা হলে তা থেকে) মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারপত্রটি (বের করে) তাকে পাঠ করে শুনাবে । ঐ সময় উক্ত প্রতিবাদকারী বলবে : আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক । আপনার মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিন যাতে আমি চুম্বন করতে পারি । মাহদী তার আহবানে সাড়া দেবে এবং সে তার দু'চোখের মাঝখানে চুম্বন করবে । এরপর সে বলবে : আপনার জন্য আমি উৎসর্গীকৃত হই । আমাদের কাছ থেকে নতুনভাবে বাইআত গ্রহণ করুন এবং মাহদীও তাদের হতে আবার বাইআত গ্রহণ করবে ।"[২৩৬]

সংক্ষিপ্ত এ বিবরণের দ্বারা যে সব ব্যক্তিকে ইমাম মাহদী (আ.) হত্যা করবেন তাদের ব্যাপারে বাহ্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের অনেকেই শিয়া অথবা সুন্নী অথবা সুফিয়ানীর সমর্থক এবং ইমামের বিরুদ্ধাচরণকারী হবে, যেমন অসৎ আলেম, বিভিন্ন দল, উপদল ও গোষ্ঠী এবং সমাজের কতিপয় শ্রেণী । আর তাদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চরদের দল থাকা একান্ত স্বাভাবিক ।

তবে এ সব ঘটনার পর ইরাক ইমাম মাহদী (আ.)- এর সরকার ও প্রশাসনের ছায়াতলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে এবং তাঁর বিশ্ব সরকারের রাজধানী ও কেন্দ্র হিসাবে তা নবজীবন লাভ করবে । ইরাক এ সময় বিশ্ব মুসলিম উম্মার হৃদয়ের কিবলা ও নয়নের মধ্যমণিতে পরিণত হবে এবং তা তাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদের চূড়ান্ত গন্তব্য হবে ।

ঐ সময কুফা, সাহলা, হীরা, নাজাফ ও কারবালা একই শহরের বিভিন্ন উপশহর বা মহল্লায় পরিণত হবে । আর এ নগরীর নাম তখন বিশ্ববাসীর মনে গেঁথে যাবে এবং সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকবে । বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ থেকে মানুষ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ নগরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে যাতে শুক্রবার দিবসে ইমাম মাহদী (আ.)- এর ইমামতিতে তাঁর বিশ্ব মসজিদে জুমার নামায আদায় করতে পারে । উল্লেখ্য যে, এ বিশ্ব- মসজিদের এক হাজার দরজা থাকবে । এতদসত্ত্বেও সেখানে উপস্থিত মিলিয়ন- মিলিয়ন জনতার মাঝে জুমার জামায়াতের কাতারে এক ব্যক্তির দাঁড়ানোর পরিমাণ জায়গা পাওয়াও অনেকের জন্য সম্ভব হবে না ।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "তার প্রশাসন পরিচালনার কেন্দ্র হবে কুফা । তার বিচারালয় হবে ঐ নগরীর জামে মসজিদ । বাইতুল মাল এবং মুসলমানদের মধ্যে গনীমত বণ্টনের কেন্দ্রস্থল হবে সাহলার মসজিদ । তার বিশ্রামাগার এবং নীরবে- নিভৃতে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করার স্থান গাররাইনের শ্বেত টিলাসমূহে অবস্থিত হবে । মহান আল্লাহর শপথ, এমন কোন মুমিন তখন থাকবে না যে ঐ স্থান এবং এর আশেপাশের কোন স্থানে বাস না করবে । তবে আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এমন কোন মুমিন থাকবে না যে সেখানে আগমন করবে না এবং অন্য রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, এমন কোন মুমিন থাকবে না যে সে স্থানের দিকে ছুটে যাবে না । তবে শেষোক্ত ভাষ্যটিই অধিকতর সঠিক । কুফা শহরের আয়তন পঁয়তাল্লিশ মাইল হবে এবং এ শহরের গগনচুম্বী অট্টালিকগুলো কারবালার অট্টালিকাসমূহের চেয়েও উন্নত হবে । মহান আল্লাহ্ কারবালাকে ফেরেশতা ও মুমিনদের আশ্রয়স্থল ও যাতায়াতের স্থানে পরিণত করবেন । এর ফলে এ নগরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে ।"[২৩৭]

তাঁর বিচারালয় অর্থাৎ বিচারের জন্য জনগণ যে স্থানে গমন করবে এবং যেখানে তাদের মধ্যে বিচার ও রায় প্রদান করা হবে তা হবে কুফার বর্তমান মসজিদ অথবা তা যে বিরাট জামে মসজিদ ইমাম মাহদী (আ.) নির্মাণ করবেন সেই মসজিদও হতে পারে । নিভৃত যে স্থানে তিনি স্রষ্টার উপাসনা করবেন সেই স্থানটি নাজাফের অদূরে অবস্থিত শ্বেত টিলাসমূহের নিকটেই হবে । কুফার আয়তন পঁয়তাল্লিশ মাইল হওয়ার অর্থ হচ্ছে কুফার আয়তন অথবা এ নগরীর দৈর্ঘ্য (লম্বায়) প্রায় একশ’ কিলোমিটার পর্যন্ত হবে ।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : “কুফার পশ্চাতে (নাজাফে) সে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে যার এক হাজারটি দরজা থাকবে । সেই মসজিদ কারবালা ও হীরার দু'নদীর পাশে নির্মিত হবে এবং কুফার বাড়িগুলোর সাথে এমনভাবে সংযুক্ত থাকবে যে, কোন ব্যক্তি দ্রুতগামী খচ্চরের ওপর আরোহণ করে জুমার নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেও সে তা ধরতে পারবে না ।”[২৩৮] অর্থাৎ তার বাহনে চড়ে দ্রুতগতিতে রওয়ানা হওয়া সত্ত্বেও জুমার নামায ধরতে পারবে না । কারণ, সে নামাযে দাঁড়ানোর জন্য কোন খালি জায়গা খুঁজে পাবে না ।

অবশ্য ইরাকে আধ্যা ক উৎকর্ষতা, বস্তুগত উন্নতি এবং ইরাক যে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সরকার ও প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল হবে এতৎসংক্রান্ত অগণিত রেওয়ায়েত বিদ্যমান যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় ।

যাহোক, (প্রাথমিক পর্যায়ে) ইমাম মাহদী (আ.) ইরাক মুক্ত করে তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং ইরাককে তাঁর প্রশাসন ও সরকারের কেন্দ্রস্থল হিসাবে মনোনীত করবেন । পারস্যোপসাগরীয় দেশগুলোসহ ইয়েমেন, হিজায, ইরান ও ইরাক তাঁর সরকার ও প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হবে । আর এভাবে ইমাম মাহদী (আ.) যখন অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত ও শঙ্কামুক্ত হবেন তখন তিনি তাঁর বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবেন । এ পর্যায়ে প্রথমে তিনি তুর্কীদের (রুশজাতি) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখানে (রাশিয়ায়) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ এবং তাদেরকে পরাজিত করবেন । এরপর তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ শামের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন এবং দামেশকের নিকট ‘মারজ আযরা’ নামক স্থানে অবতরণ করবেন । সেখানে

আল কুদস মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি সুফিয়ানী, ইহুদী এবং রোমানদের (পাশ্চাত্য) বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন । আমরা এ ব্যাপারে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকামী আে ালনের ঘটনাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ।

দ্বাদশ অধ্যায়

ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগে বিশ্বযুদ্ধ

ইজমালীভাবে মুতাওয়াতির[২৩৯] অগণিত হাদীস ও রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে । তবে এ যুদ্ধ আমাদের বর্তমান শতাব্দীর (বিগত বিংশ শতাব্দী) ঘটে যাওয়া প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর আরোপ করা সম্ভব নয় । কারণ, এ সব রেওয়ায়েতে উক্ত যুদ্ধের যে সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে ভিন্ন । বিশেষ করে, এ ভিন্নতা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময় সংঘটিতব্য বিশ্বযুদ্ধের নিহতদের সংখ্যা এবং এর সময়কালের ক্ষেত্রে প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়; বরং কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধ ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে অথবা তাঁর পবিত্র আবির্ভাবকামী আে ালন শুরু হবার পর সংঘটিত হবে ।এখানে এ রেওয়ায়েতসমূহের গুটিকতক নমুনা পেশ করা হলো :

হযরত আলী (আ.) বলেছেন : "আল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাব ও আে ালনের নিকটবর্তী সময় দু'ধরনের মৃত্যু- লাল মৃত্যু ও শ্বেত মৃত্যু হবে । হঠাৎ হঠাৎ লাল ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব হবে । তবে 'লাল মৃত্যু'র অর্থ তরবারি দ্বারা মৃত্যু এবং 'শ্বেত মৃত্যু'র অর্থ প্লেগ বা মহামারি ।"[২৪০]

'আল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাব ও আে ালনের নিকটবর্তী সময়'- এ বাক্যাংশটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধ ও লাল মৃত্যু (রক্তপাত) ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময় সংঘটিত হবে । তবে রেওয়ায়েতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হবার স্থান নির্দিষ্ট করা হয় নি।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "ভয়- ভীতি, ভূমিকম্প, ফিতনা এবং যে সব বিপদে মানব জাতি জড়িয়ে যাবে সেগুলোর পরপরই কেবল আল কায়েম আল মাহদী আবির্ভূত হবে ও কিয়াম করবে । এর আগে তারা (মানব জাতি) প্লেগ বা মহামারিতে আক্রান্ত হবে । অতঃপর আরবদের

মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত হবে, বিশ্ববাসীর মাঝে মতবিরোধের উদ্ভব হবে, ধর্মে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দেবে এবং তাদের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন এতটাই হবে যে, একে অপরকে হত্যা করতে দেখে সবাই সকাল- সন্ধ্যায় কেবল নিজের মৃত্যু কামনা করবে ।"[২৪১]

এ রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তীব্র ভয়- ভীতি ও আতংকের আগেই প্লেগ বা মহামারির প্রাদুর্ভাব হবে । উল্লেখ্য যে, এ ভয়- ভীতি ও আতংক আসলে সাধারণ দ্বন্দ্ব- সংঘাত ও ব্যাপক যুদ্ধকেই বুঝিয়েছে । তবে যদি আমরা নিশ্চিতও হই যে, রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) হাদীসটির মূল ভাষ্যে কোন ধরনের আগে- পরে করেন নি তাহলেও এ সব ঘটনা যে একের পর এক শিকলের বলয়ের মতো ঘটতে থাকবে এ রকম চিন্তা করা আমাদের জন্য দুরূহ হবে । কারণ, 'আরবদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত'- এ বাক্য যা ثُمَّ (অতঃপর) অব্যয় দ্বারা সংযোজিত হয়েছে তা যদি 'এর আগে তারা প্লেগ বা মহামারিতে আক্রান্ত হবে'- এ ParentheticalSentence[২৪২]- এর সাথে সংযোজিত হয়েছে ধরি তাহলেও তা সঠিক বলে গণ্য হবে । সেক্ষেত্রে আরবদের মধ্যকার বিরোধ, যুদ্ধ ও রক্তপাতের ঘটনা প্লেগ বা মহামারির পরে হবে; আবার অন্যদিকে 'এবং যে সব বিপদে মানব জাতি জড়িয়ে যাবে'- এ বাক্যটির সাথে 'আরবদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত...' বাক্যটি সংযোজন করাও সঠিক । সে ক্ষেত্রে আরবদের মধ্যকার যুদ্ধ ও রক্তপাত প্লেগ বা মহামারির প্রাদুর্ভাবের আগেই সংঘটিত হবে । অধিকন্তু এ সব ঘটনার বিবরণ (এ রেওয়ায়েতে) খুব সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে । তবে এ থেকে বোঝা যায় যে, আরব ও আপামর মুসলিম উম্মাহর জন্য নিরাপত্তামূলক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সময়টা হবে অত্যন্ত কঠিন সময় বা ক্রান্তিকাল । ক্ষুধা এবং দুর্ভিক্ষ যা ইমাম সাদিক থেকে বর্ণিত পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতে (.আ) উল্লিখিত হয়েছে তা ঐ বছরেই দেখা দেবে ।

ইমাম সাদিক : বলেছেন (.আ) হযরত কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাব ও বিপ্লবের আগে এমন এক বছর অবশ্যই আসবে যখন মানুষ তীব্র খাদ্যাভাবে কষ্ট পেতে থাকবে এবং তাদেরকে হত্যা করার দরুণ আতংক তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে ।[২৪৩]

পরবর্তী রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, যে আসমানী আওয়াজ ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিকটবর্তী রমযান মাসে শোনা যাবে তখন পর্যন্ত ঐ বিশ্বযুদ্ধের তীব্রতা অব্যাহত থাকবে ।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসী পরস্পর মতভেদ করবে । কিবলাপন্থীরা (মুসলমানরা) এবং বিশ্ববাসীও অসহনীয় ভয়- ভীতি ও আতংকের সম্মুখীন হবে । আর আকাশ থেকে আহবানকারীর আহবান করা পর্যন্ত তারা এ অবস্থার মধ্যেই থাকবে । যখন আকাশ থেকে গায়েবী আহবানধ্বনি শোনা যাবে তখন তোমরা হিজরত করবে ।...”[২৪৪]

এ রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধে মূলত অমুসলিম জাতিসমূহই ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আর ‘প্রাচ্য, পাশ্চাত্যবাসী এবং কিবলাপন্থীরা পরস্পর মতভেদ করবে’- এ বাক্য আসলে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত যা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীদের মতবিরোধের পরপরই মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটবে । আর এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ মতপার্থক্য আসলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মতপার্থক্যের ফল অথবা এর অনুগামী হয়ে থাকবে । অবশ্য এ বিষয়টি ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধে নিতান্ত স্বাভাবিক হবে । কারণ, এ যুদ্ধের লক্ষ্যস্থলগুলো হবে বড় বড় দেশের রাজধানী, সামরিক ঘাঁটি ও সেনানিবাসসমূহ এবং পরোক্ষভাবে মুসলমানদের মধ্যেও এ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে । কতিপয় রেওয়ায়েতেও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ।

আবু বাসির ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন : “ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : “যে পর্যন্ত দুই- তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হবে সে পর্যন্ত এ বিষয়টি (ইমাম মাহদীর আবির্ভাব) বাস্তবায়িত হবে না ।” আমি (আবু বসীর) তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : মানব জাতির দুই- তৃতীয়াংশ যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আর কে- ই বা বেঁচে থাকবে? তিনি বললেন : মানব জাতির এক- তৃতীয়াংশের মধ্যে থাকতে কি তোমরা (মুসলমানরা) পছ কর না?”[২৪৫]

সম্ভবত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর নি োক্ত এ ভাষণে অন্য সকল হাদীস ও রেওয়ায়েতের চেয়ে স্পষ্টভাবে এ যুদ্ধের সময়কাল ও কারণ উল্লিখিত হযেছে । এ খুতবায় তিনি

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বেশ কিছু নিদর্শনও বর্ণনা করেছেন । এ ভাষণে দু'টি প্যারা আছে যা উক্ত বিশ্বযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট ।

তিনি বলেন : "হে লোকসকল! প্রাচ্যে তার নিজ পায়ের দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি করার আগে অর্থাৎ বশীভূত করার সময় যে উটের লাগাম পায়ের খুরের নিচে আটকে যায় এবং এতে তার ভীতি ও অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায় সেই উটের ন্যায় ফিতনা- ফ্যাসাদ তোমাদের দেশ ও জনপদকে ধ্বংস করার আগে অথবা দাহ্য পদার্থের দ্বারা পাশ্চাত্যে এক মহাযুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করার আগেই আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর । (ঐ যুদ্ধ যখন বাঁধবে) তখন তা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে থাকবে। সে সময় ঐ ব্যক্তির জন্য আক্ষেপ এ কারণে যে, সে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে... । এ যুদ্ধ চলাকালীন নাজরান থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে ইমামের (ইমাম মাহদীর) আহবানে সাড়া দেবে । সে- ই হবে তার আহবানে সাড়া দানকারী প্রথম খ্রিস্টান । সে তার আশ্রম ধ্বংস করবে এবং ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে । সে অশ্বের ওপর আরোহণ করে আজমীদের (ইরানী সেনাবাহিনী) ও নিপীড়িত জনগণের সাথে হেদায়েতের পতাকাসহ নূখাইলার (কুফার কাছে একটি এলাকার নাম) দিকে যাবে ।

ঐ দিন ফারুক নামের একটি স্থান হবে পৃথিবীর সকল অঞ্চলের অধিবাসীর সমবেত হওয়ার স্থান । আর ঐ এলাকা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর হজ্ব গমনের পথের ওপরে বার্স ও ফোরাতের মাঝখানে অবস্থিত । সেদিন তিন হাজার হাজার ইহুদী ও খ্রিস্টান পরস্পরকে হত্যা করবে । সেদিনের ঘটনা মূলত নি োক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বলে গণ্য হবে :

"আমরা তাদেরকে যে পর্যন্ত (তরবারি দিয়ে অথবা তরবারির নিচে) কর্তিত প্রাণহীন শস্যে পরিণত না করেছি সে পর্যন্ত সব সময় এটিই ছিল তাদের শ্লোগান ।"[২৪৬]

তবে 'প্রাচ্যে তার নিজ পায়ের দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি করার আগে'- ইমামের এ বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধের সূত্রপাত প্রাচ্য অর্থাৎ রাশিয়া থেকে হবে অথবা এ থেকে প্রাচ্য এলাকায় সংঘটিতব্য দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের বিষয় প্রতীয়মান হয় । শীঘ্রই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব- আে ালনের অধ্যায়ে ইমাম বাকির (আ.) থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হবে । এতে বর্ণিত

হয়েছে যে, হিজাযের প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক শূন্যতা ও সংকট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার কারণ ।

‘দাহ্য পদার্থের দ্বারা পাশ্চাত্যে এক মহাযুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে’- এ বাক্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধ্বংসের প্রকৃত কেন্দ্র পাশ্চাত্যের দেশসমূহ হবে এবং দাহ্য পদার্থসমূহের আধিক্যের অর্থ হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সামরিক ঘাঁটি, রাজধানী এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও কেন্দ্রসমূহ । আর বাহ্যত ইমামের বাণীর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর বুকে মানুষের সমবেত হওয়ার স্থানটির নাম হবে ফারুক । তখন মানুষ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ঐ স্থানে এসে সমবেত হতে থাকবে; তাঁর সামরিক ঘাঁটি কুফা ও হিল্লার মাঝখানে অবস্থিত হবে । কারণ, নাজরানের সন্ন্যাসী নিপীড়িত জনগণের কয়েক প্রতিনিধির সাথে ঐ স্থান থেকেই তাঁর কাছে উপস্থিত হবে । ‘আলী (আ.)- এর হজ্ব গমনপথের ওপর অবস্থিত র্বাস ও ফোরাতের অন্তর্বর্তী এলাকা’- এ বাক্যাংশটি স্বয়ং রাবী অথবা পুস্তক লেখকের পক্ষ থেকে পাদটীকা হতে পারে যা মূল ভাষ্যের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে; আর সম্ভবত المحجّة (আল মুহাজ্জাহ্) শব্দটি যা এ বাক্যের মধ্যে এসেছে তার অর্থ আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর শাসনামলে হজ্ব কাফেলাসমূহের একত্রিত হওয়ার স্থান হতে পারে । অথবা এ স্থানের নামও হতে পারে যেখানে প্রেরিত প্রতিনিধিদল আলী (আ.)- এর সেনাশিবিরে প্রবেশ অথবা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সমবেত হতো ।

ঐ দিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে (সংঘটিত যুদ্ধে) তিন হাজার (হাজার) লোক নিহত হবে- এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে তিন মিলিয়ন এবং ‘হাজার’ শব্দটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে এ কারণে যে, ঐ শব্দটি বিহার গ্রন্থের ৫২তম খণ্ডের ২৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে ছিল এবং খুব সম্ভবত ঐ শব্দটি রেওয়ায়েত থেকে বাদ পড়ে গেছে । অবশ্য তা এতদর্থে নয় যে, বিশ্বযুদ্ধে মোট নিহতদের সংখ্যা তিন মিলিয়ন হবে, বরং এ সংখ্যা ঐ দিনে নিহতদের সংখ্যা অথবা অন্য কোন সময়কালেরও হতে পারে; আর এটি ঐ বিশ্বযুদ্ধের যে কোন একটি পর্যায় বা সর্বশেষ পর্যায়ও হতে পারে । আর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বযুদ্ধে ও প্লেগ বা মহামারিতে

মৃতের সংখ্যা তখনকার বিশের মোট জনসংখ্যার দুই- তৃতীয়াংশ হবে । উল্লেখ্য যে, বিশ্বযুদ্ধের আগেই প্লেগ বা মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটবে । আরেকটি রেওয়ায়েতে মৃতের সংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার সাত ভাগের পাঁচ ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "আল কায়েমের আবির্ভাবের আগে দু'ধরনের মৃত্যু থাকবে । একটি লাল মৃত্যু এবং অন্যটি শ্বেত মৃত্যু । (অবস্থা এমন হবে যে) প্রতি সাত জনের মধ্যে পাঁচ জনই প্রাণ হারাবে ।"[২৪৭]

আরো কিছু রেওয়ায়েতে দশ ভাগের নয় ভাগও বর্ণিত হয়েছে..., অবশ্য রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যকার পার্থক্য কখনো কখনো অঞ্চলসমূহের পার্থক্যের কারণে অথবা অন্য কারণেও হতে পারে । যাহোক এ বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদের প্রাণহানি ও ক্ষয়- ক্ষতির পরিমাণ খুব সামান্য বা অনুল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে ।

সংক্ষেপে : রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের একটু আগে অথবা তাঁর আবির্ভাবের বছরেই ভয়- ভীতি সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করবে; আর সার্বিকভাবে অমুসলমানরাই ব্যাপক ও ভয়াবহ ক্ষয়- ক্ষতির সম্মুখীন হবে । আর একে ব্যাপক যুদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করা যায় যে যুদ্ধে উন্নত বিধ্বংসী অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে এবং এর ফলে বিশ্বব্যাপী আতংক ছড়িয়ে পড়বে । কারণ, যদি এ যুদ্ধের পদ্ধতি সনাতনধর্মী হতো তাহলে যে মাত্রায় আতংক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে সেই মাত্রায় ঐ যুদ্ধ হতো না এবং ভয়- ভীতিও ব্যাপক হতো না অথবা অন্ততপক্ষে বিশ্বের এক বা একাধিক অঞ্চল ভয়- ভীতি, আতংক, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ থেকে মুক্ত থাকতে পারত ।

তবে এমন কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত ও প্রমাণ আছে যেগুলোর মাধ্যমে ঐ বিশ্বযুদ্ধকে কতগুলো আঞ্চলিক যুদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করতে পারে । বিশেষ করে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ইমাম বাকির (আ.)- এর নি োক্ত রেওয়ায়েতটি প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন : "বিশ্বের বুকে যুদ্ধসমূহ অগণিত হবে ।" এ রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবির্ভাবের বছরেই অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হবে । তাই এ রেওয়ায়েত ও অন্যান্য রেওয়ায়েত

যেগুলোয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে মতভেদ ও যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা সমন্বয় সাধন করে বলতে পারি যে, এ যুদ্ধগুলো আঞ্চলিক যুদ্ধ আকারে তাদের মধ্যে সংঘটিত হবে । তবে এ সব যুদ্ধের ধ্বংসা ক দিক কেবল পাশ্চাত্যেই কেন্দ্রীভূত থাকবে ।

এ বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল

রেওয়ায়েতসমূহ থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে, এ যুদ্ধের সময়কাল ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কালের খুব নিকটবর্তী হবে, যেমন এ যুদ্ধ তাঁর আবির্ভাবের বছরেই হবে... । যদি আমরা যে সব রেওয়ায়েতে এ যুদ্ধ এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করি তাহলে এ কথা বলাই উত্তম হবে যে, উক্ত বিশ্বযুদ্ধ বহু পর্যায় বিশিষ্ট হবে । কারণ, এ যুদ্ধ মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কিছু আগে থেকে শুরু হয়ে বাকী পর্যায় তাঁর আবির্ভাবের আে ালনের পরেও চলতে থাকবে । এ যুদ্ধ চলাকালেই তিনি হিজায অঞ্চল মুক্ত করবেন । ঐ বিশ্বযুদ্ধ ইরাক বিজয়ের পরে শেষ হবে । আর রুশ জাতি অথবা তাদের বাকী অংশের বিরুদ্ধে ইমাম মাহদীর যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার পরেই সংঘটিত হবে । কারণ, রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) সর্বপ্রথম যে সেনাবাহিনীকে গঠন করবেন সেটাকে তিনি তুর্কীদের (রুশজাতি) বিরুদ্ধে প্রেরণ করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন।

তবে যে সব রেওয়ায়েতে এ যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো যদি ব্যাপক পারমাণবিক যুদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করি এবং আজকের সংবাদ মাধ্যমসমূহে এরূপ যুদ্ধের ব্যাপারে যে সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রচার ও প্রকাশ করা হচ্ছে সে দিকে ভালোভাবে মনোনিবেশ করি তাহলে অবশ্যই বলতে হবে যে, এ যুদ্ধের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত হবে । সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমগুলোর বক্তব্য অনুসারে সম্ভবত এ যুদ্ধ এক মাসের বেশি স্থায়ী হবে না । মহান আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে একমাত্র ভালো জানেন ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইরানী জাতি এবং আবির্ভাবের যুগে তাদের ভূমিকা

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পূর্ব থেকেই প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত ঘেঁষে ইসলামী বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইরান পাশ্চাত্যের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসাবে বিবেচিত হতো এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে দেশটি ছিল একটি ইসলামী ঐতিহ্যবাহী দেশ। পাশ্চাত্যের এজেন্ট ও ইসরাইলের মিত্র 'শাহ' ছিলেন ইরানের শাসক এবং তিনি ভালোভাবে তাঁর বিদেশী প্রভুদের সেবায় লিপ্ত ছিলেন ও এ ভূ- খণ্ডকে পুরোপুরি তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ইরান সম্পর্কে অন্যরা যে ধারণা পোষণ করত তা ব্যতীত আমার মতো এক শিয়া মুসলমানের কাছে ইরান ছিল এমন এক দেশ যেখানে ইমাম রেযা (আ.)- এর পবিত্র মাযার এবং কোম নগরীর ইসলামী জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র বিদ্যমান এবং সে দেশটি শিয়া মাযহাব, আলেম এবং মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও রচনা করার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ। বিশেষ করে, আমরা যখন ইরানীদের প্রশংসায় বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করতাম তখন আমরা পরস্পরকে বলাবলি করতাম যে, এ রেওয়ায়েতগুলো ঐ সব রেওয়ায়েতের মতো যেগুলোয় বনি খুযাআহ্ বা ইয়েমেনীদের প্রশংসা বা নি া করা হয়েছে। এ কারণেই যেসব রেওয়ায়েতে বিভিন্ন গোত্র, দল ও কতিপয় দেশের প্রশংসা বা নি া বিদ্যমান সেগুলো সমালোচনার ঊর্ধ্বে হতে পারে না। যদি এসব রেওয়ায়েত সহীহ্ হয়ে থাকে তবুও এগুলো ইসলামের প্রথম যুগের জাতিগুলোর বিভিন্ন অবস্থা, অতীত ইতিহাস এবং পূর্ববর্তী শতাব্দীসমূহের সাথেই জড়িত।

তখন আমাদের মধ্যে একটি ধারণা খুব প্রচলিত ছিল যে, তদানীন্তন মুসলিম উম্মাহ্ মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত বিশ্ব কুফরী শক্তির আধিপত্যে ও কর্তৃত্বের অনুগত ছিল এবং তাদের সেবাদাস বলে গণ্য হতো। মুসলিম জাতি অন্য কোন জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল না, এমনকি ইরানী জাতিও অন্য সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। কারণ, তারা কুফরী সভ্যতা, জাতীয়তা ও বর্ণবৈষম্যভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থক ছিল। শাহ, তাঁর পাশ্চাত্য প্রভুরা এবং তাদের এজেন্টরা এ

ধরনের মতবাদ (বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদ) ও ধ্যান- ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটানো এবং ইরানী জাতিকে এরূপ ধ্যান- ধারণার ওপর গড়ে তোলার জন্য জোর চালাত।

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত করে ফেলে এবং তাদের দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় এতটা প্রফুল্ল হয়েছিল যে, বিগত শতাব্দীগুলোর মধ্যে তা ছিল বিরল এক ঘটনা; বরং এর চেয়েও বড় কথা হলো যে, তারা এ ধরনের বিজয়ের কথা চিন্তাও করতে পারে নি। মুসলিম উম্মাহ্ ও সকল মুসলিম দেশ এ আনে র জোয়ারে ভেসেছিল। মুসলিম উম্মার মহা আনে র অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, সর্বত্র ইরানী জাতি এবং সালমান ফার্সীর সমর্থকদের শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা হতে থাকে। যেমন ইসলামী বিশ্বের সুদূর পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সে সময় বিভিন্ন শিরোনামে এ সম্বন্ধে শত শত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সময় প্রকাশিত একটি তিউনিসীয় ম্যাগাজিনের শিরোনাম ছিল ‘জ্ঞান ও পরিচিতি’ যাতে বর্ণিত হয়েছিল : “মহানবী (সা.) মুসলিম উম্মার নেতৃত্বদানের জন্য ইরানীদেরকে মনোনীত করেছেন।” এ সব প্রবন্ধ ইরানীদের ব্যাপারে আমাদের অতীত ধারণাকে পুনঃমূল্যায়ন করতে বাধ্য করে এবং আমরা বুঝতে পারি যে, ইরানী জাতির ব্যাপারে মহানবী (সা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ কেবল তাদের অতীত ইতিহাসের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়; বরং তাদের ভবিষ্যতের সাথেও জড়িত।

হাদীসের সূত্রসহ ইরানী জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এসব রেওয়ায়েত ও হাদীস ইরানী জাতির অতীত ইতিহাসের সাথেই বেশি জড়িত এবং সবচেয়ে আর্কষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, শিয়া হাদীস সূত্রসমূহের চেয়ে সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহে এ ধরনের হাদীস বেশি বিদ্যমান।

যখন ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর হুকুমতের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে ইরানী এবং ইয়েমেনীদের বিশেষ ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তারাই হবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী এবং তাঁর আে ালনে অংশগ্রহণ করার দুর্লভ সম্মানের অধিকারী তখন কী আর করার আছে?. . . আর একইভাবে মিশরের কতিপয় যোগ্য ব্যক্তি, শামের কতিপয় প্রকৃত মুমিন এবং ইরাকের বেশ কিছু দল বা গোষ্ঠী

সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইমামের সৈনিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে ও এ মহাকল্যাণ থেকে উপকৃত হবে। একইভাবে ইসলামী বিশ্বের আনাচে- কানাচে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর যে সমর্থকবৃ ছড়িয়ে আছেন তারাও মহান আল্লাহর স্বর্গীয় এ করুণা দ্বারা ধন্য হবে। অর্থাৎ তারা ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর শুধু সৈনিকই নয়; বরং তাঁর বিশেষ সাথী, সহকারী ও উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমরা এখন সাধারণভাবে যেসব রেওয়ায়েত ইরানী জাতির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আলোচনা করব। এরপর আমরা ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে তাদের ভূমিকার ওপরও আলোকপাত করব।

ইরানীদের প্রশংসায় পবিত্র কোরআন ও হাদীসসমূহ

পবিত্র কোরআনের যে সব আয়াত ইরানীদের সাথে সম্পর্কিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ নয় প্রকার। যথা :

১. সালমান ফার্সীর সমর্থকগণ;

২. প্রাচ্য দেশের জনগণ;

৩. খোরাসানবাসী;

৪. কালো পতাকাবাহীরা;

৫. পারস্যবাসী;

৬. গৌর বর্ণের মুখবিশিষ্টরা;

৭. গৌর বর্ণের মুখবিশিষ্টদের সন্তানরা;

৮. কোমের অধিবাসী;

৯. তালেকানের অধিবাসী;

অবশ্য আপনারা দেখতে পাবেন যে, প্রধানত এসব শিরোনামের কাঙ্ক্ষিত অর্থ ও উদ্দেশ্য একটাই। আরো বেশ কিছু সংখ্যক হাদীস আছে যেগুলোতে তাদেরকে ভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

(و إن تولّوا يستبدل قوما غيركم)

'আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে আনবেন'- পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বয়ং মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

(هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنهم من يبخل و من يبخل فإنّما يبخل عن نفسه و الله الغنيّ و أنتم الفقراء و إن تتولّوا يستبدل قوما غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم)

"জেনে রাখ যে, মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য তোমাদেরকে ডাকা হবে। তোমাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি (ব্যয় করার ক্ষেত্রে) কার্পণ্য করবে; আর যে কার্পণ্য করবে সে আসলে তার নিজের প্রতি কার্পণ্য করবে; মহান আল্লাহ্ই অমুখাপেক্ষী এবং তোমরাই (মহান আল্লাহর) মুখাপেক্ষী ; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তিনি তোমাদের থেকে ভিন্ন এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।"[২৪৮]

তাফসীর গ্রন্থ আল্ কাশশাফ প্রণেতা বলেছেন যে, মহানবী (সা.)- কে আয়াতটিতে উল্লিখিত জাতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। হযরত সালমান ফারসী মহানবী (সা.)- এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। মহানবী (সা.) সালমানের ঊরুতে হাত দিয়ে চাপড় মেরে বলেছিলেন : "যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, ঈমান যদি ছায়াপথসমূহেও বিদ্যমান থাকে, তাহলে পারস্যের একদল লোক সেখান থেকেও তা নিয়ে আসবে।"[২৪৯]

ইমাম বাকির (আ.) থেকে মাজমাউল বায়ান গ্রন্থের রচয়িতা বর্ণনা করেছেন : তিনি (ইমাম বাকির) বলেছেন : "হে আরব জাতি! যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে মহান আল্লাহ্ আরেক জাতিকে অর্থাৎ ইরানীদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।"

তাফসীরে আল মীযানের রচয়িতা বলেছেন : "আদ দুররুল মানসুর, আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হামীদ তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম, কিতাব- ই আওসাত নামক গ্রন্থে

তাবরানী এবং দালায়েল নামক গ্রন্থে বাইহাকী আবু হুরাইরাহ্ থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরাহ্ বলেছেন :

(و إن تتولّوا يستبدل قوما غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم)

'আর যদি তোমরা (আরবরা) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাদের থেকে ভিন্ন একটি জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না'- এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : হে রাসূলুল্লাহ্! তারা কারা যারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে যখন আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব। মহানবী (সা.) তখন সালমান ফারসীর কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলেন : সে এবং তার জাতি। ঐ আল্লাহর শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, ঈমান যদি দূরতম ছায়াপথে থাকে তদুপরি একদল পারস্যবাসী তা সেখান থেকেও নিয়ে আসবে।"[২৫০]

এ রেওয়ায়েত সদৃশ আরো একটি রেওয়ায়েত ভিন্ন সূত্রে আবু হুরাইরাহ্ এবং একইভাবে ইবনে মারদুইয়াহ্ ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতে দু'টি অর্থ বিদ্যমান যে ব্যাপারে সবার ঐকমত্য আছে। একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, আরবদের পরে ইসলামের পতাকা বহনের দায়িত্ব পাবে ইরানীরা। কারণ, তারা ঈমান অর্জন করবে এমনকি যদি তা তাদের নাগালের বাইরেও থাকে।

এ রেওয়ায়েতে তিনটি বিষয় রয়েছে। যথা :

প্রথম বিষয় :আরব জাতিকে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের স্থলে ইরানীদেরকে অধিষ্ঠিত করার হুমকি প্রদান; এটি কি কেবল মহানবী (সা.)- এর যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট, না তারপরেও যে কোন যুগ ও প্রজন্মের সাথে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে, তা নি োক্ত এ অর্থ ব্যক্ত করে : যদি তোমরা (আরবরা) ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও আর তা যে কোন প্রজন্মের ক্ষেত্রেই হোক না কেন, পারস্যবাসীদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করব। আয়াতের বাহ্য অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ হুমকি 'উপলক্ষ বিধানের ক্ষেত্রকে সীমিত করে না'- এ নিয়মানুসারে পরবর্তীকালে সকল যুগ ও প্রজন্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ যে কোন প্রজন্মের জন্যই

চন্দ্র- সূর্যের ন্যায় ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ চন্দ্র- সূর্য যেমন সবসময় আলো দান করে যাচ্ছে তদ্রূপ পবিত্র কোরআনও সব সময় এবং সকল প্রজন্মের ক্ষেত্রে অলোকবর্তিকাস্বরূপ। কারণ, এ বিষয়টি রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং মুফাসসিরগণও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয় : "পারস্যের একদল লোক ঐ ঈমান অর্জন করবে, সবাই না"- এ থেকে স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, এ বাক্যটি পারস্যের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের প্রশংসা, তা সকল পারস্যবাসীর প্রশংসা নয়।

কিন্তু আলোচ্য আয়াত ও রেওয়ায়েতের বাহ্য অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তা সাধারণভাবে সকল পারস্যবাসীরই প্রশংসা করেছে। কারণ, তাদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা উচ্চতর পর্যায়ের ঈমান অথবা জ্ঞান অর্জন করেন, বিশেষ করে আরবদের পরে সে গোষ্ঠী যারা ইসলাম ধর্মের ধারক- বাহক তাদেরকে পর্যালোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। অতএব, যে প্রশংসা তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা এদিক থেকে যে, তারা এ ধরনের প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং তাঁদের অনুসরণ করে।

তৃতীয় বিষয় : এ পর্যন্ত কি আরবদের ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন এবং পারস্যবাসীদেরকে আরবদের স্থলাভিষিক্ত হবার বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?

জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নয় যে, আরব- অনারব নির্বিশেষে মুসলমানরা প্রকৃত ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, فعل شرط অর্থাৎ শর্ত বাক্য 'যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর' বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কেবল جوات شرط অর্থাৎ শর্তের উত্তর 'আরবদের স্থলে পারস্যবাসীদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া' অবশিষ্ট আছে। আর এ ক্ষেত্রে আমরা সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষভাবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করলে বুঝতে পারব যে, মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। পরবর্তী রেওয়ায়েত যা তাফসীরে নুরুস্ সাকালাইন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ স্থলাভিষিক্তকরণ বনি উমাইয়্যার

খিলাফতকালে বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ, তখন আরবরা পদমর্যাদা, শাসনকর্তৃত্ব এবং সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণে ব্যস্ত ছিল, আর ইরানীরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আ নিয়োগ করেছিল এবং এ ক্ষেত্রে তারা আরবদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছিল। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "আল্লাহর শপথ, তিনি তাদের চেয়ে উত্তমদেরকে অর্থাৎ আজমকে (মাওয়ালীকে) স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যদিও মাওয়ালী বলতে ঐ যুগে অ-ইরানী অনারব অর্থাৎ যেসব তুর্কী ও রোমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদেরকেও বোঝাত। কিন্তু বিশেষ করে পারস্যবাসীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতটি সম্পর্কে মহানবী (সা.) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে ইমাম সাদিক (আ.) অবগত থাকার কারণে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, ঐ সময় মাওয়ালীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল ইরানী মুসলমানরা।

(و آخرين منهم لمّا يلحقوا بهم) আয়াতের তাফসীর :

মহান আল্লাহ্ বলেন : "তিনিই (মহান আল্লাহ্) নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের থেকেই একজন রাসূল (মুহাম্মদ) প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেবেন। যদিও (এর) পূর্বে তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল এবং তাদের মধ্য থেকে আরো কতিপয় ব্যক্তির মাঝেও তিনি প্রেরিত হয়েছেন যারা এখনো তদের সাথে মিলিত হয় নি। আর মহান আল্লাহ্ই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা জুমআ : ২-৩)

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে : তিনি বলেন : "আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে ছিলাম। তখন সূরা জুমআ নাযিল হয়। মহানবী (সা.) সূরা জুমআর 'এবং তাদের মধ্যে এখনও যারা তাদের সাথে মিলিত হয় নি' (و آخرين منهم لما يلحقوا بهم)- এ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল : হে রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা যারা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হয় নি? মহানবী কোন উত্তর দিলেন না।" আবু হুরাইরাহ্ বলেন : "সালমান ফারসীও আমাদের মাঝে ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাত সালমানের ওপর

রেখে বললেন : ঐ খোদার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, ঈমান যদি সুরাইয়া তারকা পর্যন্ত চলে যায় তাহলে এদের (সালমানের জাতির) মধ্য থেকে একদল লোক তা সেখান থেকে আনয়ন করবে।”

আলী ইবনে ইবরাহীমের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে ‘এবং অন্যান্য ব্যক্তির মাঝে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি’- এ আয়াতের অর্থ ঐ সব ব্যক্তি যারা তাদের (আরবদের) পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

তাফসীরে মাজমাউল বায়ানের রচয়িতা বলেছেন : “কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সাহাবীদের পরবর্তী সকল প্রজন্মের মানুষ।” এরপর তিনি বলেছেন : “তারা হচ্ছে আজমী অর্থাৎ ঐ সব ব্যক্তি যারা আরবী ভাষায় কথা বলে না। যেহেতু মহানবী (সা.) যে সব ব্যক্তি তাঁকে দেখেছে এবং যে সব ব্যক্তি পরে জন্মগ্রহণ করবে, আরব- অনারব (আজম) নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশে নবুওয়াতসহ প্রেরিত হয়েছেন।” সাঈদ ইবনে যুবাইর ও ইমাম বাকির (আ.) থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ‘এবং তাদের মধ্যেও যারা তাদের পরে তাদের সাথে যুক্ত হবে’- এ বাক্যাংশের মুতলাক (শর্তহীন) হওয়ার কারণে আয়াতটি মহানবী (সা.)- এর যুগোত্তর সকল শ্রেণী ও প্রজন্ম, আরব- অনারব সবাইকে শামিল করে।

কিন্তু أمّيّين ও آخرين শব্দদ্বয় খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ও তুলনা করলে আমরা বলতে পারব যে, أمّيّين হলো আরবরা এবং آخرين হলো ঐ সব অনারব যারা ইসলাম গ্রহণ করবে। আহলে বাইত থেকে বর্ণিত কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এ বিষয়টি বোঝা যায় এবং তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থের রচয়িতা জামাখশারীও তা গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) আয়াতটি পারস্যবাসীরা শব্দটি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে ফুরস (فرس) শব্দটি آخرين শব্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব নমুনা (মিসদাক) অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব নমুনার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। যদিও নিছক মিলে যাওয়াটাই কারো ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক নয়, তবে মহানবী (সা.) তাদেরকে (পারস্যবাসীদের) প্রশংসা করে বলেছেন : “যত দূরে ও কষ্টসাধ্য হলেও ঈমান, জ্ঞান বা

ইসলামকে তারা হস্তগত করবে।” আরেকদিকে মহানবী এ দু’আয়াতের তাফসীরে তাঁর বক্তব্য হুবহু পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং সালমান ফারসীর কাঁধে হাত রেখে মহানবীর এ কথা বলা এ দাবির পক্ষে স্পষ্ট দলিল।

بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد- এর তাফসীর :

তাওরাত গ্রন্থে আমরা বনি ইসরাইলকে জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীতে দু’বার ফিতনা করবে। অতঃপর যখন এ দু’ফিতনার প্রথমটি সমাগত হবে (তোমরা পৃথিবীতে প্রথমবার ফিতনা করবে) তখন আমার পক্ষ থেকে ঐ বা াদেরকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করব যারা আশ্চর্যজনক ক্ষমতার অধিকারী হবে যাতে তারা তোমাদের খোঁজে সর্বত্র অনুসন্ধান চালায়; আর এ ওয়াদা অবশ্যই পূরণ হবে। অতঃপর তোমাদের জন্য পুনরায় বিজয় ঘুরিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করব এবং তোমাদেরকে তাদের থেকে সংখ্যায় অধিক ও শক্তিশালী করে দেব। যদি তোমরা ভাল কর তাহলে তা হবে তোমাদের নিজেদের জন্য, আর যদি অন্যায় কর তাহলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতি বয়ে আনবে এবং যখন দ্বিতীয় ফিতনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে বিকৃত করে দেবে। যেমনভাবে তারা প্রথমবার প্রবেশ করেছিল তদ্রূপ তারা মসজিদের ভেতর প্রবেশ করবে এবং যা কিছুর ওপর তারা কর্তৃত্ব স্থাপন করবে তা পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে। - বনি ইসরাইল : ৪- ৭

রওযা- ই কাফী থেকে নুরুস সাকালাইন তাফসীরে (بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد) ‘আমরা তোমাদের ওপর আমাদের কতিপয় প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী বা াদের প্রেরণ করব’- এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : “তারা হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তি যাদেরকে মহান আল্লাহ্ কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাবের আগে প্রেরণ করবেন এবং তারা মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের যে শত্রুকেই আহবান করুক, তাকে হত্যা না করে ছাড়বে না।”

আইয়াশী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইমাম বাকির (আ.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি (بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد) - এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন এবং বলতেন : "সে কায়েম আল মাহদী এবং তার সাথীরা প্রভূত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।"

বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে (৬০তম খণ্ড, পৃ. ২১৬) ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম সাদিক (আ.) উপরিউক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন... আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : "আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত! এ সব ব্যক্তি কারা?" ইমাম সাদিক (আ.) তিনবার বললেন : "খোদার শপথ, তারা কোমের অধিবাসী। খোদার শপথ, তারা কোমের অধিবাসী। খোদার শপথ, তারা কোমের অধিবাসী।"

কিন্তু ইরানীদের প্রশংসা এবং ইসলামের হেদায়েতের পতাকা বহন করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সংক্রান্ত যে সব হাদীস শিয়া ও সুন্নী সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো অগণিত। যেমন আরবদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত:

শারহু নাহজিল বালাগাহ্ গ্রন্থে ইবনে আবীল হাদীদ বর্ণনা করেছেন : "একদিন আশআস ইবনে কায়েস ইমাম আলী (আ)- এর কাছে আসল এবং যারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল তাদেরকে অতিক্রম করে ইমাম আলীর খুব কাছে গেল। এরপর সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : হে আমীরুল মুমিনীন! আপনারা চারপাশে বসে থাকা এ সব গৌর মুখাবয়বের অধিকারীরা আমাদের ওপর প্রভাবশালী হয়ে গেছে। হযরত আলী এ কথা শুনে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকলেন এবং পা দিয়ে মিম্বারের ওপর আঘাত করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে আলী (আ.)- এর বিশিষ্ট সাহাবী সাসাআহ্ বললেন : আশআসের সাথে আমাদের কী কাজ আছে? আজ আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) আবরদের ব্যাপারে এমন কিছু বলবেন যা সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হবে এবং তা কখনো বিস্মৃত হবে না। এরপর আলী (আ.) মাথা উঁচু করে বললেন : এ সব ব্যক্তিত্বহীন পেট- পূজারীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমাকে অক্ষম করতে চায় এবং ন্যায়বিচার করার আদেশ দেয়? এ সব ব্যক্তি গাধার মতো নিজেদের বিছানায় গড়াগড়ি দেয় এবং অন্যদেরকে হিতোপদেশ শোনা থেকে বঞ্চিত করে। তুমি কি আমাকে এদেরকে (ইরানীদেরকে) তাড়িয়ে দেবার আদেশ দিচ্ছ? আমি কখনো

তাদেরকে তাড়িয়ে দেব না। তাহলে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। তবে ঐ খোদার শপথ, যিনি বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটিয়েছেন এবং বা াদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরা অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে যেমনভাবে প্রথমবার তোমরা ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলে।

আশআস ইবনে কায়েস ছিল অনেক বড় কি া গোত্রের অধিপতি ও মুনাফিকদের নেতা। সে এমন কতিপয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা হযরত আলীকে হত্যা করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। তার কন্যা জাদা ছিল ইমাম হাসানের স্ত্রী যে তাঁকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করেছিল। তার পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আশআস সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল।

এ রেওয়ায়েত অনুসারে, আশআস মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী নামাযীদের সর্বশেষ কাতারে না বসে কাতার ভেঙ্গে নামাযীদের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে এবং তাদেরকে এদিক- ওদিক সরিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। যখন সে নামাযীদের প্রথম কাতারে বা সামনে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন সে দেখতে পায় যে, অনেক ইরানী আলী (আ.)- এর মিম্বারের চারপাশে বসে আছে। আশআস ইমাম আলীর ভাষণ থামিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেছিল : "হে আমীরুল মুমিনীন! এ সব গৌর মুখাবয়বের অধিকারী ব্যক্তিরা আমাদের ওপর প্রভাবশালী হয়ে গেছে এবং প্রাধান্য পাচ্ছে।"

তবে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মিম্বারের ওপর পদাঘাত করে আশআসকে এ কথাই বুঝতে চেয়েছিলেন : তুমি কি বলছ? ইমাম কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন এবং তাকে জবাব দেবার চিন্তা করতে লাগলেন।

কিন্তু ইমাম আলী (আ.)- এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী সাসাআহ্ ইবনে সাওহান আবদী এ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন যে, আশআসের উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে জাতিগত ভিত্তিতে বিভক্ত করা যা একটি পার্থিব মানদণ্ড। আর তার দৃষ্টিতে নিঃসে হে প্রথম সারিটি আরবদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং (শ্বেতাঙ্গ) নও মুসলমানদের (অর্থাৎ ইরানীদের) উচিত নয় ইমাম আলীর নিকটবর্তী হওয়া। যেহেতু সাসাআহ্ আলী (আ.) যে সব নীতি অনুসারে জীবন- যাপন করতেন

সেগুলো সম্পর্কে জানতেন সেহেতু তিনি ভালোভাবে জানতেন যে, আশআসের প্রতি ইমাম আলী (আ.)- এর জবাব দাঁতভাঙ্গা হবে। এ কারণেই তিনি 'আশআসের সাথে আমাদের কী কাজ'- এ কথা বলে তাকে তিরস্কার করেছিলেন। যেহেতু আশআস ইরানীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বর্ণবাদী ও গোত্রীয় স্লোগান দিয়েছে, সে কারণেই আলী (আ.) আরবদের প্রতিকূলে ও ইরানীদের অনুকূলে মন্তব্য করেছেন ও এরূপ বক্তব্য দিয়েছেন। আশআসের কথা শুনে তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর তার থেকে মুখ ফিরিয়ে মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেছিলেন : "এ সব ব্যক্তিত্বহীনের মধ্য থেকে কে আমাকে অক্ষম করবে? কে এ ব্যাপারে ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা করবে যাদের না চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, আর না লক্ষ্য আছে; বরং এরা সবাই গর্দভ, নিদ্রালু ও প্রবৃত্তি- পূজারী।" তারা আমোদ- প্রমোদ, প্রাচুর্যের লালসা এবং পশুর মতো উদরপূর্তি করে নিজেদের ব্যক্তিত্বহীনতা ও অলসতার পরিচয় দিয়েও ক্ষান্ত হয় নি; বরং অন্যদেরকেও তারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করা থেকে বঞ্চিত করছে এবং তাদেরকে কটুক্তি করছে। কারণ, তাদের (ইরানীদের) অন্তঃকরণ জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহী। আর এ কারণেই তারা তাদের ইমাম ও নেতা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর মিম্বারের চারপাশে বসেছিল।

"হে আশআস! তুমি কি আমাকে আদেশ করছ যেভাবে নূহ (আ.)- এর একদল সম্পদশালী সমর্থক তাঁকে এ ধরনের অনুরোধ করেছিল : যে সব লোক আপনার চারপাশে আছে এবং আপনার অনুসরণ করছে, তারা তো হীন- নীচ ছাড়া আর কিছুই নয়- যাদের চিন্তা করার শক্তিও নেই। কখনোই আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেব না; বরং হে আশআস! হযরত নূহ তাঁর কওমের ঐ সব ব্যক্তিত্বহীন লোকদেরকে যে জবাব দিয়েছিলেন সেই জবাবটিই আমি তোমাকে দেব। নূহ বলেছিলেন : আমি তাদেরকে তাড়াব না; এমতাবস্থায় আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"

এরপর পরহেজগারদের নেতা যে সব ব্যক্তি তাঁর মিম্বারের আশে- পাশে বসেছিল তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শপথ করে বলেছিলেন : "ঐ আল্লাহর শপথ, যিনি বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটিয়েছেন এবং প্রাণীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা যেভাবে তাদেরকে (ইরানীদের) ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানোর জন্য যুদ্ধ করেছিলে তেমনি তারাও তোমাদেরকে ইসলাম ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনার

জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।” এ বিষয়টি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরবদের মাঝে অতি সত্বর এ ঐশী অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে, তারা ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং মহান আল্লাহ্ ইরানীদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন যারা আরবী ভাষাভাষী হবে না... এবং আরো প্রতীয়মান হয় যে, এ পর্যায়ে ইসলামের বিজয় ইরান থেকেই শুরু হবে। বাইতুল মুকাদ্দাস (আল কুদস) অভিমুখে তা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হবে এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।’

‘ঐ সব সিংহ যারা পলায়ন করবে না’- এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েত :

এ রেওয়ায়েতটি আহমদ ইবনে হাম্বল মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : “অতি সত্বর মহান আল্লাহ্ তোমাদের স্থান অনারবদের দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। তারা সিংহের মতো, তারা পলায়নকারী হবে না। তারা তাদের সাথে যুদ্ধরত পক্ষ ও তোমাদের শত্রুদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদের গনীমত ব্যবহার করবে না।”[২৫১]

এ রেওয়ায়েতটি আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থে হুযাইফাহ্, সামারাহ্ ইবনে জুনদুব এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন; তবে তিনি ‘তারা তোমাদের (যুদ্ধলব্ধ) গনীমত ব্যবহার করবে না’- এ বাক্যের পরিবর্তে ‘তারা ব্যবহার করবে’ উল্লেখ করেছেন।[২৫২]

‘সাদা- কালো দুম্বাসমূহ’ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত

মহানবী (সা.) বলেছেন : “কালো দুম্বাসমূহ আমার পেছনে হাঁটছে। অতঃপর এত অধিক সংখ্যক সাদা দুম্বা এসে তাদের সাথে যোগ দিল যে, আমি আর কালো দুম্বাগুলোকে দেখতেই পেলাম না।” আবু বকর বললেন : “এ কালো দুম্বাগুলো হচ্ছে আরব এবং শ্বেত দুম্বাগুলো হচ্ছে ‘আজম’, যারা তোমাদের অনুসরণ করবে এবং তাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাবে যে, তাদের মাঝে আর

আরবদেরকে দেখা যাবে না এবং তারা নগণ্য হবে।” মহানবী (সা.) বললেন : “ওহীর ফেরেশতা এভাবেই বর্ণনা করেছেন।”[২৫৩]

‘ইরানীরা আহলে বাইতের সমর্থক’ : এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েত

ইবনে আব্বাস থেকে হাফেয আবু নাঈম উপরিউক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : “মহানবী (সা.)- এর কাছে পারস্য সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি বলেছিলেন : ইরানীরা আমাদের (আহলে বাইতের) সমর্থক ও বন্ধু।”[২৫৪]

‘আজম মহানবীর বিশ্বাসভাজন’ এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েত :

এ রেওয়ায়েতটি আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন : “মহানবী (সা.)- এর কাছে মাওয়ালী ও আজমীদের ব্যাপারে কথা উঠলে তিনি বলেছিলেন : মহান আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের চেয়ে (অথবা তোমাদের কতিপয় ব্যক্তির চেয়ে) তাদের ওপর বেশি নির্ভর করি।”[২৫৫]

প্রায় একই অর্থের হাদীস তিরমিযীও তাঁর হাদীসগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে আজম (অনারব) সাধারণ অর্থজ্ঞাপক এবং ইরানী ও সকল অনারব, যেমন তুর্কীদেরকেও শামিল করে।[২৫৬]

‘জনগণ পারস্যবাসী ও রোমীয়গণ ব্যতীত অন্য কেউ নয়’-এ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত :

আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতটি আবু হুরাইরাহ্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন : “আমার উম্মত পূর্ববর্তী উম্মত এবং তাদের আগের প্রজন্মগুলো যা কিছু পেয়েছিল সে সব হুবহু পাবে।” তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : “হে রাসূলাল্লাহ্! যেমনভাবে পারসিক ও রোমানরা

অর্জন করেছে তেমন?” তখন তিনি বলেছিলেন : “পারস্যবাসী এবং রোমীয়গণ ব্যতীত জনগণ কারা?”[২৫৭]

এ রেওয়ায়েত সভ্যতার ইতিহাসের একটি বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে; আর তা হলো ইতিহাসে পারস্য (আজম) এবং রোমীয়গণ অর্থাৎ পাশ্চাত্য মানব সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু বলে গণ্য এবং বর্তমান যুগেও আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, পারস্যজাতি অর্থাৎ ইরানীদের মতো আর কোন জাতিই সভ্যতাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত নয়।

ইরানী জাতি এবং ইমাম মাহ্দী এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের শুভ সূচনা -(.আ)

শিয়া- সুন্নী হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে ইমাম মাহদী (আ.)- এর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে যে, তাঁর পক্ষে যে প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক বিপ্লব ও আ ালন সফল হবে সেই বিপ্লব ও আ ালনের পরই তিনি আবির্ভূত হবেন এবং কালো পতাকাসমূহের বাহক হবে ইরানী জাতি যারা তাঁর সরকার ও প্রশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী এবং তাঁর শাসন কর্তৃত্বের প্রাথমিক পূর্ব পদক্ষেদসমূহ বাস্তবায়নকারী। এসব রেওয়ায়েতে ঐকমত্য আছে যে, দু’জন প্রতিশ্রুত ব্যক্তিত্ব খোরাসানী সাইয়্যেদ অথবা খোরাসানী হাশিমী এবং তাঁর সাহায্যকারী শুআইব ইবনে সালিহ্ উভয়ই ইরানী হবেন। এ দু’ব্যক্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ শিয়া- সুন্নী হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে বিদ্যমান।

তবে শিয়া হাদীস সূত্রসমূহে ইরানী জাতি ছাড়াও ‘ইয়েমেনিগণ’ নামে খ্যাত অন্য এক জাতিকেও ইমাম মাহদী (আ.)- এর আর্বিভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিয়া সূত্র ও গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রেওয়ায়েত থেকে সার্বিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের পূর্বে সংগ্রামকারী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী বিভিন্ন সরকার, শক্তি বা আ ালন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যেমন এ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, “তিনি আসবেন এবং মহান আল্লাহর জন্য কোষমুক্ত একটি তরবারী তখনও বিদ্যমান থাকবে।” অবশ্য এ ধরনের রেওয়ায়েত যদি থেকে থাকে। কারণ, ইয়াওমুল খালাস গ্রন্থের রচয়িতা উপরিউক্ত হাদীসটি

পাঁচটি সূত্র উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ঐ সব সূত্রে আমি ঐ রেওয়ায়েতটি পাই নি। তবে তিনি আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রের কথা সূত্রসহ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যেন আমাদেরকে সূক্ষ্মদর্শী ও বিশ্বস্ত করেন।... যেমন ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত আবান ইবনে তাগলিবের রেওয়ায়েতটি। তিনি বলেছেন : "আমি ইমাম সাদিক (আ.)- কে বলতে শুনেছি যখন সত্যের পতাকা উড্ডীন হবে তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সেই পতাকাকে অভিশাপ দিতে থাকবে। তুমি কি জান, কি কারণে তারা অভিশাপ দেবে? আমি বললাম : না। তখন তিনি বললেন : তার (মাহদী) আবির্ভাবের পূর্বেই (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের) জনগণ মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত এবং তাঁর বংশধরদের কাছ থেকে যে বিষয়ের সম্মুখীন হবে সেজন্য।"[২৫৮]

এ রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর (ইমাম মাহদী) আহলে বাইত বনি হাশিমের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর অনুসারীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট করবে। শত্রুরা যখনই তাঁর আবির্ভাবকামী আন্দোলনের মুখোমুখি হবে তখনই তা হবে তাদের জন্য এক বিরাট বিপদ যার ফলে তারা ঘাবড়ে যাবে। আমরা ইতোমধ্যে যে রেওয়ায়েতটি بعثنا عليكم عبادا لنا بأس شديد - এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় 'রওযাতুল কাফী' গ্রন্থে থেকে উল্লেখ করেছি তা ইমাম জাফর আস সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "মহান আল্লাহ্ যে দলকে আল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বেই আবির্ভূত করবেন তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বংশধরদের কোন শত্রুকেই জীবিত রাখবে না।"

আরো অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের বিষয়টি সামরিক শক্তি ও বিশ্বব্যাপী প্রচার কার্যক্রমের সাথে জড়িত এবং কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত ও আলোচিত হতে থাকবে।

সুতরাং ইমাম মাহদী (আ.)- এর ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

ক. কালো পতাকাবাহীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ যেগুলোর ব্যাপারে শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে।

খ. ইয়েমেনীর প্রশাসন ও সরকার সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ যেগুলো কেবল শিয়া হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সব রেওয়ায়েতের সদৃশ কিছু রেওয়ায়েত ও হাদীস সুন্নী সূত্র ও গ্রন্থসমূহেও বিদ্যমান আছে যেগুলোয় বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের পরে ইয়েমেনীর আবির্ভাব হবে।

গ. ঐ সব রেওয়ায়েত যেগুলোয় ইমাম মাহদী (আ.)- এর ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের আবির্ভাব ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি তাদেরকে পরিচিতি দান না করেই বর্ণিত হয়েছে। তবে অতি সত্বর আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এ সব রেওয়ায়েত সঠিকভাবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর ইরানী ও ইয়েমেনী সঙ্গীদেরকেই নির্দেশ করে যারা তাঁর হুকুমতের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হবে।

তবে রেওয়ায়েতসমূহে ইয়েমেনীদের হুকুমত প্রতিষ্ঠার সময়কাল নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছরেই এবং সিরিয়ায় সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের সমসাময়িক অথবা সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের নিকটবর্তী সময় ইয়েমেনীদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, সুফিয়ানী ইমাম মাহদীর শত্রু ও বিরোধী হবে।

তবে ইরানী ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের হুকুমতের দু'টি পর্যায় রয়েছে। যথা :

প্রথম পর্যায় : কোম থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ইরানীদের আন্দোলনের শুভ সূচনা। আর এ ব্যক্তির আন্দোলনই হবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সূচনা স্বরূপ। কারণ, রেওয়ায়েতসমূহে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদীর আন্দোলনের শুভ সূচনা প্রাচ্য (ইরান) থেকে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায় : ইরানীদের মাঝে খোরাসানী সাইয়্যেদ এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও শ্যামল বর্ণের যুবক- রেওয়ায়েতসমূহে যাঁর নাম 'শুআইব ইবনে সালিহ্' বলে উল্লিখিত হয়েছে- এ দুই প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আবির্ভাব।

যে সব ঘটনা হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের ভূমিকা চার পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা :

১। কোম থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ইরানীদের আ ালনের সূচনা থেকে তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া পর্যন্ত।

২। এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে তাদের জড়িয়ে যাওয়া থেকে শত্রুদের ওপর নিজেদের প্রত্যাশা ও দাবিসমূহ চাপিয়ে দেয়া পর্যন্ত।

৩। নিজেদের ঘোষিত প্রাথমিক দাবি ও প্রত্যাশাসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তাদের ব্যাপক উত্থান ও সংগ্রাম।

৪। ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে তাদের পতাকা অর্পণ এবং তাঁর বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার আ ালনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইরানীদের যুদ্ধকালে খোরাসানী ও শুআইবের আবির্ভাব হবে। আর তা এভাবে যে, শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হয়ে যাচ্ছে দেখে ইরানীরা খোরাসানীকে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি পরিচালনা করার জন্য মনোনীত করবে যদিও তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হবেন না। তবুও তারা তাঁকেই তাদের প্রশাসক পরিচালক ও নেতা নির্বাচিত করবে। এরপর খোরাসানী সাইয়্যেদ শুআইব ইবনে সালিহকে তাঁর সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করবেন।

কিছু কিছু রেওয়ায়েতে ইরানীদের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের সর্বশেষ পর্যায়ের সময়কাল ছয় বছর বলে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সর্বশেষ পর্যায় ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সাথেই যুক্ত থাকবে। এ সময়কালটা হবে শুআইব ও খোরাসানীর পর্যায়। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে : "খোরাসান থেকে বনি আব্বাসের কতিপয় কালো পতাকা এবং তারপর অন্যান্য কালো পতাকা বের হবে যেগুলোর বাহকরা কালো টুপি ও সাদা পোশাক পরিহিত থাকবে। তাদের অগ্রভাগে এক ব্যক্তি থাকবেন যাঁকে সালিহ্ ইবনে শুআইব অথবা শুআইব ইবনে সালিহ্ বলা হবে। তিনি বনি তামীম গোত্রীয় হবেন। তারা সুফিয়ানী বাহিনীকে পরাজিত করবে

এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবে যাতে করে তারা ইমাম মাহদীর হুকুমতের ক্ষেত্র প্রস্তত করতে সক্ষম হয়। শামদেশ থেকে তিনশ’ ষাট ব্যক্তি তাঁর (শুআইব ইবনে সালিহ) সাথে যোগ দেবে। তাঁর আবির্ভাব এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করার মধ্যে ব্যবধান হবে ৭২ মাস।”[২৫৯]

এসব হাদীসের বিপরীতে আরো রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, খোরাসানী ও শুআইবের আবির্ভাব ইয়েমেনী ও সুফিয়ানীর আবির্ভাবকালের সমসাময়িক হবে।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত : “খোরাসানী, সুফিয়ানী ও ইয়েমেনীর আবির্ভাব একই বছর, একই মাস ও একই দিনেই হবে। এসব পতাকার মধ্যে ইয়েমেনীর পতাকা সবচেয়ে হেদায়েতকারী হবে। কারণ, সে জনগণকে সত্যের দিকে আহবান করবে।”[২৬০]

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “সুফিয়ানী, ইয়েমেনী এবং খোরাসানীর আবির্ভাব একই বছরের একই মাস এবং একই দিনে হবে অর্থাৎ তাদের আবির্ভাব তাসবীহের দানাগুলোর সদৃশ একের পর এক সংঘটিত হবে। সবদিকেই যুদ্ধ বেধে যাবে। ঐ ব্যক্তিদের জন্য আক্ষেপ যারা তাদের (ইয়েমেনী ও খোরাসানীর) বিপক্ষে দাঁড়াবে। এসব পতাকার মধ্যে ইয়েমেনীর পতাকাই হবে সবচেয়ে হেদায়েতকারী। তা হবে সত্যের পতাকা এবং তোমাদের অধিপতি নেতার (ইমাম মাহদী) দিকে আহবান জানাবে।” [২৬১]

বাহ্যত তাসবীহের দানাগুলোর মতো ধারাবাহিকভাবে এ তিনজনের আবির্ভাব ও আে ালন একই দিনে সংঘটিত হবে বলার সম্ভাব্য অর্থ হচ্ছে এ তিন জনের আবির্ভাব ও আে ালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ একটির সাথে আরেকটি রাজনৈতিক সূত্রে গ্রোথিত থাকবে এবং তাদের আবির্ভাবের সূচনাও একই দিবসে হবে। তবে তাদের আে ালনের ধারাক্রম এবং তাদের যাবতীয় বিষয়ের দৃঢ়তা তাসবীহের দানাগুলোর মতো একের পর এক সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হবে।

অধিকন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে খোরাসানীর আবির্ভাব ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব ও আে ালনের মধ্যে সময়গত ব্যবধান যে বায়াত্তর মাস বলে উল্লিখিত হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য।

কারণ, তা মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ্ থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়ার কাছে তাঁর পিতা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর লিখিত পত্র ছিল যা মহানবী (সা.)- এর বাণী। এতে ভবিষ্যতের যাবতীয় ঘটনার বিবরণ ছিল; বরং কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে এতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মুসলমানদের সকল শাসনকর্তার নাম লিখিত ছিল। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র আবু হাশিম এ লিখিত পত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। আব্বাসীদের মধ্য থেকে যারা শাসনকর্তৃত্ব লাভ করবে তাদের নামও এতে ছিল।

এতদসত্ত্বেও খোরাসানী ও শুআইবের ব্যাপারে ঐ সব রেওয়ায়েত উত্তম বলে মনে হয় যেগুলোয় বর্ণিত হয়েছে যে, খোরাসানী ও শুআইবের আবির্ভাব সুফিয়ানী ও ইয়েমেনীর আবির্ভাবের সমসাময়িক হবে। কারণ, এ রেওয়ায়েতগুলো আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এগুলোর সনদ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়; বরং এ সব রেওয়ায়েতে সহীহ সনদবিশিষ্ট (যে রেওয়ায়েতের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত) হাদীসও বিদ্যমান, যেমন আবু বাসীর কর্তৃক বর্ণিত ইমাম বাকির (আ.)- এর হাদীস।

যাহোক, যদি আমরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর হুকুমতের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের সরকার ও প্রশাসনের পর্যায় তাঁর আবির্ভাবের এক বছর আগে অথবা সম্ভাবনার ভিত্তিতে ছয় বছর আগে বাস্তবায়িত হবে বলে ধরে নিই তাহলে এ পর্যায়টি হবে তাদের হুকুমতের শেষ পর্যায়। তবে তাদের হুকুমত ও রাষ্ট্রের সর্বশেষ পর্যায়ের পূর্ববর্তী পর্যায়সমূহ সম্পর্কে জানাই অপেক্ষাকৃত দূরূহ মনে হয়। অর্থাৎ কোমের এক ব্যক্তির দ্বারা তাদের হুকুমতের সূচনা এবং খোরাসানী সাইয়্যেদ ও শুআইবের আবির্ভাবের মধ্যে কী পরিমাণ সময়গত ব্যবধান আছে তা জানা আসলে বেশ কঠিন। এটি ইরানীদের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহের পরম্পরায় একটি হারানো অংশ হবে। আর আমি রেওয়ায়েতসমূহে দেখি নি যে, তা কী পরিমাণ ছিল।... তবে কতিপয় রেওয়ায়েতে এ প্রসঙ্গে কিছু ইশারা বিদ্যমান যা আমরা ইরানীদের হুকুমত সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা করার পরই উল্লেখ করব।

ইরান থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর হুকুমতের সূচনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত

এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে একটি হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচ্য থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আ ালনের শুভ সূচনা হবে। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন :

"তার আবির্ভাবের সূচনা প্রাচ্য থেকে হবে। আর যখন এ বিষয়টি সংঘটিত হবে তখন সুফিয়ানী আবির্ভূত হবে।"[২৬২]

আরেক দিকে আলেমদের যে ব্যাপারে ঐকমত্য আছে এবং যা রেওয়ায়েতসমূহে মুতাওয়াতির[২৬৩] সূত্রে বর্ণিত তা হচ্ছে, ইমাম মাহদী (আ.) পবিত্র মক্কায় আবির্ভূত হবেন। সুতরাং 'প্রাচ্য থেকে তার আ ালনের সূত্রপাত হবে'- আমীরুল মুমিনীন আলীর এ হাদীসটির কাঙ্ক্ষিত অর্থ অবশ্যই এটি হবে যে, তাঁর আ ালন প্রাচ্য অর্থাৎ ইরান থেকে শুরু হবে। একইভাবে উক্ত রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর আ ালনের সূত্রপাত সুফিয়ানীর আবির্ভাবের আগেই হবে এবং তাঁর আবির্ভাবের সূত্রপাত ও সুফিয়ানীর আবির্ভাবের মাঝে সময়গত ব্যবধান খুব বেশিও হবে না, আবার খুব কমও হবে না। কারণ, রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদীর আ ালন সুফিয়ানীর আ ালনের সাথে واو (এবং) অব্যয় দ্বারা সংযোজিত হয়েছে, তা ف ও ثُمَّ (যেগুলোর অর্থ অতঃপর বা তারপর) দ্বারা সংযোজিত হয় নি। উল্লেখ্য যে, ف ও ثُمَّ অব্যয়দ্বয় ব্যবধান নির্দেশক; বরং বলা যায়, এ রেওয়ায়েতটি ইরান থেকে ইমাম মাহদীর হুকুমত ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীর কার্যক্রমের সূচনা এবং সুফিয়ানীর আবির্ভাবের মাঝে এক ধরনের কার্যকারণগত সম্পর্ক নির্দেশ করে। আপনাদের স্মরণে আছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব, অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের পটভূমি ও ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইসলামী আ ালনের জোয়ারের উত্তরোত্তর প্রসারের মোকাবিলায় সুফিয়ানীর আ ালন হবে নিছক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর উম্মত এবং তাঁর আহলে বাইতের বংশধারার এক ব্যক্তির হুকুমত সংক্রান্ত রেওয়ায়েত

যে রেওয়ায়েতটি আবু বাসীর ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন তা এ প্রসঙ্গে বিদ্যমান রেওয়ায়েতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

সাদিক (আ.) বলেছেন : “হে আবু বাসীর! অমুকের বংশ যতক্ষণ মসনদে উপবিষ্ট থাকবে এবং তাদের শাসনক্ষমতা ধ্বংস না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা.)- এর উম্মত সাচ্ছ য্ লাভ করবে না। ঐ বংশ নির্মূল হওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আহলে বাইতের বংশধারার এক ব্যক্তির কাছে হুকুমত অর্পণ করবেন যার কর্মপদ্ধতি হবে তাকওয়াভিত্তিক এবং কর্মকাণ্ড হবে জনগণের জন্য সুপথপ্রদর্শনকারী। সে জনগণের মাঝে বিচার- ফয়সালার ক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণ করেেব না। মহান আল্লাহর শপথ, আমি তার নাম ও তার পিতার নাম পর্যন্ত জানি। তখন ঐ শক্তিশালী ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি যার মুখমণ্ডলে একটি তিলের চিহ্ন এবং দেহের ত্বকে আরো দু’টি চিহ্ন বিদ্যমান সে হবে একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা এবং তার কাছে যা কিছু আমানত হিসাবে রাখা হয়েছে তার রক্ষক। পৃথিবীকে পাপীরা যেমনভাবে অন্যায়- অত্যাচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে তেমনি সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে।”[২৬৪]

এটি একটি উল্লেখযোগ্য রেওয়ায়েত; তবে আফসোসের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ হাদীসটির শেষাংশ অসম্পূর্ণ। ‘বিহার’ গ্রন্থের সংকলক এ রেওয়ায়েতটি সাইয়্যেদ ইবনে তাউস প্রণীত ‘ইকবাল’ নামক গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছেন। ‘ইকবাল’ গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর গ্রন্থের ৫৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ রেওয়ায়েতটি ৩৬২ হিজরীতে বাতায়েনীর ‘আল মালাহিম’ গ্রন্থে দেখেছেন এবং ঐ গ্রন্থ থেকে তিনি এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন, তবে তা অসম্পূর্ণ; অর্থাৎ তিনি তা পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করেন নি। বাতয়েনী ইমাম সাদিক (আ.)- এর অন্যতম সাথী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য এ গ্রন্থটি মুসলিম দেশগুলোর আনাচে- কানাচের গ্রন্থাগারসমূহে অজানা হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহের মাঝে থাকতে পারে।

রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সম্মানিত সাইয়্যেদ আহলে বাইতের বংশধারার হবেন যিনি ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। তিনি জনগণকে তাকওয়া- পরহেজগারীর দিকে পরিচালিত করবেন এবং ইসলামের বিধি- বিধানের ভিত্তিতে তিনি

আমল করবেন। তিনি উৎকোচগ্রহীতা হবেন না। এই সাইয়্যেদ যাঁর কথা এ রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে তাঁর ইমাম খোমেইনী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে ‘অমুকের বংশ যতক্ষণ মসনদে উপবিষ্ট থাকবে’- ইমামের এ কথার মধ্যে ‘অমুকের বংশ’- এর অর্থ যে বনি আব্বাস হবে- এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা প্রতিপন্ন হয় না; অথচ সাইয়্যেদ ইবনে তাউস ‘অমুকের বংশ’ বলতে বনি আব্বাসকেই বুঝিয়েছেন। একইভাবে অন্য যে সকল রেওয়ায়েতে ইমামগণ ‘অমুক ও অমুকের বংশ’ বলেছেন অবশ্য সেগুলোয় তাঁদের এ ধরনের উক্তির অর্থ হলো কখনো কখনো বনি আব্বাস এবং কখনো ঐ সব বংশ যারা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে রাজত্ব করবে। যেমন যে সব রেওয়ায়েতে হিজাযের শাসনকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত অমুকের বংশ ও অমুকের বংশের মধ্যকার মতবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে তার অর্থ হলো তারা নিজেদের মধ্য থেকে কোন শাসনকর্তা (বাদশাহ্) নিযুক্ত করার ব্যাপারে ঐকমত্যে আসতে পারবে না। আর এ ধরনের অবস্থাতেই ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন। উদাহরণস্বরূপ আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) থেকে বর্ণিত নি োক্ত রেওয়ায়েত। এতে তিনি বলেছেন : “অমুকের বংশের রাজত্বের পতনের ব্যাপারে কি আমি তোমাদেরকে অবহিত করব না?” আমরা বললাম : “জি। হে আমীরুল মুমিনীন!” তিনি বললেন : “কুরাইশ বংশীয় এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হারাম এলাকায় হত্যা করা হবে। ঐ আল্লাহ্ যিনি বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটনা এবং সকল অস্তিত্বশীল সত্তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তাঁর শপথ, এ হত্যাকাণ্ডের পনের রাত পরে তাদের (ঐ বংশের) রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে।”[২৬৫]

এ রেওয়ায়েতটি ছাড়াও আরো বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত আছে যেগুলোয় অমুকের বংশের মধ্যকার বিরোধ ও মতপার্থক্য অথবা তাদের মধ্যকার এক অত্যাচারী শাসকের মৃত্যুর পর সুফিয়ানীর আবির্ভাব অথবা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিকটবর্তী কালের কতিপয় নিদর্শনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অতএব, এ রেওয়ায়েতে উল্লিখিত ‘অমুকের বংশ’- কে অবশ্যই বনি আব্বাস বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, তাদের রাজত্ব শত শত বছর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বরং যে সব রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে ‘বনি আব্বাস’ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো অবশ্যই সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা ও বাছাই করা দরকার। কারণ, ইমামদের থেকে এ সব রেওয়ায়েত ‘অমুকের সন্তানগণ’ এবং ‘অমুকের বংশধররা’- এরূপ উক্তি সহকারে বর্ণিত হয়েছে। আর রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) নিজেই এ ধরনের উক্তিকে পরিবর্তিত করে ‘বনি আব্বাস’ বলে বর্ণনা করেছেন এ বিশ্বাস নিয়ে যে, ইমামদের এ উক্তি অর্থাৎ ‘অমুকের সন্তানরা’- এর কাঙ্ক্ষিত অর্থ হচ্ছে বনি আব্বাস।

কখনো কখনো আবির্ভাব সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে ‘অমুকের বংশ’- এ উক্তিটিকে বনি আব্বাস বলে ব্যাখ্যা করা সঠিক হবে। কারণ, বনি আব্বাসের নাম উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে তাদের অনুসৃত পদ্ধতি ও কর্মকাণ্ড যা সর্বদা মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের পবিত্র ইমামদের পথ ও পদ্ধতির ঠিক বিপরীত ছিল। তাই বনি আব্বাস বলার অর্থ স্বয়ং আব্বাসিগণ এবং তাদের বংশধারা নয়। অবশ্য খুব কদাচিৎ এ ধরনের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে। কারণ, অধিকাংশ রেওয়ায়েতে ‘অমুকের বংশ ও সন্তানগণ’- এ ধরনের উক্তি বিদ্যমান।

যাহোক আলোচ্য রেওয়ায়েতে (অমুকের বংশ যতক্ষণ মসনদে উপবিষ্ট থাকবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাসনকর্তৃত্ব ধ্বংস না হবে ততক্ষণ... এবং তাদের রাজত্ব ও শাসনের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে মহান আল্লাহ্ আহলে বাইতের বংশধারার এক ব্যক্তির হাতে শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করবেন।) উল্লিখিত ‘অমুকের বংশ’ বলতে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে যারা আব্বাসী বংশোদ্ভূত নয়। আর তাদের পরেই প্রতিশ্রুত সাইয়্যেদ আবির্ভূত হবেন এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

কিন্তু ‘ঐ শক্তিশালী ও ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি যার মুখমণ্ডলে তিলের চিহ্ন এবং দেহের ত্বকে আরো দু’টি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে তিনি হবেন একজন্য ন্যায়পরায়ণ নেতা’- এ উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সাইয়্যেদের পর আরো কোনো ব্যক্তি আসবেন। যার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, তিনি ইমাম মাহদী (আ.) হবেন। আর তিনিই এ সব চিহ্নের অধিকারী হবেন। আর এ রেওয়ায়েতেও তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে ঐ সব নিদর্শনের উল্লেখ আছে। তবে ‘শক্তিশালী ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি’- এ

ধরনের উক্তি ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে খাপ খায় না এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে মিলে না। কারণ, সকল রেওয়ায়েত ও হাদীসে ইমাম মাহদী (আ.)-কে দীর্ঘকায় ও নিখুঁত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রেওয়ায়েতের এক বা একাধিক অংশ সাইয়্যেদ ইবনে তাউস অথবা অন্য কোন রাবীর বর্ণনা করার সময় বাদ পড়ে যেতেও পারে। আর ঐ শক্তিশালী ও ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিটির আগমন আমাদের আলোচিত সাইয়্যেদের পরপরই হবে এবং তাঁর আরো কিছু বৈশিষ্ট্য এ রেওয়ায়েত থেকে বাদ পড়ে গেছে। তাই আমাদের বহুল আলোচিত এ সাইয়্যেদের শাসনামল যে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে তা এ রেওয়ায়েত থেকে প্রতিভাত হয় না।

কোম এবং এ নগরীর প্রতিশ্রুত ব্যক্তি সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোম থেকে এক ব্যক্তি ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদের উত্থান ও বিপ্লব সংক্রান্ত রেওয়ায়েতটি বিদ্যমান। ইমাম কাযিম (আ.) থেকে বর্ণিত :

"কোমের এক ব্যক্তি জনগণকে মহান আল্লাহর দিকে আহবান জানাবে। তাঁর চারপাশে এমন সব ব্যক্তি সমবেত হবে যাদের অন্তঃকরণ লোহার টুকরার মতো দৃঢ় হবে। যাদেরকে ঘটনাপ্রবাহের ঝড় মোটেও টলাতে করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করে ক্লান্ত হবে না। তারা যুদ্ধকে ভয় করবে না। কেবল তারা মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। আর মুত্তাকী- পরহেজগারদের জন্যই হচ্ছে চূড়ান্ত শুভ পরিণতি।"[২৬৬]

একইভাবে এর পরবর্তী বিষয়াদি কোম নগরীর সাথে সম্পর্কিত। উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, ইমাম কাযিম (আ.) এ রেওয়ায়েতে কোমের এক ব্যক্তি- এ উক্তিটি করেছেন। তিনি বলেননি : "কোমবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি।" তাই এ বাক্যটি হযরত ইমাম খোমেইনীর ওপর আরোপ করা যায়। কারণ তিনি ছিলেন খোমেইন শহরের অধিবাসী এবং কোমে বসবাসকারী। আর তিনি 'জনগণকে মহান আল্লাহর দিকে আহবান জানাবেন'- এ বাক্যটি থেকে

যে তিনি কেবল কোমের অধিবাসীদেরকে অথবা প্রাচ্যবাসীদেরকে আহবান জানাবেন তা প্রতিভাত হয় না। (বরং তিনি যে সমগ্র বিশ্ববাসীকেই মহান আল্লাহর দিকে আহবান জানাবেন সেটাই প্রতিপন্ন হয়); আর শত্রুদের তীব্র শত্রুতা এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষ যে তাঁর ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও তাঁরা এতটা দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করেছেন যে, তাঁরা সামান্য পরিমাণও টলেননি ও বিচ্যুত হন নি।

এ ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাঁর আবির্ভাবকাল এ রেওয়ায়েতে নির্দিষ্ট করা হয় নি। কিন্তু ইমাম খোমেইনীর আগে এতসব উল্লেখযোগ্য ও বিরল বৈশিষ্ট্যসমেত এ ধরনের ব্যক্তি ও সঙ্গী- সাথীদের কোন নজীর কোম ও সমগ্র ইরানের ইতিহাসে বিদ্যমান নেই। অবশ্য এ রেওয়ায়েতটি অসম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। অথবা ইমাম কোন এক উপলক্ষে এ কথা বলে থাকতে পারেন। তবে ‘বিহারুল আনওয়ার’ গ্রন্থের সংকলক আল্লামা মাজলিসী (রহ.) এ রেওয়ায়েতটি এক হাজার বছর আগে হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আল হাসান কোমী কর্তৃক রচিত কোমের ইতিহাস গ্রন্থ (কিতাব- ই তারীখ- ই কোম) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্য পরিতাপের বিষয় যে, উক্ত গ্রন্থের কপি এখন দুষ্প্রাপ্য।

কখনো কখনো বলা হয় যে, এটা ঠিক যে, কোম ও ইরানের ইতিহাসে এতসব বিরল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সঙ্গী- সাথীসমেত এ ধরনের প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা কারো জানা নেই, তবে এ রেওয়ায়েতটি যে ইমাম খোমেইনী ও তাঁর সাথীদের ওপর আরোপ করা যাবে এমন কোন দলিল- প্রমাণও বিদ্যমান নেই; বরং এ রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য হতে পারে অন্য কোন ব্যক্তি এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীরা যাঁরা আমাদের যুগে আবির্ভূত হবেন অথবা দীর্ঘ সময় বা অল্প কিছুকাল পরে আসবেন।

উত্তর : এটা ঠিক যে, রেওয়ায়েতে প্রতিশ্রুত এ ব্যক্তির আবির্ভাবের সময়কাল নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করা হয় নি। তবে অন্যান্য অনেক রেওয়ায়েতে কোম ও ইরান সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা ছাড়াও এ রেওয়ায়েতে যে সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় সে সব উল্লিখিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হচ্ছেন স্বয়ং ইমাম খোমেইনী এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীরা। সুতরাং মহানবী

(সা.) ও ইমামগণ যদি কোন ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন যা বর্তমানে বিদ্যমান অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ খাপ খায়, তাহলে তা উপেক্ষা করে অনাগত ভবিষ্যৎ কালে এতদসদৃশ বা এ ঘটনার চেয়েও স্পষ্ট অন্য কোন ঘটনার ওপর তা আরোপ করা মোটেও যুক্তিসংগত হবে না।

কোম এবং এ নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত যে সব রেওয়ায়েত আহলে বাইত থেকে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো থেকে ভালোভাবে বোঝা যায় যে, এ নগরী তাঁদের কাছে এক বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল; বরং ইমাম বাকির (আ.) কর্তৃক ৭৩ হিজরীতে ইরানের বুকে এ নগরীর গোড়াপত্তন হয়েছিল। তাই এ নগরীর প্রতি ইমাম বাকির (আ.) সবসময় বিশেষ দৃষ্টি দান করেছেন।

আহলে বাইতের ইমামগণ তাঁদের প্রপিতামহ রাসূলে খোদা (সা.) থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার দ্বারা তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ভবিষ্যতে এ পবিত্র নগরী এক বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবে এবং এ নগরীর অধিবাসীরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশ্বস্ত সঙ্গী- সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কতিপয় রেওয়ায়েতে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, এ পবিত্র নগরীর নাম কোম যা আল কায়েম বিল হাক্ব (সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত) ইমাম মাহদী (আ.)- এর নামের সাথে জড়িত এবং তাঁর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য কোমবাসীদের উত্থান ও বিপ্লবের সাথেও এ নাম সামঞ্জস্যপূর্ণ; আরেক দিকে এ শহরের গোড়াপত্তনকালে এ শহরের অদূরে ‘কামানদান’ বা ‘কামাদ’ নামের একটি জনপদের অস্তিত্ব এতদর্থে নয় যে, এ শহরের নামকরণ কালে আরবী ‘কোম’ (قم) শব্দের অর্থ বিবেচনায় আনা হয় নি এবং এ সম্পর্কে চিন্তা ব্যতীতই এ নগরীর নাম ‘কোম’ রাখা হয়েছে অথবা এমনিতেই এর ফার্সী নামে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন ইমাম বাকির (আ.) ও ইমাম সাদিক (আ.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ও আলেমদের পক্ষ থেকে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে এ নগরীর গোড়াপত্তন সাধিত হয়েছিল...। ইমাম সাদিক (আ.) থেকে আফফান বাসরী বর্ণনা করেছেন : “ইমাম সাদিক (আ.) আমাকে বলেছেন : তুমি কি জান যে, কেন এ শহরের নাম ‘কোম’ রাখা হয়েছে? আমি

বললাম : মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)- ই এ ব্যাপারে অধিক অবগত। তিনি বললেন : নিশ্চয়ই 'কোম' এ কারণে রাখা হয়েছে যে, কোমের অধিবাসীরা আল কায়েম আল মাহদীর চারপাশে সমবেত হয়ে তার সাথে কিয়াম (আ ালন ও বিপ্লব) করবে, তার পাশে দৃঢ়পদ থাকবে এবং তাকে সাহায্য করবে।"[২৬৭]

এ রেওয়ায়েত এবং এ ধরনের রেওয়ায়েতসমূহ আবদুল্লাহ্ ইবনে মালিক আল আশআরী, তাঁর ভাই আহওয়াস এবং তাঁদের সমর্থকগণ কর্তৃক পবিত্র কোম নগরীর পত্তন সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণস্বরূপ। উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তিবর্গ সকলেই ইমাম বাকির (আ.)- এর বিশেষ সাথী এবং তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ সকল রেওয়ায়েত থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইমাম বাকির (আ.)- এর নির্দেশে এ নগরীটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। আর 'কোম' নামটি স্বয়ং ইমাম বাকির (আ.)- ই নব্য প্রতিষ্ঠিত এ নগরীটির জন্য নির্বাচন করেছিলেন। রেওয়ায়েতসমূহে 'কোম' নামটি পুংলিঙ্গ হিসাবে 'নগর' (بلد) অর্থে এবং স্ত্রী লিঙ্গ হিসাবে 'নগরী' (بلدة) অর্থেও উল্লিখিত হয়েছে। এ শব্দটি যেমন মুনসারিফ (ব্যাকরণগত শব্দ প্রকরণ প্রক্রিয়ার নিময়াবলীর দ্বারা যে শব্দ পরিবর্তিত হয়) আকারে তেমনি গায়ের মুনসারিফ (ব্যাকরণগত শব্দ প্রকরণ প্রক্রিয়ার নিয়মাবলী দ্বারা যে শব্দ পরিবর্তিত হয় না) আকারেও আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কতিপয় রেওয়ায়েতের বাহ্য অর্থ হচ্ছে এটাই যে, ইমামগণ কোম নগরীর ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তাঁরা একটি শহর এবং এর অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থের চেয়েও ব্যাপকতর ও উত্তম অর্থে এ নগরীকে অভিহিত করেছিলেন। তাই এ নামটি তাঁরা আহলে বাইতের বেলায়েত প্রতিষ্ঠার জন্য এ এলাকার অধিবাসীদের সব সময় দণ্ডায়মান (قم) থাকা এবং উত্থানের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহার করেছেন বিশেষত প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গে তাদের সংগ্রামী ভূমিকার কারণে। এ কারণেই যখন রেই নগরীর কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : "আমরা রাই নগরীর অধিবাসীরা আপনার

সমীপে উপস্থিত হয়েছি”, তখন ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : “আমাদের কোমের ভ্রাতৃবৃ ! স্বাগতম।” অতঃপর তাঁরা বললেন : “আমরা রাই নগরীর অধিবাসী।” ইমাম সাদিক পুনরায় বললেন : “আমাদের কোমের ভ্রাতৃবৃ ! স্বাগতম।” তাঁরা পুনরায় বললেন : “আমরা রাই নগরীর অধিবাসী।” এরপরও ইমাম পূর্বের কথাই ব্যক্ত করলেন। তাঁরাও তাঁদের কথা (আমরা রাই নগরীর অধিবাসী) কয়েকবার উল্লেখ করলেন। আর ইমাম সাদিকও প্রথম বারের মতো তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন (আমাদের কোমের ভ্রাতৃবৃ ! স্বাগতম) এবং বললেন : “মহান আল্লাহর একটি হারাম আছে, আর তা হলো পবিত্র মক্কা মুকাররামাহ্; মহানবী (সা.)- এর একটি হারাম আছে, আর তা হলো মদীনা মুনাওওয়ারাহ্; আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর একটি হারাম আছে যা হচ্ছে কুফা; আর আমাদেরও (আহলে বাইতের) একটি হারাম আছে যা হচ্ছে কোম নগরী। অতি সত্বর ফাতিমা না ী আমার বংশোদ্ভূত এক নারী এ নগরীতে চির নিদ্রায় শায়িত হবে। যে ব্যক্তি কোমে তার কবর যিয়ারত করবে সে বেহেশতবাসী হবে।”[২৬৮]

রাবী বলেন : “ইমাম সাদিক (আ.) এ কথা এমন এক সময় বলেছিলেন যে, তখন ইমাম মূসা আল কাযিম (আ.) জন্মগ্রহণও করেন নি। উল্লেখ্য যে), ইমাম মূসা আল কাযিম ছিলেন হযরত ফাতিমা বিনতে মূসা ইবনে জাফরের কন্যা। ([২৬৯]

কোম আহলে বাইতের ইমামদের হারাম এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত এ কোম হচ্ছে আহলে বাইতের ইমামদের বেলায়েত এবং তাঁদেরকে সাহায্য করার কেন্দ্রস্থল। রাই নগরী ও ইরানের অন্যান্য এলাকার অধিবাসীরাও (বৃহত্তর অর্থে) ‘কোমবাসী’ বলে গণ্য হবে। কারণ তারাও আহলে বাইত প্রসঙ্গে কোমবাসীদের পথ, মত ও পদ্ধতির অনুসারী। এ কারণেই রেওয়ায়েতসমূহে যে কোমবাসীদের কথা এবং তারা যে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন- এ কথা বর্ণিত হয়েছে তাদের সবারই ইরানী হওয়া সম্ভব। তারা বেলায়েত, বন্ধুত্ব, যুদ্ধ ও জিহাদের ক্ষেত্রে ইমামদের অনুসারী; ; বরং ইমাম মাহদী (আ.)- এর অনুসারী অ- ইরানী মুসলমানরাও (বৃহত্তর অর্থে) কোমবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, হযরত সাদিক (আ.) এ কথা যখন বলেছিলেন তখনও হযরত মূসা আল কাযিম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন নি- রাবীর এ কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, ইমাম সাদিক (আ.) যে কথা ইমাম কাযিমের জন্মগ্রহণের আগেই বলেছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর পুত্র ইমাম মূসার জন্মগ্রহণ (১২৮ হিজরী) করার আগেই স্বীয় পৌত্রী (ইমাম মূসার কন্যা) হযরত ফাতিমা মাসূমার জন্মগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর তাঁর কোমে সমাধিত হওয়ার ঘটনা ৭০ বছর পরে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

কোমের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করেছেন যে, যখন আব্বাসী খলীফা মামুন ইমাম আলী ইবনে মূসা আর রিযা (আ.)- কে ২০০ হিজরীতে মদীনা থেকে মারভে নিয়ে আসে, তার এক বছর পর ২০১ হিজরীতে তাঁর বোন হযরত ফাতিমা মাসূমাহ্ ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য মদীনা থেকে বের হয়ে ইরানের দিকে যাত্রা করেন। যখন তিনি সভে শহরে পৌঁছে তখন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন : “আমার ও কোমের মাঝে কতখানি দূরত্ব আছে?” তখন তাঁকে বলা হয়েছিল : “১০ ফারসাখ।” (এক ফারসাখ = ৬.২৪ কি. মি.)

এ খবর সাদের সন্তানদের (মালিক আশআরীর পুত্র) কাছে পৌঁছলে সবাই সভের দিকে রওয়ানা হন যাতে তাঁরা তাঁকে তাঁদের শহর কোমে এসে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। যখন তাঁরা তাঁর কাছে পৌঁছেন তখন খাযরাজের পুত্র মূসা জনতার মধ্য থেকে বের হয়ে হযরত ফাতিমার দিকে গিয়ে তাঁর উটের রশি ধরে কোমে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে নিজ গৃহে স্থান দেন। কোমে ১৬ বা ১৭ দিন অবস্থান করার পর পূর্ব অসুস্থতার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গোসল ও কাফনের পর খাযরাজের পুত্র মূসা তাঁর নিজস্ব জমিতে তাঁকে দাফন করেন এবং আজও তাঁর পবিত্র কবর সেখানেই বিদ্যমান। দাফন করার পর মাদুর ও চাটাই নির্মিত ছাউনী তাঁর কবরের ওপর স্থাপন করা হয়েছিল। ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর মেয়ে যয়নাব (আ.) কর্তৃক হযরত ফাতিমা মাসূমার কবরের ওপর একটি গম্বুজ এবং তৎসংলগ্ন একটি হলঘর নির্মাণ করা পর্যন্ত তা পূর্বের অবস্থায়ই ছিল।

এ সব রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ফাতিমা মাসূমাহ্ অত্যধিক ইবাদত- বে গী করতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও মহানুভবতার অধিকারিণী। তিনি তাঁর দাদী হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- এর মতো অল্পবয়স্কা হয়েও আহলে বাইতের কাছে বিশেষ মর্যাদা, উচ্চ সম্মান ও গুরুত্বের অধিকারিণী ছিলেন। আর তাঁর এ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান কোম নগরীর আলেম এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অজ্ঞাত ছিল না। কারণ, তাঁরা হযরত ফাতিমা মাসূমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য কোম থেকে সভে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর সমাধির ওপর তুলনামূলকভাবে একটি সাদামাটা সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর মাযারের ওপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপর থেকেই তা আহলে বাইতের প্রেমিকদের যিয়ারতগাহে পরিণত হয়। কোম নগরীর বেশ কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি অসিয়ত করেছিলেন যেন তাঁদেরকে মৃত্যুর পর হযরত ফাতিমা মাসূমার মাযারের পাশে দাফন করা হয়।

রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুকালে হযরত ফাতিমা মাসূমা (আ.)- এর বয়স ২৮ বছর ছিল। তাঁর বয়স কম হওয়ার কারণেই ইরানীরা তাঁকে ‘ফাতিমা মাসূমাহ্’ (নিষ্পাপ ফাতিমা) অথবা ‘মাসূমা- ই কোম’ (কোম নগরীর নিষ্পাপ রমণী) বলে অভিহিত করে। কারণ, ফার্সী ভাষায় ‘মাসূম’ শব্দের অর্থ নিষ্পাপ। আর এ কারণেই অল্পবয়স্ক শিশু যার কোন পাপ নেই, তাকে মাসূম বলা হয়। অবশ্য পাপ থেকে মুক্ত থাকার কারণেও তাঁকে ‘মাসূমাহ্’ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, শিয়া মাযহাবে ইসমাত (নিষ্পাপত্ব) দু’প্রকারের। এক ধরনের নিষ্পাপত্ব যা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) এবং তা মহান নবী ও ইমামদের মধ্যে বিদ্যমান। আর মহানবী (সা.)- এর পর এ ধরনের ইসমাত কেবল ১৩ নিষ্পাপ ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান[২৭০]। আরেক ধরনের নিষ্পাপত্ব আছে যা ওয়াজিব নয়। আর এ ধরনের নিষ্পাপত্ব মহান আল্লাহর ওলী ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের মাঝে বিদ্যমান। তাঁরা পাপ এবং চারিত্রিক দোষ- ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

পরবর্তী রেওয়ায়েত যা ইমাম রিযা (আ.) থেকে বর্ণিত তা থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ইমামগণ কোম নগরীর গোড়াপত্তনের শুরু থেকে এ নগরীর জনগণকে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর সাথী বলে গণ্য করেছেন।

ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর প্রতি এ নগরীর বাসি াদের ভালোবাসা ও ভক্তি তাঁর জন্মগ্রহণের আগে থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

সাফওয়ান ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন : “একদিন আমি ইমাম রিযা (আ.)- এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। কোমবাসীদের এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর প্রতি তাদের ভক্তি ও ভালোবাসার কথা আলোচনা করা হলে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন : মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এরপর তিনি বললেন : বেহেশ্তে আট দরজা বিশিষ্ট যার একটি কোমবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। তারা সমগ্র বিশ্বে আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের অনুসারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। মহান আল্লাহ্ আমাদের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব তাদের স্বভাবপ্রকৃতির মধ্যে মিশ্রিত করে দিয়েছেন।[২৭১]

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, বেহেশ্তের দরজাগুলো মানব জাতির কর্ম অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস ও বণ্টন করা হয়েছে। এ কারণেই ‘জান্নাতের একটি দরজা কোমবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে’- এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, তারা ইমামদের সাথে সংগ্রামকারীদের দরজা অথবা সৎকর্মশীল বা াদের বিশেষ দরজা দিয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন। উল্লেখ্য যে, রেওয়ায়েতে সৎকর্মশীল হওয়ার বিষয়টি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। ‘তারা সমগ্র বিশ্বে আমাদের অনুসারীদের মধ্যে সর্বোত্তম’- ইমাম রিযা (আ.)- এর এ উক্তি থেকে আহলে বাইতের সকল অনুসারীর মধ্যে কোমবাসীদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর প্রতি কোমবাসীদের ভক্তি ও ভালোবাসা এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সজীব ও জীবন্ত আছে; বরং ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের সাথে সাথে তাদের এ ভক্তি- ভালোবাসা পূর্ণতার চরম শীর্ষে পৌঁছেছে।

তাঁদের ঈমান, কর্মকাণ্ড এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর নামে তাদের সন্তান- সন্ততি, মসজিদ- মাদ্রাসা, স্কুল- কলেজ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নামকরণের ক্ষেত্রে এ সত্য পূর্ণরূপে দৃশ্যমান। আর বিষয়টি এতটা গভীর যে, এ নগরীর কোন একটি গৃহও এ নাম

হতে মুক্ত নয় (অর্থাৎ কোমের প্রতিটি গৃহে বসবাসকারীদের মধ্যে অন্তত একজনের নাম ইমাম মাহদী (আ.)- এর নামে রাখা হয়ে থাকে।)

কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোমবাসীদের থেকে বিপদাপদ দূর করে দেয়া হয়েছে এবং যারা এ নগরীর অনিষ্ট সাধন করতে চায় মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করবেন।

আবান ইবনে উসমান ও হাম্মাদ ইবনে নাব থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন : "আমরা ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন উমরান ইবনে আবদুল্লাহ্ কোমী সেখানে প্রবেশ করলেন এবং ইমামের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করলেন। ইমাম সাদিক (আ.) খুব স্নেহ ও মমতা সহকারে তাঁর সাথে আচরণ করলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর আমি ইমামকে জিজ্ঞাসা করলাম : এ লোকটি কে, যার সাথে আপনি এত সদাচরণ করলেন? ইমাম সাদিক (আ.) বললেন : সে মহানুভব ব্যক্তিদের বংশের লোকদের (কোমবাসীদের) অন্তর্ভুক্ত। কোন জালিমই তাদের প্রতি অসদিচ্ছা পোষণ করে না; আর তা করলে মহান আল্লাহ্ তাকে দুমড়ে-মুচড়ে ধ্বংস করে দেবেন।"[২৭২]

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : কোম নগরী থেকে বালা- মুসিবত দূর করা হয়েছে।[২৭৩]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, "কোমবাসীরা আমাদের থেকে এবং আমরাও তাদের থেকে। যে পর্যন্ত তারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করবে (আরেকটি পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত আছে : যে পর্যন্ত তারা তাদের মত, পথ ও পদ্ধতি পরিবর্তন না করবে) সে পর্যন্ত যে জালিমই তাদের ব্যাপারে অসদিচ্ছা পোষণ করবে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। তবে যখন তারা এ ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়বে তখন মহান আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে তাদের শাসনকর্তা বানিয়ে দেবেন। তবে তারা আল কায়েম আল মাহদীর সঙ্গী- সাথী এবং আমাদের আহলে বাইতের অত্যাচারিত হবার বিষয়টি সকলের কাছে প্রকাশকারী এবং আমাদের অধিকার সংরক্ষণকারী।" অতঃপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন : "হে আল্লাহ্! তাদেরকে সব ধরনের ফিতনা, অনিষ্ট ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন এবং তাদেরকে সব ধরনের আঘাত থেকে মুক্তি দিন।"[২৭৪]

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : বিপদাপদ পবিত্র কোম এবং এর অধিবাসীদের থেকে দূর হয়ে গেছে। আর শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে যখন কোম নগরী এবং এর অধিবাসীরা জনগণকে ওপর (মহান আল্লাহর দীনের) প্রামাণ্য দলিল হবে। আর তা হবে আমাদের কায়েম আল মাহদীর অন্তর্ধান এবং তার আবির্ভাবকালে। আর ব্যাপারটি যদি ঠিক এমন না হয় তাহলে পৃথিবী এর অধিবাসীদেরকে গ্রাস করবে।

মহান আল্লাহর ফেরেশতাগণ এ শহর এবং এ শহরের অধিবাসীদের থেকে বিপদাপদ দূর করে দেন। মুবতালা বলেন : আর যে জালিমই তাদের ব্যাপারে অসদিচ্ছা পোষণ করবে, জালেমদের ধ্বংসকারী মহান আল্লাহ্ তাকে দুমড়ে-মুচড়ে ধ্বংস করে দেবেন অথবা তাকে সমস্যা, বিপদাপদ অথবা শত্রুতার মুখোমুখি করবেন। মহান আল্লাহ্ অত্যাচারী শাসকদের শাসনামলে কোম ও তার অধিবাসীদেরকে তাদের (অত্যাচারীদের) স্মরণ থেকে এমনভাবে মুছে দেবেন যে, যেভাবে জালেমরা মহান আল্লাহর নামে ভুলে গেছে।”[২৭৫]

অবশ্য তা এতদর্থে নয় যে, কোমের অধিবাসীরা অনিষ্ট দ্বারা মোটেও আক্রান্ত হবে না। বরং সম্ভাবনা রয়েছে তারা বেশ কিছু সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে। তবে মহান আল্লাহ্ তাদের থেকে অত্যন্ত কঠিন বিপদাপদ দূরে রাখবেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ দিয়ে সাহায্য করবেন যার অতি বাস্তব ও উজ্জ্বল উদাহরণ হলো বিদ্রোহী ও সীমা ল নকারীদেরকে ধ্বংস করা এবং বিভিন্ন ধরনের সংকটের মধ্যে আপতিত করে তাদের ব্যস্ত রাখা যেন তারা কোমবাসীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত না হতে এবং একেবারেই তাদের কথা স্মরণ করতে না পারে।

‘বিহারুল আনওয়ার’ গ্রন্থের রচয়িতা পবিত্র কোম নগরীর ভবিষ্যৎ এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের আগে এ নগরীর আদর্শিক ভূমিকা সম্পর্কে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে দু’টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রথম হাদীস : “মহান আল্লাহ্ কুফা নগরীর মাধ্যমে অন্য সকল নগরীর ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করবেন এবং একইভাবে এ নগরীর মুমিনদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মুমিনের কাছে এবং কোম নগরীর মাধ্যমে সকল শহর ও নগরীর ওপর এবং এ নগরীর অধিবাসীদের মাধ্যমে জিন ও মানব

জাতি নির্বিশেষে সকল বিশ্ববাসীর ওপর যুক্তি প্রদর্শন ও প্রমাণ উপস্থাপন করবেন; মহান আল্লাহ্ কোমবাসীদেরকে চিন্তাগতভাবে দুর্বল ও অনগ্রসর করেন নি; বরং তাদেরকে তিনি সামর্থ্য দান ও সাহায্য করেছেন; অতঃপর তিনি বললেন এ নগরীর দীনদাররা খুব কষ্টে জীবন যাপন : করবে; আর এর অন্যথা হলে অন্যান্য স্থান থেকে জনগণ খুব দ্রুত সেখানে চলে আসবে এবং এ কারণে ঐ স্থান এবং এর অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তখন তারা যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমন বিশ্ববাসীদের জন্য হুজ্জাত হতে পারবে না। যখন কোম নগরীর (খোদার দীনের দলিল) অবস্থা এ পর্যায়ে উপনীত হবে[২৭৬] তখন আকাশ ও পৃথিবী শান্ত থাকবে না এবং এগুলোর অধিবাসীরা আর মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারবে না। কোম এবং এর অধিবাসীদের থেকে বিপদাপদ দূর করে দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে যখন কোম এবং এ নগরীর অধিবাসীরা সমগ্র মানব জাতির ওপর মহান আল্লাহর দলিল হয়ে যাবে এবং এটি হবে আমাদের কায়েম আল মাহদীর অন্তর্ধানকালে এবং তার আবির্ভাবের সময়। আর যদি এমন না হয় তাহলে পৃথিবী এর বাসি াদেরকে সমূলে গ্রাস করবে গর্ভে প্রোথিত হয়ে -অর্থাৎ সকল বিশ্ববাসী ভূ) মহান আল্লাহর ফেরেশতাগণ এ শহর ও এর অধিবাসীদের থেকে সব ধরনের ।(ধ্বংস হয়ে যাবে বিপদ দূর করার জন্য নিয়োজিত আছেন; আর যে অত্যাচারী এ নগরীর অনিষ্ট সাধন করার অসদুদ্দেশ্যে পোষণ করবে, যিনি সকল অত্যাচারীকে ধ্বংস করেন সেই মহান আল্লাহ্ তাকে দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দেবেন -(যেমন ইরানের জালিম বাদশাহ্ মুহাম্মদ রেযা শাহ পাহলভী এবং ইরাকের স্বৈরাচারী সাদ্দাম হুসাইনকে মহান আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন।) অথবা সংকটে জড়িয়ে দেবেন বা বিপদাপন্ন করবেন অথবা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত করবেন। মহান আল্লাহ্ অত্যাচারীরা যেমন মহান আল্লাহর স্মরণ করা ভুলে গিয়েছিল ঠিক তেমনি কোম ও এ নগরীর অধিবাসীদের নাম তাদের স্মরণ থেকে মুছে দেবেন।”

দ্বিতীয় হাদীস : “শীঘ্রই কুফা নগরী ঈমানদার শূন্য হয়ে যাবে এবং সাপ যেভাবে নিজের গর্তে ঢুকে যায় সেভাবে ধর্মীয় জ্ঞান কুফা থেকে প্রস্থান করবে এবং কোম নামের একটি নগরী থেকে তা প্রকাশিত হবে এবং ঐ নগরী ও জনপদ এমনভাবে জ্ঞান ও উত্তম গুণাবলীর খনিতে পরিণত হবে

যে, পৃথিবীর বুকে কোন লোকই তখন চিন্তামূলক দাসত্ব ও দুর্বলতায় ভুগবে না, এমনকি নববধূরাও তাদের নিজ বাসর ঘরে চিন্তামূলক দীনতায় ভুগবে না। আর এ সব ঘটনা আমাদের কায়েম আল মাহ্দীর আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময় সংঘটিত হবে। (সমগ্র বিশ্বে) কোম ও এ নগরীর অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মের (শাশ্বত) বাণী পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে হুজ্জাতের (ইমাম মাহ্দী) প্রতিনিধিত্ব করবে; আর এমন যদি না হয় তাহলে পৃথিবী এর অধিবাসীদেরকে সমূলে গ্রাস করবে এবং পৃথিবীর বুকে তখন আর কোন হুজ্জাতই অবশিষ্ট থাকবে না। এ নগরী থেকে জ্ঞান বিশ্বের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিস্তার লাভ করবে আর এভাবেই এ নগরী সমগ্র বিশ্ববাসীর ওপর মহান আল্লাহর হুজ্জাত হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর বুকে এমন কোন ব্যক্তিই বিদ্যমান থাকবে না যার কাছে দীন ও জ্ঞান পৌঁছবে না। আর তখনই কায়েম আল মাহ্দী (আ.) আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর আবির্ভাব বা াদের ওপর মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গজবের কারণ হবে। কারণ, মহান আল্লাহ্ তাঁর বা াদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ না তারা ইমাম মাহ্দীকে অস্বীকার করবে।”[২৭৭]

এ দু’হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় :

১. যেহেতু এ দু’টি হাদীস হুবহু বা শাব্দিকভাবে বর্ণিত না হয়ে অর্থগতভাবে বর্ণিত হয়েছে সেহেতু এ দু’টি হাদীসের বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে কিছুটা অগ্র- পশ্চাৎ হয়েছে। তবে এ দু’টি হাদীসের অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. এ সব রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, জ্ঞান ও আহলে বাইতের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কুফা নগরীর ধর্মীয় ভূমিকা আসলেই ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে হযরত মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের খুব কাছাকাছি সময় তা নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য নাজাফও কুফা নগরীরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ নগরীর আসল নাম নাজাফ- ই কুফা (কুফার নাজাফ) ছিল; বরং কখনো কখনো ‘কুফা’ বলতে সমগ্র ইরাক বোঝানো হতো। আর আমরা এ বিষয়টি ইতোমধ্যে যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। তবে কোম নগরীর ধর্মীয় ভূমিকা একইভাবে অব্যাহত থাকবে এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের কাছাকাছি সময় এ নগরীর ভূমিকা আরো মহান ও গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর

হাদীসের নি োক্ত দু'টি লাইনে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে। যেমন : 'এ সব কিছু আমাদের কায়েম আল মাহদীর অন্তর্ধানকালে এবং তার আবির্ভাবের সময় সংঘটিত হবে' এবং 'আর এ সব বিষয় আমাদের কায়েমের আবির্ভাবের কাছাকাছি সময় সংঘটিত হবে'।

৩. ঐ সময় পবিত্র কোম নগরীর মহান আদর্শিক ভূমিকা কেবল ইরান বা শিয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা হবে বিশ্বজনীন, এমনকি তা অমুসলিমদেরকেও শামিল করবে। 'এবং শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে যখন কোম নগরী এবং এর অধিবাসীরা সমগ্র মানব জাতির ওপর (মহান আল্লাহর) হুজ্জাত হবে', 'এবং পৃথিবীতে এমন কোন লোক থাকবে না যার কাছে ধর্ম ও জ্ঞান পৌঁছবে না'- এর অর্থ এই নয় যে, এ নগরী থেকে জ্ঞান ও ধর্ম বিশ্বের প্রতিটি লোকের কাছে পৌঁছবে; বরং এতদর্থে যে, ইসলাম ধর্মের আহবান এমনভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে যাবে এবং এমনভাবে তাদের কাছে উপস্থাপিত হবে যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের বিধি- বিধান জানার ও মানার চেষ্টা করে তাহলে এ বিষয় তার জন্য সম্ভব ও সহজসাধ্য হবে।

অবশ্য ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে পবিত্র কোম নগরীর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুসংগঠিত প্রচারণা সংস্থা ও পরিকল্পিত কার্যক্রম সম্বলিত একটি হুকুমত প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট; বরং তা উদ্ধত বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ওপরও নির্ভরশীল হবে। আর এ বিষয়টি পবিত্র কোম নগরী থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীর কর্ণে ইসলাম ধর্মের বাণী ও আহবান পৌঁছে যাওয়ারও কারণ হবে।

৪. কোম নগরীর এরূপ ব্যাপক সাংস্কৃতিক ভূমিকা অর্থাৎ এ নগরী থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়টি উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ক্রোধ ও শত্রুতার কারণ হবে। ইসলাম ধর্মের প্রতি এ শত্রুতার কারণেই মহান আল্লাহ্ ইমাম মাহদী (আ.)- এর শক্তিশালী হাতের মাধ্যমে উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। কারণ, এ শত্রুতা মানব জাতির ওপর মহান আল্লাহর হুজ্জাত (প্রমাণ) পূরণ করে দেবে। শত্রুদের পক্ষ থেকে সমস্যা

সৃষ্টি ইসলামের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার কারণে নয়; বরং এ ধর্মের প্রতি তাদের শক্রুতা ও বিরোধিতার কারণেই হবে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ হাদীসে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তা কুফা ও ইরাকের ব্যাপারে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কোম ও ইরানের ব্যাপারে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। আসলে বর্তমানে কোম ও ইরান বিশ্বের মুসলিম জাতির ওপর মহান আল্লাহর হুজ্জাত। এমনকি আমরা যদি ধরেও নিই যে, এ ধরনের সচেতনতা যা এ দুই রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে তার উদ্ভব ও প্রসারে সম্ভবত কয়েক দশক লেগে যেতে পারে। তারপরও কোন সে হ নেই যে, এর কতিপয় পূর্ব প্রক্রিয়া ও পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তবে 'আমাদের কায়েমের আবির্ভাবের কাছাকাছি সময়'- হাদীসের এ বাক্যটি নির্দেশ করে যে, পবিত্র কোম নগরীর এ ধরনের আন্তর্জাতিক অবস্থান ও গুরুত্ব অর্জন এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের মধ্যে তেমন একটা সময়গত ব্যবধান থাকবে না।

প্রাচ্যবাসী এবং কালো পতাকাসমূহ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত

এ হাদীসটি শিয়া- সুন্নী হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং তা ‘কালো পতাকাসমূহের হাদীস’, ‘প্রাচ্যবাসীদের হাদীস’ এবং ‘মহানবী (সা.)- এর পরে তাঁর পবিত্র আহলে বাইত যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন সে বিষয় সংক্রান্ত রেওয়ায়েত’- এর শিরোনামে খ্যাতি লাভ করেছে। আরেকদিকে, এ হাদীসটি বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ ও সূত্রে মহানবী (সা.)- এর কতিপয় সাহাবী থেকে শব্দ ও বাক্যসমূহের মধ্যে সামান্য পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়েত ও বর্ণনায় এ হাদীসের কতিপয় অংশ বর্ণিত হয়েছে। আবার কতিপয় হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সব হাদীসের রাবীরা (বর্ণনাকারী) সকলেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

আহলে সুন্নাতের হাদীস বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ ও সূত্রসমূহ যেগুলোয় এ রেওয়ায়েত অথবা এর অংশবিশেষ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : সুনান- ই ইবনে মাজাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯ ও ৫১৮; হাকিমের মুস্তাদরাকুস সাহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৪ ও ৫৫৩; ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, ফিতান, পৃ. ৮৪ ও ৮৫; ইবনে আবি শাইবার মুসান্নিফ গ্রন্থ, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২৩৫; সুনান- ই আদ দারেমী, পৃ. ৯৩ এবং পরবর্তী হাদীস গ্রন্থসমূহে পূর্বোক্ত গ্রন্থাদির বরাত দিয়ে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে।

কতিপয় সহীহ হাদীস গ্রন্থপ্রণেতা, যেমন ইবনে মাজাহ্, আহমাদ ইবনে হাম্বাল এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস কর্তৃক বর্ণিত এ রেওয়ায়েতটি যা হচ্ছে নি রূপ : “একদল লোক প্রাচ্য থেকে বের হবে (বিপ্লব করবে) এবং হযরত মাহদী (আ.)- এর হুকুমতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে”, তা সম্ভবত নি োক্ত এ রেওয়ায়েতটিরই অংশ ।

আল হাকিমের মুস্তাদরাকুস সাহীহাইন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হাদীসটি হুবহু নিচে উল্লেখ করা হলো :

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : আমরা মহানবী (সা.)- এর সমীপে উপস্থিত হলাম। তিনি অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখে ও আনন্দ র সাথে আমাদের বরণ করলেন। আমরা তাঁর কাছে যা জিজ্ঞাসা করলাম সে ব্যাপারে তিনি উত্তরও দিলেন। আর আমরা নীরব হলে তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন। আর ঐ সময় একদল হাশিম বংশীয় যুবক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল যাদের

মধ্যে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনও ছিলেন। মহানবী (সা.)- এর দৃষ্টি তাদের ওপর পড়লে তাঁর দু'নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। আমরা তখন বললাম : হে রাসূলাল্লাহ্! আমরা প্রায়ই অপনার মুখমণ্ডলে এমন কিছু দেখতে পাই যা আমাদেরকে কষ্ট দেয়। মহানবী (সা.) বললেন : আমরা এমন এক পরিবার, মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য পার্থিব জগতের ওপর আখেরাতকে মনোনীত করেছেন। শীঘ্রই আমার পরে আমার আহলে বাইত শহর- নগর, অঞ্চল ও দেশসমূহে শরণার্থীর মতো ছড়িয়ে পড়বে। আর এ অবস্থা ঐ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যখন প্রাচ্য (ইরান) থেকে কালো পতাকাসমূহ উত্থিত হবে ও পতপত করে উড়তে থাকবে। কালো পতাকাবাহীরা তাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করবে। তবে তাদের অধিকারসমূহ প্রদান করা হবে না। এজন্য তারা তাদের অধিকারসমূহ থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না। কিন্তু তাদের দাবির প্রতি সাড়া দেয়া হবে না। তারা পুনরায় তাদের অধিকার চাইবে কিন্তু তাদের দাবির প্রতি গুরুত্ব দেযা হবে না। এমতাবস্থায় তারা সংগ্রাম করার পথ বেছে নেবে এবং বিজয়ী হবে। যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অথবা তোমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি ঐ সময় বিদ্যমান থাকবে তখন তার উচিত হবে আমার আহলে বাইতভুক্ত নেতার সাথে যোগ দেয়া, এমনকি কষ্ট করে বরফের ওপর দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তার সঙ্গে যোগ দেবে। কারণ, এ সব কালো পতাকা হবে হেদায়েতের পতাকা যেগুলো আমার আহলে বাইতের এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) হাতে তারা অর্পণ করবে, যার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ এবং যার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম। সে পৃথিবীর অধিপতি হবে এবং এ পৃথিবী অন্যায়, অত্যাচার ও বৈষম্যে পরিপূর্ণ হয়ে যাবার পর সে তা ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে।

অনুরূপ হাদীস আহলে বাইতের অনুসারীদের রচিত হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সাইয়্যেদ ইবনে তাউস তাঁর আল মালাহিয ওয়াল ফিতান গ্রন্থের ৬০ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা মাজলিসী হাফিয আবু নাঈম প্রণীত গ্রন্থ আরবাঈন থেকে বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থের ৫১ খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় (প্রাচ্য থেকে হযরত ইমাম মাহদীর আগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট ২৭তম

রেওয়ায়েত) এবং এরূপ রেওয়ায়েত এ গ্রন্থের ৫২তম খণ্ডের ২৪৩ পৃষ্ঠায় ইমাম বাকির (আ.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "যেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাচ্য থেকে একদল বের হচ্ছে এবং তারা তাদের অধিকার দাবি করছে; কিন্তু তাদের দাবির প্রতি সাড়া দেয়া হচ্ছে না; তারা পুনরায় তাদের দাবির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে। কিন্তু তাদের বিরোধীরা তা মেনে নেবে না। যখন তারা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা কাঁধে তরবারি তুলে নেবে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে; আর তখনই তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত দাবির ইতিবাচক জবাব পাবে; কিন্তু এবার তারা নিজেরাই তা মেনে নেবে না; অবশেষে তাদের সবাই সংগ্রাম করতে থাকবে। আর তারা হেদায়েতের পতাকা তোমাদের অধিপতির (ইমাম মাহদী) শক্তিশালী হাত ব্যতীত আর কারো হাতে অর্পণ করবে না। তাদের নিহত ব্যক্তিরা শহীদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু আমি যদি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম তাহলে এ বিষয়ে অর্থাৎ ইসলামের অধিপতিকে সাহায্য করার জন্য নিজেকে সংরক্ষণ করতাম।"

এ রেওয়ায়েত বা হাদীসটি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বিষয় এ থেকে বের হয়ে আসে :

প্রথম বিষয় : এ রেওয়ায়েতটি ইজমালী মুতাওয়াতির । এর মুখ্য বিষয় হচ্ছে, মহানবী (সা.) কর্তৃক তাঁর পরে তাঁর আহলে বাইতের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হওয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং যে উম্মত বা জাতি তাঁর আহলে বাইতের অধিকার প্রদানের দাবি জানাবে তারা ঐ সব ব্যক্তি যারা প্রাচ্য থেকে উত্থিত হবে এবং তাদের মহান নেতা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশ্ব সরকার ও প্রশাসনের ক্ষেত্র ও পটভূমি প্রস্তুত করবে। এসব ব্যক্তির শাসন ক্ষমতা লাভ করার পরেই ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে ইসলামকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করাবেন; তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।

দ্বিতীয় বিষয় : 'একদল লোক প্রাচ্য থেকে বের হবে যাদের পতাকাগুলো হবে কালো'- এ বাক্যে 'একদল লোক' বলতে ইরানীদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সকল সাহাবী যাঁরা এ রেওয়ায়েত ও অন্যান্য রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য আছে এবং তাবেঈন

যাঁরা এ রেওয়ায়েতটি সাহাবীদের থেকে গ্রহণ করেছেন তাঁরাও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং একইভাবে তাঁদের পরে পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর সকল হাদীস সংকলকের মধ্যেও এ বিষয়টির ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। অর্থাৎ এসব ব্যক্তির (ইরানীদের) অভ্যুত্থান এবং উত্থানের ব্যাপারটা ঐ যুগে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার বলে গণ্য হতো। এ কারণেই তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিই এ দল বা গোষ্ঠী ভিন্ন মত, উদাহরণস্বরূপ তুরস্কবাসী অথবা ভারতীয় অথবা অন্য কোন দেশের অধিবাসী হতে পারে- এ ব্যাপারে কোন ইঙ্গিতই করেন নি। বরং কতিপয় রাবী এবং সংকলক স্পষ্ট বলেছেন যে, তারা ইরানী হবে, এমনকি বেশ কিছু সংখ্যক বর্ণনায় 'খোরাসানীরা' শব্দটি এসেছে। পরবর্তীতে খোরাসানের পতাকাসমূহ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় বিষয় : ঐ সব ব্যক্তির উত্থান ও আ লন বিশ্ববাসীর শত্রুতা এবং (তাদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া) যুদ্ধের মোকাবিলা করে অবশেষে জয়ী হবে এবং এর পরপর ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন।

চতুর্থ বিষয় :এমনকি খুব সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাদের সমসাময়িক প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর অত্যাবশ্যক তাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া। এমনকি তাদেরকে সাহায্য করার জন্য জমাট বরফের ওপর দিয়ে পথ চলতে হলেও তাদের এ কাজই করতে হবে।

পঞ্চম বিষয় : তাদের পতাকা হবে হেদায়েতের পতাকা। অর্থাৎ তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সঠিক ধর্মীয় রূপ ও পরিচিতি থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড ও লক্ষ্য- উদ্দেশ্য ইসলামের বিধি- বিধান ও এ ধর্মের পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে এমনভাবে সামঞ্জস্যশীল হবে যে, যদি কোন মুসলমান এ দল বা গোষ্ঠীটির সাথে সহযোগিতা করে তাহলে সে তার ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করেছে এবং তারা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে।

ষষ্ঠ বিষয় : এ রেওয়ায়েত অনাগত ভবিষ্যৎ এবং গাইব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতের সত্যতা নির্দেশকারী অন্যতম মুজিযাস্বরূপ। এটা এ কারণে যে, মহানবী (সা.) তাঁর আহলে বাইতের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হওয়া এবং পৃথিবীর আনাচে- কানাচে

তাঁদের ছড়িয়ে পড়া ও শরণার্থী হওয়ার ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন তা বিগত শতাব্দীগুলোয় ঘটেছে হয়েছে। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, আমরা ইতিহাসে এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী এমন কোন পরিবার সম্পর্কে জানি না যে, তারা মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত এবং হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফাতেমা (আ.)- এর বংশধরদের মতো নির্বাসিত হতে এবং উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়টি আলোচনা করার পর যেহেতু ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত পূর্বে উল্লিখিত রেওয়ায়েতে তাদের উত্থান, বিপ্লব ও আ ালন সংক্রান্ত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হয়েছে সেহেতু আমরা এ রেওয়ায়েতে ব্যবহৃত কিছু বাক্য পর্যালোচনা করব। আমার দৃষ্টিতে যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এ রেওয়ায়েতটি মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসটির সাথে সম্পর্কযুক্ত অথবা তার সদৃশ। যদিও ইমাম বাকির (আ.) এরূপ সম্পর্ক থাকার ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, তবে তিনি এবং অন্য সকল ইমাম বলেছেন যে, তাঁরা যা বর্ণনা করেন তা তাঁদের শ্রদ্ধেয় প্রপিতামহগণ এবং তাঁদের উর্ধ্বতন পুরুষ মহানবী (সা.) থেকেই বর্ণিত।

'আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, একদল লোক প্রাচ্য থেকে বের হযেছে...'- এ বাক্যটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জনগণের এ উত্থান ও বিপ্লব মহান আল্লাহর অন্যতম অবশ্যম্ভাবী অঙ্গীকার এবং এ কারণেই যে সব বাক্যে মহানবী (সা.) অথবা ইমামগণ 'আমি যেন দেখতে পাচ্ছি' অথবা 'ঐ বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে'- এ ধরনের উক্তি করেছেন সেগুলো থেকে তাঁদের চিন্তা- বিশ্বাসে এ বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী, সুস্পষ্ট এবং অকাট্য হওয়া এবং এ ব্যাপারে তাঁদের দৃঢ় আস্থা থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায়। যেন তা এমনই যে, তাঁরা পুরো ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করছেন; বরং বলা যায় যে, মহান আল্লাহ্ তাঁদের যে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন এবং যা মহানবী (সা.) ও আহলে বাইতের মর্যাদার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল সেই অর্ন্তদৃষ্টি সহকারে তাঁদের এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইরানীদের আ ালন, বিপ্লবের মাধ্যমে হবে। কারণ, 'তারা অবশ্যই কিয়াম করবে'- এ উক্তির অর্থও ঠিক এটাই। আর 'আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে,

একদল লোক প্রাচ্য থেকে বের হবে এবং তারা তাদের অধিকার দাবি করবে। তাদের দাবির ওপর পুনরায় জোর গুরুত্বারোপ করবে। কিন্তু তাদের বিরোধীরা তা মেনে নেবে না। যখন এ ধরনের অবস্থা তারা প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা তাদের কাধে তরবারি তুলে শত্রুদের মোকাবিলায় দাঁড়াবে। আর এরূপ পরিস্থিতিতে তারা তাদের শত্রুর পক্ষ থেকে (তাদের দাবির ব্যাপারে) ইতিবাচক সাড়া পাবে। তবে তারা নিজেরাই এবার তা মেনে নেবে না। অবশেষে তাদের সবাই সংগ্রাম করতে থাকবে। পরবর্তী এ উক্তিতেও একই বিষয়ের ইঙ্গিত বিদ্যমান।

ইরানীদের ধারাবাহিক এ আ ালনকে ৮০ বছর পূর্বের তাদের সাংবিধানিক আ ালন হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; কারণ জনগণ চেয়েছিল যে, কতিপয় আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ রাষ্ট্রের আইন-কানুন তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং দেশের যে আইন ইসলামের বিধি-বিধানের পরিপন্থী হবে তা তাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন। তদান্তীন্তন ইরান সরকার ১৯০৬ সালের সংবিধানে বাহ্যত: জনগণের এ দাবি মেনে নেয়, কিন্তু আসলে তারা তা মেনে নেয় নি। এরপর ১৯৫১ সালে আয়াতুল্লাহ্ কাশানী ও মুসাদ্দেকের আ ালনে আবার তারা এ দাবি জানালে ইরান সরকার এর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনি; আর এ পর্যায়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের দ্বিতীয় বিপ্লব ব্যর্থ করার মাধ্যমে শাহ্ যে ঐ দিনগুলোতে ইরান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তাকে ইরানে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ইরানী জনগণ এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কাঁধে অস্ত্র তুলে নিয়ে ইমাম খোমেইনীর আ ালনে আ াৎসর্গ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং লক্ষ লক্ষ জনতা শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ যুগ সন্ধিক্ষণেও শাহ্ ও তার বিদেশী প্রভুরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য) নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকে এবং ইরানী জনগণকে বলা হয় যে, শাহের শাসন কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকার শর্তে দেশের আইন-কানুনের ওপর ৬ জন ফকীহ্-মুজতাহিদের তদারক ও তত্ত্বাবধান সম্বলিত ১৯০৬ সালে গৃহীত সংবিধানের ধারাগুলো শাহ্ সরকার মেনে নেবে। তবে কতিপয় আলেমের পক্ষ থেকে শাহ্ সরকারের এ প্রস্তাব ও পরিকল্পনা মেনে নেয়া হলেও ইমাম খোমেইনী এবং ইরানের কোটি কোটি জনতা তা মেনে নেন নি। তারা

পবিত্র ইসলামী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে এবং উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির ওপর বিজয় লাভ করার মাধ্যমে দেশে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তারা নিশ্চিতভাবে হেদায়েতের এ পতাকা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালে তাঁর হাতে অর্পণ করবে।

তবে অধিকতর ভালো ব্যাখ্যা হচ্ছে, তারা তাদের শত্রুদের কাছে ন্যায্য অধিকারের দাবি করবে। আর তাদের এসব শত্রু হবে পরাশক্তিবর্গ। পরাশক্তিবর্গের কাছে ইরানী জাতির দাবি ছিল যেন তারা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে এবং তাদের দেশে ইসলাম ধর্মের বিধি- বিধান কায়েম করতে দেয়। আর এভাবে তারা (পরাশক্তিবর্গ) তাদেরকে তাদের আধিপত্য ও প্রভাব থেকে মুক্তি দেয় এবং তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যেন মেনে নেয়। কিন্তু তাদের ন্যায় দাবির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না যার ফলে তারা পরাশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু তারা এ যুদ্ধে বিজয়ী হবে। তাদের শত্রুরা এ অবস্থা দেখে একটি শর্তের ভিত্তিতে তাদের পূর্বের দাবি মেনে নিতে এবং অধিকার প্রদান করতে চাইবে। আর শর্তটা হচ্ছে, তারা ইরানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, কিন্তু তারা বিপ্লব রফতানী করতে পারবে না। তবে তখন দেরী এবং বিশ্ব- পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার কারণে ইরানীরা পরাশক্তিবর্গের এ প্রস্তাবে রাজী হবে না। এরপর ইরানী জনগণের নতুন বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে এবং তারা সংগ্রামের পথ বেছে নেবে। পরাশক্তিবর্গ তাদেরকে যেসব সুবিধা প্রদান করতে চাইবে তারা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করবে এবং ইরানের চেয়েও অনেক বৃহত্তর ও বিস্তৃত সামাজিক পরিমণ্ডলে ইসলাম ধর্মের কর্তৃত্ব ও কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করবে। আর এ সব ঘটনা ঘটার পরপরই ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন এবং ইরানী জাতি তাঁর হাতে সংগ্রামের পতাকা অর্পণ করবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যে বিষয়টি অধিকতর উত্তম পন্থায় এসেছে তা হচ্ছে এই যে, ইমাম খোমেইনী (রহ.)- এর আ ালনের দাবি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ, সাংবিধানিক আ ালন বা হযরত আয়াতুল্লাহ্ কাশানী ও ড. মোসাদ্দেকের আ ালনের দাবি- দাওয়ার অনুরূপ ছিল না। বরং সেগুলো আলেম সমাজের নেতৃত্বে বৈধ ইসলামী হুকুমতের দাবি থেকেই উদ্ভূত ছিল।

তবে ‘এবং তারা তাদের কাঁধে তরবারি তুলে নেবে’- এ উক্তি থেকে মনে হচ্ছে যে, বর্তমান যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের পূর্ণপ্রস্তুতি হতে পারে।

তবে বাক্যটিকে শাহের ঘুণে ধরা পতনমুখ সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে লক্ষ- কোটি জনতার সংগ্রাম, প্রতিরোধ, বিক্ষোভ ও শাহাদাত বরণের প্রবল ইচ্ছা ইত্যাদির ওপর প্রয়োগ করা যায় না। কারণ, ঐ সময় জনগণের হাতে অস্ত্র ছিল না যে, তারা তা কাঁধে তুলে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। বরং তাদের আে ালন ও বিপ্লব ছিল নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ। তারা খালি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বিপ্লব করেছে এবং আে ালনে অংশগ্রহণ করেছে। আর যদি শাহের সামরিক ঘাঁটি ও ক্যান্টনমেন্টসমূহের পতন এবং জনগণের হাতে অস্ত্র আসার বিষয়টি ধরে নিয়ে এ বিষয়ের সাথে যোগ করি তুবও এ বিপ্লবটি সশস্ত্র ও সামরিক সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব- সংঘাতের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। শাহের গার্ড বাহিনীর সাথে জনগণের যে সামান্য সংঘর্ষ হয়েছিল তা বিবেচনায় আনলেও ইসলামী বিপ্লব বিজয়ে অন্যান্য সকল বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সাথে সশস্ত্র অভিযানসমূহের অনুপাত পাঁচ শতাংশের চেয়েও কম হবে। অধিকন্তু রেওয়ায়েতটির বর্ণনাধারা ও বাচনভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, ইরানী জাতির অভ্যুত্থান এবং নিজেদের বিভিন্ন দাবি উত্থাপন একই আে ালনে এবং একের পর এক সংঘটিত হবে। আর তা বেশ কিছু ধাপে এবং দীর্ঘ একশ’ বছর ধরে সংঘটিত হবে না।

এ ছাড়াও, এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীসের অধিকাংশ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও মূল পাঠ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিজেদের প্রথম দাবি- দাওয়া ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের ক্ষেত্রে ইরানীদের এ প্রতিক্রিয়া আসলে তাদের এক অসম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরই হবে। উল্লেখ্য যে, তারা ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করবে। তবে “তারা তাদের অধিকারে দাবি জানাবে এবং যখন তারা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে না তখনই তারা সংগ্রামে অবতীর্ণ এবং বিজয়ী হবে। অতঃপর তারা ইতিবাচক সাড়া পাবে। কিন্তু তারা নিজেরাই তখন তা মেনে নেবে না...।”[২৭৮]

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কেবল দু’টি বিষয় থেকে যায় :

প্রথম বিষয় : 'এবং তারা তাদের অধিকার অন্বেষণ করবে, কিন্তু ইতিবাচক সাড়া পাবে না'- এ বাক্যটি থেকে বোঝা যায় যে, তাদের দাবি দু'পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। তাই ঐ পর্যায়দ্বয় কি কি?

এ দু'পর্যায়কে তিনভাবে উত্তর দেয়া যায় :

১. যেহেতু এ একই বিররণের পুনরাবৃত্তি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা তাদের বৈধ ন্যায়সঙ্গত কাঙ্ক্ষিত অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের শত্রুদের কাছে জোর দাবি জানাবে ও তীব্র চাপ প্রয়োগ করবে। তবে কোন ব্যক্তি যদি মহানবী (সা.) ও ইমামদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেয় তাহলে তাঁদের (আ.) থেকে, বিশেষ করে আলোচ্য এ রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিকে সে অসম্ভব বলে মনে করবে।

২. এ উত্তর যা সম্ভবত এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হবে তা হচ্ছে এই যে, তাদের বিপ্লবের দুই পর্যায়ে এ ঘটনা ঘটবে, প্রথমে তারা যুদ্ধের পূর্বে তাদের ন্যায্য দাবি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ ব্যক্ত করবে যা গ্রহণ করা হবে না; কিন্তু পরবর্তী পর্যায় যুদ্ধে তাদের বিজয় লাভ করার পর তারা নিজেরাই তা মেনে নেবে না।

৩. যেহেতু শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের উভয় পর্যায়েই তারা তাদের অধিকার দাবি করবে, অথচ তাদের দাবির প্রতি মনোযোগ দেয়া হবে না সেহেতু বিজয় অর্জন করা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এ পর্যায়ে তাদের পূর্বেকার দাবিসমূহ বাস্তবায়িত করা হবে। তবে তারা নিজেরাই তা মেনে নেবে না। আর এভাবে তাদের বিপ্লব ব্যাপক পরিসরে বাস্তবায়িত হবে। অবশেষে তাদের সবাই রুখে দাঁড়াবে এবং সংগ্রাম ও যুদ্ধ করবে। আর এর পরেই ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন।

দ্বিতীয় বিষয় : 'অবশেষে তারা রুখে দাঁড়াবে এবং সংগ্রাম ও যুদ্ধ করবে'- ইমামের এ বাণী এ বিষয়টি নির্দেশ করে যে, এই কিয়াম তাদের উত্থান ও বিপ্লবের চেয়েও আরো ব্যাপক ও মহান হবে। ঠিক একইভাবে উপরিউক্ত বাণী এ বিষয়টিও নির্দেশ করে যে, এ পর্যায়টি এ বিপ্লবের পূর্ণতা লাভ ও দৃঢ় হওয়ারও পর্যায়; ইরানীরা বিপ্লবের এ পর্যায়ে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে

সর্বজনীন ব্যাপকভিত্তিক সংগ্রাম এবং জিহাদের নির্দেশ ও ফতোয়া লাভ করবে এবং অত্র এলাকায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। আর এটাই ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইরানী জাতির বিপ্লবের খুরুজ অর্থাৎ উত্থান- অভ্যুত্থান অর্থে এবং তাদের দাবি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ যা বাস্তবায়িত হচ্ছিল সেগুলো তাদের নিজেদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তাদের আ লনকে ‘কিয়াম’ অর্থাৎ ‘ব্যাপকভিত্তিক গণ- জাগরণ এবং সর্বা ক সংগ্রাম ও যুদ্ধ’ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বর্ণনায় বলা হয়েছে, ‘অবশেষে তারা রুখে দাঁড়াবে এবং ব্যাপকভিত্তিক সংগ্রাম শুরু করবে’, এটি বলা হয় নি যে, ‘সুতরাং তারা বিপ্লব ও ব্যাপকভিত্তিক সংগ্রাম শুরু করবে’। এ উক্তি থেকে এটিই বোধগম্য হয় যে, যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর নিজেদের দাবি- দাওয়া, চাওয়া- পাওয়া এবং আকাঙ্ক্ষাসমূহের ব্যাপারে শত্রুদের থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করা এবং তাদের সুমহান গণ- জাগরণ ও সর্বব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকতে পারে। বরং কখনো কখনো এ উক্তি থেকে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, তাদের মধ্যে একটা চিন্তাধারা- যা কেবল শত্রুদের কাছ থেকে বড় ছাড় ও সুবিধা আদায় করার ব্যাপারেই সম্মতি প্রকাশ করে তা উদ্ভব হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে স হ- সংশয়ের একটা পর্যায়ের উদ্ভব হবে। অথবা যে সব বহিঃপরিস্থিতি তাদেরকে পরিবেষ্টিত রাখবে সেগুলোর কারণেও তাদের মধ্যে এ ধরনের স হ- সংশয়ের উদ্ভব হতে পারে। তবে এ সময় অন্য একটি দল তাদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে পুনরায় রুখে দাঁড়াবে এবং সর্বা ক সংগ্রাম ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে; আর এ আ লনই ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

‘তাদের নিহতরা শহীদ হবে’- এ উক্তিটি হচ্ছে ইমাম বাকির (আ.)- এর পক্ষ থেকে এক মহান সাক্ষ্য ঐ সব ব্যক্তির জন্য যারা ইরানী জাতির আ লন, বিপ্লব, যুদ্ধ ও সংগ্রামে নিহত হবে- তারা ইরানী জাতির আ লন, অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের সময় অথবা শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হবার সময় নিহত হোক অথবা তাদের সর্বশেষ ব্যাপকভিত্তিক আ লন ও সংগ্রামকালে।

ইমামের এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা সত্য ও হেদায়েতের পতাকাবাহী হবে এবং তাদের নেতৃত্বধারা বৈধ এবং তাদের ইসলামী ও রাজনৈতিক ধারাও ত্রুটিমুক্ত ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কারণ, যে সব ব্যক্তি অনৈসলামিক নেতার নেতৃত্বে এবং বিচ্যুত- পথভ্রষ্টদের পতাকাতলে নিহত হবে তাদেরকে কখনই শহীদ বলা যাবে না। আর শহীদকে যে কারণে শহীদ বলা হয় তা হচ্ছে যারা তাদের হত্যা করেছে তাদের ব্যাপারে সে সাক্ষ্য দেবে এবং সে জনগণের ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে, সে জনগণকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছিল আর তারা তাকে কুফর ও গোমরাহীর দিকে আহবান জানিয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, হ্যাঁ, 'তাদের নিহতরা শহীদ'- ইমাম বাকির (আ.)- এর এ সাক্ষ্য তাদের যোদ্ধাদের যুদ্ধের সঠিকতা ও তাদের উদ্দেশ্যের পবিত্রতা অথবা তাদের মধ্য থেকে যে সব বেসামরিক লোক নিহত হবে তাদের বিনা অপরাধে ও অন্যায়ভাবে নিহত হওয়াকে নির্দেশ করে, কিন্তু তা তাদের নেতার সততা ও উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা এবং তাদের চিন্তাধারা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে না। যদি আমরা তর্কের খাতিরে যুক্তিহীন এ অর্থ মেনেও নিই এবং মুসলমানের কর্মের ও নিয়তের বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত সর্বজনীন সূত্র থেকে বের হয়েও আসি তবুও এ ধরনের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ মানুষের নীতি অবস্থানের পরিবর্তন এবং দায়িত্বভার লাঘব করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভূমিকা রাখবে না।

'যদি আমি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম তাহলে এ বিষয়ের অধিকর্তাকে সাহায্য করতাম'- এ বাক্যটি যা হযরত বাকির (আ.) তাঁর নিজের ব্যাপারেই করেছেন এবং বলেছেন যে, যদি তিনি তাদেরকে পান, যদিও তাদের নিহত ব্যক্তিরা শহীদ বলে গণ্য হবে, তবুও তিনি হযরত মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকাল প্রত্যক্ষ করার জন্য নিজেকে বিপদাপদ থেকে সংরক্ষণ করবেন। ইমামের এ উক্তিটি ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীদের সুমহান বিপ্লব, আ লন ও সংগ্রামের সুমহান মর্যাদার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করে যে, ইমাম বাকির (আ.) ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে থাকার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং একে তাঁর জন্য সৌভাগ্য বলে

মনে করেছেন। আরেক দিকে এসব উক্তি নিজ বংশধর হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি তাঁর পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ ও সৌজন্য প্রকাশেরই নামান্তর।

এ উক্তি থেকে এটাও প্রতিভাত হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব পর্যন্ত ইরানীদের আ ালনের সময়গত ব্যবধান একজন মানুষের স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের চেয়ে বেশি হবে না। কারণ ইমাম বাকির (আ.)- এর বাণী বা হাদীসের বাহ্য অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তিনি তাদের আ ালন প্রত্যক্ষ করেন তাহলে তিনি নিজেকে সংরক্ষণ করবেন। আর এটা মুজিযাবশত নয়। বরং নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র। আর এটি হচ্ছে ঐ বিষয়টিরও অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল যে, আমরা বর্তমানে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগে পদার্পণ করেছি এবং ঠিক একইভাবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগের সাথে ইরানীদের আ ালনের সংযুক্তি ও নিকটবর্তী হবার বিষয়টিও এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

যা হোক রাবী এবং ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিবর্গের কাছে কোন স হ নেই যে, এ রেওয়ায়েত ও অন্যান্য রেওয়ায়েতে যে কালো পতাকাসমূহের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলো ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের পতাকা। যদিও যে সব রেওয়ায়েতে বনি আব্বাসের পতাকাসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বিশুদ্ধ বলে আমরা মনে করি। কারণ আপনার লক্ষ্য করেছেন যে, রেওয়ায়েতসমূহ পতাকবাহীদের দু'টি দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য করেছে এবং প্রকৃত ব্যাপারটাও ঠিক এমন যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব আব্বাসী বংশ বা অন্যান্য বংশে হবে না (বরং তিনি হবেন হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার বংশধর)। আরেকদিকে, আমরা ইঙ্গিত করেছি যে, আব্বাসী পতাকাসমূহের গমনস্থল ও উদ্দেশ্য ছিল দামেস্ক এবং হযরত মাহদী (আ.)- এর পতাকবাহী ও সঙ্গী- সাথীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে বাইতুল মুকাদ্দাস।

যদিও এ রেওয়ায়েতে কালো পতাকাসমূহের ঘটনা ও প্রসঙ্গটি সংক্ষিপ্ত বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুসংবাদ দিয়েছে, যদিও আল কুদস অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁদের পৌঁছানোর পথে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা বিদ্যমান। এ ঘটনা ঘটার সময়কাল রেওয়ায়েতে উল্লেখ

করা হয় নি। তবে অন্যান্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : “এসব পতাকার নেতৃত্ব সালেহ্ ইবনে শুআইবের দায়িত্বে থাকবে।” মুহম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ্ বর্ণনা করেছেন : “বনি আব্বাসের কালো পতাকাসমূহ বের হবে। অতঃপর আরো বেশ কিছু সংখ্যক সদৃশ কালো পতাকা যেগুলোর বাহকরা কালো টুপি এবং সাদা পোশাক পরিহিত থাকবে। তাদের সামনাসামনি বনি তামীম গোত্রভুক্ত সালেহ্ নামের এক ব্যক্তি থাকবেন। তারা সুফিয়ানী বাহিনীকে পরাজিত করবে। অবশেষে এ কালো পতাকাবাহী সেনাবাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ ও প্রবেশ করবে এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।”

এ রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, আল কুদস অভিমুখে এ অগ্রযাত্রার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল কুদস ও ফিলিস্তিন মুক্ত করার জন্য ইমাম মাহদী (আ.)- এর আক্রমণ। তবে সালেহ্ ইবনে শুআইবের পূর্বে আল কুদস অভিমুখে এসব পতাকার (ইরানী সেনাবাহিনীর) অগ্রসর হতে কোন বাধা নেই। যেমন আমরা ইতোমধ্যে শামদেশের ঘটনাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি যে, সুফিয়ানীর পূর্বেই ইরানী সেনাবাহিনী শামদেশে বিদ্যমান থাকবে।

তালেকানের হাদীস

তালেকান প্রসঙ্গ আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

“তালেকানের জন্য সৌভাগ্য! সেখানে মহান আল্লাহর এমন কিছু গুপ্তধন আছে যেগুলো না স্বর্ণের, না রৌপ্যের; বরং সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বিদ্যমান আছে মহান আল্লাহকে যেভাবে চেনা উচিত ঠিক সেভাবে তারা তাঁকে চিনেছে এবং তারা শেষ যামানায় মাহদীর সঙ্গী হবে।”[২৭৯]

আর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : “তালেকানকে অভিন ন! তালেকানকে অভিন ন!”[২৮০]

এই রেওয়ায়েত শিয়া হাদীসসূত্র ও গ্রন্থসমূহে আরেকভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : বিহারুল আন্ওয়ার গ্রন্থে আলী ইবনে আবদুল হামীদ প্রণীত সুরূর- ই আহলে ঈমান গ্রন্থ থেকে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

“তালেকানে মহান আল্লাহর বেশ কিছু গুপ্তধন আছে যেগুলো না স্বর্ণ, না রৌপ্য এবং (সেখানে তাঁর) এমন একটি পতাকা আছে যা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত খুলে উড়ানো হয়নি। এ অঞ্চলে এমন কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যাদের অন্তঃকরণ লোহার টুকরোর মতো মজবুত। তারা ক্লান্ত হয় না। মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কখনই সন্দেহ- সংশয়ের উদ্রেক হয় না। তারা আগুনের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। তারা যদি কোন পর্বতে আক্রমণ চালায় তাহলে সেই পর্বতকেও স্থানচ্যুত করতে পারবে। হাতে পতাকা নিয়ে তারা যে দেশের দিকে যাবে তারা তা বিরাণ ও ধ্বংস করে দেবে। ঈগলের মতো তারা তাদের অশ্বসমূহের পৃষ্ঠদেশে সওয়ার হয়ে কল্যাণ লাভের আশায় ইমাম মাহদী (আ.)- এর সওয়ারী পশুর জীন চুম্বন এবং হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবে। তারা আগুনে আত্মাহুতি দানকারী প্রজাপতিগুলোর মতো তাঁকে (ইমাম মাহদী) চারদিক থেকে ঘিরে রাখবে এবং বিপদের সময় তাঁকে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে রক্ষা করবে। রাতগুলো তারা মুনাজাত করে কাটাবে এবং দিবাভাগে তারা অশ্বারোহণ করে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে থাকবে। তারা রাতের বেলা দুনিয়া ত্যাগী তাপস এবং দিবাভাগে সিংহবৎ। তারা তাদের নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে প্রভুর প্রতি দাস- দাসীরা যেভাবে অনুগত থাকে তার চেয়েও বেশি অনুগত হবে। তাদের ঔজ্জ্বল্য তীব্র আলো বিশিষ্ট বাতিসমূহের মতো, যেন তাদের অন্তঃকরণসমূহ ঈমানে পূর্ণ প্রদীপ। তারা মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত; তারা শাহাদাতকামী এবং মহান আল্লাহর পথে নিহত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের আছে; শহীদ সম্রাট ইমাম হুসাইন (আ.)- এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ তাদের শ্লোগান; যখন তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তখন একমাস পথ চলার দূরত্বে অবস্থিত শত্রুদের অন্তরে ভয়- ভীতি আসন গেড়ে বসবে। তারা দলে দলে ইমাম মাহদী (আ.)- এর দিকে গমন করতে থাকবে। এসব মহানুভব ব্যক্তির মাধ্যমেই মহান আল্লাহ্ সত্যাশ্রয়ী নেতা ইমাম মাহদীকে বিজয়ী করবেন।”[২৮১]

আমার দৃষ্টিতে এ সব রেওয়ায়েতে তালেকান বলতে একটি অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে যা আলবুর্য পর্বর্তমালায় অবস্থিত এবং তেহরান থেকে ১০০ কি.মি উত্তরে। ঐ এলাকাটিতে বেশ কতকগুলো গ্রাম আছে এবং তা ‘তালেকান’ নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত সেখানে কোন বড় শহর

বিদ্যমান নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, তালেকান অঞ্চলের জনগণের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য, যেমন আন্তরিকতা, তাকওয়া এবং অন্যদেরকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেয়ার আগ্রহ বিদ্যমান যে কারণে উত্তর ইরান এবং ইরানের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা ধর্মীয় উপলক্ষ্যসমূহে কোরআন পাঠ এবং তাদের সন্তানদের পবিত্র কোরআন শিক্ষাদানের তালেকান অঞ্চলের পল্লী থেকে শিক্ষক নির্বাচন করে থাকে।

কিন্তু তালেকানের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করার পর আমাদের দৃষ্টিতে যে অভিমতটি উৎকৃষ্ট বলে মনে হয় তা হচ্ছে যে, তালেকান শহরের অধিবাসীরা বলতে তালেকানের ভৌগোলিক এলাকা নয়; বরং সমগ্র ইরানবাসীকেই বোঝানো হয়েছে। তবে, ইমামগণ তালেকানবাসীদেরকে তাদের তালকানের নামে ঐ এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো এবং অধিবাসীদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর ভিত্তিতে নামাঙ্কিত করেছেন।

তালেকানের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ

ইমাম মাহদী (আ.)- এর একদল সঙ্গীর কথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এ সংখ্যা কি ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশ নাকি তাঁর বিশেষ সঙ্গী- সাথীদের ওপরই কেবল প্রযোজ্য?

আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে বর্ণিত রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তারা ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশেষ সঙ্গী- সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, রেওয়ায়েতে তাদের প্রকৃতি সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা ছাড়াও তাদের সংখ্যা, বিজয়কেতন এবং তাদের জয়ী হওয়ার বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে।

কারণ, তালেকান সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে ইমাম মাহদী (আ.)- এর পাশে ইরানীদেরকে পরিচিত করিয়ে দেয়া এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের পরে তাঁর আ ালনে তাদের অংশগ্রহণ করার প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার ব্যাপারে কোন কিছু বলা হয়নি।

তবে মহান আল্লাহর এই ওলীদের এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর এই সঙ্গীদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ সত্যবাদী ইমামদের সুমহান সাক্ষ্যসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ সাধক, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, দৃঢ় বিশ্বাস এবং অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার অধিকারী অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা অতুলনীয় বীর যোদ্ধা। তারা মহান আল্লাহর পথে শাহাদাতকে ভালোবাসে এবং তারা মহান আল্লাহর কাছে ঐ মহান সাফল্য অর্থাৎ শাহাদাত কামনা করে। তারা শহীদ সম্রাট আবু আবদিল্লাহ্ ইমাম হুসাইন (আ.)- এর প্রকৃত প্রেমিক এবং তাদের ে াগান হচ্ছে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাঁর সুমহান বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা। আর যেহেতু ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি তাদের ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা গভীর এবং অস্বাভাবিক মাত্রায় অধিক সেহেতু ইরানীরাও এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; আর এসব বৈশিষ্ট্যই তাদের যুবকদের মাঝে ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি তাদের ভক্তি- শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উত্তাল তরঙ্গ ও জোয়ার সৃষ্টি করছে।

ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ কি আবির্ভাবের যুগের শুরুর নির্দেশক?

যদি কেউ সূক্ষ্মভাবে আবির্ভাবের যুগে ইরানীদের ভূমিকা সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করেন তাহলে তিনি দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।

প্রথম সিদ্ধান্ত : নিশ্চিতভাবে মহানবী (সা.) ও ইমামদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে ইরানীদের প্রশংসা করা হয়েছে। যদিও ইসলামের পতাকা বহন এবং ইসলামী সভ্যতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইরানীদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা যে সকল রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে জাতীয়তাবাদী, বর্ণবাদী বা শিয়া- সুন্নী সাম্প্রদায়িকতার মাপকাঠিতে বিচার- বিশ্লেষণ করে বাতিল করার প্রয়াস আমরা চালাতে পারি। কিন্তু মুস্তাফিয সূত্রে ইমাম মাহদী (আ.)- এর হুকুমত প্রতিষ্ঠায় ইরানীদের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ভূমিকার বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। এ সব রেওয়ায়েত থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে,

(لِيُظهره على الدّين كلّه) - এর মতো আয়াতসমূহে শেষ যামানায় ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ ও প্রতিশ্রুত বিজয়টি আল কুদস অভিমুখে দু'দিক থেকে বাস্তবায়িত হবে। প্রথমটি হলো ইরান থেকে সামরিক ও গণবাহিনীর অগ্রযাত্রার মাধ্যমে (উল্লেখ্য যে, ইরান আহলে বাইতের প্রেমিক এক বিশাল জনসংখ্যা অধ্যূষিত দেশ) এবং দ্বিতীয় আন্দোলনটি পবিত্র মক্কা নগরী ও হিজায থেকে শুরু হবে। এই দুই মহান আন্দোলন ইরাকে পরস্পরের সাথে মিলিত হবে এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনীদ্বয় আল কুদস অভিমুখে অগ্রসর হবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত: আমরা এখন আবির্ভাবের যুগে প্রবেশ করেছি যা রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর আবির্ভাবের যুগের প্রথম পর্যায় হচ্ছে ইরানীদের আন্দোলন ও গণবিপ্লব যা হযরত মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের প্রারম্ভিকাস্বরূপ এবং কোম নগরীস্থ এক ব্যক্তির (ইমাম খোমেইনী) দ্বারা শুরু হয়েছে। এ বিপ্লব তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করেছে। আর তা হচ্ছে আল কুদস মুক্ত করা এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আর এখন এ বিপ্লব ঐ সব সমস্যা ও সংকট মোকাবিলা করছে যেগুলো এর শত্রুরা এর অগ্রযাত্রার পথে সৃষ্টি করেছে। আর এ ঐশী বিপ্লবের স্থায়িত্ব কেবল ঐ দু'জন উদার ব্যক্তিত্বের প্রতীক্ষার মধ্যে নিহিত রয়েছে যাঁরা এ বিপ্লবের প্রতিশ্রুত নেতা হবেন। এঁদের একজন 'খোরাসানী সাইয়্যেদ' এবং অপরজন তাঁর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক- যিনি হবেন বাদামী বর্ণের যুবক ও রাই নগরীর অধিবাসী। তাঁর নাম রেওয়ায়েতসমূহে 'শুআইব ইবনে সালিহ্' এবং কিছু কিছু রেওয়ায়েতে 'সালিহ্ ইবনে শুআইব' বর্ণিত হয়েছে। খোরাসানী সাইয়্যেদ তাঁকে ইরানী সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করবেন। এরপর ইমাম মাহদীও তাঁকে তাঁর সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করবেন।

'ইরানে ইসলামী বিপ্লবের অগ্রযাত্রা শুরু হওয়ার মাধ্যমে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগও শুরু হয়ে গেছে'- এ বিষয়টি অবশ্য এমন একটি আলোচনা যা ব্যাপক ও গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে। আর এ কারণেই পূর্ববর্তী রেওয়ায়েত ও অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে এ বিষয়টির সপক্ষে যে সব দলিল পেশ করা হয়েছে সেগুলো আমরা সংক্ষেপে পুনরায় আলোচনা করব।

কখনো কখনো বলা হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর পুণ্যময় আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং এ ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা শিয়া মাযহাবের অন্যতম মূলনীতি। আর শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের কাছে এ ধরনের আকীদা মহান আল্লাহর ঐ সব ঐশ্বরিক অঙ্গীকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো মহানবী (সা.) এবং ইমামগণের পবিত্র কণ্ঠে বর্ণিত হয়েছে। যেমন শিয়া ও সুন্নী হাদীসশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে যে সব অবশ্যম্ভাবী বিষয় উল্লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে এটিও আছে যে, ইরানীরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর হুকুমতের পটভূমি ও ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হবে। কিন্তু ইরানীদের এ বৈশিষ্ট্য যা রেওয়ায়েতসমূহে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে এবং যা হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী তা খোরাসানী সাইয়্যেদ এবং তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান শুআইব ইবনে সালিহ্ নামের দুই প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আবির্ভাবের মাধ্যমে শুরু হবে। শিয়া হাদীস গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে, এ দু'ব্যক্তির আবির্ভাবকাল সুফিয়ানী ও ইয়েমেনীর আবির্ভাবের সমসাময়িক হবে। আর আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহে এসেছে যে, ইমামের এ দুই সাথীর আবির্ভাব এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে তাঁদের ইসলামের পতাকা অর্পণ করার মাঝে বায়াত্তর মাস অর্থাৎ ছয় বছর ব্যবধান থাকবে।

তবে ইমাম খোমেইনীর নেতৃত্বে ইরানে বর্তমান ইসলামী বিপ্লব যে প্রতিশ্রুত ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব পর্যন্ত তা যে অব্যাহত থাকবে অথবা আপেক্ষিকভাবে তাঁর আবির্ভাবের কাছাকাছি সময় অথবা আবির্ভাবের প্রায় নিকটবর্তী মুহূর্তে 'খোরাসানী সাইয়্যেদ' এবং 'শুআইব ইবনে সালিহ্' আবির্ভূত হবেন- এ বিষয়টি হচ্ছে একটি সম্ভাব্য ও ধারণাভিত্তিক বিষয় যা বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

তবে এ বিপ্লব সম্পর্কে যে সব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিবরণ হিসাবে এসেছে সেগুলো থেকে আসলে ধারণা ব্যতীত আর কিছুই লাভ করা যায় না। অতএব, এ বিপ্লব এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের মাঝে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান থাকার সম্ভাবনাটি যে হাদীসে এসেছে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

এটি হচ্ছে এরূপ কতকগুলো বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার যেগুলোর কারণে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব কালের শুরু সম্পর্কে স্পষ্ট অভিমত দানের ক্ষেত্রে আপত্তি তোলা হয়েছে। এ বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালকে বছরের ভিত্তিতে দশ, বিশ অথবা এরূপ কোন সংখ্যার মধ্যে নির্ধারণ করা যাবে না। বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে সব ঘটনা রেওয়ায়েতসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি ও ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী হিসাবে গণ্য এবং সেগুলো তাঁর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আসলে এ সব ঘটনার মধ্য থেকে দু'টি ঘটতে শুরু করেছে।

প্রথম ঘটনা : পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ফিতনা, গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা যা সব মুসলমানকেই স্পর্শ করবে এবং অপর একটি ফিতনা যা রেওয়ায়েতসমূহে 'ফিলিস্তিনের ফিতনা' বলে অভিহিত হয়েছে- তা পরাশক্তিসমূহের অপকর্ম ও ফিতনা থেকেই উদ্ভূত।

দ্বিতীয় ঘটনা : ইরানে ইসলামী শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন।

অতএব, আবির্ভাবের যুগের অর্থ হচ্ছে আমাদের বক্তব্যের সেই প্রচলিত অর্থ অর্থাৎ ইসরাইলের পরাজয় বরণের যুগ অথবা বিপ্লবসমূহে যুগ অথবা ইসলামের বহিঃপ্রকাশের যুগ- যা 'আবির্ভাবের শতাব্দী' অথবা 'আবির্ভাবের সমসাময়িক প্রজন্ম' বলেও উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত যে রেওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে তাতে ইরানীদের বিপ্লব এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের মধ্যে ব্যবধানটাকে একজন লোকের স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের সমান বলে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : "আমি যদি ঐ সময়টি পাই তাহলে এ বিষয়ের অধিপতিকে (ইমাম মাহদী) সাহায্য করার জন্য নিজেকে সংরক্ষণ করব।"

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালের শুভ সূচনা নির্দেশকারী রেওয়ায়েতসমূহ অগণিত। এ রেওয়ায়েতসমূহ ইজমালী তাওয়াতুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে এ সব রেওয়ায়েতকে বর্তমানে যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলোর সাথে মিলালে আমরা এগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব। বরং দাবি করা যেতে পারে যে, এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে গুটিকতক রেওয়ায়েত

এককভাবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের যুগ শুরু হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান দানের জন্য যথেষ্ট।

সর্বশেষ ফিতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহকে ‘পাশ্চাত্যের কালা- বধির ফিতনা’ যা থেকে ফিলিস্তিনের ফিতনারও উৎপত্তি হয়েছে তা ব্যতীত আর অন্য কোন কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কি? এখানে উল্লেখ্য যে, এ সর্বশেষ ফিতনা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, তা অচিরেই তাঁর উম্মতের ওপর আপতিত হবে এবং মুসলমানদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করবে; অতঃপর ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের যুগে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। এটি হবে ঐ ফিতনা যা রেওয়ায়েতে ‘শামের ফিতনা’ বলে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে।

“যখন ফিলিস্তিনের ফিতনার উদ্ভব হবে তখন মশকের মধ্যে পানি যেভাবে আ ালিত হয় সেভাবে শাম আ ালিত হবে।”[২৮২]

এ ফিতনা এমনভাবে শাম অর্থাৎ ফিলিস্তিনের আশে- পাশের এলাকার ওপর ভয়াল কালো থাবা বিস্তার করবে যে, মশকের মধ্যে পানি যেভাবে টগবগ করে আ ালিত হয় ঠিক সেভাবে তা সেখানকার অধিবাসীদের তীব্রভাবে আ ালিত করবে।

আমরা যদি ‘সর্বশেষ ফিতনা’ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ যেগুলো ইজমালী তাওয়াতুরের পর্যায়ে রয়েছে এবং একইভাবে ফিলিস্তিন ও শামদেশের ফিতনা যা এ সর্বশেষ ফিতনা হতে উদ্ভূত এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করি এবং সে সাথে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করি তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, রেওয়ায়েতে বর্ণিত ফিতনার প্রকৃত অর্থ বর্তমান যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরাশক্তিসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী ফিতনা ও গোলযোগ। আর রেওয়ায়েতসমূহও ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত উক্ত ফিতনা অব্যাহতভাবে চলতে থাকার বিষয়টিকেই নির্দেশ করে। আমরা ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ফিতনা’ শীর্ষক অধ্যায়ে যে সব রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছি সেগুলোর নমুনা এতদপ্রসঙ্গে বিদ্যমান অসংখ্য রেওয়ায়েতের যে কোন একটিও হতে পারে। আর এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক

রেওয়ায়েতটিই হচ্ছে ‘ফিলিস্তিনের ফিতনা’ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত যা নাম ও শনাক্তকারী চিহ্নসহ বর্ণিত হয়েছে।

খোরাসানী সাইয়্যেদ ও শুআইব ইবনে সালিহের আবির্ভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? এ সব রেওয়ায়েতে স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে ঐ দু’ মহান ব্যক্তি ইরানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং শত্রুর সাথে এ ইসলামী হুকুমতের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর ইরানে আবির্ভূত হবেন এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাঁরা ইরানী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে ফিলিস্তিনে একটি ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন যা হবে ইমাম মাহদীর হুকুমত ও প্রশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী। এখন প্রশ্ন হলো যে দু’মহান ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হবেন তাঁরা কি ইরানের সেনাবাহিনীকে অথবা নিজ জাতিকে সরাসরি ও কোনরূপ পটভূমি ছাড়াই হঠাৎ করে নেতৃত্ব দেবেন অর্থাৎ তাঁরা কি শূন্য থেকে শুরু করবেন? অবশ্যই এমন নয়। তাই রেওয়ায়েতসমূহে তাঁদের আবির্ভাবের যে ধরনটির কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, তখন সেখানে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পটভূমির অস্তিত্বের পাশাপাশি ইরানের জনগণের পূর্ণ প্রস্তুতি থাকবে; আর তাদের এ প্রস্তুতি কেবল ধর্মীয় ও আদর্শিক দিক থেকেই উপযুক্ত হবে না; বরং বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবেচনায়ও তা উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। আর ইমাম মাহদী (আ.)- এর সমর্থক ইরানী এবং তাদের শত্রুদের মধ্যকার যুদ্ধের সূচনা এ কারণেই হবে। আর তাই রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আছে যে, যখন ইরানীরা অনুভব করবে যে, শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে তখন তারা খোরাসানী সাইয়্যেদের শরণাপন্ন হবে এবং তাঁকে তাদের সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করবে যদিও তিনিও প্রথমে তা গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যখন প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তাবে তখন তিনি তাঁর বন্ধু ও সঙ্গী শুআইব ইবনে সালিহকে তাঁর সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করবেন।

যে হাদীসটি ইমাম বাকির (আ.) থেকে শিয়া হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাথে মিলে যায় সেই হাদীসটিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? হাদীসটিতে ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাচ্য থেকে একদল

লোক বের হয়ে তাদের অধিকার দাবি করছে; কিন্তু তাদের দাবির প্রতি সাড়া দেয়া হচ্ছে না। পুনরায় তারা তাদের অধিকার দেয়ার ব্যাপারে তাগীদ করতে থাকবে, কিন্তু বিরোধীরা তা মেনে নেবে না। যখন তারা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা তাদের কাঁধে অস্ত্র তুলে নিয়ে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তখনই তাদের দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেয়া হবে। কিন্তু সর্বা ক ও চূড়ান্ত আ ালন না করা পর্যন্ত তারা তা গ্রহণ করবে না। আর তারা তোমাদের নেতা ইমাম মাহদীর শক্তিশালী হাতে হেদায়েতের পতাকা অর্পণ করা ব্যতীত অন্য কারো হাতে তা অর্পণ করবে না। তাদের নিহত ব্যক্তিরা শহীদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু আমি যদি ঐ সময় পেতাম তাহলে এ বিষয়ের অধিপতিকে সাহায্য করার জন্য নিজকে সংরক্ষণ করতাম।”

ইতোমধ্যে এ রেওয়ায়েতটির ব্যাখ্যা প্রাচ্যবাসী ও কালো পতাকাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতে প্রদান করা হয়েছে এবং ঠিক একইভাবে পূর্বোল্লিখিত একটি রেওয়ায়েতে এসেছে : “অতঃপর তারা সংগ্রাম করবে এবং বিজয়ী হবে; আর তারা যা দাবি করবে তা অর্জন করবে; কিন্তু তারা নিজেরাই তা আর মেনে নেবে না।”

এ রেওয়ায়েতটি যখন ইরানী জাতির বর্তমান বিপ্লব ও আ ালনের সাথে খাপ খাচ্ছে তখন আমরা কিভাবে তা এভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিতে পারি যে, মহানবী (সা.) ও ইমামগণ ইরানীদের ভবিষ্যতের অন্য কোন বিপ্লব ও আ ালন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন? অথচ আমরা দেখেছি ইরানীদের বর্তমান বিপ্লব এবং এতৎসংক্রান্ত যা ঘটছে তার সঙ্গেই এ রেওয়ায়েতটি অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, তাই তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। তাই রেওয়ায়েতটিকে আমরা তাদের এই বিপ্লব ও আ ালনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলব নাকি অন্য কোন বিপ্লব ও আ ালন যা একই রকম রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও শর্তের অধিকারী হবে এবং বহু শতাব্দী পরে তাদের দ্বারা সংঘটিত হবে তার ওপর প্রয়োগ করব? শেষোক্ত ধরনের ব্যাখ্যা কি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে?

মহানবী (সা.) ও ইমামদের থেকে বর্ণিত যে সব রেওয়ায়েতে কোম এবং এ নগরীর আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে সেগুলো আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? বিশেষ করে ঐ

রেওয়ায়েতগুলো কিভাবে ব্যাখ্যা করব যেগুলোয় বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবস্থান ও মর্যাদা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের নিকটবর্তী কালে অর্জিত হবে এবং তাঁর আবির্ভূত হওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকবে; আর ঠিক একই অবস্থা ঐ রেওয়ায়েতটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাতে কোম নগরী থেকে এক প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এবং তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাঁরা যেমন যুদ্ধকে ভয় করবে না ঠিক তেমনি তারা যুদ্ধ করে ক্লান্তও হবে না। আর আমরা এ নগরীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারছি যে, এই গত দিন পর্যন্ত এ নগরীতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এটি ছিল একটি দুর্বল শহর এবং শিয়া বিশ্ব ও ধর্মপ্রাণ শিয়াদের মধ্যেই কেবল এ নগরীর আধ্যা ক প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

আর এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, এ কোম নগরী, এর বিপ্লব ও আ লন, এর বৈপ্লবিক পথ ও পদ্ধতি এবং ইসলাম ধর্মকে আধুনিক বিশ্বে উপস্থাপন ও পরিচিত করার বিষয়টি বিশ্ববাসীদের কর্ণকুহরকে পূর্ণ করে দিয়েছে। কোম নগরীর গৃহীত পরিকল্পনা ও কৌশলগুলো মুসলমানদের অন্তঃকরণ ও মুসলিম সমাজসমূহে মজবুত আসন গেড়ে নিয়েছে। এ নগরী থেকে জ্ঞান আজ বিশ্বমুসলিমের হৃদয়ে প্রবেশ করছে ও পৌঁছে যাচ্ছে।

অতএব, যখন কোম নগরীর বিশেষ মর্যাদা এবং এ শহর হতে এক প্রতিশ্রুত ব্যক্তির বিপ্লব করা সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ পবিত্র কোম নগরী থেকে শুরু হওয়া এই বিপ্লবের সাথে মিলে যাচ্ছে তখন এটি কি যৌক্তিক যে, সংঘটিত এ ঘটনাকে উপেক্ষা করে বর্ণিত রেওয়ায়েতকে এভাবে ব্যাখ্যা করব যে, এ ঘটনাটি শত- সহস্র বছর পর কোমে ঘটবে এবং তখন কোম থেকে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন, তাঁর সঙ্গী ও সমর্থকদের বৈশিষ্ট্য হবে এমন এবং তাঁর বিপ্লব ও শাসনব্যবস্থা হবে এমন।

কোম নগরীর প্রতিশ্রুত ব্যক্তির ব্যাপারে এ ধরনের বিষয় যদি সত্য হয় তাহলে কোম শহরের প্রতিশ্রুত আন্তর্জাতিক অবস্থান ও মর্যাদা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের ক্ষেত্রেও তা সঠিক হবে। যে দু'রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময় এ অবস্থান ও মর্যাদার সৃষ্টি এবং তাঁর

আবির্ভাবকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে সেই রেওয়ায়েতদ্বয়ের ব্যাপারে কী করা যেতে পারে?

কারণ, এতদুভয়ে বর্ণিত হয়েছে : "(পবিত্র কোম নগরীর) উক্ত অবস্থান ও মর্যাদা আমাদের কায়েমের (ইমাম মাহ্দী) আবির্ভাবের নিকটবর্তী কালে সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহ্ কোম এবং এর অধিবাসীদেরকে হুজ্জাতের (ইমাম মাহ্দী) স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি করবেন।" "আর তা হবে আমাদের কায়েমের অন্তর্ধানকালে এবং তা তার আবির্ভূত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।" আর এ রেওয়ায়েতদ্বয় ইতোমধ্যে বিহার ৬০তম খণ্ড, পৃ. ২১৩ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, কোম ও ইরানে যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর প্রতি গুটিকতক হাদীসে যে ইশারা-ইঙ্গিত বিদ্যমান সে ব্যাপারে আপত্তি করা এবং হাদীসসমূহে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে এর প্রকাশ্য অর্থ থেকে অন্য অর্থে নেয়ার চেষ্টা এবং অতীত ও বর্তমানকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর ওপর তা আরোপ করার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে স হ পোষণ আসলে আগাম বিচার এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি দুর্বল বিশ্বাসের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং আমরা যদি বিষয়টি ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে, মাসুমদের (নিষ্পাপদের) বাণী যা 'ইজমালী তাওয়াতুর' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে যদি কেউ নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করতে না পারে তাহলে সে অবশ্যই এ বিষয়ে স হ-সংশয় এবং বিতর্ক থেকে মুক্ত হতে পারে নি। আর মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যে, তিনি আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে এ ধরনের অবস্থা থেকে হেফাজত করুন।

ইরানে খোরাসানী ও শুআইবের আবির্ভাব

রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, এ দু'ব্যক্তিত্ব ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সঙ্গী-সাথীদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইমামের আবির্ভাবের কাছাকাছি সময় তাঁরা ইরান থেকে আবির্ভূত হবেন। তাঁরা ইমামের আবির্ভাবের আ ালনে অংশগ্রহণ করবেন।

মোটামুটিভাবে আহলে সুন্নাত এবং শিয়া সূত্রে বর্ণিত কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে এ দু'ব্যক্তির ভূমিকা হবে ঐ সময় ইরানীরা নিজ শত্রুদের সাথে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে এবং ঐ যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার কারণে তারা খোরাসানী সাইয়্যেদকে তাদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচিত করবে যদিও তিনি এ পদ গ্রহণে আগ্রহ প্রদর্শন করবেন না। কিন্তু তাদের অত্যধিক পীড়াপীড়ির কারণে তিনি অবশেষে এ দায়িত্ব নেবেন। যখন তিনি ইরানীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন তখন তিনি ইরানী সশস্ত্র বাহিনীতে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সেনাপতি শুআইব ইবনে সালিহকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত করবেন।

এভাবেই খোরাসানী ও শুআইব ইরান- তুরস্ক- ইরাক সীমান্তে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন এবং শামে অবস্থানরত ইরানী সেনাবাহিনীকে সামনের দিকে (ইসরাইলের দিকে) প্রেরণ করবেন এবং ঐ একই সময় ইরাক ও শাম   ন্ট থেকে প্রিয় কুদস ও ফিলিস্তিনের দিকে বৃহৎ সেনা অগ্রাভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন।

এ যুদ্ধে খোরাসানী সাইয়্যেদ রাজনৈতিক ও সামরিক   ন্টে বেশ কিছু পরিবর্তনের মুখোমুখি হবেন। এগুলো হচ্ছে :

ইরাক ফ্রন্ট: যা সুফিয়ানীর আধিপত্য ও কর্তৃত্বাধীনে চলে যাবে এবং সে ইরাক দখল করার জন্য তার সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে কিরকিসীয়াহ্ নামক স্থানে তুর্কদের (রুশ) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। আমরা সুফিয়ানীর আ   ালন ও বিপ্লব সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

হিজায ফ্রন্ট: হযরত মাহদী (আ.) পবিত্র মক্কা থেকে আবির্ভূত হবেন এবং মক্কা শহর মুক্ত করে সেখানে অবস্থান করতে থাকবেন। ঐ সময় অমুক বংশের অবশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় গোত্রসমূহের দ্বারা হিজায- সরকার পরিচালিত হবে।

হিজাযে ইরানী সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হবে সে ব্যাপারে রেওয়ায়েতসমূহে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। কারণ তা দু'দিক থেকে বাস্তবায়নযোগ্য নয় :

১ .আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিবেশপরিস্থিতি - ।

২. এ ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম মাহদী (আ.)- এর অসম্মতি জ্ঞাপন। কারণ সুফিয়ানী মক্কার উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ এবং মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভূমিধ্বসের মুজিযা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মক্কা নগরীতে অবস্থান করার জন্য আদিষ্ট হবেন। আর এ ভূমিধ্বস হবে মুসলমানদের জন্য নিদর্শন।

অবশ্য খোরাসানী সাইয়্যেদ কর্তৃক কিছু সংখ্যক সৈন্য ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাহায্যার্থে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রেরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) ভূমিধ্বসের মাধ্যমে সুফিয়ানী বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার পর প্রায় বারো হাজার সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে বের হবেন। অপেক্ষাকৃত উত্তম অভিমত হচ্ছে এই যে, এ সেনাবাহিনী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশেষ সঙ্গী- সাথীবৃ এবং যে সব মুমিন পবিত্র মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হবেন তাঁরা, ইয়েমেনী বাহিনীর একটি অংশ এবং খোরাসানী সাইয়্যেদ যে সেনাদল পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রেরণ করবেন তাদের একটি অংশের দ্বারা গঠিত হয়ে থাকবে। খোরাসানী সাইয়্যেদ ও শুআইবের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি ইরাকের কিরকিসীয়ার রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সুফিয়ানী ও তুর্কীদের ফাঁকি দিয়ে নিজ সেনাবাহিনীকে কিরকিসীয়ার নিকটবর্তী স্থান দিয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। কারণ, তিনি ও ইরানী সেনাবাহিনী কিরকিসীয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না।

এ থেকে বোঝা যায় যে, যেহেতু খোরাসানী বাহিনী ইরাকের খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে এবং ইরাক দখল করার উদ্দেশে আগত সুফিয়ানী বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে অবগত থাকবে তবুও তারা ইরাকে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে। এ কারণেই সুফিয়ানী বাহিনী তাদের চেয়ে আঠার দিন আগে ইরাকে প্রবেশ করে সেখানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং জঘন্য অপরাধ ও অপকর্মে লিপ্ত হবে।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (৪৮ পৃ.) বর্ণিত হয়েছে : "সুফিয়ানী কুফায় প্রবেশ করে তিন দিন সে শহরটিতে রক্তপাত ও লুটপাট বৈধ করে দেবে। সে এ শহরের ষাট হাজার অধিবাসীকে হত্যা করবে এবং আঠার রাত সেখানে অবস্থান করবে। কালো পতাকাবাহীরাও

পানির কাছে অবস্থান গ্রহণ করার জন্য সেখানে আগমন করবে। তাদের আগমনের সংবাদ কুফায় প্রচারিত হবে এবং সুফিয়ানী বাহিনীর কানে পৌঁছবে। তারা এ সংবাদ শোনার পর সেখানে অবস্থান করার চেয়ে পলায়ন করাকে প্রাধান্য দেবে।"

অবশ্য ইরাকে এ বাহিনীর প্রবেশ বিলম্বিত হওয়ার কারণ পারস্যোপসাগর বা অন্য কোন স্থানে অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া অথবা ইরানের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও গোলযোগ দমন করাও হতে পারে। কতিপয় রেওয়ায়েতে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা বিলম্ব করার কারণ রাজনৈতিক বিষয় হতে পারে। তারা ইরাকে প্রবেশ করার জন্য একটি উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ ও অবস্থার অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত পরবর্তী রেওয়ায়েতে বিলম্ব করার কারণ যে সামরিক কৌশলগত দিক হবে- এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বিদ্যমান।

"যাতে খোরাসানী ও সুফিয়ানী তাদের (ইরাকবাসীদের) পানে অগ্রসর হয় এবং উভয়ে দু'টি প্রতিযোগী অশ্বের ন্যায় একজন এখান থেকে, আরেকজন ওখান থেকে কুফার দিকে যাত্রা করবে।"

তবে মদীনা নগরী এবং হিযাজের অন্যান্য শহর মুক্ত করার লক্ষ্যে হযরত মাহদী (আ.)- এর সাহায্যার্থে ইরানী বাহিনী প্রেরণের বিষয়টি রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয় নি। বাহ্যত সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজনও হবে না। এ কারণেই ইরানী সেনাবাহিনী যখন ইরাকে প্রবেশ করবে তখন তারা ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি তাদের বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং বাইআতের ঘোষণা দেবে। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "যে সব কালো পতাকা খোরাসান থেকে বের হবে সেগুলো কুফায় আগমন করবে এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সাথে সাথে কালো পতাকাবাহীরা বাইআত নবায়ন করার জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হবে।"[২৮৩]

অন্যদিকে ইরানীদের অগ্রযাত্রা এবং দক্ষিণ ইরানে তাদের সমাবেশ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ সম্ভবত হিজায এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর দিকে তাদের (ইরানীদের) ব্যাপক হারে গমন সংক্রান্ত তথ্য জ্ঞাপন করে।

“যখন সুফিয়ানীর সাঁজোয়া বাহিনী কুফার দিকে যাত্রা করবে তখন তিনি (ইমাম মাহদী) খোরাসানবাসীদের খোঁজে দূত প্রেরণ করবেন এবং খোরাসানীরাও ইমাম মাহদী (আ.)- এর খোঁজে বের হবে।”[২৮৪]

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, খোরাসানী সাইয়্যেদের নেতৃত্বে দক্ষিণ ইরানের আহ্ওয়ায শহরের অদূরে (কূহে সেফীদ) এলাকায় ইরানী জনগণের এক বিশাল সমাবেশ হবে। ইমাম মাহদী হিজায মুক্ত (.আ) করার পর এ অঞ্চলের দিকে যাত্রা করবেন এবং সেখানে তিনি তাঁর খোরাসানী সঙ্গী- সাথী এবং নিজ সৈন্যদের সাথে মিলিত হবেন। সেখানেই তাঁর নেতৃত্বাধীন এ সেনাবাহিনী এবং সুফিয়ানী বাহিনীর মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে যাবে।

এ যুদ্ধটা সম্ভবত সুফিয়ানীকে সাহায্যকারী পাশ্চাত্য নৌবাহিনীর সাথে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর যুদ্ধও হতে পারে। আর এ বিষয়টি ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব আে ালনের অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থন করে একটি বিষয়। আর তা হলো যে, সুফিয়ানী ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীদের মধ্যকার যুদ্ধটা হবে ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ যা ইমাম মাহদী (আ.)- কে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাপী গণজোয়ারের পথ উন্মুক্ত করবে। এ সময় জনগণ তাঁর সাক্ষাৎ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে এবং তাঁকে অন্বেষণ করতে থাকবে।[২৮৫]

তখন থেকেই খোরাসানী ও শুআইব ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশেষ সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং শুআইব ইমাম মাহদী (আ.)- এর সেনাবহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হবেন। আর খোরাসানীদের সেনাবাহিনী ইমাম মাহদী (আ.)- এর সশস্ত্র বাহিনীর কেন্দ্রমূল বা মূল অক্ষ হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মাহদী (আ.) ইরাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংস্কার এবং সকল গোলযোগ সৃষ্টিকারী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাত থেকে সে দেশটিকে মুক্ত করবেন। এরপর তিনি তুর্কীদের (রুশজাতি) সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন এবং সবশেষে আল কুদস মুক্ত করার লক্ষ্যে বৃহৎ সামরিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য তিনি তাদের (খোরাসানী বাহিনী) ওপর নির্ভর করবেন।

আর এটা ছিল ইরানের এ দু'জন প্রতিশ্রুত ব্যক্তিত্বের ভূমিকা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আহলে সুন্নাতের হাদীস সূত্র ও গ্রন্থসমূহে এবং কিছু সংখ্যক শিয়া হাদীস সূত্র ও গ্রন্থসমূহে এ দু'ব্যক্তি সংক্রান্ত অসংখ্য রেওয়ায়েত ও হাদীস থেকে যে ধারণা জন্মে সেটার ভিত্তিতে এ ঘটনা (অর্থাৎ ইরানে উক্ত প্রতিশ্রুত ব্যক্তিত্বদ্বয়ের আবির্ভাব) আমাকে পুনরায় শিয়া হাদীস সূত্র ও গ্রন্থসমূহে খোরাসানী ও শুআইব সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের ব্যাপারে আরো ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা চালানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, প্রথম প্রথম আমার মনে হয়েছিল যে, খোরাসানী ও শুআইবের আবির্ভাবের বিষয়টি, বিশেষ করে আবু মুসলিম খোরাসানীর বিষয়টি বনি আব্বাস অর্থাৎ আব্বাসীদের সৃষ্ট উপাখ্যান হতে পারে। কিন্তু শিয়া হাদীস সূত্র ও গ্রন্থসমূহে অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং এগুলো অধ্যয়ন করার পর সহীহ সনদ ও সূত্র সহকারে বেশ কিছু রেওয়ায়েত দেখতে পাই যেগুলোয় খোরাসানীর কথা উল্লিখিত হয়েছে, যেমন ইমাম সাদিক (আ.) ও অন্যান্য ইমাম থেকে আবু বাসীরের রেওয়ায়েত যা ইয়েমেনী সম্পর্কে তথ্য জ্ঞাপন করে স্বয়ং সেই রেওয়ায়েত এবং আরো কতিপয় রেওয়ায়েত দেখতে পেয়েছি যেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমামদের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে প্রতিশ্রুত খোরাসানীর আবির্ভাব প্রসঙ্গটি আবু মুসলিমের অভ্যুত্থানের পূর্বেই এবং মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহকে আব্বাসীরা নিজেদের এবং আবু মুসলিমের সাথে সংশ্লিষ্ট করার আগেই ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

অতএব, খোরাসানীর আ ালন ও অভ্যুত্থান শিয়া হাদীস সূত্রসমূহেও একটি প্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিত বিষয়। আর শিয়া সূত্রসমূহে তাদের যে ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে ঠিক সেই ভূমিকার কথাই সুন্নী সূত্রসমূহেও বিদ্যমান।

আর ঠিক একইভাবে তাঁর (খোরাসানী) বন্ধু শুআইব ইবনে সালিহের আবির্ভাব সংক্রান্ত বিবরণের সার সংক্ষেপও আমাদের সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে যদিও খোরাসানী সাইয়্যেদের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ বহু দিক থেকে শুআইব ইবনে সালিহ্ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

খোরাসানী ও শুআইবের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নই উত্থাপিত হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, এ সব রেওয়ায়েতে উল্লিখিত খোরাসানী বলতে কি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে অথবা ইরানের ঐ নেতাকে বোঝানো হয়ে থাকতে পারে যিনি ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালে ইরানে বিদ্যমান থাকবেন?

তবে খোরাসানী সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ যেগুলো আহলে সুন্নাতের সূত্রে এবং একইভাবে পরবর্তী শিয়া সূত্রসমূহে বিদ্যমান সেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) অথবা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বংশধর হবেন এবং তিনি খোরাসানী হাশিমী নামে উল্লিখিত হয়েছেন। ঐ সব হাদীসে তাঁর দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তিনি জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলের অধিকারী হবেন এবং তাঁর ডান গালে বা ডান হাতে তিল থাকবে।

তবে খোরাসানীর ব্যাপারে যে সব রেওয়ায়েত শিয়াদের প্রথম শ্রেণীর হাদীস সূত্র ও গ্রন্থসমূহ, যেমন নূমানী ও শেখ তূসীর গাইবাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো খুব সম্ভবত তাঁকে খোরাসানীদের সাহায্যকারী অথবা খোরাসানবাসীদের নেতা অথবা খোরাসান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বলে ব্যাখ্যা করেছে। কারণ এ সব রেওয়ায়েত তাঁকে 'খোরাসানী হাশিমী' বলে আখ্যায়িত না করে কেবল 'খোরাসানী' নামে উল্লেখ করেছে। তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল- প্রমাণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি যে সুফিয়ানী ও ইয়েমেনীর আবির্ভাব ও আ লনের সময় আবির্ভূত হয়ে ইরাক অভিমুখে নিজ সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন তা একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিষয়।

এ দু'ব্যক্তি সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তন্মধ্যে এ প্রশ্নটিও আছে যে, খোরাসানী ও শুআইব কি দু'টি রূপক ও প্রতীকী নাম হতে পারে? এর উত্তরে খোরাসানীর ব্যাপারে বলতে হয় যে, রেওয়ায়েতসমূহে তাঁর প্রকৃত নাম উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং এটা ভাবার কোন অবকাশ নেই যে, তাঁর নাম রূপক ও প্রতীকী। হ্যাঁ, আমরা বলতে পারব যে, খোরাসানের সাথে তাঁর সম্পর্ক এতদর্থে নয় যে, তিনি অবশ্যই বর্তমানে খোরাসান প্রদেশের অধিবাসী হবেন। কারণ ইসলামের প্রথম যুগে খোরাসানকে প্রাচ্য বলে অভিহিত করা হতো যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বর্তমান

ইরান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের[২৮৬] শাসনাধীন ইরানসংলগ্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ। তাই খোরাসানী উক্ত ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে কোন এলাকার অধিবাসী হতে পারেন। তাই খোরাসানের সাথে তাঁর সম্পর্কিত হওয়া অর্থাৎ তাঁকে শুধু 'খোরাসানী' বলাই সঠিক। কারণ সুন্নী সূত্রসমূহে যেভাবে তাঁকে হাসানী বা হুসাইনী বলা হয়েছে ঠিক তদ্রূপ শিয়াদের প্রথম সারির প্রসিদ্ধ হাদীস সূত্রসমূহ থেকে তিনি যে হাসানী বা হুসাইন সাইয়্যেদ হবেন তা বোঝা যায় না।

কিন্তু শুআইব ইবনে সালিহ অথবা সালিহ্ ইবনে শুআইব- এর ব্যাপারে অবশ্যই বলতে হয় যে, রেওয়ায়েতসমূহে তাঁর (শারীরিক ও চারিত্রিক) বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। যেমন তাঁর দেহের রং হবে তামাটে বা শ্যামলা। তাঁর দেহের গড়ন হবে হালকা- পাতলা। তাঁর দাঁড়ি হবে খুব সামান্য। তিনি হবেন বিচক্ষণ ও স্থির বিশ্বাসের অধিকারী। তাঁর ইচ্ছাশক্তি হবে দৃঢ় ও স্থায়ী। তিনি অন্যতম প্রসিদ্ধ ও প্রতিভাধর সমর বিশারদ হবেন ইত্যাদি। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে মহান আল্লাহর ঐশী অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হওয়া পর্যন্ত এটা হতে পারে তাঁর ছদ্ম নাম। আর ঠিক একইভাবে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম শুআইব (আ.) ও সালিহ্ (আ.)- এর নামের অনুরূপ অথবা এ দু'নামের সমার্থকও হতে পারে। কিছু কিছু রেওয়ায়েতে তাঁকে সামারকা র অধিবাসী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সামারকা নগরী বর্তমানে সোভিয়েত শাসনাধীন।[২৮৭]

কিন্তু অধিকাংশ রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি রেই নগরীর অধিবাসী, বনি তামীম গোত্রভুক্ত অথবা মাহরূম না ী বনি তামীমের এক শাখা গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত অথবা বনি তামীম গোত্রের একজন দাস হবেন। যা হোক এটি যদি সত্য হয় তাহলে তিনি সম্ভবত দক্ষিণ ইরানের অধিবাসী হবেন। কারণ সেখানে আজও বনি তামীম গোত্রের শাখা গোত্রসমূহ বিদ্যমান অথবা তিনি বনি তামীম গোত্রের ঐ সব শাখা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যারা ইসলামের প্রথম যুগে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য খোরাসান প্রদেশে চলে এসেছিল। আজ তাদের অধিকাংশই ইরানী জনগণের মাঝে মিলেমিশে গেছে এবং মাশহাদ নগরীর অদূরে গুটিকতক ছোট গ্রামে তাদের কিছু সংখ্যক আজও বিদ্যমান আছে যারা আরবী ভাষায় কথা বলে। অথবা তাদের সাথে তাঁর রক্তসম্পর্কীয় আ ীয়তার বন্ধন থাকাটাও সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এ দু'ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সংক্রান্ত। আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম যে, (রেওয়ায়েতসমূহ থেকে) মনে হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে এবং সুফিয়ানী ও ইয়েমেনীর অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের সময় এ দু'জন আবির্ভূত হবেন। অবশ্য যে রেওয়ায়েতটিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, শুআইবের আ ালন এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে সার্বিক দায়িত্বভার অর্পণ করার মাঝে ৭২ মাস ব্যবধান থাকবে, তা সহীহ বলা যেতে পারে। তাহলে এমতাবস্থায় খোরাসানী ও শুআইবের আবির্ভাব ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের ৬ বছর পূর্বে হবে।

তবে কোমের ইরানী এক ব্যক্তির মাধ্যমে ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের হুকুমতের শুভ সূচনাকাল এবং খোরাসানী ও শুআইবের আবির্ভাবকালের মধ্যকার ব্যবধান রেওয়ায়েতসমূহে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি। তবে যে সব ইশারা- ইঙ্গিত এবং দলিল- প্রমাণের মাধ্যমে তা সংক্ষেপে নির্ধারণ করা সম্ভব সেই সব দলিল- প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ঐ সকল রেওয়ায়েত যেগুলোয় কোম নগরী এবং এর ঘটনাবলী, যেমন এ নগরীর বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও চিন্তাগত অবস্থান ও গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এ সব কিছু যে হযরত কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাবের খুব নিকটবর্তী সময় সংঘটিত হবে এতৎসংক্রান্ত বিবরণ ও বর্ণনা এ সব রেওয়য়েতে এসেছে। আমরা এ বিষয়টি 'বিহারুল আনওয়ার' গ্রন্থের ৬০তম খণ্ড, পৃ. ২১৩ থেকে বর্ণনা করেছি।

যে রেওয়ায়েতটি ইমাম বাকির (আ.) থেকে 'বিহারুল আনওয়ার' গ্রন্থের ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৪৩- এ বর্ণিত হয়েছে [যাতে তিনি বলেছেন : আমি যদি ঐ সময়টি পেতাম তাহলে আমি এ বিষয় অর্থাৎ ইসলামের অধিপতির জন্য নিজেকে সংরক্ষণ করতাম।] তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কায়েম আল মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব ও প্রাচ্যবাসীদের (ইরানীদের) হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মধ্যকার ব্যবধান একজন মানুষের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অপেক্ষা বেশি হবে না । এতদপ্রসঙ্গে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি হাদীস আছে যা আগে বিহারুল আনওয়ার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৬৯ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো : "মহান আল্লাহ্ আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তির কাছে তা অর্পণ করবেন যার

অনুসৃত কর্মপন্থা হবে তাকওয়া নির্ভর এবং যার কর্মকাণ্ড হবে জনগণের হেদায়েতকারী। সে জনগণের মাঝে বিচার ও ফয়সালা করার ব্যাপারে কোন উৎকোচ গ্রহণ করবে না। মহান আল্লাহর শপথ, আমি তার নাম ও তার পিতার নাম জানি। অতঃপর ঐ বলিষ্ঠ ও ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি... যার মুখমণ্ডলে তিল এবং দেহের ত্বকে আরো দু'টি চিহ্ন রয়েছে সে আসবে। সে ঐ আমানতের সংরক্ষণকারী যা তার কাছে রাখা আছে এবং সে সমগ্র পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে পূর্ণ করে দেবে।"

সর্বপ্রথম আহলে বাইতের বংশোদ্ভূত একজন সাইয়্যেদের মাধ্যমে যে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীদের হুকুমতের শুভ সূচনা হবে এতৎসংক্রান্ত ইশারা- ইঙ্গিত এ রেওয়ায়েতে বিদ্যমান। আর সম্ভাবনার ভিত্তিতে এ রেওয়ায়েতটি হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)- এর ওপর প্রযোজ্য হয় অথবা ইমাম খোমেইনী (রহ.)- এর পরে এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে এক বা একাধিক ব্যক্তি উক্ত হুকুমতের কর্ণধার হতে পারেন সে বিষয়টিও ইঙ্গিত করে। কারণ, যেহেতু আমরা বলেছি যে, এ রেওয়ায়েতটি অসম্পূর্ণ, সেহেতু এই খোরাসানী সাইয়্যেদ হবেন সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে ইরানে শাসন করবেন অথবা ইরানের সর্বশেষ শাসকের সমসাময়িক হবেন।

আর সর্বশেষ প্রশ্ন যা খোরাসানী সাইয়্যেদের ব্যাপারে উত্থাপন করা হয় তা হলো যে, তিনি কি মারাজায়ে তাকলীদ অথবা মারজা- ই তাকলীদের পাশে অবস্থানকারী একজন রাজনৈতিক নেতা, যেমন প্রেসিডেন্ট অথবা কোন মারজা- ই তাকলীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহকারী ও উপদেষ্টা হবেন?

'খোরাসানী' সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রাচ্য (ইরান) সরকারের শীর্ষ নেতা হবেন। কেবল এ সম্ভাবনাটাই থেকে যায় যে, তিনি মারজা ও নেতার নির্দেশে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সার্বিক বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। সম্ভবত এমনটিও হতে পারে। আর মহান আল্লাহ্ই (এ বিষয়ে) একমাত্র জ্ঞাত।

আমরা শীঘ্রই মহান আল্লাহ্ ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে যে সব গায়েবী সাহায্য, কারামত ও মুজিযাসমূহ প্রকাশ করবেন সে দিকে ইঙ্গিত করব এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে পরিবর্তন, পূর্ণতা ও উৎকর্ষ সাধিত হবে তা হাদীসের আলোকে অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করব।

ইমাম মাহদী (আ.) 'সাহলা' এলাকাকে যে তাঁর নিজের ও নিজ পরিবারের বাসস্থান হিসাবে মনোনীত করবেন তা বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছ। উল্লেখ্য যে, সাহলা কারবালার দিক থেকে কুফা নগরীর কাছে অবস্থিত একটি এলাকার নাম।

ইমাম মাহদীর অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে আর কুদস অভিমুখে অগ্রযাত্রা এবং বৃহৎ সামরিক অভিযান পরিচালনা করার আগে ইরাকে দীর্ঘ অবস্থান। যেমন : "তখন সে কুফায় আসবে এবং যে পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন সে সেখানে থাকবে।"[২৮৮]

সম্ভবত ইরাককে তাঁর সরকারের রাজধানী হিসাবে মনোনীত করা এবং সেখানকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্য ছাড়াও তাঁর সেখানে অবস্থানের অন্যতম কারণ হবে সারা বিশ্ব থেকে স্বীয় নির্বাচিত সহযোগী ও উপদেষ্টাদের এ রাজধানীতে একত্রিত করা এবং সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী গঠন ও বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা।

অতঃপর তিনি তাঁর নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে আল কুদস (বাইতুল মুকাদ্দাস) মুক্ত করার জন্য রওয়ানা হয়ে যাবেন। ইমাম বাকির (আ.) থেকে একটি রেওয়ায়েত (হাদীস) বর্ণিত হয়েছে যাতে তিনি বলেছেন :

"আল কায়েম যখন কুফায় প্রবেশ করবে তখন পৃথিবীতে এমন কোন মুমিন বিদ্যমান থাকবে না যে সেখানে উপস্থিত হবে না অথবা সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবে না। আর এটা হচ্ছে আমীরুল মুমিনীনের বাণী যে, সে তার সাথীদেরকে বলবে : এ তাগুতকে (সুফিয়ানী) ধ্বংস করার জন্য আমাদের সাথে চল।"[২৮৯]

আর আলী (আ.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমরা জেনে রাখ, আমি আল কায়েম আল মাহদীকে নাজাফে দেখতে পাচ্ছি, সে পবিত্র মক্কা থেকে ৫০০০ ফেরেশতার মাঝে সেখানে

আগমন করবে এমতাবস্থায় যে, জিবরাঈল তার ডান পাশে এবং মীকাঈল তার বাম পাশে এবং মুমিনরা তার সামনাসামনি হাঁটতে থাকবে। আর সে তার সেনাবাহিনীকে শহরসমূহে প্রেরণ ও মোতায়েন করবে।”[২৯০]

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : শুআইব ইবনে সালিহ্ তার সেনাবাহিনীর অগ্রনায়ক হবে।” তিনি (শুআইব) আল কায়েম আল মাহ্দী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর সেনাপতিও হবেন।

কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে প্রথম যে সেনাদলটিকে ইমাম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করবেন তা তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন। ইবনে হাম্মাদ এ ব্যাপারে আরতাত থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন : “সুফিয়ানী তুর্কদের (রুশজাতি) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তবে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর হাতে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস সাধিত হবে এবং এটিই তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত তাঁর প্রথম সেনাদল।”[২৯১]

ইবনে তাউসের ‘আল মালাহিম ওয়াল ফিতান’ নামক গ্রন্থে (পৃ. ৫২) প্রায় এই একই অর্থসম্বলিত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইবনে হাম্মাদের গ্রন্থ থেকে সত্তর বা ততোধিক পৃষ্ঠা তাঁর নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর আমরা তুর্কী জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বলেছি যে, এ সব রেওয়ায়েতে তুর্কী জাতি বলতে তুর্কী মুসলমানদেরকে বোঝানো হয় নি; বরং কাফির তুর্কীদেরকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান প্রচুর সাক্ষ্য- প্রমাণ এ বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে এবং আরো কতিপয় রেওয়ায়েতে তুর্কীরা বলতে তুর্কী ভ্রাতৃবৃ অথবা তুর্কীদের পক্ষ থেকে একদলকে বোঝানো হয়েছে। তুর্কীরা শব্দের সম্ভাব্য শক্তিশালী অর্থ হচ্ছে রুশজাতি।

চতুর্দশ অধ্যায়

শুভ আবির্ভাবের আন্দোলন

রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর পবিত্র আন্দোলন ও বিপ্লব চৌদ্দ মাসে পূর্ণতা লাভ করবে। প্রথম ছয় মাসে ইমাম উদ্বিগ্নতার মধ্যে কাটাবেন এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীদের মাধ্যমে গোপনীয়তা রক্ষা করে আন্দোলন পরিচালনা করবেন এবং পরবর্তী আট মাসের মধ্যে পবিত্র মক্কায় আবির্ভূত হবেন। এরপর তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। সেখান থেকে ইরাক ও কুদস (বাইতুল মুকাদ্দাস) অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তাঁর আনুগত্য করবে ও আদেশ- নির্দেশ মেনে চলবে। তখন রোমীয়দের (পাশ্চাত্য) সাথে তিনি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পরে যথাসময়ে দেয়া হবে।

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আন্দোলনের আগে দু'টি ঘটনা ঘটবে যেগুলো হবে মহান আল্লাহর নিদর্শন। তখন তিনি তাঁর আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করবেন :

প্রথম ঘটনা : উসমান সুফিয়ানীর নেতৃত্বে শামদেশে সামরিক অভ্যুত্থান। কিন্তু জনগণ ভাববে যে, এ অভ্যুত্থান হচ্ছে আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে সচরাচর যে সব সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে থাকে সেগুলোর মতোই।

তবে মুসলিম উম্মাহর চিরশত্রু পাশ্চাত্য ও ইহুদীরা এটাকে তাদের প্রতিষ্ঠিত একটি শক্তিশালী ও ক্রীড়নক সরকার হিসাবে মনে করবে এবং ফিলিস্তিনের আশে- পাশের অঞ্চলের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করবে। সুফিয়ানীর সরকার শক্তি প্রয়োগ করে এ অঞ্চলের সার্বিক অবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং তাদের পাশ্চাত্য ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযানসমূহ প্রতিহত করবে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ এলাকায় এ সামরিক শক্তিই আল কুদস অভিমুখে অগ্রসরমান প্রেরিত প্রথম ইরানী বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তাঁদেরকে ইরাক সীমান্তে ব্যস্ত রাখবে।

সুফিয়ানী সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে এবং জানে যে, মহানবী (সা.) কর্তৃক সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তারা বলবে যে, মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.) সত্য বলেছেন : "আমাদের প্রভু পবিত্র এবং নিশ্চয়ই প্রভুর অঙ্গীকার বাস্তাবায়িত হবে..." এবং তাদের অন্তরসমূহ প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)- এর ব্যাপারে আশাবাদী হবে। তখন তারা তাঁর ব্যাপারে অনেক কথা বলবে এবং তাঁকে সাহায্য করার ব্যাপারে নিজেদের প্রস্তুতি ঘোষণা করবে।

দ্বিতীয় ঘটনা : দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে পৃথিবীবাসীর প্রতি একটি আসমানী আওয়াজ যা সবাই এবং সকল ভাষাভাষী গোষ্ঠী ও জাতি তাদের নিজ নিজ ভাষায় শুনতে পাবে। এ আহবান- ধ্বনি হবে খুবই শক্তিশালী ও ভেদকারী যা আকাশ এবং সব দিক থেকে ভেসে আসবে। এ ধ্বনি ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত এবং উপবিষ্ট ব্যক্তিকে নিজ পায়ের ওপর দাঁড় করাবে। জনগণ এ আসমানী ধ্বনি শুনে বিষয়টি জানার জন্য উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে করতে নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে আসবে। এই ধ্বনি জনতাকে অন্যায়- অত্যাচার, কুফর, দ্বন্দ্ব- সংঘর্ষ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকা এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আনুগত্য করার প্রতি আহবান জানাবে। এ ধ্বনি ইমাম মাহদী (আ.)- কে তাঁর পিতার নামসহ ডাকা হবে।

রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জাতি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুত এ ঐশী নিদর্শনের সামনে মাথা নত করবে। কারণ এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যা :

"যদি আমরা তাদের ওপর আসমান থেকে মুজিযা অবতীর্ণ করতে চাই যার সামনে তারা সবাই আ সমর্পণ ও মাথা নত করবে।..." (শুয়ারা : ৪)

তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে বিশ্বব্যাপী এ প্রশ্ন সকলের মুখে মুখে জোরালোভাবে উচ্চারিত এবং সকল প্রচার মাধ্যমের পক্ষ থেকে 'মাহদী কে, তিনি কোথায় আছেন' তা অনুসন্ধান করা হবে ও আলোচনা- পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু যখনই সবাই জানবে যে, তিনি মুসলমানদের নেতা, মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের একজন সদস্য এবং তিনি অতি সত্বর হিজাযে আ প্রকাশ করবেন, তখন উক্ত আলৌকিক

আসমানী আহবান- ধ্বনির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা এবং বিশ্বব্যাপী নয়া ইসলামী জাগরণের ওপর মরণাঘাত হানা ও ইসলামী আন্দোলনের এ মহান নেতা ইমাম মাহদীকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করা হবে। কিন্তু গায়েবে বিশ্বাসীরা যারা এ আহবান- ধ্বনি সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ শুনেছে তারা ভালোভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবে যে, এ ধ্বনিই হচ্ছে প্রতিশ্রুত সত্য ধ্বনি এবং তারা শুকরানা সিজদা আদায় করবে এবং মহান আল্লাহর সামনে তাদের অন্তরের বিনয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তারা সবসময় ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করবে, তাঁকে অন্বেষণ করতে থাকবে এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে।

এ আসমানী ধ্বনি যা জনগণকে ইমাম মাহদী (আ.)- কে অনুসরণ ও আনুগত্য করার জন্য আহবান জানাবে এবং তাঁকে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নামসহ স্মরণ করবে এতৎসংক্রান্ত অগণিত রেওয়ায়েত শিয়া ও সুন্নী সূত্রসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। আর এগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির।[২৯২]

ইবনে হাম্মাদ এ রেওয়ায়েতটি তাঁর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ৫৯, ৬০, ৯২, ৯৩ পৃষ্ঠায় এবং আরো অন্যান্য স্থানে এবং মাজলিসী বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থের ৫২তম খণ্ডের ১১৯, ২৮৭, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৬ ও ৩০০ ও অন্যান্য পৃষ্ঠায় ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন : "আকাশ থেকে একজন আহবানকারী ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে থাকবে : নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা অমুকের পুত্র অমুকের। অতএব, কিসের জন্য হত্যাকাণ্ড (সংঘটিত হচ্ছে)?"[২৯৩]

তিনি বলেছেন : "দু'টি ধ্বনি শোনা যাবে। একটি হলো প্রথম দিন রাত শুরু হওয়ার সময় এবং দ্বিতীয়টি হলো দ্বিতীয় রাতের শেষে।" হিশাম ইবনে সালিম বলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তা কেমন?" তিনি বললেন, "একটি ধ্বনি আকাশ হতে এবং অন্যটি শয়তানের পক্ষ থেকে হবে।" আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "কিভাবে একটিকে আরেকটি হতে আলাদা করা যাবে?" তিনি বললেন, "এর শ্রোতা তা অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তা নির্ণয়ে সক্ষম হবে।"[২৯৪]

মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণিত : "আকাশ থেকে একজন আহবানকারী আল কায়েম আল মাহদী (আ.)- এর নাম ধরে এমনভাবে ডাকবেন যে, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত তা শোনা যাবে, এ ধ্বনির প্রভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি বসে পড়বে এবং যে বসা থাকবে সে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে যাবে। আর ঐ ধ্বনিটা হবে রুহুল আমীন জিবরাঈল (আ.)- এর ধ্বনি।"[২৯৫]

আবদুল্লাহ্ ইবনে সিনান থেকে বর্ণিত : "আমি ইমাম সাদিক (আ.)- এর সামনে উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন একজন হামাদানবাসীকে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম যে, আহলে সুন্নাহ আমাদেরকে তিরষ্কার করে বলে : তোমরা বিশ্বাস কর যে, আকাশ থেকে একজন আহবানকারী ইমাম মাহদী (আ.)- এর নাম ধরে আহবান জানাবে! হযরত হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি এ কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন : এ বিষয়টা আমার থেকে বর্ণনা করো না, বরং আমার পিতা থেকে বর্ণনা করবে। সেক্ষেত্রে তোমাদের ওপর কোন আপত্তি থাকবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার পিতা বলতেন : মহান আল্লাহর শপথ, এ বিষয়টা তাঁর কিতাবে স্পষ্ট বিদ্যমান। যেমন এরশাদ হয়েছে : আর যদি আমরা চাইতাম তাদের ওপর আকাশ হতে একটি মুজিযা (আলৌকিক নিদর্শন) অবতীর্ণ করতাম যার সামনে তারা তাদের মাথা নত করত।"[২৯৬]

সাইফ ইবনে উমাইরাহ্ বলেন : "আমি দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আল মানসুরের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ভূমিকা ছাড়াই বললেন : হে সাইফ ইবনে উমাইরাহ্! নিঃসন্দেহে আকাশ হতে এক আহবানকারী আবু তালিবের বংশধারা হতে এক ব্যক্তির নাম ঘোষণা করবে। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার জন্য কোরবান হই। এ বিষয়টা আপনি রেওয়ায়েত করছেন! তিনি বললেন : হ্যাঁ। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, এ বর্ণনাটি আমি নিজ কানে শুনেছি। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এখন পর্যন্তও এ রেওয়ায়েতটি শুনি নি। তিনি বললেন : হে সাইফ! এ কথা সত্য। আর যদি এমন আহবানকারীই আগমন করে তাহলে আমরাই তাঁর আহবানে প্রথম সাড়াদানকারী হব। এমন নয় কি যে, ঐ আহবান- ধ্বনি জনগণকে [আমাদের পিতৃব্য পুত্রদের মধ্যে থেকে] এক ব্যক্তির দিকে আহবান জানাবে। আমি

বললাম : সে ব্যক্তিটি কি হযরত ফাতিমার বংশধর হবেন? তিনি বললেন : হে সাইফ! হ্যাঁ। আমি যদি এ কথা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলীর কাছ থেকে না শুনতাম এবং সমগ্র পৃথিবীবাসীও যদি তা বর্ণনা করত তাহলে আমি কখনই তাদের কাছ থেকে তা মেনে নিতাম না। তবে তিনি (এ বর্ণনাকারী) হলেন মুহাম্মদ ইবনে আলী (ইমাম বাকির)[২৯৭]।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (পৃ. ৯২) সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত : "এমন একটি ফিতনার উদ্ভব হবে যা শুরুতে শিশুদের খেলনার মতো হবে। তা যদি কোন একদিকে প্রশমিত হয় তাহলে তা অন্য এক দিক থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এ ফিতনা আসমান থেকে আহবানকারীর আহবানের সময় পর্যন্ত শেষ হবে না। আহবানকারী আহবান করে বলতে থাকবে : তোমরা সবাই শুনে নাও যে, তোমাদের নেতা অমুক ব্যক্তি।" ইবনে মুসাইয়ার তাঁর হাতদ্বয় এমনভাবে পরস্পর সংযুক্ত করলেন যে, সেগুলো কাঁপছিল। তখন তিনি তিনবার বললেন : তিনিই হলেন তোমাদের সত্যিকার নেতা।"

ঐ একই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : "যখন আকাশ থেকে একজন আহবানকারী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, সত্য মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইতের সাথে আছে, তখন ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর নাম জনগণের মুখে মুখে ধ্বনিত হবে এবং মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা আসন লাভ করবে এবং জনগণ তখন তাঁকে ব্যতীত আর কোন কিছুর চিন্তাও করবে না।"

আরো বর্ণিত হয়েছে : ইমাম বাকির (আ.) থেকে জাবির এবং তাঁর থেকে সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আকাশ থেকে এক আহবানকারী উচ্চৈঃস্বরে আহবান করে বলবে : তোমরা সবাই জেনে নাও যে, সত্য, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইতের মধ্যেই আছে। এরপর পৃথিবী থেকে আরেকটি ধ্বনি ধ্বনিত হবে এবং বলা হবে : তোমরা সবাই জেনে রাখ যে, সত্য হযরত ঈসা (আ.)- এর বংশে অথবা আব্বাসের বংশে আছে (আমার স হ আছে) এবং নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে উত্থিত দ্বিতীয় এ ধ্বনিটি হবে শয়তানের। সে মানব জাতিকে নিরাশ করতে এরূপ ধ্বনি উঠাবে।" (স হকারী আবু আবদিল্লাহ্ নাঈম)

এ গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় মহানবী (সা.) থেকে ইবনে মাসউদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে : "যখন রমযান মাসে আকাশ থেকে ধ্বনি শোনা যাবে তখন তোমরা সবাই জানবে যে, শাওয়াল মাসে এক ভীষণ গোলযোগ হবে; যীলক্বদ মাসে গোত্রগুলো একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং যিলহজ্ব মাসে রক্তপাত সংঘটিত হবে। তিনি তিনবার বললেন : কিন্তু মুহররম কেমন মুহররমই না হবে! কত দূর! কত দূর! এ মাসে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের কারণে অসংখ্য মানুষ নিহত হবে।" আমি প্রশ্ন করলাম : "হে রাসূলাল্লাহ্! আসমানী ধ্বনি ও আহবানটি কী?" তিনি বললেন : "এ ধ্বনি রমযান মাসের মাঝামাঝিতে শুক্রবার রাতে শোনা যাবে। এটি হচ্ছে এমন এক ধ্বনি যা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করবে এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বসিয়ে দেবে এবং সতি- সাধ্বী পর্দানশীল মহিলাদেরকে পর্দা থেকে বের করে আনবে...। যে বছর ভূমিকম্প অধিক হবে, যখন শুক্রবার দিবসের ফজরের নামায আদায় করবে তখন নিজেদের ঘরে ফিরে দরজা ও জানালা বন্ধ করে নিজেদেরকে ঢেকে রাখবে এবং নিজেদের কান বেধে রাখবে। যখন ঐ শব্দটা শুনবে তখন সিজদার স্থানে মাথা রেখে বলবে :

سبحان القدّوس سبحان القدّوس سبحان القدّوس

যে কেউ এমন করবে সে- ই নাজাত পাবে। আর যে ব্যক্তি তা করবে না সে ধ্বংস হয়ে যাবে।" এবং অন্যান্য রেওয়ায়েত যেগুলো এ প্রসঙ্গে শিয়া- সুন্নী সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শিয়া- সুন্নী সূত্রসমূহে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মাহদী (আ.)- এর বিরোধী এ পার্থিব ধ্বনিটি যা রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা সরাসরি ইবলীসের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনিও হতে পারে। যেমন সে উহুদ যুদ্ধে চিৎকার করে বলেছিল : "মুহাম্মদ নিহত হয়েছে।" আবার তা ইবলীসের সঙ্গী- সাথী অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শয়তানী চক্রের প্রচার মাধ্যম দ্বারাও প্রদত্ত হতে পারে। তারা আসমানী আহবান- ধ্বনি বিশ্বব্যাপী ইসলামের যে পুনর্জাগরণী ও জোয়ার সৃষ্টি করবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বাধা দানের জন্য আসমানী আহবানধ্বনি বিরোধী অথচ তৎসদৃশ আহবান- ধ্বনি তৈরি করবে।

তবে আসমানী আহবান- ধ্বনি যে যুদ্ধ বন্ধ করার দিকে সবাইকে আহবান জানাবে তা ঐ বিশ্বযুদ্ধ হতে পারে যা আমরা আগে আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে, ঐ যুদ্ধ পারমাণবিক যুদ্ধ নাও হতে পারে; বরং তা বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক যুদ্ধ হতে পারে। রেওয়ায়েতসমূহের বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

আসমানী আহবান- ধ্বনি সংঘটিত হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়- এ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিতে থাকা উচিত। কারণ, যেমন আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন তদনুসারে কতিপয় রেওয়ায়েত এই আহবান- ধ্বনিকে রমযান মাসে, কতিপয় রেওয়ায়েত[২৯৮] রজব মাসে এবং আরো কতিপয় রেওয়ায়েত, যেমন ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে পৃ. ৯২ বর্ণিত হাদীসটি হজ্ব মৌসুমে এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি আবার (৯৩ পৃষ্ঠায়) নাফসে যাকীয়ার মৃত্যুর পরে মুহররম মাসে হতে পারে বলে উল্লেখ করেছে।

আরো কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে ধারণা হয় যে, ঐ আসমানী আহবান- ধ্বনি একাধিক হবে, এমনকি কতিপয় রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। একজন গবেষক আলেম শিয়া হাদীস সূত্রসমূহে বর্ণিত আহবান- ধ্বনির সংখ্যা আট পর্যন্ত হিসাব করেছেন এবং দেখা গেছে যে, আহলে সুন্নাতের হাদীস সূত্রসমূহেও উক্ত আহবানধ্বনির সংখ্যা আট। তবে সর্বোত্তম বলে যা মনে হয় তা হচ্ছে, আসমানী আহবান- ধ্বনি কেবল একটি হবে- একাধিক হবে না। আর তা রমযান মাসেই শোনা যাবে। তবে উক্ত আহবান- ধ্বনি যে একাধিক হবে এ ধারণাটি আসলে এ আহবানের সময় সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের মধ্যকার পার্থক্য থেকেই উদ্ভূত। আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ই ভালোভাবে অবগত।

এ দু'নিদর্শন অর্থাৎ রজব মাসে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান এবং রমযান মাসে আসমানী আওয়াজের পর মুহররম মাসে হযরত মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস ব্যবধান থাকে। আহলে সুন্নাতের হাদীস সূত্রগুলো এ কয় মাসে ইমাম মাহদী (আ.)- এর কয়েকটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছে, যেমন মদীনা মুনাওওয়ারায় এবং মক্কায় নিজ সঙ্গী- সাথীদের সাথে তাঁর মিলিত হওয়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগ্রহ, উদ্দীপনা ও ব্যাকুলতা সহকারে

তাঁর বাইআত করার জন্য যারা তাঁর সন্ধান করছে তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ। এ সব ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে আগত সাত জন আলেম পূর্ব নির্ধারিত কোন কর্মসূচী ছাড়াই ইমামের সাথে পবিত্র মক্কায় সাক্ষাৎ করবেন যাঁদের প্রত্যেকেই আবার (মক্কায় আসার আগে) তাঁদের নিজ নিজ শহরে তিনশ' তের জন মুখলিস ধার্মিক ব্যক্তির কাছ থেকে ইমাম মাহ্দীর পক্ষে বাইআত গ্রহণ করবেন। তাঁরা ইমাম মাহ্দীর সন্ধান করতে থাকবেন যাতে তাঁরা নিজেদের এবং তাঁদের অনুসারীদের পক্ষ থেকে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর বাইআত করতে পারেন এবং তিনি তাঁদেরকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাঁদেরকে তিনি তাঁর বিশেষ সাথীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর মহানবী (সা.) তাঁর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। শীঘ্রই আমরা এতৎসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ প্রদান করব।

আর শিয়া সূত্রসমূহে এ ছয় মাসকে দীর্ঘ অন্তর্ধানকালের পর আবির্ভাবের গোপনকাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত তাঁর আবির্ভাবের বিষয়টি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য থাকবে। হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণিত এ হাদীসটির অর্থ হলো যখনই তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তখনই তিনি আবির্ভূত হবেন। শুরুতে ইমাম মাহ্দী (আ.) ধীরে ধীরে আ প্রকাশ করবেন। অতঃপর সাধারণ মানুষের কাছে আবির্ভাবের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর ধীরে ধীরে আবির্ভাব এ কারণেও হতে পারে যে, ইমামের আবির্ভাবের বিষয়টিকে জনগণ কিভাবে নেয় তা পরীক্ষা করা এবং তাঁর আবির্ভাবের বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট ও সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এ যুগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী হাদীস ছাড়াও আরো কিছু রেওয়ায়েত ও হাদীস বিদ্যমান যেগুলো সনদের দিক থেকে সহীহ বলে গণ্য এবং এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হচ্ছে স্বীয় প্রতিনিধি আলী ইবনে মুহাম্মদ আস সামাররীর কাছে প্রেরিত হযরত মাহ্দী (আ.)- এর হস্তলিখিত পত্র। এতে তিনি বলেছেন : "অতি শীঘ্রই আমার অনুসারীদের মধ্য থেকে একদল লোক আবির্ভূত হবে যারা আমাকে দেখার দাবি করবে। তোমরা জেনে নাও যে, যে কেউ সুফিয়ানীর আবির্ভাব, অভ্যুত্থান এবং আসমানী আহবান- ধ্বনি শ্রুত হবার আগে আমাকে দেখেছে বলে দাবি করবে সে

আসলে মিথ্যাবাদী। আর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই)।”[২৯৯]

এ দু’ঘটনা ঘটার আগে যে ব্যক্তি ইমাম মাহ্দীকে দেখেছে বলে দাবি করবে- এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে সাহিবুল আমর অর্থাৎ ইমাম মাহ্দীর প্রতিনিধি বলে নিজেকে দাবি করবে; তবে প্রতিনিধিত্বের দাবি অথবা এ ব্যাপারে কোন কথা বলা ব্যতিরেকে শুধু ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর সমীপে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁকে দেখা ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার বিষয়টি উপরিউক্ত হাদীসের ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। ইমাম মাহ্দীর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে বেশ কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত আলেম ও আল্লাহর ওলীদের সূত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক রেওয়ায়েত বিদ্যমান। আর সম্ভবত এ কারণেই স্বয়ং ইমাম মাহ্দীর লিখিত পত্রে ইমামকে দেখা ও তাঁর সাথে সাক্ষাতকে (رؤيت) প্রত্যাখ্যান না করে বরং মুশাহাদাহকে[৩০০] (مشاهدة) প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর লিখিত পত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান এবং আসমানী আহবান- ধ্বনির মাধ্যমে তাঁর দীর্ঘ অন্তর্ধানের পরিসমাপ্তি হবে। এর পরের অন্তর্ধানটি গোপন থাকার দৃষ্টিতে তাঁর প্রথম অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অন্তর্ধানের সদৃশ হবে এবং তা তাঁর আবির্ভাবের সূচনা ও পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হবে। অর্থাৎ ইমাম এ সময় জালিমদের ও তাদের গোয়ে া নেটওয়ার্ক থেকে গোপন থাকবেন। তবে এ সময় তিনি তাঁর সঙ্গী- সাথীদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাঁর সমীপে উপস্থিত হবেন। আর তিনিও তাঁর ও মুমিনদের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী হিসাবে বেশ কিছু প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন।

পরবর্তী রেওয়ায়েতসমূহ থেকে এ রকম মনে হয় যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) সুফিয়ানীর আবির্ভাবের পর আবির্ভূত হবেন; অতঃপর মুহররম মাসে তাঁর প্রতিশ্রুত আবির্ভাবকাল পর্যন্ত গোপন থাকবেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) থেকে বর্ণিত হাযলাম বিন বশীরের রেওয়ায়েতে

বর্ণিত আছে : "যখন সুফিয়ানী আবির্ভূত হবে তখন ইমাম মাহ্দী (আ.) কিছুদিন গোপন থাকবেন এবং এরপর তিনি পুনরায় জনসমক্ষে আবির্ভূত হবেন।"[৩০১]

আমাদের বিশ্বাসমতে, রজব মাসে সুফিয়ানীর আবির্ভাবের পর ইমাম মাহ্দী (আ.) যে আবির্ভূত হবেন এবং তখন থেকে মুহররম মাসে পুনরাবির্ভূত হওয়া পর্যন্ত তিনি গোপন থাকবেন- এতদ্ব্যতীত আর কোন ব্যাখ্যা এ রেওয়ায়েতের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে রেওয়ায়েতটি ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব কি রমযান মাসে আসমানী আহ্বান- ধ্বনির আগে না পরে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে নি।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "আল কায়েম আল মাহ্দী ততক্ষণ আবির্ভূত হবে না যতক্ষণ না বারো ব্যক্তি তাকে দেখেছে বলে ঐকমত্য পোষণ করবে। কিন্তু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।"[৩০২]

বাহ্যত মনে হচ্ছে যে, তাঁরা সত্যবাদী হবেন; কারণ ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর সাক্ষাতের ব্যাপারে ঐকমত্যটা ইমাম বর্ণনা করেছেন এবং জনগণ যে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে- এ ব্যাপারে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। দৃশ্যত ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঐ সময়ে ঘটবে যখন ইমাম গোপনে থাকাবস্থায় আবির্ভূত হবেন যাতে করে ধীরে ধীরে তাঁর আবির্ভাবের বিষয়টি স্পষ্ট ও প্রকাশিত হয়ে যায় এবং অবশেষে তাঁর নাম ও স্মরণ উচ্চকিত হয়; আর ঠিক তখনই তিনি (সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে) প্রকাশিত হবেন।

অতএব, হযরত মাহ্দী (আ.) এ যুগসন্ধিক্ষণে নেতৃত্বের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা পালন করবেন এবং ঐ সংবেদনশীল মুহূর্তে তিনি তাঁর দিক- নির্দেশনাসমূহের দ্বারা ক্ষেত্রপ্রস্তুতকারী ইয়েমেনী ও ইরানী সরকারদ্বয়কে পরিচালিত করবেন এবং সকল মুসলিম দেশে তিনি তাঁর সাথীদের সাথে যোগাযোগ করবেন যাঁরা হবেন মহান আল্লাহর ওলী।

এখন, যাতে আমরা সংক্ষিপ্ত প্রকাশকালে ইমাম মাহ্দী (আ.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে ধারণা লাভ করতে পারি সেজন্য আমরা তাঁর অন্তর্ধানকালের কর্মকাণ্ডসমূহ সংক্ষেপে

উল্লেখ করব। কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মদীনা মুনাওওয়ারায় বসবাস এবং ত্রিশ জনের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত আছে : "এ বিষয় অর্থাৎ ইসলামের অধিপতির (ইমাম মাহদীর) একটি অন্তর্ধান আছে এবং ঐ অন্তর্ধানকালে তাকে বাধ্য হয়েই নির্জন বাস করতে হবে। তার সর্বোত্তম বাসস্থান হবে মদীনা। সে সেখানে তার ত্রিশ জন সাথীর সাথে বসবাস করবে। আর তাদের উপস্থিতি ও সঙ্গদানের কারণে তার কোন দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা থাকবে না।"[৩০৩]

একইভাবে আরো কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) হযরত খিযির (আ.)- এর সাথে থাকবেন। এতদপ্রসঙ্গে ইমাম রেযা (আ.) বলেন : "খিযির (আ.) যেহেতু আবে হায়াত পান করেছিলেন সেহেতু তিনি ইসরাফীলের সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেন না। তবে তিনি আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদেরকে সালাম দেন; আমরা তাঁর কণ্ঠ শুনি, কিন্তু তাঁকে দেখি না। যখনই যে স্থানেই তাঁর নাম উচ্চারণ করা হবে তখন সেখানে তাঁর ওপর দরুদ ও সালাত প্রেরণ করা উচিত। তিনি হজ্ব মৌসুমে মক্কায় উপস্থিত হয়ে হজ্বের সকল (মানাসিক) আমল আঞ্জাম দেন। তিনি আরাফাতে অবস্থান করেন এবং মুমিনদের প্রার্থনা শেষে 'আমীন' বলেন। মহান আল্লাহ্ খিযির (আ.)- এর মাধ্যমে আমাদের কায়েম আল মাহদীর একাকিত্বকে অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্টতার এবং তার নিঃসঙ্গতাকে তার পাশে মিলন, বন্ধুত্ব ও সখ্যতায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।"[৩০৪]

পূর্ববর্তী রেওয়ায়েত থেকে দৃশ্যত মনে হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর ৩০ জন সাথী সবসময় পরিবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাৎ যখনই তাদের একজনের মৃত্যু হবে তখনই অন্য একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। যদিও এ সম্ভাবনাও আছে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁদের কারো জীবন খিযির (আ.) ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর মতো দীর্ঘায়িত করে দিতে পারেন। যে সব 'আবদাল'- এর কথা ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত ১৫ রজবের দোয়ায় বর্ণিত হয়েছে সম্ভবত তাঁরা হতে পারেন এ সব ব্যক্তি।

ইমাম সাদিক (আ.) মহানবী ও তাঁর আহলে বাইতের ওপর দরুদ ও সালাত প্রেরণের পর বলেছেন : "হে আল্লাহ্! আপনার যোগ্য সৎকর্মশীল মুমিন, মহৎ ব্যক্তি, রোযাদার, ইবাদতকারী, নিষ্ঠাবান, দুনিয়াত্যাগী, চেষ্টা- সাধনাকারী এবং আপনার পথে সংগ্রামরত মুজাহিদদের ওপর দরুদ ও সালাত প্রেরণ করুন।"[৩০৫]

শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে এ ত্রিশ জন অথবা ততোধিক সংখ্যক ব্যক্তি যাঁরা মহান আল্লাহর ওলী (বন্ধু) তাঁরা ইমাম মাহদী (আ.) অন্তর্ধানকালে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.) ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করবেন এবং বিভিন্ন দেশে আ লন গড়ে তুলবেন অথবা তিনি কুঁড়ে ঘর ও প্রাসাদসহ সকল গৃহ ও স্থানে প্রবেশ এবং বাজারসমূহে চলাফেরা করবেন। তিনি প্রতি বছর হজ্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন... আর যেমনভাবে হযরত খিযির (আ.)- এর পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডগুলোর রহস্য ও অন্তর্নিহিত দর্শন মূসা (আ.)- কে সেগুলো সম্পর্কে অবগত করার পরই কেবল তাঁর জন্য উন্মোচিত হয়েছিল তেমনি ইমাম মাহদীর অন্তর্ধানের রহস্যও কেবল তাঁর আবির্ভাব ও আ প্রকাশের পরপরই উন্মোচিত হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ফযল বলেন : "ইমাম সাদিক (আ.)- কে বলতে শুনেছি : ইসলামের অধিপতির (ইমাম মাহদীর) অবশ্যই একটি অন্তর্ধান আছে যা বাতিলপন্থীদেরকে স হের মধ্যে ফেলবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হই। কেন তা হবে? তিনি বললেন : একটি বিশেষ কারণে যা তোমাদের কাছে বলার অনুমতি আমাদের নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইমাম মাহদী (আ.)- এর অন্তর্ধানের রহস্য কী? তিনি বললেন : ইমাম মাহদীর অন্তর্ধানের দর্শন মহান আল্লাহর পূর্ববর্তী হুজ্জাতদের (নবী ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের) অন্তর্ধান- দর্শনের অনুরূপ। যেমনভাবে হযরত খিযির (আ.)- এর পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডসমূহের রহস্য অর্থাৎ নৌকা ছিদ্র করা, একটি বালককে হত্যা করা এবং দেয়াল মেরামত ও পুনঃনির্মাণ, হযরত মূসা (আ.)- এর কাছে খিযির (আ.) থেকে তাঁর বিচ্ছিন্ন হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্পষ্ট হয় নি, ঠিক তেমনি ইমাম মাহদী (আ.)- এর অন্তর্ধান- রহস্য কেবল তার আ প্রকাশ ও আবির্ভাবের পরপরই স্পষ্ট বোধগম্য হবে।

হে ফযলের পুত্র! এ বিষয়টি হচ্ছে মহান আল্লাহর অন্যতম ঐশী নির্দেশ, তাঁর অন্যতম রহস্য এবং গায়েবী বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত...। আর যদি আমরা মহান আল্লাহকে প্রজ্ঞাময় বলে জানি, তাহলে তাঁর সকল কর্মকেও অবশ্যই প্রাজ্ঞজনোচিত বলে গণ্য ও বিশ্বাস করতে হবে, যদিও এগুলোর রহস্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।"[৩০৬]

মুহাম্মদ ইবনে উসমান উমরী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : "মহান আল্লাহর শপথ, সাহিবুল আমর (ইমাম মাহদী) প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমে উপস্থিত থাকেন, জনতাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদেরকে চিনেন। কিন্তু জনতা তাঁকে দেখা সত্ত্বেও চিনতে পারে না।"[৩০৭]

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : "মহান আল্লাহ্ হযরত ইউসুফ (আ.)- এর ব্যাপারে যে কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন তা তিনি তাঁর (সর্বশেষ) হুজ্জাতের (ইমাম মাহদীর) ক্ষেত্রে যে আঞ্জাম দেবেন- তা কিভাবে (মুসলিম) উম্মাহ্ অস্বীকার করবে? সে তাদের হাট- বাজারসমূহে চলাফেরা করবে এবং তাদের কার্পেটের ওপর পা রাখবে, অথচ মহান আল্লাহ্ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সামনে তার পরিচয় প্রকাশ করার অনুমতি না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাকে চিনতে পারবে না। যেভাবে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)- কে অনুমতি দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারটিও তেমন হবে। যখন তিনি (ইউসুফ) বললেন : তোমরা কি জান যে, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কেমন আচরণ করেছিলে এবং তাদেরকে কী ধরনের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলে, অথচ তখন তোমরা অসচেতন ছিলে। তখন ভাইয়েরা বলেছিল : তুমিই কি ইউসুফ? তিনি বলেছিলেন : হ্যাঁ, আমি ইউসুফ এবং এও আমার ভাই।"[৩০৮]

এ সব রেওয়ায়েত এবং এতদসদৃশ অন্যান্য রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, অন্তর্ধানকালে ইমামের অবস্থা ইউসুফ (আ.)- এর অবস্থা সদৃশ হবে। তাঁর আচরণ হবে ইউসুফ (আ.)- এর আচরণ সদৃশ। পবিত্র কোরআন এ সব আশ্চর্যজক বিষয়াদির খানিকটা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে ও তুলে ধরেছে। এমনকি এ সব রেওয়ায়েত ও হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মাহদী ও হযরত খিযির (আ.) একত্রে বসবাস এবং একে অপরকে সাহায্য- সহযোগিতা করেন।

অবশ্য আমাদের এ কথা বলাই উত্তম যে, হযরত মাহ্দী (আ.)- এর অধিকাংশ পদক্ষেপ তাঁর সুযোগ্য সঙ্গী- সাথী ও শিষ্যদের হাতে বাস্তবায়িত হবে। যে সব ব্যক্তি পৃথিবী এবং দূরত্বসমূহ অতি দ্রুত অতিক্রম করেন এবং মহান আল্লাহ্ যাঁদেরকে তাঁদের ঈমান এবং হযরত মাহ্দীর শিক্ষার মাধ্যমে হেদায়েত করেন, বরং যাঁদের কারামতসমূহ, যেমন পানির ওপর হাঁটা, পায়ে হেঁটে নিমিষে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বেশ কিছু বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী ও রেওয়ায়েত, এমনকি মহান আল্লাহর ওলী এবং যোগ্য বা াদের চেয়েও যাঁরা নি তর আধ্যা ি ক মর্যাদার অধিকারী তাঁদের ক্ষেত্রেও এ সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

তবে মহান আল্লাহ্ ছোট- বড় যাবতীয় ঘটনা ও বিষয় এগুলোর নিজস্ব কারণসমূহের মাধ্যমে সংঘটিত করান। তবে এ সব কার্যকারণ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাঁর যে কোন বা া অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করেন। বহু ঘটনা ও বিষয় যেগুলো আমাদের কাছে মনে হয় যে, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণসমূহের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যদি সেগুলোর প্রকৃত অবস্থা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় তাহলে আমরা সেগুলোর সংঘটনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর গায়েবী হাত (ঐশ্বরিক কারণ) ক্রিয়াশীল দেখতে পাব।

তাই অত্যাচারী শাসকের প্রেরিত ব্যক্তি যখন যে নৌকাটি হযরত খিযির (আ.) ফুটো করে দিয়েছিলেন তা জোর করে নেয়ার ইচ্ছা করে তখন সে তা ক্রটিযুক্ত দেখে ছেড়ে দেয়। অথচ সে ঐ অবস্থায় এ বিষয়ে যে গায়েবী হস্তক্ষেপ ছিল তা মোটেও বুঝতে পারে নি।

একইভাবে ঐ বালকটির পিতা- মাতা যখন ঈমান সহকারে জীবন যাপন এবং মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা ও নির্দেশ পালন করেছে তখন বোঝা যায় নি যে, তাদের এ পুত্র- সন্তান যদি জীবিত থাকে তাহলে তাদেরকে কুফর ও খোদাদ্রোহিতার দিকে টেনে নিয়ে যাবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।

আর যখন ইয়াতীম ভ্রাতৃদ্বয় প্রাপ্তবয়স্ক হবে এবং দেয়ালের নিচে সংরক্ষিত তাদের গুপ্তধন খুঁজে পেয়ে বের করে আনবে তখনও তারা জানতে পারবে না যে, যদি হযরত খিযির (আ.) ঐ

প্রাচীরটি মেরামত না করতেন তাহলে উক্ত গুপ্তধন প্রকাশিত হয়ে যেত অথবা এর সংরক্ষণ করার স্থান ধ্বংস হয়ে যেত।

আর এ তিনটি ঘটনা যেগুলো মহান আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ করেছেন সেগুলো যদি খিযির (আ.) মূসা (আ.)- এর সাথে যে গুটিকতক মুহূর্ত কাটিয়েছিলেন সেই সময় তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে যে সব অগণিত বিষয় তিনি তাঁর দীর্ঘ আয়ুস্কালে তাঁর কর্মবহুল দিবসগুলোতে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন সেগুলো নিয়ে আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত।

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "মহান আল্লাহ্ আমার ভাই মূসা (আ.)- এর ওপর দয়া করুন। তিনি ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির (হযরত খিযিরের) সাথে ত্বরা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে তাঁর কাছ থেকে এমন সব আশ্চর্যজনক বিষয় প্রত্যক্ষ করতেন যা তিনি কখনো দেখেন নি।"[৩০৯]

একইভাবে অন্তর্ধানকালে ইমাম মাহদী (আ.)- এর কর্মকাণ্ড নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করা উচিত। আর তিনি সকল ইসলামী রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত খিযির (আ.)- এর চেয়েও মহান আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান। কারণ, তিনি ঐ সাত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সকল বেহেশতবাসীর নেতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবী (সা.) বলেছেন : "আমরা আবদুল মুত্তালিবের সাত বংশধর, বেহেশ্তবাসীদের নেতা। এ সাত জন স্বয়ং আমি, হামযাহ্, আলী, জাফর, হাসান, হুসাইন এবং মাহদী।"[৩১০]

হযরত কায়েম আল মাহদী (আ.), তাঁর সহকারী খিযির (আ.) ও তাঁর সাথীরা এবং তাঁদের শিষ্য মহান আল্লাহর ওলীরা বিশ্বব্যাপী যে সব কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং যে সব ছোট- বড় ঘটনা ঘটাচ্ছেন সেগুলো সম্পর্কে কেবল মহান আল্লাহ্ই অবগত আছেন।

তবে তাঁদের অন্তর্ধান এবং কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত কারণ প্রকাশিত না হওয়াই স্বাভাবিক। এগুলোর রহস্য কেবল তাঁদের আবির্ভাবের পরই প্রকাশ পাবে। আর আমাদের যুগে অথবা পূর্ববর্তী যুগগুলোতে তাঁরা যে সব কাজ সম্পাদন করেছেন সেগুলোর গুটিকতক যদি তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ করেন তাহলে তখনই কেবল সেগুলোর অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটিত হবে।

ইতিহাসের গতিধারা এবং বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বাদ দিলেও আমাদের মধ্য থেকে অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রসমূহে এসব পুণ্যা াদের হতে সাহায্য পেয়েছেন।

এখানে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর তা হলো মহান আল্লাহর গায়েব এবং ইমাম মাহদী (আ.), হযরত খিযির (আ.) ও আবদালদের (পুণ্যবান মুমিনদের) কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বিশ্বাস কুতুব ও পুণ্যবান ওলীদের ব্যাপারে সূফিদের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা হতে ভিন্ন যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। যদিও কতিপয় সূফী তাঁদের মত ও বিশ্বাস ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদের ওপর প্রয়োগ করার চেষ্টাও করেছেন।

আল কাফআমী (রহ.) মিসবাহ্ গ্রন্থের পাদটীকায় সাফীনাতুল বিহার গ্রন্থে যেমন বর্ণিত হয়েছে তদ্রূপ কাতাবা (قطب) ধাতু প্রসঙ্গে বলেছেন : বলা হয়েছে যে, পৃথিবী একজন কুতুব (قطب), চার ওয়াতাদ (وتد), চল্লিশ বাদাল (بدل), সত্তর নাজীব (نجيب) এবং তিনশ' ষাট সৎকর্মশীল (صالح) বা াবিহীন হয় না (অর্থাৎ ইহলৌকিক জীবন ও জগতের স্থায়িত্বের জন্য এসব আধ্যা ি ক ব্যক্তিত্বের সব সময় ও সার্বক্ষণিক উপস্থিতি আবশ্যক। এর অন্যথা হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে)। তাই কুতুব হচ্ছেন মাহদী (আ.) এবং ওয়াতাদরা (দীনের স্থায়িত্বদানকারী) কখনোই চার জনের কম হন না। কারণ, এ ইহজগৎ হচ্ছে তাঁবুসদৃশ। মাহদী (আ.) হচ্ছেন তার খুঁটি বা স্তম্ভ সদৃশ; আর উক্ত চার ওয়াতাদ্ হচ্ছেন এর রশি। তবে কখনো কখনো ওয়াতাদদের সংখ্যা চারের বেশিও হতে পারে। আবদালদের সংখ্যা চল্লিশের উর্ধ্বে। নাজীবরা সত্তরের অধিক। সৎকর্মশীলদের সংখ্যা তিনশ' ষাট জনেরও বেশি। আর হযরত খিযির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) ওয়াতাদদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা দু'জন সবসময় কুতুবের চার পাশে অবস্থান করেন।

ওয়াতাদদের (বহুবচন আওতাদ) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও মহান আল্লাহর ব্যাপারে গাফেল (অমনোযোগী) হন না। তাঁরা এ পৃথিবী ও পার্থিব জীবন থেকে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু গ্রহণ করেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো পদস্খলিত হন না অর্থাৎ কোন পাপ

তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হয় না। যদিও তাঁদের ক্ষেত্রে নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু নিষ্পাপ হওয়া কুতুবের ক্ষেত্রে আবশ্যক।

তবে আবদালগণের মর্তবা ওয়াতাদদের চেয়ে নিচে। তাঁরা কখনো কখনো মহান আল্লাহর ব্যাপারে অমনোযোগী হতে পারেন। কিন্তু কখনো এরূপ হলে তাঁরা যিকির (স্মরণ) করার দ্বারা তা পুষিয়ে নেন। তাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাপ করেন না।

আর সৎকর্মশীল বা   ারা হচ্ছেন পরহেজগার বা   া যাঁরা ন্যায়পরায়ণ। তাঁদের দ্বারা কখনো পাপ সংঘটিত হতে পারে। তবে এরূপ হলে তাঁরাও অনুতাপ- পরিতাপের দ্বারা তা পুষিয়ে নেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

(إنّ الّذين اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشّيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون)

“নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া- পরহেজগারী অবলম্বন করেছে, যখন তাদেরকে একদল শয়তান স্পর্শ করে (শয়তানদের প্ররোচনায় পাপ করে ফেলে) তখন তারা (সাথে সাথে) মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। কারণ, তারা চাক্ষুষমান ও অন্তর্দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন।”

এরপর কাফআসী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, উপরিউক্ত পর্যায়সমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি পর্যায়ে সংখ্যা হ্রাস পেলে ঠিক এর নি র পর্যায় হতে কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সৎকর্মশীল বা   াদের সংখ্যা হ্রাস পেলে সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তখন সৎকর্মশীল বা   াদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় (যার ফলে সৎকর্মশীল বা   াদের সংখ্যা তিনশ’ ষাট সবসময় ধ্রুব থাকে। আর সাধারণ মানুষের কাতার থেকে ঐ ব্যক্তি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে যে অন্য সকলের চেয়ে অধিক পরহেজগার ও সৎ)।

মহান আল্লাহর নবী ইলিয়াস (আ.) সম্পর্কে এবং তিনি যে ঐ সব জীবিত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাঁদের জীবনকে মহান আল্লাহ্ তাঁর জানা কোন অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বলে দীর্ঘায়িত করেছেন- এতৎসংক্রান্ত তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা আসলে ইলিয়াস (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যে সব আয়াত বিদ্যমান সেগুলোর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কতিপয় মুফাসসিরের অভিমতেরই অনুরূপ। আর এ বিষয়টি আহলে বাইত থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খিযির

(আ.)- এর মতো মহান আল্লাহ্ তাঁর জীবন দীর্ঘায়িত করেছেন এবং তাঁরা প্রতি বছর আরাফাত ও অন্যান্য স্থানে মিলিত হন।

যা হোক, রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহ থেকে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান এবং আসমানী গায়েবী আহবান- ধ্বনি থেকে মুহররম মাসে তাঁর (ইমাম মাহ্দী) আবির্ভাব পর্যন্ত এ ছয় মাস কাল ইমাম মাহ্দী এবং তাঁর সঙ্গীদের কর্মকাণ্ড দিয়ে ভরপুর থাকবে। তাঁদের হাতে এবং তাঁদের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট থাকবে তাদের হাতে জনগণের সামনে বহু কারামত ও অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকবে। আর এটি তখন এক আন্তর্জাতিক মহা ঘটনায় পরিণত হবে যা সকল মানুষ ও রাষ্ট্রকে সমভাবে ব্যস্ত রাখবে।

তবে মুসলিম জাতিসমূহ সবসময় ইমাম মাহ্দী, তাঁর কারামতসমূহ এবং তাঁর আবির্ভাবকাল অত্যাসন্ন হবার ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকবে। আর এটি হবে তাঁর আবির্ভাবের জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রস্বরূপ।

তবে ঐ সময়কালটি মিথ্যাবাদী ও ভণ্ডদের জন্য মাহ্দী হবার মিথ্যা দাবী এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উর্বর ক্ষেত্রও হবে। রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর আবির্ভাবের আগে মাহ্দী হবার মিথ্যা দাবী নিয়ে বারোটি পতাকা উত্তোলিত হবে। আবু তালিবের বংশধর বারো ব্যক্তির প্রত্যেকেই একটি করে পতাকা উত্তোলন করে জনগণকে নিজেদের দিকে আহবান জানাবে (অর্থাৎ নিজেদেরকে মাহ্দী বলে দাবী করবে)। এ সব পতাকা হবে পথভ্রষ্টতার পতাকা এবং ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষমান বিশ্বকে (বিশেষ করে মুসলিম জাতিসমূহকে) নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করার পার্থিব অপচেষ্টাস্বরূপ।

মুফাযযাল ইবনে আমর আল জু'ফী ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন : "আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তার (মাহ্দী) নাম উচ্চারণ করার ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। মহান আল্লাহর শপথ, তোমার ইমাম অবশ্যই দীর্ঘকাল তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে (গায়েব) থাকবেন যার ফলে বলা হতে থাকবে যে, তিনি মারা গেছেন অথবা ধ্বংস হয়ে গেছেন অথবা তিনি কোথায় যে চলে গেছেন! (আর এভাবে তোমরা অবশ্য অবশ্যই পরীক্ষিত হতে

থাকবে)। তার বিচ্ছেদের বেদনায় মুমিনদের নয়ন থেকে অশ্রু ঝরতে থাকবে। যেমনভাবে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গমালায় জাহাজ ও তরী উল্টে গিয়ে নিমজ্জিত হয় তেমনি তোমরাও ধরাশায়ী হতে থাকবে। যে ব্যক্তির কাছ থেকে মহান আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, যার হৃদয়ে ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা যাকে সাহায্য করেছেন সে ব্যতীত আর কেউই মুক্তি পাবে না। আর তখন বারোটি অনুরূপ পতাকা উত্তোলিত হবে যার একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করা যাবে না।"

মুফাযযাল বলেন : "অতঃপর আমি কাঁদলাম। তিনি আমাকে বললেন : "হে আবু আবদিল্লাহ্! তুমি কেন কাঁদছ? আমি বললাম : "কেমন করে আমি না কেঁদে থাকতে পারি যখন আপনিই বলছেন যে, বারোটি পতাকা উত্তোলিত হবে অথচ সেগুলোর একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করা যাবে না? তখন আমরা কী করতে পারব? ইমাম তখন বারা ার ভিতরে আলোদানকারী আলোকোজ্জ্বল সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললেন : হে আবু আবদিল্লাহ্! তুমি কি এ সূর্যটি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম : জী, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : "মহান আল্লাহর শপথ, আমাদের কিয়ামকারীর অবস্থা এ সূর্যের চেয়েও স্পষ্ট ও অধিকতর উজ্জ্বল।"[৩১১]

অর্থাৎ যারা মাহদী হবার মিথ্যা দাবী করবে তাদের কারণে ইমাম মাহদীর বিষয় তোমাদের কাছে অস্পষ্ট ও বোধগম্য না হবার ভয় তোমরা করো না। কারণ, তার মর্যাদা আবির্ভাবের আগে এবং আবির্ভাবের সময়ে তার নিদর্শনাদি এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের কারণে উজ্জ্বল সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য যে, মিথ্যাবাদী ও ভণ্ডদের সাথে তাঁর ব্যক্তিত্বের কোন তুলনাই চলে না।

আরেকদিকে তাঁর আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইয়েমেনী ও ইরানী সরকার আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ এবং বিশ্বের জাতিসমূহকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকবে। আর এ কারণে, এ দু' রাষ্ট্র ইমাম মাহদীর দিক নির্দেশনার প্রতি আগের চেয়ে আরো বেশি মুখাপেক্ষী হবে।

এছাড়াও রেওয়ায়েত ও বাহ্যিক অবস্থাসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম মাহদীর অনুকূলে বিশ্বব্যাপী গণজোয়ারের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তাঁর শত্রুদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে বিশ্ব- কুফরী চক্রের শীর্ষ নেতৃবৃ এবং তাদের সহযোগী সুফিয়ানীর পক্ষ থেকে প্রদর্শিত হবে। রেওয়ায়েতসমূহের ভাষ্য আনুসারে এ এলাকা (মধ্যপ্রাচ্য) অস্থিতিশীল ও স্পর্শকাতর অঞ্চল হবার কারণে ইরাক ও হিজাযের সার্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার কাজে তারা নিয়োজিত থাকবে। বিশেষ করে এ দুটি দেশ তখন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে দুর্বল দেশ বলে গণ্য হবে।

বিধায় একদিকে তারা (ইমাম মাহদীর শত্রুপক্ষ) ইরাকে আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইরানীদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং সে দেশের সরকারের দুর্বল হবার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়বে।

আবার অন্যদিকে তারা হিজাযেও এক রাজনৈতিক শূন্যাবস্থা, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে গোত্রীয় সংঘাত এবং সেখানে আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ইয়েমেনীদের প্রভাব- প্রতিপত্তির সম্মুখীন হবে। হিজাযে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি সে দেশের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সকলেই সেখান থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের অপেক্ষা করবে। তখন সবার মাঝে প্রচারিত হয়ে যাবে যে, তিনি মদীনা শরীফে অবস্থান করছেন। আর পবিত্র মক্কা নগরী থেকে তাঁর আ লনের শুভ সূত্রপাত হবে। তাই শত্রুদের ইমাম মাহদী (আ.) বিরোধী যাবতীয় রাজনৈতিক ও সমরিক তৎপরতা পবিত্র মক্কা ও মদীনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকবে। আর সুফিয়ানী পবিত্র মদীনার ওপর সামরিক আক্রমণ শুরু করবে এবং ইমাম মাহদী মদীনায় বনি হাশিমের মধ্যে আ গোপন করে আছেন- এ স হে ব্যাপক হারে তাদের ব ী করবে।

এ এলাকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব থাকার কারণে ইরাক ও হিজাযে সুফিয়ানী বাহিনীর অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসনের সাথে সাথে পারস্যোপসাগর ও ভূ- মধ্যসাগরে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের সামরিক বাহিনীও উপস্থিত হবে।

সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হচ্ছে ঐ সময় অথবা এর কাছাকাছি সময় রামাল্লায় রোমের সেনাবাহিনী (পাশ্চাত্য বাহিনী) এবং জাযীরা অঞ্চলে তুর্কী (রুশ বা প্রাচ্য) বাহিনীর আগমন। আর এ বিষয়টি বেশ কয়কটি রেওয়ায়েতেও বর্ণিত হয়েছে।

হিজাযে প্রশাসনিক সংকট

শিয়া- সুন্নী হাদীস গ্রন্থ ও সূত্র সমূহে ঐকমত্য আছে যে, হিজাযে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের শুভ সূচনা সেদেশে রাজনৈতিক শূন্যতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে গোত্রসমূহের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উৎপত্তির মাধ্যমে সংঘটিত হবে।

আর একজন বাদশাহ অথবা খলীফার মৃত্যুর মাধ্যমে তা সংঘটিত হবে। তার মৃত্যুর মাধ্যমে মহামুক্তি বাস্তবায়িত হবে। কতিপয় রেওয়ায়েতে উক্ত বাদশাহ বা খলীফার নাম ‘আবদুল্লাহ্’ হবে বলা হয়েছে। আবার কতিপয় রেওয়ায়েতে আরাফাত দিবসে (৯ যিলহজ্ব) তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর থেকে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান, আসমানী গায়েবী আহবান, হিজাযে সামরিক হস্তক্ষেপ করার জন্য সিরীয় বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানান এবং এরপর ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব পর্যন্ত হিজাযে ঘটনাবলী একের এর এক ঘটতে থাকবে।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত : “যে আমাকে আবদুল্লাহর মৃত্যু নিশ্চিত করবে আমি তাকে আল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করব।” এরপর তিনি বললেন : “আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আর কোন ব্যক্তির ব্যাপারে জনগণ একমত হতে পারবে না (অর্থাৎ আর কেউ স্থায়ীভাবে হিজাযে শাসন ও রাজত্ব করতে পারবে না)। মহান আল্লাহ্ চাইলে তোমাদের নেতা (মাহদী) ব্যতীত এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে না। বছরের পর বছর ধরে এক ব্যক্তির রাজ্য শাসনের দিন গত হবে এবং কয়েক মাস বা কয়েক দিনের শাসন ও রাজত্বের পালা আসবে।” আমি (রাবী) বললাম : “সেটাও কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? তিনি বললেন : না।”[৩১২]

তাঁর থেকে বর্ণিত আছে : "জনগণ (হাজীরা) যখন (৯ যিলহজ্ব, হজ্ব পালনের জন্য) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান (উকূফ) করতে থাকবে তখন তাদের কাছে একটি শীর্ণ ও দ্রুত গতিসম্পন্ন উটের পিঠে আরোহণ করে এক ব্যক্তি এসে তাদেরকে একজন খলীফার মৃত্যু সংবাদ দেবে। তার মৃত্যুর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইত এবং মানব জাতির মহামুক্তি বাস্তবায়িত হবে।"[৩১৩]

রেওয়ায়েতে বর্ণিত النّاقة الدّعبلة এর অর্থ হচ্ছে দ্রুত গতিসম্পন্ন শীর্ণ উটনী। আর এটি হচ্ছে অতি দ্রুত সংবাদ পৌঁছানো এবং হাজীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করার প্রতি ইঙ্গিতবহ। আর বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, সংবাদ জ্ঞাপন প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে রেওয়ায়েতের কাঙ্ক্ষিত বিষয়। আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, শীর্ণ ও দ্রুত গতিসম্পন্ন উটনীর আরোহীকে হত্যা করা হবে যে আরাফাতের ময়দানে হাজীদের মাঝে এ সংবাদটি প্রচার করবে।

এ খলীফা যার মৃত্যু অথবা হত্যার সংবাদ আরাফাত দিবসে ঘোষণা করা হবে সে পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতে উল্লিখিত বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্ও হতে পারে। আর 'বছরের পর বছর ধরে রাজ্য শাসনের দিন গত হবে এবং কয়েক মাস বা কয়েক দিনের শাসন ও রাজত্বের পালা আসবে'- এ কথার অর্থ হচ্ছে তার (আবদুল্লাহর) পর যাকেই শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হবে সে পূর্ণ এক বছর টিকে থাকতে পারবে না। কয়েক মাস বা কয়েক দিন গত না হতেই তাকে অপসারণ করে আরেক ব্যক্তিকে শাসনকর্তৃত্ব দেয়া হবে। আর এ অবস্থা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে।

কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে যে, উক্ত বাদশাহ্ চারিত্রিক ও নৈতিক (চরিত্রহীন ও সমকামী হওয়ার) কারণে নিহত হবে এবং তাকে তারই এক ভৃত্য হত্যা করবে। আর হত্যাকারী হিজাযের বাইরে পালিয়ে যাবে। তার খোঁজে নিহত বাদশার নিকটবর্তী কিছু লোক (নিরাপত্তা ও গোয়ে া কর্মকর্তারা) দেশের বাইরে যাবে এবং তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করার আগেই ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে সেখানে দ্বন্দ্ব- সংঘাত শুরু হয়ে যাবে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : তার (বাদশাহ্) হত্যার কারণ হবে তারই এক নপুংসক ভৃত্যকে তার বিয়ে করা। আর সে তাকে জবাই করে হত্যা করবে এবং চল্লিশ দিন তার মৃত্যুর খবর গোপন রাখবে। অতঃপর ঐ পলাতক নপুংসকের খোঁজে যখন অশ্বরোহীরা (বিদেশ) যাত্রা করবে তখন তাদের রাজত্ব ও শাসন ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত যারা তার সন্ধানে প্রথমে বের হবে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করবে না।"[৩১৪]

এ বাদশার হত্যাকাণ্ডের পর হিজাযে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব- সংঘাতের কথা যে সব রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা অগণিত। আমরা এখানে কয়েকটি রেওয়ায়েত নমূনাস্বরূপ উল্লেখ করছি :

বাযান্তী ইমাম রেয়া (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন : "তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই মহামুক্তির নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে একটি ঘটনা যা দুই হারামের মাঝখানে সংঘটিত হবে। আমি বললাম : ঐ ঘটনা কী হবে? তখন তিনি বললেন : দুই হারামের মাঝখানে গোত্রীয় গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হবে। অমুক বংশীয় অমুক ব্যক্তি পনেরটি ভেড়া হত্যা করবে।[৩১৫] অর্থাৎ এক জন রাজা বা গোত্রপতি অপর কোন প্রসিদ্ধ রাজা বা গোত্রপতির বংশধরদের মধ্য থেকে পনের ব্যক্তিকে হত্যা করবে।

আবু বসীর থেকে বর্ণিত : "আমি হযরত আবু আবদিল্লাহ্ (আ.)- কে (ইমাম সাদিক) বললাম : আবু জাফর (আ.) অর্থাৎ ইমাম বাকির কি বলতেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইতের কায়েম (মাহদী)- এর দু'টি অন্তর্ধান আছে, সেগুলোর একটি অপরটির চেয়ে দীর্ঘ? তখন তিনি বললেন : হ্যাঁ। তবে মতভেদের কারণে অমুকের বংশধরদের তরবারি কোষমুক্ত হয়ে অবস্থা সংকীর্ণ হওয়া, সুফিয়ানীর আবির্ভাব, সংকট ও বিপদাপদ তীব্র আকার ধারণ করা, ব্যাপক গণহত্যা যার ফলে মহান আল্লাহর হারাম (পবিত্র মক্কা নগরী) এবং রাসুলুল্লাহ্ (সা.)- এর হারামে (মদীনা শরীফ) জনগণের আশ্রয় নেয়া পর্যন্ত এ মহাঘটনা বাস্তবায়িত হবে না।"[৩১৬]

এ রেওয়ায়েত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হিজাযের কর্তৃত্বশীল গোত্রের মধ্যেই এ দ্বন্দ্বের সূচনা হবে।"

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) থেকে বর্ণিত আছে : “এর (ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ও বিপ্লবের) বেশ কিছু নিদর্শন আছে। এগুলোর প্রথমটি হচ্ছে পরিখা খনন ও ওঁৎ পাতার মাধ্যমে কুফা নগরী অবরুদ্ধ করা, সর্ববৃহৎ মসজিদের চারপাশে পতাকাসমূহের পতপত্ করে উড্ডীন হওয়া, সেদিনের যুদ্ধের হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই দোষখী হবে।”[৩১৭]

সর্ববৃহৎ মসজিদ বলতে মসজিদুল হারামকে বোঝানো হয়েছে এবং পবিত্র মক্কা নগরীর চারপাশে অথবা হিজাযে পতাকাবাহী গোষ্ঠী ও সেনাদলসমূহ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। আর সেগুলোর কোনটিই সত্যের পতাকা হবে না।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (পৃ. ৫৯) হিজাযের রাজনৈতিক সংকট সংক্রান্ত বিশটিরও অধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এ সব রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরে শাসন- ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য গোত্রসমূহের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতটি : “মুসলিম উম্মাহর কাছে এমন এক সময় (যুগ) আসবে যখন রমযান মাসে গায়েবী ধ্বনি শোনা যাবে। (রমযান পরবর্তী) শাওয়াল মাস তুলনামূলকভাবে শান্ত অবস্থা ও নীরবতার মধ্যেই অতিবাহিত হবে। কিন্তু যিলকদ মাসে গোত্রসমূহ একে অপরের প্রতি মৈত্রীসুলভ আচরণ ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে। আর যিলহজ্ব মাসে হাজীদের সম্পদ লুণ্ঠিত হবে এবং (এর পরবর্তী) মুহররম মাস কেমন মুহররমই না হবে! আর তিনি এ কথা তিনবার উচ্চারণ করেন।”[৩১৮]

ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা.) বলেছেন : “যখন রমযান মাসে (আসমানী) গায়েবী ধ্বনি শোনা যাবে তখন শাওয়াল মাসে গোলযোগ দেখা দেবে। আর যিলকদ মাসে গোত্রসমূহে মতভেদ ও বিরোধ দেখা দেবে। যিলহজ্ব মাসে বক্তপাত হবে। আর এর পরবর্তী মুহররম কেমন মুহররমই না হবে! আর তিনি এ কথা তিনবার বললেন।”[৩১৯]

উক্ত গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত : “জনগণ এক সাথে হজ্ব করবে এবং নেতা ছাড়াই তারা আরাফাতের ময়দানে রওয়ানা হবে। যখন তারা মিনায় অবস্থান গ্রহণ করবে তখন তারা কুকুরের মতো একে অপরের ওপর অক্রমণ চালাবে। আর গোত্রসমূহ একে অপরের

ওপর আক্রমণ চালিয়ে এতটা রক্তপাত করবে যে, জামরা- ই আকাবাহ্ পর্যন্ত রক্তের বন্যা বয়ে যাবে।" অর্থাৎ তাদের অবস্থা তখন ক্ষ্যাপা জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুরের অবস্থার মতো হয়ে যাবে। হজ্ব পালন করার পর তাদের মধ্যে শত্রুতা পুনরায় প্রকাশ পাবে এবং তারা পরস্পরকে হত্যা করতে থাকবে। অবস্থা এতদূর গড়াবে যে জামরা- ই আকাবার পাশ দিয়ে তাদের রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত এ সব রেওয়ায়েতে আসমানী গায়েবী আহবান ধ্বনির পরপরই হিজাযে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব- সংঘাতের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তবে আরো কিছু রেওয়ায়েত আছে সেগুলোয় এ রাজনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

এর প্রথমটি হচ্ছে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের আগে এ সংকটের উৎপত্তি হবে; আর আমরা ইতোমধ্যে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছি।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার মতবিরোধ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত বিশ্বযুদ্ধের সাথে এ সংকটের উৎপত্তির একটা সম্পর্ক থাকবে। তাই ইবনে আবী ইয়াফূর থেকে বর্ণিত আছে : "আমাকে আবু আবদিল্লাহ্ (ইমাম জাফর সাদিক) বলেছেন : নিজ হাতের আঙ্গুলগুলো গণনা কর। অমুকের ধ্বংস হওয়া, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান এবং মানব হত্যা... অতঃপর তিনি বললেন : অমুকের ধ্বংস হওয়া ও নিহত হওয়ার মাধ্যমে মহামুক্তি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে।"[৩২০]

রেওয়ায়েতটিতে যে ধারাক্রমে এ ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে সেই ধারাক্রমে এগুলো সংঘটিত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিতর্ক করা যেতে পারে। তবে কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত যেগুলোর কয়েকটি ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের আগেই অমুকের হত্যা ও দ্বন্দ্ব- সংঘাত শুরু হয়ে যাবে।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "আল কায়েম নয়, এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদির মতো বিজোড় সাল বা বছরে আবির্ভূত হবে। অতঃপর বনি আব্বাস (অমুকের বংশ) শাসন কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে যখন তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরম শীর্ষে অবস্থান করতে

এবং আরাম- আয়েশ ও বিলাসিতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে তখনই তাদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়ে যাবে। (আর যেহেতু তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব- সংঘাতের উদ্ভব হবে সেহেতু) তাদের শাসনের পতন ঘটবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেবে। কিবলার অনুসারীরাও (মুসলিম উম্মাহ্) পরস্পর দ্বন্দ্ব- সংঘাতে লিপ্ত হবে। মানব জাতি ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণে তীব্র দুঃখ- কষ্ট ও যাতনার সম্মুখীন হবে। আর আকাশ থেকে একজন আহবানকারীর আহবান পর্যন্ত জনগণ সর্বদা এ অবস্থার মধ্যেই থাকবে। তাই আহবানকারী যখন আহবান জানাবে তখন তোমরা হিজরত করতে থাকবে।"[৩২১]

এ রেওয়ায়েতের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তা অমুক বংশের মধ্যকার মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব সংঘাত ও তাদের রাজত্বের পতন, প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের মধ্যকার বিরোধ এবং মুসলমানদেরকেও যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার বিরোধ গ্রাস করবে তার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছে। হিজাযে যে রাজনৈতিক সংকটের উদ্ভব হবে তার সাথে যেন এ আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব- সংঘাতের সম্পর্ক থাকবে।

আর বনি আব্বাস যাদের মধ্যে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের কিছুকাল আগে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব- সংঘাত দেখা দেবে তাদের বলতে অমুকের বংশকে বোঝানো হয়েছে যাদের ব্যাপারে কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তারা হবে ইমাম মাহদীর আগে হিজায শাসনকারী সর্বশেষ রাজবংশ।

হাদীসসমূহ থেকে গৃহীত ফলাফল হচ্ছে এই যে, যে সব ঘটনা হিজাযে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপস্বরূপ ঘটবে সেগুলোর ধারাক্রম হিজায অথবা পূর্ব দিকের কোন এক এলাকায় প্রকাণ্ড হলুদ- লাল অগ্নি প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হবে। আর ঐ আগুন বেশ কয়েকদিন ধরে প্রজ্বলিত থাকবে। এরপর অমুক বংশের শেষ বাদশাহ্ নিহত হবে এবং তার উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেবে। আর এ মতভেদ হিজাযের রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আর এ সব রাজনৈতিক শক্তির শীর্ষে থাকবে সে দেশের গোত্রসমূহ। এরফলে শাসনকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এমন এক রাজনৈতিক সংকট ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

এরপর সুফিয়ানীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান, আসমানী গায়েবী আহবান ধ্বনি, এরপর হিজাযে সুফিয়ানী বাহিনীর অনুপ্রবেশ, মদীনার ঘটনাবলী ও অতঃপর মক্কার ঘটনাসমূহ ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকবে।

আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান বেশ কিছু হাদীসে হিজাযের এ আগুনের বিবরণ এসেছে। এ সব রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তা হবে কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রেওয়ায়েত[৩২২] । হিজাযে আগুনের উদ্ভব হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এ আগুনের আলোয় বুসরায় অবস্থিত উটের গলা আলোকিত হবে অর্থাৎ এ আগুনের আলো সিরিয়ার বুসরা নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

এগুলোর মধ্য থেকে আরো কতিপয় হাদীস হাকিমের মুস্তাদারাকুস্ সহীহাইন গ্রন্থে[৩২৩] বিদ্যমান। এগুলোতে উল্লিখিত আছে যে, এ আগুন জামাল আল ওয়াররাক অথবা হাবস সাইল অথবা ওয়াদী হাসীল (হুসাইল) থেকে আবির্ভূত হবে। হাবস সাইল পবিত্র মদীনা নগরীর অদূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। তবে ওয়াদী হাসীল হাবস সাইলের অপভ্রংশও হতে পারে (যা ভুলক্রমে লেখা হয়েছে)।

কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে যে, এ আগুন এডেনের হাদরামাউত থেকে আবির্ভূত হবে এবং তা মানুষকে হাশরের ময়দান অথবা পশ্চিমের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

যেমনটি পরিদৃষ্ট হয় তাতে সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে তা দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত হয় নি যে, উক্ত আগুন কিয়ামত দিবসের অন্যতম আলামত। বরং ভবিষ্যতে যে এ আগুনের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী তা এ রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে।

আমার কাছে প্রধান্যপ্রাপ্ত অভিমত হচ্ছে এই যে, এ আগুন কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হবে এবং তা হবে এডেন অথবা হাদরামাউতের আগুন। আর শিয়া- সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহে এ আগুনের বিবরণ বিদ্যমান।

তবে হিজাযের আগুন যার উৎপত্তি হবে পবিত্র মদীনা নগরীতে তা বড় কোন কিছুর আলামত হওয়া ছাড়াই মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত একটি অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র। আর তা ইতোমধ্যে

বাস্তবায়িত হয়েছে। মদীনার নিকটে একটি আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ঘটনা ঐতিহাসিকদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিল।

আর এ দু'টি আগুন যে আগুন ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের অন্যতম নিদর্শন হবে তা থেকে ভিন্ন হবে। হাদীসে এ আগুনকে 'প্রাচ্যের আগুন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু হাদীসে তা হিজাযের পূর্বাঞ্চলের আগুন বলে উল্লিখিত হয়েছে। ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ২১ পৃষ্ঠায় ইবনে মেদান থেকে বর্ণিত : "যখন তোমরা রমযান মাসে আকাশে পূর্ব দিক থেকে আগুনের একটি স্তম্ভ প্রত্যক্ষ করবে তখন তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী খাদ্য- সামগ্রী প্রস্তুত করে রেখ। কারণ, তা হবে দুর্ভিক্ষের বছর।"

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "যখন তোমরা পূর্ব দিক থেকে একটি প্রকাণ্ড আগুন প্রত্যক্ষ করবে তখন মানব জাতির মহামুক্তি বাস্তবায়িত হবে। আর তা আল কায়েমের আবির্ভাবের কিছু আগে সংঘটিত হবে।"

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "তোমরা যখন পূর্ব দিকে সবুজ ও লাল বর্ণের কাপড় সদৃশ একটি আগুন প্রত্যক্ষ করবে যা তিন দিন অথবা সাত দিন ধরে প্রজ্বলিত থাকবে তখনই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইতের মহামুক্তির আশা করতে পারবে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।" রেওয়ায়েতে বর্ণিত الهردي (আল হিরদী)- এর অর্থ হচ্ছে সবুজ ও লাল রঙে রঞ্জিত বস্ত্র।

আবার এ আগুন যেমন প্রাকৃতিক আগ্নেয়গিরিও হতে পারে তেমনি প্রেট্রোলের বা তেল খনির এক বিরাট বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আবার তা ঐশ্বরিক কোন নিদর্শনও হতে পারে যা ইমাম মাহদীর আবির্ভারে অন্যতম নিদর্শন। ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : যে আগুন আকাশে আবির্ভূত হবে এবং যে রক্তিমাভা সমগ্র আকাশ ছেয়ে ফেলবে তা দেখে মানুষ ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ও আে ালনের আগে পাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।"[৩২৪]

হিজাযের এ আগুন সে দেশের রাজনৈতিক সংকট শুরু হওয়ার আগে অথবা তা চলাকালে প্রকাশিত হবে। তবে মহান আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে অধিক অবগত।

মদীনা থেকে ভীত- সন্ত্রস্ত্র অবস্থায় বের হওয়া

হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে যে, সুফিয়ানীর বাহিনী পবিত্র মদীনা নগরী দখল করবে এবং তিন দিনের জন্য সেখানে সব কিছু করা সৈন্যদের জন্য বৈধ ঘোষণা করবে। ইমাম মাহদীর খোঁজে বনি হাশিমের যাকেই তারা পাবে তাকেই তারা ব ী করবে এবং তাদের মধ্য থেকে বেশ কিছু ব্যক্তিকে হত্যাও করবে।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (৮৮ পৃ.) লিখিত হয়েছে : সুফিয়ানীর বাহিনী মদীনায় যাবে এবং কুরাইশদের মধ্য থেকে বেশ কিছু ব্যক্তিকে এবং আনসারদের মধ্য থেকে চারশ' ব্যক্তিকে হত্যা করবে। তারা গর্ভবতী নারীদের পেট চিড়ে তাদের গর্ভস্থ সন্তানদের হত্যা করবে। তারা কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তি ও তার বোনকে হত্যা করবে যাদের নাম হবে যথাক্রমে মুহাম্মদ ও ফাতিমা। তাদের দু'জনকে মদীনার মসজিদে নববীর দরজার ওপর ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করা হবে।

উক্ত গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় আবু রুমান থেকে বর্ণিত : "সে (সুফিয়ানী) মদীনায় একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে। অতঃপর তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বংশধরদের মধ্য থেকে যাকে পাবে তাকে ব ী করবে। তারা বনি হাশিমের বেশ কিছু সংখ্যক পুরুষ ও নারীকে হত্যা করবে। আর তখনই ইমাম মাহদী (আ.) ও মুবিয (আল মানসূর) মদীনা থেকে মক্কায় পালিয়ে যাবেন এবং তাঁদের সন্ধানে লোক প্রেরণ করা হবে কিন্তু তাঁরা দু'জন মহান আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে আশ্রয় নেবেন।"

হাকিমের মুস্তাদরাকুস্ সহীহাইনে (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪২) বর্ণিত আছে যে, মদীনাবাসী সুফিয়ানী উক্ত নগরী দখল করার কারণে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে।

জাবির ইবনে ইয়াযীদ আল জুফী থেকে বর্ণিত। ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "সে (সুফিয়ানী) মদীনায় একটি সেনাদল প্রেরণ করবে। তারা সেখানে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে। আর মাহ্‌দী ও আল মানসূর সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বংশধরদের মধ্য থেকে ছোট- বড় সবাইকে ব ী করা হবে এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে ব ী করা ব্যতীত ছেড়ে দেয়া হবে না। দু'ব্যক্তির সন্ধানে সেনাদল প্রেরণ করা হবে।"[৩২৫]

যে লোককে সুফিয়ানী বাহিনী হত্যা করবে সে ঐ যুবক হতে ভিন্ন যার সম্পর্কে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে মদীনায় নিহত হবে। "ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : হে যুরারাহ্! মদীনায় অবশ্যই একজন তরুণকে হত্যা করা হবে। আমি তাঁকে বললাম : আমি আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হই। সে কি ঐ ব্যক্তি নয় যাকে সুফিয়ানী- বাহিনী হত্যা করবে? তিনি বললেন : না। তবে অমুকের বংশধরদের সেনাবাহিনী তাকে হত্যা করবে। ঐ বাহিনী মদীনায় ঢোকার আগেই সে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। তাই জনগণ জানবে না যে, সে কোথায় আছে। তাই একজন যুবককে ধরে এনে হত্যা করবে। যখন তাকে অন্যায়ভাবে শত্রুতাবশত হত্যা করা হবে তখন মহান আল্লাহ্ তাদেরকে আর ছেড়ে দেবেন না। আর তখনই তোমরা মহামুক্তির আশা করতে পারবে।"[৩২৬]

কিছু কিছু রেওয়ায়েতে এ তরুণকে নাফসে যাকীয়াহ্ (পুণ্যা া) বলা হয়েছে। আর সে হবে ঐ নাফসে যাকীয়াহ্ থেকে ভিন্ন যাঁকে ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের কিছুকাল আগে পবিত্র মক্কা নগরীতে হত্যা করা হবে।

এ সব হাদীস ও অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, হিজাযের দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু প্রশাসন, হিজাযে, বিশেষ করে পবিত্র মদীনায় শিয়াদের গ্রেফতার করার ব্যাপারে তৎপর থাকবে এবং পুণ্যা া যুবককে নিছক তাঁর নাম 'মুহাম্মদ ইবনুল হাসান' হওয়ার জন্য অথবা ইমাম মাহ্‌দীর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষাকারী ওলীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে হত্যা করবে। উল্লেখ্য যে, তখন 'মুহাম্মদ ইবনুল হাসান' এ নামটি জনগণের কাছে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)- এর নাম হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করবে।

এরপর সুফিয়ানীর সেনাবাহিনী হিজাযে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তারা আরো ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস ও দমন নীতি চালাতে থাকবে। অতঃপর বনি হাশিমের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে তারা মনে করবে তাদের সবাইকে ব ী করবে এবং যে ব্যক্তির নাম 'মুহাম্মদ' তাকে এবং তার বোনকে নিছক তার নাম 'মুহাম্মদ' এবং তার পিতার নাম 'হাসান' হওয়ার জন্য হত্যা করবে।

রেওয়ায়েতসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে ইমাম মাহদী (আ.) হযরত মূসা (আ.)- এর ন্যায় ভীত অবস্থায় সতর্কতার সাথে মদীনা নগরী থেকে বের হবেন। তাঁর সাথে তাঁরই এক সাঙ্গী থাকবেন যাঁর নাম পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতে 'মানসূর' এবং আরেক রেওয়ায়েতে 'মুনতাসির' বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আল মুবীয নামটি মুনতাসির নামের অপভ্রংশও হতে পারে।

আরেক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি মদীনা নগরী থেকে মহানবী (সা.)- এর উত্তরাধিকার সাথে নিয়ে বের হবেন। আর তাতে থাকবে মহানবী (সা.)- এর তরবারি, বর্ম, পতাকা, পাগড়ী এবং চাদর।

পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে তিনি কখন বের হবেন তার সময়কাল শিয়া হাদীস সূত্রসমূহে আমি পাই নি। তবে রমযান মাসে আসমানী গায়েবী আহবানের পরই অর্থাৎ হজ্ব মৌসুমেই তা হওয়া যুক্তিসংগত। আমার মনে পড়ছে আমি একটি রেওয়ায়েতে দেখেছি যে, রমযান মাসে মদীনায় সুফিয়ানী বাহিনী প্রবেশ করবে।

মুফাযযাল ইবনে আসর কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতটিতে ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "মহান আল্লাহর শপথ, হে মুফাযযাল! আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি যে, সে মক্কায় প্রবেশ করেছে। তার মাথায় হলুদ পাগড়ী। তার দু'পায়ে মহানবী (সা.)- এর চপ্পল। তার হাতে তাঁর লাঠি রয়েছে। পবিত্র কাবা গৃহে পৌঁছে দেয়ার জন্য সে তার সামনে কতকগুলো বাছুর চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কেউ নেই যে তাকে চেনে।"[৩২৭]

এ রেওয়ায়েতের সনদ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইমাম মাহদী (আ.)- এর অনুসন্ধানরত শত্রুদের গোয়ে া নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি এবং তাঁর অন্তর্ধানে থাকার বিষয়টি যা তাঁর সংক্ষিপ্ত অন্তর্ধান এবং সে সময় তাঁর আ গোপন করে থাকার সাথে সদৃশ সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ রেওয়ায়েত এবং এতদসদৃশ অন্যান্য রেওয়ায়েত যৌক্তিক হবে। আর আবির্ভাবের বছরের হজ্ব মৌসুম উষ্ণ ও প্রাণবন্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি, ইসলামী দেশসমূহের অবস্থা, হিজাযে পরিস্থিতির অবনতি ও সংকটজনক হওয়া, সে দেশে সুফিয়ানী বাহিনীর অনুপ্রবেশের কারণে জরুরী অবস্থার ঘোষণা দান ইত্যাদির কারণে হিজাযের শাসকদের কাছে পবিত্র হজ্ব মৌসুম একটি বিপজ্জনক বিষয় বলে মনে হবে। তাই তারা হাজীদের সংখ্যা যতটা সম্ভব হ্রাস করবে এবং পবিত্র মক্কা ও মদীনায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তবে তা মুসলিম জাতিসমূহের পবিত্র মক্কার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। মুসলিম জাতিসমূহ প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। তাই সম্ভবত লক্ষ লক্ষ বরং মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমান বিভিন্ন দেশ থেকে ঐ বছর হজ্ব পালন করার উৎসাহ নিয়ে ছুটে আসবে। তাদের সরকারসমূহ এবং হিজায সরকার কর্তৃক আয়োজিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ থাকা সত্ত্বেও তাদের এক বিরাট অংশ পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌঁছতে পারবে।

ঐ বছর হাজীদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রশ্ন হবে : ‘ইমাম মাহদী (আ.)- এর ব্যাপারে তুমি কী শুনেছ’। তবে এটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিপজ্জনক প্রশ্ন যা হাজীরা নিজেদের মাঝে আলোচনা করবে এবং ইমাম মাহদী সংক্রান্ত বিশেষ সংবাদ তারা গোপনে বর্ণনা করবে এবং সে সাথে তারা হিজায- সরকার ও সুফিয়ানী বাহিনীর সর্বশেষ পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করবে।

নি র রেওয়ায়েতটি ইমাম মাহদী (আ.)- এর ব্যাপারে আগ্রহ এবং তাঁকে সন্ধান করার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অবস্থা এবং বিশেষ করে মক্কা নগরীতে অবস্থানরত হাজীদের অবস্থার একটি সার্বিক চিত্র অংকন করে।

ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদীস আবু উমর ইবনে আবী লাহিয়াহ্ থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তিনি আবদুল ওয়াহহাব ইবনে হুসাইন থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে সাবিত থেকে, তিনি তাঁর পিতা (সাবিত) থেকে, তিনি আল হারিস ইবনে আবদিল্লাহ্ থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন : "যখন ব্যবসা- বাণিজ্যে ম ন্দাভাব দেখা দেবে ও পথসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে তখন বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে কোন ধরনের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী ছাড়াই সাত জন আলেম বের হয়ে প্রত্যেকেই তিনশ'র অধিক ব্যক্তির কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন। অতঃপর তাঁরা পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্রিত হবেন এবং পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তাঁরা পরস্পরকে প্রশ্ন করবেন : আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? তখন তাঁরা বলবেন : আমরা এমন এক ব্যক্তির সন্ধানে এসেছি যাঁর হাতে এ সব ফিতনার অবসান হওয়া উচিত এবং তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ ক ন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করবেন। আর আমরা তাঁকে তাঁর নাম, তাঁর পিতা ও মায়ের নাম এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ সমেত চিনি। অতঃপর ঐ সাত আলেম এ ব্যাপারে একমত হয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে তাঁকে খুঁজতে থাকবেন। (তাঁকে খুজে পাবার পর) তাঁরা তাঁকে বলবেন : আপনি কি অমুকের পুত্র অমুক? তিনি বলবেন : না; বরং আমি একজন আনসারী। এ কথা বলে তিনি তাঁদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবেন। অতঃপর তাঁরা ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে জ্ঞাত ও বিশেষজ্ঞদের কাছে তাঁর কথা ব্যক্ত করবেন। তখন তাঁদেরকে বলা হবে যে, তিনিই আপনাদের নেতা যাঁকে আপনারা খুঁজছেন এবং তিনি মদীনায় চলে গেছেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে মদীনায় খুঁজতে থাকবেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে মদীনায় রেখে মক্কায় চলে আসবেন। তাঁরা আবার তাঁর সন্ধানে মক্কায় চলে আসবেন। তাঁকে সেখানে খুঁজতে থাকবেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে খুঁজে পেয়ে বলবেন : আপনি অমুকের পুত্র অমুক? আর আপনার মা অমুকের কন্যা অমুক। আপনার মধ্যে অমুক অমুক নিদর্শন আছে। অথচ আপনি একবার আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে চলে গেছেন। আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন যাতে আমরা আপনার হাতে বাইআত করতে পারি। তখন তিনি

বলবেন : আমি আপনাদের নেতা নই। আমি আনসার বংশোদ্ভূত অমুকের পুত্র অমুক। আমাকে নির্দেশ দিলে আমি আপনাদের নেতাকে দেখিয়ে দেব। অতঃপর তিনি তাঁদের কাছ থেকে আবার পালিয়ে যাবেন। তাঁরা আবার তাঁকে মদীনায় খুঁজতে থাকবেন, কিন্তু তিনি তাঁদেরকে মদীনায় ফেলে রেখে মক্কায় চলে আসবেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে পবিত্র মক্কা নগরীতে রুকনের কাছে খুঁজে পেয়ে বলবেন : যদি আপনি আপনার হাতে বাইআত করার জন্য আপনার হাত বাড়িয়ে না দেন তাহলে আমাদের পাপ এবং আমাদের রক্তের দায়-দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তাবে। সুফিয়ানীর সেনাবাহিনী আমাদের সন্ধানে বের হয়েছে এবং আমাদের ধরার জন্য তৎপর হয়েছে। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে এক জারজ ব্যক্তি। অতঃপর তিনি রুকন ও মাকামের মাঝখানে বসে বাইআতের জন্য নিজ হস্তদ্বয় প্রসারিক করবেন। অতঃপর তাঁর জন্য বাইআত গ্রহণ করা হবে। মহান আল্লাহ্ মানব জাতির অন্তরে তাঁর জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। অতঃপর তিনি একদল ব্যক্তিসহ রওয়ানা হবেন যাঁরা হবেন দিবাভাগে সিংহের মতো বীর ও সাহসী এবং রাতের বেলা দুনিয়াত্যাগী তাপসের ন্যায়।”

এ রেওয়ায়েতের সনদ ও মতনে (বর্ণনায়) বেশ কিছু দুর্বল দিক রয়েছে। এগুলোর একটি হচ্ছে ক ট্যান্টিনোপল বিজয়। উল্লেখ্য যে, এই ক ট্যান্টিনোপল নগরী মুসলমানদের কাছে বেশ কয়েক শতাব্দীব্যাপী সামরিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং তা পাঁচশ’ বছর আগে সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতেহ্ কর্তৃক বিজিত হওয়ার আগে মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি অংশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এ নগরী বিজয়ের সুসংবাদদানকারী বেশ কিছু রেওয়ায়েতও মুসলমানরা মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছে। এ সব রেওয়ায়েতের শুদ্ধ বা বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে গবেষণা করা প্রয়োজন।

তবে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে যেগুলো বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সেগুলো হচ্ছে ঐ সব রেওয়ায়েত যেগুলোয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক ট্যান্টিনোপল নগরী ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বিজিত হবে। আর ওপরে উল্লিখিত রেওয়ায়েতেও এটিই উল্লেখ করা হয়েছে। কতিপয় রাবী আরো উল্লেখ করেছেন যে, ক ট্যান্টিনোপল বিজয় মুসলমানদের

বৃহৎ সমস্যাগুলোর সমাধান করবে। আর আসলেই এ নগরী মুসলমানদের বৃহৎ সমস্যাগুলোর মধ্যেই পরিগণিত হতো।

একইভাবে এ সম্ভাবনাও দেয়া যেতে পারে যে, ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহে (.আ) রাজধানীকে বোঝানো (পাশ্চাত্য) ক ট্যান্টিনোপল বলতে রোমেরহয়েছে যা তাঁর আবির্ভাবের যুগে বিদ্যমান থাকবে। আবার কিছু কিছু রেওয়ায়েতে এ নগরীকে (The Great Roman City) 'বৃহৎ রোমান নগরী' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী এবং তাঁর সঙ্গীরা ঐ নগরী তাকবীর ধ্বনি দিয়ে জয় করবেন। (.আ)

তবে এ রেওয়ায়েতের অবস্থা যা- ই হোক না কেন, এমনকি যদি তা বানোয়াটও হয় তবুও এটি হচ্ছে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতার উক্তি যা তিনি প্রায় বারোশ' বছর আগে লিখেছেন। কারণ, ইবনে হাম্মাদ ২২৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আর তিনি এ হাদীসটি তাঁর পূর্ববর্তী অর্থাৎ তাবেয়ীদের হতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বছরের সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থা, তাঁর আবির্ভাবের খবর মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া এবং তাঁকে খুঁজে পেতে তাদের গভীর অনুসন্ধানের বিষয়গুলো সম্পর্কিত চিত্র অন্ততপক্ষে রেওয়ায়েতটির বর্ণনাকারীদের দৃষ্টিতে ছিল। অধিকন্তু রেওয়ায়েতটিতে বর্ণিত অধিকাংশ বিষয় অন্যান্য রেওয়ায়েতেও উল্লিখিত হয়েছে অথবা অন্যান্য রেওয়ায়েতে যে বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তা থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।

ঐরূপ সংকটজনক পরিস্থিতিতে ঐ সাত জন আলেমের মক্কায় আসার বিষয়টি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ব্যাপারে মুসলমানদের তীব্র আগ্রহকেই প্রমাণ করে। তেমনি ইমাম মাহদীকে খুঁজে পেতে মক্কায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং ঐ সাত জন আলেমের প্রত্যেকের নিজ দেশের মুমিন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ইমাম মাহদীর সঙ্গে জীবন দিতে প্রস্তুত এরূপ তিনশ' তের ব্যক্তি হতে বাইআত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো মুসলমানদের মধ্যে ইমাম মাহদীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতিশ্রুত তিনশ' তের বিশেষ সঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত (বদর যুদ্ধে রাসুলের সঙ্গীর সমান) হতে তাঁদের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকেই প্রমাণ করে।

তবে তাদের কাছ থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বারবার পালিয়ে যাওয়া ও সড়ে পড়ার বিষয়টি যা এ রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে তা দুর্বলতামুক্ত নয়। তিনি যে পছ না করা সত্ত্বেও বাইআত গ্রহণ করবেন এ বিষয়টি যা শিয়া- সুন্নী হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা সম্ভবত এ ধরনের ধারণার উৎস হতে পারে। এমনকি ইমাম সাদিক (আ.)- এর একজন উঁচু পর্যায়ের সাহাবী ধারণা পোষণ করতেন যে, ইমাম মাহদী (আ.) বাইআত গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন; আর এ বিষয়টি (বাধ্য হয়ে বাইআত গ্রহণ) মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। তাই ইমাম সাদিক (আ.) হাদীসে উল্লিখিত إكراه (ইকরাহ্) বা অপছ করা শব্দের অর্থ যে, إجبار (ইজবার) বা বাধ্যকরণ নয়, তা তাঁকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে ছিলেন (যার ফলে তাঁর এ ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায়) এবং এ ব্যাপারে তিনিও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেন।

এটি সাধারণ মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এবং ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি তাদের আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন- এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলো যেভাবে তাঁর বাইআত গ্রহণ করার বিষয়টি চিত্রিত করেছে তা প্রাগুক্ত রেওয়ায়েত যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে ভিন্ন।

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক ইমাম মাহদীর চারপাশে তাঁর সাহাবীদেরকে একত্রিতকরণ

ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাহাবীদের ব্যাপারে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে শিয়া- সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহে তাঁদের সংখ্যা সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা বদর যুদ্ধে মহানবী (সা.)- এর সাহাবীদের সংখ্যার অনুরূপ হবেন অর্থাৎ তাঁদের সংখ্যা হবে তিনশ’ তের জন। আর এ বিষয়টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মাহদীর হাতে ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণ এবং তাঁর প্রপিতামহ মহানবী (সা.)- এর হাতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের মাঝে এক বিরাট সাদৃশ্য বিদ্যমান। অধিকন্তু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদীর সাহাবীদের মাঝে

প্রথম দিককার নবীদের সাহাবীদের সময় প্রচলিত বেশ কিছু প্রথা (সুন্নাহ্) পুনরায় বাস্তবায়িত হবে।

তাই ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "হযরত মূসা (আ.)- এর সাহাবীরা নদী দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন যা إنّ الله مبتليكم بنهر (নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষিত করবেন)- মহান আল্লাহর এ বাণীতে বর্ণিত হয়েছে। আর আল কায়েমের সাহাবীরাও অনুরূপভাবে পরীক্ষিত হবে।"[৩২৮]

তবে কেবল তারাই তাঁর একমাত্র সাহায্যকারী ও সাহাবী নন। তাই তাঁর অন্তর্ধানকালে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পূর্বোল্লোখিত আবদালদের থেকে ভিন্ন হবে। বরং রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর সৈন্যবাহিনী যারা তাঁর সাথে পবিত্র মক্কা নগরী থেকে বের হবে তাদের সংখ্যা হবে দশ হাজার অথবা ততোধিক। আর যে বাহিনী তাঁর সাথে ইরাকে প্রবেশ করবে এবং তিনি যাদের মাধ্যমে পবিত্র আল কুদস বিজয় করবেন তাদের সংখ্যা হবে লক্ষ- লক্ষ।

সুতরাং এরা সবাই হবে তাঁর সাহায্যকারী ও সাহাবী; বরং ইসলামী বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্য থেকে তাঁর কোটি কোটি একান্ত নিষ্ঠাবান সঙ্গী থাকবে।

দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, তারা মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকা ও বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হবে। রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে তাদের মধ্যে থাকবেন মিশরের স ান্ত বংশীয় ব্যক্তিরা, শাম দেশের আবদালরা, ইরাকের পুণ্যবান ব্যক্তিরা এবং তালেকান ও কোমের মূল্যবান রত্নসদৃশ মহৎ পুণ্যা ারা। ইবনে আরাবী তাঁর আল ফুতুহাতুল মাক্কীয়াহ্ গ্রন্থে তাদের (ইমাম মাহদীর সাথীদের) জাতীয়তা সম্পর্কে বলেছেন : তারা অনারব বা ইরাকী হবে, তাদের মধ্যে কোন আরব থাকবে না। কিন্তু তারা কেবল আরবী ভাষায় কথা বলবে। আবার বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু আরবও থাকবে। এ সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এ মশহুর (প্রসিদ্ধ) হাদীসটি : "তাদের মধ্যে থাকবে মিশরীয় স ান্ত (মহৎ) বংশীয় ব্যক্তিবর্গ, শামদেশের অধিবাসী আবদালরা এবং ইরাকের পুণ্যবান ব্যক্তিরা।"[৩২৯]

আর ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ৯৫ পৃষ্ঠায় ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে বিদ্যমান রেওয়ায়েতসমূহও প্রাগুক্ত রেওয়ায়েতসদৃশ। রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অনারব থাকবে। তবে তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান ও সিংহভাগই হবে ইরানী।

তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথীদের মধ্যে পঞ্চাশ জন মহিলাও থাকবে। আর বিষয়টি ইমাম বাকির (আ.) থেকে একটি রেওয়ায়েতেও বর্ণিত হয়েছে। তবে আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে দশ জন নারী থাকবে যারা আহতদের সেবা শুশ্রূষা করবে।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম ধর্মে ও ইমাম মাহদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, মর্যাদা ও মহান ভূমিকা থাকবে। আর এ ভূমিকা হবে সবদিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বেদুইনী সহিংসতা এবং নারীর প্রতি সব ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত। স্মর্তব্য যে, নারীর প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিষ্ঠুরতা এখনও আমাদের দেশে ও সমাজে বিদ্যমান। একইভাবে, পাশ্চাত্য সভাতায় নারীর যে অসম্মান ও অবমাননা এবং তার ওপর কলঙ্কের যে কালিমা লেপন করা হয়েছে সেগুলো থেকেও উল্লিখিত এ ভূমিকা পবিত্র থাকবে।

চতুর্থ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হযেছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর অধিকাংশ সঙ্গী যুবক হবে। বরং এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে পৌঢ় ও বৃদ্ধদের সংখ্যা পথিকের ব্যঞ্জনের মধ্যে লবন যেমন সামান্য মাত্রায় থাকে, তেমনি নগণ্য হবে।

যেমন আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বর্ণিত নি েৱ হাদীসটিতে বলা হয়েছে : "আল মাহদীর সঙ্গীরা হবে যুবক। চোখের মধ্যে সুরমা এবং ব্যাঞ্জনে লবন যেমন সামান্য হয়, তেমনি তাদের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক পৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকবে। আর পথিকের পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য জিনিসই হচ্ছে লবন।"[৩৩০]

পঞ্চম প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে তাদের প্রশংসায় এবং তাদের উচ্চ মর্যাদা ও মহৎ গুণাবলীর বর্ণনায় বহু হাদীস বিদ্যমান। অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদীর কাছে একটি সহীফা আছে যার মধ্যে তাদের সংখ্যা, নাম, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ আছে। তারা নিমিষেই সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করবে। তাদের জন্য সকল কঠিন ও দুরূহ বিষয় সহজ করে দেয়া হবে, তারা মহান আল্লাহর ক্রোধ প্রকাশকারী সেনাবাহিনী হবে; তারা হবে ভয়ঙ্কর শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী যাদেরকে মহান আল্লাহ্ নি োক্ত আয়াতে ইহুদীদের ওপর বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আয়াতটি হলো :

(بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد)

“আমরা তোমাদের ওপর (তোমাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য) আমাদের কতিপয় প্রচণ্ড শক্তিধর ও ক্ষমতাশালী বা াকে প্রেরণ করেছিলাম।”

আর তারাই হবে নি োক্ত আয়াতে উল্লিখিত মুষ্টিমেয় প্রতিশ্রুত উম্মাহ্। আয়াতটি হলো :

(و لئن أخّرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة ليقولنّ ما يحسبه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم)

আর তারাই হবে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র বংশধর পুণ্যবানদের পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারাই ফকীহ্, বিচারক এবং প্রশাসক। মহান আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণসমূহকে দৃঢ় ও মজবুত করে দেবেন। তাই তারা কাউকে ভয় করবে না এবং তাদের মাঝে কোন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির কারণে তারা আনি ত হবে না অর্থাৎ তাঁদের চারপাশে জনতার আধিক্য ও সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি মোটেও তাদের ঈমান ও স্রষ্টার প্রতি তাদের অন্তরঙ্গরতা বৃদ্ধি করবে না (আবার জনতার সমর্থন প্রত্যাহার ও তাদের সংখ্যা হ্রাস তাদের ঈমান ও স্রষ্টার প্রতি তাদের অন্তরঙ্গতা হ্রাস করবে না)। তারা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, ইমাম মাহদীর অবস্থানকে দেখতে পাবে এবং তাঁর সাথে কথা বলবে। তাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে চল্লিশ অথবা তিনশ’ পুরুষের দৈহিক শক্তি প্রদান করা হবে।

বরং রেওয়ায়েতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সকল নবীর সাহাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আস সাফফার প্রণীত বাসাইরুদ দারাজাত গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে আবু

বসীর রেওয়ায়েত করেছেন : "একদিন মহানবী (সা.)- এর সামনে তাঁর একদল সাহাবী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দু'বার বললেন : হে আল্লাহ্! আপনি আমার ভাইদের সাথে আমাকে মিলিত করুন। তখন সাহাবীরা বললেন : হে রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন : না, তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাইয়েরা হবে সর্বশেষ যুগের একদল ব্যক্তি যারা আমাকে না দেখেও আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। তারা তাদের পিতার ঔরস ও মাতৃজঠর থেকে হওয়ার পূর্বেই মহান আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পিতাদের নামসহ আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেই ঈমানের ক্ষেত্রে এতটা দৃঢ় ও মজবুত যে, তাদের ঈমানকে টলানো আঁধার রাতে অত্যন্ত দৃঢ় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ উপড়ানো অপেক্ষাও কঠিন অথবা তারা যেন অনির্বাপনীয় জ্বলন্ত কয়লাধারী।"

সহীহ মুসলিমে (১ম খণ্ডের ১৫০ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত আছে : "আমি আমাদের ভাইদেরকে দেখার ইচ্ছা করেছি। তখন সাহাবীরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার দীনী ভাই নই? তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভাইয়েরা এখনো আসে নি (অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে নি)। সাহাবীরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যারা এখনো আসে নি তাদেরকে আপনি কীভাবে চেনেন? মহানবী বললেন : তোমরা কি মনে কর একপাল কালো চিহ্নধারী অশ্বের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির হাত ও পায়ে উজ্জ্বল সাদা চিহ্নধারী অশ্বসমূহ থাকে সে তার অশ্বগুলোকে চিনবে না? তখন সবাই বলল : জী, হ্যাঁ। হে রাসূলুল্লাহ্! মহানবী বললেন : তারা হাউসে কাওসারে আমার নিকট তাদের ওজুর কারণে অতি উজ্জ্বল ও শুভ্র মুখমণ্ডল, হাত ও পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আর আমি হাউসে কাওসারে তাদের অগ্র প্রতিনিধি হব। জেনে রাখ, পথহারা উটকে যেভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেভাবে একদল লোককে আমার হাউস থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তাদেরকে ডাকতে থাকব : তোমরা এদিকে এসো। তখন আমাকে বলা হবে : আপনার পরে তারা (ধর্মে) পরিবর্তন করে ফেলেছিল। তখন আমিও বলতে থাকব : দূর হয়ে যাও! তোমরা সবাই দূর হয়ে যাও!"

এভাবেই হাদীসসমূহে তাদের বৈশিষ্ট্য ও কারামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, গুহাবাসীরা (আসহাবে কাহাফ) পুনরুজ্জীবিত হয়ে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর সঙ্গী- সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর তাঁদের মধ্যে থাকবেন হযরত খিযির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.)। কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর নির্দেশে কতিপয় মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ষষ্ঠ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে রেওয়ায়েতসমূহ নির্দেশ করে যে, ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের কাছাকাছি সময়ে তাঁর সঙ্গীরা তিনটি দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হবেন। একটি দল তাঁর সাথে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করবে অথবা অন্যদের আগেই সেখানে পৌঁছবে। দ্বিতীয় দলটি মেঘের ওপর আরোহণ করে বা বাতাসের মাধ্যমে তাঁর সাথে মিলিত হবে। তৃতীয় দলটি তাদের নিজ নিজ শহরে নিজেদের বাড়িতে রাত যাপন করবে কিন্তু তারা বুঝতেই পারবে না যে, তারা পবিত্র মক্কায় উপনীত হয়েছে এবং সেখানে অবস্থান করছে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "এ বিষয়ের অধিপতির জন্য এ কয়েকটি উপত্যকার মাঝে অন্তর্ধানের ঘটনা ঘটবে এবং তিনি যি তূয়া এলাকার (মক্কার একটি উপত্যকা এবং এ নগরীতে প্রবেশ করার একটি পথ) দিকে ইঙ্গিত করলেন; (এরপর বললেন) এমনকি যখন তার আবির্ভাবের দু'রাত অবশিষ্ট থাকবে তখন সে তার এক গোলামকে প্রেরণ করবে যেন সে তার কতিপয় সাহাবীর সাথে মিলিত হয়ে বলে : আপনারা এখানে ক'জন আছেন? তারা বলবে : প্রায় চল্লিশ জন। অতঃপর সে বলবে : যদি আপনারা আপনাদের নেতাকে দেখতে পান তাহলে আপনাদের অবস্থা কেমন হবে? তারা বলবে : মহান আল্লাহর শপথ, যদি তিনি পাহাড়- পর্বতে আশ্রয় নেন তাহলেও আমরা তার সাথে আশ্রয় নেব। অতঃপর সে তাদের সামনাসামনি এসে বলবে : আপনারা আপনাদের মধ্যকার দশ জন শ্রেষ্ঠ ও মনোনীত ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর তারা তাদের সাথে পরামর্শ করবে। এরপর সে তাদেরকে নিয়ে তোমাদের নেতার কাছে নিয়ে যাবে এবং সে তাদেরকে ঐ প্রতিশ্রুত রাত যা ঐ রাতের পরের রাত হবে তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে।"[৩৩১]

বাহ্যত এ রেওয়ায়েতে উল্লিখিত অন্তর্ধানের অর্থ হচ্ছে ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাবের আগের মুহূর্তে তাঁর যে স্বল্পমেয়াদী অন্তর্ধান থাকবে তা। আর এ সব সঙ্গী ঐ সব আবদাল নন যাঁরা তাঁর সাথে আছেন অথবা তাঁর সাথে যাঁদের যোগাযোগ আছে। আর তাঁরা ঐ বারো ব্যক্তিও নন যাঁদের প্রত্যেকেই একমত যে, তাঁরা তাঁকে দেখেছেন অথচ তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। বরং এরা হবেন তাঁর সন্ধানকারী ঐ সাত আলেমের ন্যায় যাঁদের কথা এর আগে উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "আল কায়েম পৃথিবীর নয়টি অঞ্চলের পঁয়তাল্লিশ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে আবির্ভূত হবে। একটি এলাকা থেকে একজন, আরেকটি এলাকা থেকে দু'জন, তৃতীয় এলাকা থেকে তিন জন, চতুর্থ এলাকা থেকে চার জন, পঞ্চম এলাকা থেকে পাঁচ জন, ষষ্ঠ এলাকা থেকে ছয় জন, সপ্তম এলাকা থেকে সাত জন, অষ্টম এলাকা থেকে আট জন, নবম এলাকা থেকে নয় জন। আর এভাবে তার (প্রতিশ্রুত) সাথীদের সংখ্যা পুরো হবে।"[৩৩২]

এ রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমাম মাহ্দী (আ.) আবির্ভাবের সূচনালগ্নে নিজেই সামনে এগিয়ে আসবেন অথবা তিনি মক্কা নগরী পানে এগিয়ে যাবেন। আর এও অসম্ভব নয় যে, যে দু'দলের কথা প্রাগুক্ত রেওয়ায়েতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে আসলে তাঁরা এক দল এবং তাঁরা ইমাম মাহ্দীর অন্যান্য সাথীদের আগেই মক্কায় পৌঁছে যাবেন।

সম্ভবত যে সব সাহাবী আকস্মিকভাবে তাঁদের শয্যা থেকে উধাও হয়ে যাবেন এবং মহান আল্লাহ্‌র শক্তিবলে চোখের পলকেই নিজ নিজ দেশ ও জনপদ থেকে মক্কায় পৌঁছে যাবেন তাঁরা তাঁদের আগে যাঁরা মক্কায় পৌঁছবেন তাঁদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন।

তবে রেওয়ায়েত অনুসারে যাঁরা মেঘে চরে দিনের বেলা তাঁর কাছে আসবেন তাঁরা নিজ নিজ পিতার নামসহ বিখ্যাত হবেন। অর্থাৎ তাঁরা মক্কায় স্বাভাবিকভাবে (উড়োজাহাজে পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে) আগমন করবেন। যার ফলে জনগণের মাঝে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না। তাই শর্তহীনভাবে তাঁরা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আর আবদালগণ যাঁরা তাঁর সাথে বসবাস করেন অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর নির্দেশিত কাজ ও দায়িত্বসমূহ পালন করছেন এবং সূক্ষ্মভাবে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে জ্ঞাত তাঁরা তাঁর আবির্ভাবকালে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবেন।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "নিশ্চয়ই এ বিষয়ের অধিপতির সাথীরা সংরক্ষিত আছে। সমগ্র মানব জাতিও যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেও মহান আল্লাহ্ তার সাহাবীদেরকে তার কাছে নিয়ে আসবেন। আর তাদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেছেন : যদি তারা এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করে তাহলে আমি এ ব্যাপারে এমন এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করব যারা এ ব্যাপারে অবিশ্বাসী নয়। মহান আল্লাহ্ আর তাদের ব্যাপারে আরো বলেছেন : আর অচিরেই মহান আল্লাহ্ এমন এক জাতিকে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে। তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়ী এবং কাফিরদের ওপর কঠোর হবে।"[৩৩৩] ।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "তাদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তি থাকবে যারা রাতে নিজ শয্যা থেকে গায়েব হয়ে যাবে এবং প্রভাতে তারা পবিত্র মক্কায় অবস্থান করবে। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে দিনের বেলা মেঘমালায় ভ্রমণ করতে দেখা যাবে। তারা তাদের পিতাদের নামসহ পরিচিত থাকবে।" আমি (রাবী) বললাম : "আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হই। তাদের মধ্যে কারা সর্বোত্তম ঈমানের অধিকারী?" তিনি বললেন : "যে দিবাভাগে মেঘে ভ্রমণ করে সে।"[৩৩৪]

দিনের বেলা মেঘমালায় চড়ে তাঁদের ভ্রমণ করার অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্ অলৌকিকভাবে তাঁদেরকে মেঘের ওপর সওয়ার করে তাঁদের নিজ নিজ দেশ থেকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে আসবেন। তবে এর অর্থ অন্যান্য বিমানযাত্রীর মতো তাঁদেরও বিমানে মক্কায় আগমনও হতে পারে। পাসপোর্টে তাঁদের নাম ও তাঁদের পিতাদের নাম উল্লেখ থাকার কারণে তাঁদের পরিচিতি জ্ঞাত থাকবে। আর উক্ত হাদীসসমূহে হয়তো এটিই বলা হয়েছে। কারণ, ঐ যুগে বিমানের অস্তিত্ব ছিল না।

যাঁরা রাতের বেলা নিজ নিজ শয্যা থেকে গায়েব হয়ে প্রভাতে মক্কায় উপস্থিত হবে অথবা ঐ সব সাহাবী যাঁদের সাথে অন্য সকলের আগে তিনি যোগাযোগ করে বিভিন্ন দায়িত্ব দেবেন তাঁদের সকলের চেয়ে মেঘমালার ওপর সওয়ার হয়ে যাঁরা দিনের বেলা ভ্রমণ করবেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ হবার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁরা প্রকৃত মুমিন হিসেবে ইমাম মাহদীর সাথে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। যাঁরা নিজ নিজ শয্যা থেকে উধাও হয়ে যাবেন তাঁরা ঐ রাত এমতাবস্থায় যাপন করবেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউই জানবেন না যে, তিনি মহান আল্লাহর কাছে ইমাম মাহদীর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। তবে তাঁদের তাকওয়া ও বিবেক- বুদ্ধি তাঁদেরকে এ মর্যাদার যোগ্য করবে। তাই মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে ইমাম মাহদীর সঙ্গী মনোনীত করবেন। আর সেখানে তাঁরা তাঁর সেবায় উপস্থিত হবেন।

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা যখন নিজেদের বাড়ির ছাদে ঘুমিয়ে থাকবেন তখনই হঠাৎ তাঁরা গায়েব হয়ে যাবেন ও তাঁদের আ ীয়রা তাঁদেরকে খুঁজে পাবে না। তাঁদেরকে মহান আল্লাহ্ মক্কায় নিয়ে যাবেন। আর এর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব গ্রীষ্মকালে অথবা গ্রীষ্ম ও শরতের মাঝামাঝি সময়ে হবে। আর এ বিষয়টি আমরা পরে উল্লেখ করব। যাঁরা তাঁদের শয্যা থেকে গায়েব হয়ে যাবেন তাঁদের একটি অংশ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল ও দেশসমূহের অধিবাসী হবেন। সেখানকার অধিবাসীরা গ্রীষ্মকালে তাদের বাড়ির ছাদের ওপর অথবা উঠানে ঘুমায়।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাহাবীরা শুক্রবার রাতে ৯ মুহররমের দিবাগত রাতে পবিত্র মক্কায় সমবেত হবেন। ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত : “মহান আল্লাহ্ তাদেরকে শুক্রবার রাতে পবিত্র মক্কায় একত্রিত করবেন। তাই তারা সবাই শুক্রবার প্রভাতে তার হাতে আনুগত্যের শপথ (বাইআত) করবে এবং তাদের কেউই বিরুদ্ধাচরণ করবে না।”[৩৩৫]

এ রেওয়ায়েতটি শিয়া- সুন্নী সূত্রসমূহে বর্ণিত রেওয়ায়েতের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় : “মহান আল্লাহ্ মাহদীর বিষয় এক রাতের মধ্যেই ঠিক করে দেবেন।”

এতদপ্রসঙ্গে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

المهدي منّا أهل البيت يُصلح الله أمره في ليلة

"মাহদী আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্ তার বিষয় এক রাতের মধ্যে ঠিক ও সমাধা করে দিবেন।"

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে : يُصلحه الله في ليلة "মহান আল্লাহ্ তাঁকে এক রাতের মধ্যে প্রস্তুত করে দেবেন।"

এ বিষয়টি আরো অনেক রেওয়ায়েতের সাথেও সামঞ্জস্যশীল যেগুলোয় ৯ মুহররম শুক্রবারের দিবাগত সন্ধ্যায় ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের শুরু, অতঃপর ১০ মুহররম (আশুরার দিবস) শনিবারে তাঁর আ প্রকাশের বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ, নাফসে যাকীয়ার শাহাদাত

রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে এবং তখনকার সামাজিক পরিবেশ- পরিস্থিতির প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সময় পবিত্র মক্কায় সক্রিয় শক্তিসমূহ বিদ্যমান থাকবে। যেমন হিজায সরকার যা দুর্বল ও পতনমুখ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম মাহদীর সম্ভাব্য আবির্ভাব মোকাবিলা করার জন্য শক্তি সঞ্চয় এবং সামরিক বাহিনী মোতায়েন করবে। আবির্ভাবের পর তাঁর প্রতি সকল মুসলমান ঝুঁকে পড়বে এবং তারা হজ্ব মৌসুমে তাঁর জন্য তাদের সকল কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা প্রদর্শন করবে।

বৃহৎ শক্তি ও রাষ্ট্রসমূহের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ :হিজায সরকার অথবা সুফিয়ানীর সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য অথবা হিজায, বিশেষ করে মক্কার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্বতন্ত্র এ সব সংস্থা তৎপর থাকবে।

সুফিয়ানীর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক : তারা মদীনায় তাদের হাতের মুঠো থেকে যে দু'ব্যক্তি পলায়ন করবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে এবং মক্কা থেকে ইমাম মাহদীর যে কোন আ লন ও তৎপরতা দমন করার জন্য প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করার জন্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।

এর বিপরীতে হিজাযে, বিশেষ করে মক্কায় ইয়েমেনীদেরও অবশ্যই ভূমিকা থাকবে। আর তাদের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী সরকার বেশ কয়েক মাস আগেই ইয়েমেনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে।

একইভাবে মক্কায় ইমাম মাহদীর ইরানী সাহায্যকারীরাও বিদ্যমান থাকবে। বরং হিজায ও মক্কার অধিবাসীদের মধ্য থেকে এবং হিজায প্রশাসনের অভ্যন্তরে মহান আল্লাহর সৎকর্মশীল বা াদের মধ্যেও তাঁর সাহায্যকারীরা থাকবে। এ ধরনের অনুকূল- প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ইমাম মাহদী পবিত্র হারাম শরীফ থেকে তাঁর আ ালনের ঘোষণা দেবেন এবং মক্কার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

আর স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তাজনিত কারণে রেওয়ায়েতসমূহে ইমাম মাহদীর এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয় নি। তবে যে সব কিছু তাঁর পবিত্র আ ালন সফল করার ক্ষেত্রে সহায়ক ও উপকারী এবং এর জন্য ক্ষতিকারক নয় কেবল সেগুলোই ঐ সব রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

রেওয়ায়েতসমূহে সবচেয়ে যে স্পষ্ট পদক্ষেপটি বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে ইমাম তাঁর সাহাবী ও অ ীয়দের মধ্য থেকে একজন যুবককে ২৪ অথবা ২৩ যিলহজ্ব অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের ১৫ রাত আগে প্রেরণ করবেন যাতে সে মক্কাবাসীদের কাছে ইমামের বাণী পাঠ করে শোনায়।

তবে নামাযের পর হারাম শরীফে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদের উদ্দেশে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বাণী অথবা এর কয়েকটি প্যারা পাঠ করতে না করতেই তাঁর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে মসজিদুল হারামের ভিতরে রুকন ও মাকামের মাঝখানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হবে। আর তাঁর এ শাহাদাত আসমান ও জমীনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

এ ঘটনাটি একটি পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ হবে যা বিভিন্ন উপকারী দিকসম্বলিত। কারণ, তা মুসলমানদের কাছে হিজায প্রশাসনের নিষ্ঠুরতা এবং এর পেছনে যে কুফরী শক্তিবর্গ আছে তা প্রকাশ করে দেবে।

এ তিক্ত ঘটনা ইমাম মাহদী (আ.)- এর আে   ালনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। স্মর্তব্য যে, তাঁর আবির্ভাব এ ঘটনার পর দু'সপ্তাহের বেশি বিলম্বিত হবে না। আরেক দিকে এ ধরনের ত্বরিৎ পরীক্ষামূলক ও নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে হিজায প্রশাসনের অভ্যন্তরে পরিতাপ ও দুর্বলতার উদ্ভব হবে (অর্থাৎ এ হত্যাকাণ্ড ক্ষয়িষ্ণু হিজায প্রশসনকে আরো দুর্বল ও পতন্মুখ করে দেবে)।

পবিত্র মক্কা নগরীতে এ পুণ্যা   া যুবকের শাহাদাত সংক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ শিয়া- সুন্নী সূত্র ও গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান এবং শিয়া গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে এগুলো প্রচুর। আর এ সব রেওয়ায়েতে তাঁকে অল্পবয়স্ক যুবক ও 'আন নাফসূয্ যাকিয়াহ্' (পবিত্র পুণ্যা া) বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে কয়েকটিতে তাঁর নাম 'মুহাম্মদ ইবনুল হাসান' বলেও উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম আমীরুল মু'মিনীন আলী (আ.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেছেন : ''আমি কি তোমাদেরকে অমুক বংশের রাজত্বের সর্বশেষ সময়কাল বলে দেব?'' আমরা (রাবী) বললাম, ''হে আমীরুল মু'মিনীন, জী হ্যাঁ, (বলুন)।'' তিনি বললেন, ''একজন সম্মানিত কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তিকে হারাম শরীফে (মক্কা নগরীর মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে) হত্যা করা হবে যার রক্তপাত হারাম বলে গণ্য। যিনি বীজ সমূহকে বিদীর্ণ করে বৃক্ষরাজি সৃষ্টি এবং প্রাণের উন্মেষ ঘটিয়েছেন তার শপথ এ ঘটনার পর তাদের রাজত্ব পনের রাতের বেশী স্থায়ী হবে না।'' আমরা বললাম, ''এর আগে অথবা এর পরে কি কিছু ঘটবে অতঃপর তিনি বললেন, ''রমযান মাসে আসমানী গায়বী আহবান ধ্বনি যা জাগ্রত ব্যক্তিকে ভীত- দূর্বল করে দেবে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করবে এবং যুবতীকে তার বাসর ঘর থেকে বের করে আনবে।[৩৩৬]

عن قوم من قريش (কুরাইশ্ গোত্রের অমুক বংশীয়) এটি একটি ভুল বাক্য হতে পারে। কারণ কোন অর্থ এ থেকে বোধগম্য নয়।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে আবু বসীর কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে। ঐ রেওয়ায়েতে ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : আল- কায়েম (ইমাম মাহদী) তাঁর সাহাবাদেরকে

বলবেন : ‘‘হে লোক সকল, মক্কাবাসীরা আমাকে চায় না। তবুও আমি তাদের কাছে আমাদের মত ব্যক্তির জন্য হুজ্জাত (দলীল- প্রমাণ) পেশ্ করার জন্য তাদের কাছে প্রতিনিধি (আমার সাহাবাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিকে) প্রেরণ করব।’’ তিনি তার একজন সাহাবাকে ডেকে বলবেন, ‘‘তুমি মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে বলবেঃ হে মক্কার অধিবাসীবৃ , আমি তোমাদের কাছে অমুকের প্রেরিত দূত। আর তিনি তোমাদেরকে বলেছেন : নিশ্চয়ই আমরা মহান আল্লাহর ঐশী কৃপার আহলুল বাইত (আ.) এবং রিসালাত ও খিলাফতের খনি। আর আমরা মহানবী (সা.) এর বংশধর এবং মহান নবীদের পবিত্র রক্তজ বংশ ধারা। আমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। আমাদের ওপর নির্যাতন চালান হয়েছে। আমাদেরকে দমন করা হয়েছে। যখন থেকে আমাদের নবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাই আমরা তোমাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তোমারাও আমাদেরকে সাহায্য করো।’’ তাই ঐ যুবকটি যখন এ কথা বলবে, তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে রুকন ও মাকামের মাঝখানে জবাই করা হবে। আর যুবকটি হবে নাফসে যাকিয়াহ্ (পবিত্র পূণ্যা া)। যখন এ সংবাদ ইমাম মাহদী (আ.) এর কাছে পৌঁছবে তখন তিনি তার সাহাবাদেরকে বলবেন : ‘‘আমি তোমাদেরকে অবগত করি নি যে, মক্কাবাসীরা আমাকে চায় না?’’ অতঃপর আর (আ.) আবির্ভূত হওয়া পর্যন্ত মক্কাবাসীরা তাকে আহবান করবে না। অতঃপর তিনি তূওয়াব পাহাড়ের পেছন দিক থেকে ৩১৩ বদর যুদ্ধের মুজাহিদদের সংখ্যা অনুরুপ ৩১৩ জন সাথী সহকারে মক্কা নগরীতে অবতরণ করবেন। এরপর তিনি মসজিদুল হারামে এসে মকাম- ই ইব্রাহীমে ৪ রাকাত্ নামায পড়বেন। এরপর তিনি হজরে আসওয়াদের দিকে পিঠ হেলান দিয়ে মহান আল্লাহর প্রশাংসা ও গুণকীর্তন করবেন এবং মহানবী (সা.)কে স্মরণ করে তাঁর ওপর দরূদ পাঠ করবেন। এরপর তিনি এমন কথা বলবেন যা জনগণের মধ্য থেকে কেউই কোন দিন বলে নি।[৩৩৭]

ইতিমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি এ রেওয়ায়েতটি মারফূ এবং তূওয়া হতে পবিত্র মক্কা নগরীর একটি পাহাড় এবং সেখানে প্রবেশ করা একটি পথ। আর নাফসে যাকিয়াহ্ সম্পর্কে যা কিছু

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আসলে শক্তিশালী। তিনি হবেন শক্তিশালী অধিকারী। তবে ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের ধরন- প্রক্রিয়ায় অধিক প্রাধান্য প্রাপ্ত বিষয় হচ্ছে এই যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবাগণ মসজিদুল হারামে একসংগে নয় বরং একাকী প্রবেশ করবেন। আর এ ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব।

ইবনে হাম্মাদ তার গ্রন্থের ৮৯, ৯১ ও ৯৩ পৃষ্ঠায় যে নাফসে যাকিয়াহ্ মদীনায় এবং যে নাফসে যাকিয়াহ্ পবিত্র মক্কা নগরীতে নিহত হবে। তাদের সম্পর্কে বেশ কিছু রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রেওয়ায়েতটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো : নাফসে যাকিয়াহ্ নিহত হওয়া পর্যন্ত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন না। যখন ঐ নাফসে যাকীয়াহ্ নিহত হবে তখন আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তার হত্যাকারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে। অতঃপর জনগণ ইমাম মাহদী (আ.) এর কাছে এসে নববধূকে বাসর রাতে যেভাবে আর স্বামী-গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক সেভাবে তাঁর চারপাশে জড় ও সমবেত হবে। আর তিনি পৃথিবীকে ন্যায় বিচার দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবেন। তখন যমীনের বুকে বৃক্ষ ও উদ্ভিদরাজি জন্মবে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষিত হবে। আর তাঁর বেলায়েত কালে (শাসন ও ইমামতকালে) আমার উম্মৎ যেভাবে নেয়ামত প্রাপ্ত হবে তারা অন্যসময় কখনো সেভাবে নেয়ামত প্রাপ্ত হয় নি।[৩৩৮]

৯১ পৃষ্ঠায় আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন নাফসে যাকিয়াহ্ নিহত হবে এবং তার ভাই পবিত্র মক্কা নগরীতে নিহত হবে তখন এ ভয়ানক অপরাধের জন্য আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান জানিয়ে বলবে : ‘‘নিশ্চয়ই তোমাদের নেতা অমুক। আর তিনিই হচ্ছেন মাহদী যিনি সমগ্র পৃথিবী সত্যও ন্যায় পরায়ণতা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবেন।’’[৩৩৯]

(و قل جاء الحق و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا)

আর (হে নবী !) আপনি বলে দিন : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা দূরীভূত ও ধ্বংস হবেই ।

ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব আ লনের শুরুর ধরন ও প্রক্রিয়া এবং এর সময়কাল সংক্রান্ত রেওয়ায়েত ও হাদীস সমূহের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। তবে যা উত্তম বলে মনে হয় তা হচ্ছে

এই যে, ইমাম মাহদী (আ.) ৩১৩ জন সঙ্গী- সাথী (সাহাবী) সহকারে আবির্ভূত হবেন। তখন তিনি মুহররম মাসের ৯ তারিখের সন্ধ্যায় একা একা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে এশার নামাযের পর মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বাণী প্রদানের মাধ্যমে তার পবিত্র আ ালনের ঘোষণা দেবেন। অতঃপর তাঁর সঙ্গী- সাথীগণ ঐ রাতে পবিত্র মক্কা নগরী ও হারামের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন। পরের দিন অর্থাৎ ১০ মুহররমে তিনি তাঁর বাণী সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তাদের নিজ নিজ ভাষায় প্রদান করবেন।

অতঃপর সুফিয়ানী বাহিনীর ভূমিধ্বসে ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়ার মু'জিয়া সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করতে থাকবেন। অতঃপর তিনি দশ হাজার বা ততোধিক সৈন্যসহ পবিত্র মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, রেওয়ায়েত সমূহে পবিত্র মক্কা নগরী থেকে ইমাম মাহদী (আ.) এর আ ালনের সূচনা আবির্ভাব (ظهور) উত্থান (قيام) ও বের হওয়া (خروج) এ সব শব্দ সহযোগে বর্ণিত হয়েছে এবং মনে হচ্ছে যে, এসব উক্তির অর্থ একই। তবে কতিপয় রেওয়ায়েতে আবির্ভাব ও বের হওয়া`র মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। আর মক্কায় ইমাম মাহদী (আ.) এর আ ালনকে আবির্ভাব এবং সেখান থেকে পবিত্র মদীনার দিকে তার গমন বা যাত্রাকে বের হওয়া বলা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে ইমামের আবির্ভাব পবিত্র মক্কা নগরীতে তার বিশেষ সঙ্গী- সাথীদের উপস্থিতিতে হবে। অথচ পবিত্র মক্কা থেকে মদীনা নগরীর উদ্দেশ্যে তার যাত্র ঐ সময় সংঘটিত হবে যখন তার সঙ্গী- সাথীদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হবে এবং সুফিয়ানী বাহিনী ও ভূমি ধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস হবে।

হযরত আব্দুল আযীম হাসানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : আমি হযরত ইমাম জাওয়াদ (আ.) কে বললাম, ''আমি আশা করি যে, আপনিই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আহলুল বাইতের কায়েম যিনি যেভাবে পৃথিবী অন্যায়- অত্যাচার দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক তেমনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।'' তিনি বললেন, ''হে আব্দুল কাসিম, আমরা আহলুল বাইত (আ.) সবাই কায়েম বি আমরিল্লাহ্ (মহান আল্লাহর দ্বীন ও

খিলাফতের তত্ত্বাবধায়ক) এবং মহান আল্লাহর ধর্মের দিকে পরিচালনাকারী। আমি সেই কায়েম নই যিনি পৃথিবীকে কাফির- নাস্তিকদের থেকে পবিত্র করবেন এবং ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে তা পূর্ণ করে দেবেন। আর সেই কায়েম হবে সেই ব্যক্তি যাঁর জন্ম মানুষের কাছ থেকে গোপন থাকবে এবং যিনি স্বয়ং তাদের থেকে লুক্কায়িত অর্থাৎ অন্তর্ধানে থাকবেন। আর তাঁর নামে তাঁকে ডাকা তাদের ওপর তখন নিষিদ্ধ থাকবে। তাঁর নাম হবে মহানবীর (সা.) নামের অনুরূপ এবং কুনিয়াহ্ (পিতা, পুত্র বা কন্যার নামসহ উপাধি) হবে মহানবী (সা.) এর কুনিয়াহ্ (অর্থাৎ আবুল কাসিম) তিনি নিমিষে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সফর করবেন। তার জন্য সকল কষ্টসাধ্য ও দূরূহ বিষয় সহজসাধ্য করে দেয়া হবে। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যার অনুরূপ তাঁর সাহাবাদের মধ্যে থেকে ৩১৩ জন পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ থেকে তাঁর কাছে এসে মিলিত ও একত্রিত হবেন। আর এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর এ বাণীটির মর্মার্থ :

(أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إنّ الله على كل شئ قدير)

(তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সবাইকে মহান আল্লাহ একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।) অএব, পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে যখন ৩১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সাথে মিলিত হবে তখন তিনি আবির্ভূত হবেন। আর যখন তার সঙ্গী- সাথীদের সংখ্যা দশ হাজারে এ উন্নীত হবে তখন তিনি মহান আল্লাহ্ যে পর্যন্ত সন্তুষ্ট না হবেন সে পর্যন্ত তিনি আল্লাহ পাকের শক্রদেরকে হত্যা ও নিধন করতে থাকবেন। আব্দুল আযীম বলেন: "আমি তাঁকে বললাম, হে আমার নেতা, কিভাবে জানা যাবে যে, মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন? তিনি বললেন, ‘‘ যখন মহান আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে দয়া প্রবিষ্ট করিয়ে দেবেন ।[৩৪০]

আর আমাশও আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেছেন। একদা আমীরুল মু'মিনীন্ আলী (আ.) ইমাম হুসাইন (আ.) এর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘নিশ্চয়ই আমার এ পুত্রটি সাইয়েদ (নেতা)। আর মহানবীও (সা.) তাঁকে সাইয়েদ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ঔরস (বংশধর) থেকে মহান আল্লাহ তোমাদের নবীর নামের অনুরূপ নাম বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন। অতঃপর সে চরিত্র ও শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে ও তাঁর সদৃশ্য হবে। তিনি ঐ সময় বের হবেন যখন জনতা

গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে, সত্যকে মিটিয়ে ফেলা হবে এবং প্রকাশ্যে অন্যায়- অত্যাচার করা হবে। মহান আল্লাহর শপথ যদি তিনি আবির্ভূত না হন তাহলে তার গর্দান- ই কেটে ফেলা হবে। আকাশ বাসীরা তার আবির্ভাবের মাধ্যমে আন প্রকাশ করবে। যেভাবে পৃথিবী অন্যায়- অবিচার- অত্যাচার দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে ভরে দেবেন ।[৩৪১]

যদি তিনি অবির্ভূত না হন তাহলে তাঁর গর্দানই কেটে ফেলা হবে। ইমাম (আ.) এর উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবির্ভাবের অল্প কিছুকাল আগে শত্রু পক্ষীয় নিরাপত্তা ও গোয়ে া নেটওয়ার্ক প্রকৃত ঘটনা যা ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারবে এবং ইমাম মাহদী (আ.) এর পরিকল্পনা এমনভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে যে, যদি তিনি আবির্ভুত না হন তাহলে তাঁকে হত্যা করার হুমকী দেয়া হবে।

ইব্রাহীম জারীরী নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। যিনি বলেছেন : নাফসে যাকিয়াহ্ মহানবী (সা.) এর আহলুল বাইতের অন্তর্ভূক্ত। তার নাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (আ.)। তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে। আর যখন তাকে হত্যা করা হবে তখন আকাশ ও পৃথিবীতে তাদের আর কোন অজুহাতই আর বিদ্যমান থাকবেনা। এ সময়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশধারার কায়েমকে মহান আল্লাহ্ একদল লোকের মাঝে আবির্ভূত করবেন। তারা জনগণের দৃষ্টিতে চোখের সুরমার চেয়েও অধিকতর কঠিন অর্থাৎ স্বল্প হবে। যখন তারা আবির্ভূত হবেন তখন জনতা তাদের জন্য অশ্রুপাত করবে। কারণ তারা ভাববে যে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে। তবে মহান আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উন্মুক্ত করে দেবেন। তাই তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে তারাই হচ্ছে প্রকৃত মু'মিন এবং তোমাদের আরও জানা থাকা দরকার যে, সর্বোত্তম জিহাদ আখেরী যামানায় হবে।[৩৪২]

এ রেওয়ায়ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) শুরুতে অল্প কয়েকজন সঙ্গীসহ আবির্ভূত হবেন। জনগণ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে এবং আশংকা করবে যে, তাঁরা দ্রুত ব ী ও নিহত হবে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত : নিশ্চয়ই কায়েম যি তূওয়া পাহাড়ের পথ ধরে বদর যুদ্ধের মুজাহিদদের সংখ্যা অনুরুপ সংখ্যক অর্থাৎ ৩১৩ জন সাথীসহ আসবেন। অতঃপর তিনি হজরে আসওয়াদের ওপর দাঁড়াবেন এবং মহানবী (সা.) এর পতাকা উত্তোলন করবেন।

আলী ইবনে হামযাহ বলেনঃ এ বিষয়টা আমি আবুল হাসান মূসা ইবনে জাফর (আ.) এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ''এবং একটি লিখিত খোলা পত্র''।[৩৪৩]

এ রেওয়ায়েতের অর্থ এটি নয় যে, ইমাম মাহদী (আ.) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার আগে যি তূওয়া থেকে নিজ সঙ্গীদের সাথে নিয়ে তাঁর আবির্ভাবের ঘোষণা দেবেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে যে, পবিত্র মক্কা নগরীতে তাদের আগমন যি তূওয়ার পথ ধরে হবে অথবা মসজিদুল হারামের দিকে তাদের অগ্রযাত্রা ও এগিয়ে যাওয়ার সূচনা সেখান থেকেই হবে। আর উত্তোলিত পতাকাটি হবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এরই পতাকা, রেওয়ায়েত সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা হযরত মাহদী(আ.) এর সাথে থাকবে এবং জঙ্গে জামালের পর থেকে ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক উত্তোলন করা পর্যন্ত তা আর উত্তোলন করা হয় নি।

আর ইমাম কাযিম (আ.) এর উক্তি 'এবং একটি লিখিত খোলা পত্র', যা রেওয়ায়েতটির পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ইমাম মাহদী (আ.) জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা একটি খোলা পত্র বের করবেন এবং সম্ভবতঃ লিখিত পত্রটি উক্ত প্রসিদ্ধ অঙ্গীকার পত্র হবে, যা মহানবী (সা.) এর মুখনিঃসৃত বাণী এবং হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) এর হস্তাক্ষরে লিখিত। আর ঠিক এভাবেই একই উৎসে বিদ্যমান রেওয়ায়েতটিও এ দিকেই ঈঙ্গিত প্রদান করে।

রেওয়ায়েত সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে মহানবী (সা.) এর জীবন এবং সকল নবীরর সীরাত উত্তরাধিকার সমূহ বিদ্যমান থাকবে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন : মাহদী (আ.) যী তূওয়া পর্বতের দূর্গম সরু (গিরি) পথ দিয়ে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যার অনুরূপ ৩১৩ ব্যক্তিসহ মক্কায় অবতরণ করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন এবং মাকাম- ই ইব্রাহীমে চার রাকাত নামায পড়ে হজরে

আসওয়াদে হেলান দিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা, স্তুতি ও গুণকীর্তন করার পর মহানবী (সা.) নাম স্বরণ করে তাঁর (সা.) ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করবেন। অতঃপর তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে এমন ভাষণ দেবেন যা কেউ কোন দিন বলে নি। প্রথম যাঁরা তার হাতে বাইআত করবে তারা হবে জিব্রাঈল ও মীকরাঈল।[৩৪৪]

তবে রেওয়ায়েত সমূহে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর দু'টি ভাষণ যার প্রথমটি তিনি মক্কা বাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদান করবেন এবং দ্বিতীয়টি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রদান করবেন। তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ৯৫ পৃষ্ঠায় আবু জাফর (ইমাম বাকির) (আ.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি (সা.) বলেন : অতঃপর মাহদী (আ.) এশার ওয়াক্তে আবির্ভূত হবেন। তাঁর সাথে থাকবে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর পতাকা, পোষাক ও তরবারিসহ বেশ কিছু নিদর্শন, আলোও বিবৃতি । এশার নামায পড়ার পর সে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করবে : হে লোকসকল আমি তোমাদের মহান আল্লাহর কথা এবং তোমরা যে তোমাদের প্রভূর সামনে উপনিত ও দণ্ডায়মান তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তিনি তার ঐশি দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তার সাথে কোন কিছু শরীক না করতে, তাঁর ও তাঁর রাসুলের অনুগত্যের ওপর অটল থাকতে। পবিত্র কোরআন যা প্রচলন করেছে তা প্রচলন এবং যা বিলুপ্ত ও উচ্ছেদ করেছে তা বিলুপ্ত ও উচ্ছেদ করতে, হিদায়েতের ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা এবং তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করতে তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। অতঃপএর এ পার্থিব জগতের ধ্বংস ও বিলুপ্তি আসন্ন হয়ে গেছে এবং তা বিদায় নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তাই আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে, ঐশীগ্রন্থ কোরআন অনুযায়ী আমল করতে, মিথ্যা- বাতিলের বিলোপ সাধন এবং মহান আল্লাহর বিধিবিধান পুনরুজ্জীবিত করতে আহবান জানাচ্ছি।'' অতঃপর তিনি বদর যুদ্ধের যোদ্ধাদের সংখ্যক অনুরূপ অর্থাৎ ৩১৩ জন সঙ্গীসহ পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ছাড়াই আবির্ভূত হবেন। উল্লেখ্য যে তার সঙ্গীগণ শরৎকালীন ইতস্তুতঃ

বিক্ষিপ্ত মেঘমালার ন্যায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। তারা হবে রাতের বেলা দুনিয়া ত্যাগী সাধক পুরুষ এবং দিনের বেলা সিংহ পুরুষ বীর। মহান আল্লাহ্ মাহদীর জন্য হিজাজ ভূখণ্ড বিজিত করে দেবেন এবং সেদেশে বনী হাশিমের যারাই কারাগারে ব ী থাকবে তাদেরকে তিনি মুক্ত করবেন। তখন কালো পতাকাসমূহ কূফায় অবতরণ করবে এবং ইমাম মাহদী (আ.) এর কাছে বাইআত করার জন্য তারা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করবে। তিনি সকল অন্যায় ও অত্যাচারের অবসান ঘটাবেন এবং অত্যাচারীদেরকে ধ্বংস করবেন। পরিশেষে বিশ্বের সকল দেশে তাঁর মাধ্যমে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

হাদীসটিতে বর্ণিত قزع الخريف শরৎ কালের মেঘমালা যা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তবস্থায় আকাশে ভেসে বেড়ায় ও অতঃপর তা একত্রিত হয়। তবে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইমাম মাহদী (আ.) এর সাহাবাদের একত্রিত হওয়ার বিষয়কে শরৎকালীন আকাশে ইতস্ততঃ ভাসমান ও বিক্ষিপ্ত মেঘমালার সাথে তুলনা করেছেন তিনি হচ্ছেন ইমাম আমীরুল মু'মিনীন আলী (আ.)।

একইভাবে নাহজুল বালাগাহর ১৬৬ নং ভাষণে এবং সম্ভবত তিনি তা মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকবেন।

আর ইতোমধ্যে আমরা যেমন ঈঙ্গিত করেছি তদানুযায়ী পবিত্র মক্কা নগরীতে শরৎকাল অথবা গ্রীষ্মের শেষে ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হওয়া এবং তা সঙ্গী- সাথীদের সমবেত ও একত্রিত হবার সম্ভাবনা আছে।

আবু খালিদ আল- কাবুলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ইমাম আবু জাফর (ইমাম বাকির) বলেছেন : মহান আল্লাহর শপথ আমি যেন অবশ্যই কায়েমের দিকে তাকিয়ে আছি। সে হাজরে আসওয়াদের ওপর পিঠ ঠেকিয়ে আছেন। এর পর সে নিজ অধিকারের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নাম শপথ করে বলছেন : হে লোক সকল, যে কেউই আমার ব্যাপারে তর্ক- বিতর্ক করবে সে যেন জেনে রাখে যে আমি মহান আল্লাহর কাছে সকল লোক অপেক্ষা সবচেয়ে যোগ্য ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হে লোক সকল, যে কেউ আদম (আ.) এর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক- বিতর্ক করবে তাহলে আমি আদম (আ.) এর ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। হে লোক সকল, যে কেউ

নূহ (আ.) এর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক- বিতর্ক করবে তাহলে আমি নূহ (আ.) এর ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। হে লোক সকল, যে কেউ ইব্রাহীম (আ.) এর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক- বিতর্ক করবে তাহলে আমি ইব্রাহীম (আ.) এর ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। হে লোক সকল, যে কেউ মূসা (আ.) এর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক- বিতর্ক করবে তাহলে আমি মূসা (আ.) এর ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। হে লোক সকল, যে কেউ ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক- বিতর্ক করবে তাহলে আমি ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। হে লোক সকল, যে কেউ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক- বিতর্ক করবে তাহলে আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে সবচেয়ে যোগ্য ও নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তি। হে লোক সকল, যে কেউ মহান আল্লাহর ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নিয়ে আমার সাথে তর্ক- বিতর্ক করবে তাহলে আমি মহান আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ এ ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে আমি সবচেয়ে জ্ঞাত ও জ্ঞানী)। এরপর সে মাকাম- ই ইব্রাহীমে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বে।[৩৪৫]

কতিপয় রেওয়ায়েতে কিছু কিছু বাড়তি বিষয় বা বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে যেমন নি াক্ত রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা হল। তিনি (ইমাম মাহদী) বলবেন : হে লোক সকল, নিশ্চয়ই আমরা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাই লোকদের মধ্য থেকে কে আমাদের আহবানে সাড়া দেবে? আমি তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আহলে বাইতভূক্ত। আর আমরাই মহানবীর (সা.) কাছে সকল মানুষ অপেক্ষা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও নিকটবর্তী। আমি আদম (আ.) এর উত্তরসূরী ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত। আমি নূহ (আ.) এর সঞ্চিত সম্পদের ভান্ডার, ইব্রাহীমের বংশধারা থেকে মনোনীত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আহলে বাইতেরও মনোনীত (ব্যক্তি)। যে কোন ব্যক্তি আমার সাথে রসূলুল্লাহর (সা.) এর সুন্নাহ নিয়ে তর্ক- বিতর্ক করবে তাহলে আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাহর ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞানী (অর্থাৎ সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত)। অতঃপর মহান আল্লাহ তার চারপাশে তার সঙ্গী- সাথীদেরকে একত্রিত করে দেবেন যাদের সংখ্যা হবে ৩১৩জন। আর তিনি তাদেরকে পূর্বহতে নির্ধারণ করা

ছাড়াই একত্রিত করে দেবেন। তাঁরা রুকন ও মাকাম- ই ইব্রাহীমের মাঝখানে তার হাতে বাইআত করবে। আর তাঁর সাথে রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছ থেকে একটি প্রতীজ্ঞা পত্র থাকবে যা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছে বিদ্যমান।[৩৪৬]

কিছু কিছু রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) এর একজন সাহাবা সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামে দাড়িয়ে জনতার সামনে তাঁকে (সা.) পরিচিতি করাবে এবং তাদেরকে তাঁর কথা শোনার এবং তাঁর প্রতি সাড়া দান করার আহবান জানাবে। এরপর তিনি দাঁড়াবেন এবং বক্তৃতা দেবেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন, ‘‘অতঃপর তাঁর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে জনতাকে সম্বোধন করে বলবে : হে লোক সকল, এ ব্যক্তি তোমাদের কাঙ্ক্ষিত যিনি তোমাদের কাছে এসেছেন। তিনি তোমাদেরকে ঐ বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন যে, বিষয়ের দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদেরকে আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেনঃ অতঃপর তারা সবাই দাঁড়াবে আর তিনি নিজেও দাঁড়িয়ে বলবেন, ‘‘হে জনতা, আমি অমুকের পুত্র অমুক রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বংশধর। মহানবী (সা.) তোমাদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহবান জানিয়েছেন আমিও তোমাদেরকে সে একই বিষয়ের দিকে আহবান করছি। অতঃপর তাঁকে হত্যা করার জন্য লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু তিন শতাধিক ব্যক্তি ইমাম মাহদী (আ.) এর বিশেষ সঙ্গী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ও হত্যাকারীদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।[৩৪৭]

‘‘তাঁর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি’’ এ বাক্যাংশের অর্থ তাঁর রক্ত সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি। আর অতঃপর তারা সবাই দাঁড়াবে এ বাক্যটির অর্থ : অতঃপর তারা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে দেখার জন্য দাঁড়াবে যাঁর কথা জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত হবে এবং জনগণও যাঁর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষামাণ থাকবে।

অতঃপর তারা সবাই দাঁড়াবে’ এ কথার অর্থ এটি হবার সম্ভাবনা আছে যে, হিজায প্রশাসন ও সরকারের ভয়ে তারা সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য উঠে দাড়াবে। আর যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য দাঁড়াবে তারা অবশ্যই হিজায সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হবে।

এ রেওয়ায়েতটিতে ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রতি মুসলমানদের অধীর আগ্রহ, তাঁকে তাদের সন্ধান এবং একই সময় ইমাম মাহদী (আ.) এর শত্রুপক্ষ কর্তৃক ধর পাকড় এবং তাদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতায় তাদের ভীত সন্ত্রস্ত থাকার একটি সুক্ষ্ম চিত্র অংকিত হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে ইমামের বিশেষ সঙ্গীরা (তিনশ' তের জন) যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঐ ধরণের ভয়ঙ্কর শ্বাসরূদ্ধকর পরিবেশের থেকে হারাম শরীফ ও পবিত্র মক্কানগরীকে মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট হবেন তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। আর ''আমি মাহদীর প্রেরিত দূত- এ কথা বলার অপরাধে এবং ইমাম মাহদী (আ.) এর বাণীর কিছু অংশ পাঠ করার কারণে নাফসে যাকীয়াহ্ কে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা থেকে হিজায বিশেষকরে পবিত্র মক্কায় বিরাজমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়। নিঃস হে মহান আল্লাহ ইমাম মাহদী (আ.) কে যে সব গায়েবী (আধ্যা ক) উপায়- উপকরণ প্রদান করবেন যেগুলো ছাড়াও তার জন্য প্রকৃতিক উপকরণসমূহও প্রস্তুত করবেন । যারফলে তার বক্তৃতা অনুষ্ঠান যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হবে । এরপর তার সঙ্গীরা প্রথমে হারাম শরীফের ওপর এবং এর পর সমগ্র মক্কার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে । আর এটি তাঁর শতশত অথবা হাজার হাজার ইয়েমেনী, হিজাযী ও ইরানী সঙ্গী, যারা রেওয়ায়েতসমূহ মোতাবেক ইমাম মাহদী (আ.) এর হাতে বাইআত করবে তাদের হাতে সম্পন্ন হবে। আর এরাই হবে তাঁর জন ও সেনাশক্তি যারা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর পবিত্র আ োলন ও বিপ্লব বিজয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে এবং তারা পবিত্র মক্কানগরীর সার্বিক বিষয় ও নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে। তারা ইমাম (আ.) এর প্রতি গণ সমর্থনকে একটি পূর্ণতা প্রাপ্ত বিপ্লবে রূপান্তরিত করবে। আর একইভাবে, ইমামের তিনশ 'তের জন বিশেষ সঙ্গী তাঁর নিয়োজিত অধিনায়ক হিসেবে ইমামের সমর্থকদের কর্মতৎপরতাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ভূমিকা পালন করবেন।

এ কথার অর্থ এই নয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর বিপ্লব ও আ োলন হবে একটি রক্তাত্ত বিপ্লব । কারণ মসজিদুল হারাম এবং এমনকি পবিত্র মক্কা নগরীতে কোন সংঘর্ষ বা রক্তপাত সংঘটিত হওয়ার রেওয়ায়েত সমূহে উল্লিখিত হয় নি। আমি (গ্রন্থকার) একজন আলেমের

কাছে শুনেছি যে, ইমাম মাহদী (আ.) এর সঙ্গীরা মসজিদুল হারামের জামায়াতের নামাযে ইমামকে ঐ রাতে (৯ মুহররম) হত্যা করবে। তবে এ প্রসঙ্গে কোন রেওয়ায়েত আমার হস্তগত হয় নি। কিন্তু সর্বশেষ যে বিষয়টা আমার হস্তগত হয়েছে তা ছিল 'ইলযামুন' নামের গ্রন্থের রচয়িতা কর্তৃক ঐ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠায় একজন আলেমের উদ্ধৃতি । তিনি বলেছেন : ''হুজ্জাত অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.) ১০ মুহররম আ প্রকাশ করবেন এবং আটটি চিকন রোগা (বাছুর) সামনে চালিয়ে নিয়ে তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সেখানকার খতীবকে হত্যা করবেন। খতীব নিহত হলে তিনি জনগণের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন। আর যখন শনিবার রাত চলে আসবে তখন তিনি কাবার ছাদের ওপর উঠে তাঁর ৩১৩ জন সঙ্গীকে ডাকবেন। তারা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এসে তাঁর চারপাশে জড় হবেন এবং তিনি শনিবার দিবসের প্রভাতে জনগণকে তাঁর হতে বাইআত করার আহবান জানাবেন।''

কিন্তু এ উক্তিটি প্রথমতঃ হাদীস (রেওয়ায়েত) নয়। এছাড়াও এর মূল পাঠ যার কিছু অংশের প্রতি এখানে ঈঙ্গিত করেছি তা দূর্বল (যাঈফ)। আর এ কারণেই আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত হচ্ছে এই যে, গায়েবী খোদায়ী সাহায্য, শত্রুদের অন্তরে ভয়- ভীতির উদ্রেক এবং ইমাম মাহদীর অনুসন্ধানকারী ও তাঁর আবির্ভাবের প্রত্যাশী গণজোয়ারের অস্তিত্বের কারণে তাঁর আবির্ভাবের আ ালন হবে রক্তপাতহীন আ ালন অর্থাৎ এতে কোন রক্তপাত সংঘটিত হবে না। এ ছাড়াও হারাম শরীফ এবং মক্কার প্রশাসনিক কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহের ওপর রক্তপাত ছাড়াই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দক্ষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা প্রয়োগ করার কারণে সেখানে রক্তপাত হবে না। মসজিদুল হারাম এবং মক্কা নগরীর সম্মান রক্ষা করার জন্য সেখানে রক্তপাত না করা ইমামের বিশেষ লক্ষ্য হতে পারে।

ঐ পবিত্র রাতে পবিত্র মক্কা নগরী মুক্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস নিবে। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) এর বিজয় কেতন এ নগরীতে উড়তে থাকবে এবং এর আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে। শত্রুরা এবং তাদের আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম ইমাম মাহদী (আ.) এর আ ালনের সাফল্যের সংবাদ চেপে যাওয়া অথবা বিলম্বে তা প্রচার করার চেষ্টা করবে অথবা যেহেতু ইতোমধ্যে কতিপয় চরমপন্থী

পবিত্র মক্কা ও অন্যান্য স্থানে মাহদী হওয়ার মিথ্যা দাবী করবে সেহেতু তারা দেখাতে চাইবে যে এটি হচ্ছে ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীকারী এক চরমপন্থীর আন্দোলন।

শত্রুরা মক্কার ভিতরে তাদের চরদেরকে এ আন্দোলনের নেতা এবং তার শক্তি- সামর্থ্য ও দূর্বল দিকগুলোর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নিয়োগ করবে। তারা এতৎসংক্রান্ত তথ্যাবলী সুফিয়ানী বাহিনীর কাছে অর্পন করার জন্য আদিষ্ট থাকবে যাতে করে যতদ্রুত সম্ভব ইমাম মাহদী (আ.) বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

তার আবির্ভাবের পরের দিন অর্থাৎ আশুরার দিবস যা হবে কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী শনিবার সেদিন ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর আন্দোলন যে বিশ্বজনীন তা প্রমাণের লক্ষ্যে মুসলিম জাতি ও সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সব ভাষায় ভাষণ দিবেন। তিনি তাঁর ভাষণে কাফির ও জালিমদের বিরুদ্ধে তাদের কাছে সাহায্য চাইবেন।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কায়েম শনিবার অর্থাৎ আশুরার দিনে অর্থাৎ যে দিনে ইমাম হুসাইন (আ.) শহীদ হয়েছিলেন সে দিনে আবির্ভূত হবেন।[৩৪৮]

ইমাম মাহদী (আ.) যে শুক্রবার এশার নামাযের পর আবির্ভূত হবেন এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েতটি ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর এ রেওয়ায়েতদ্বয়ের মধ্যে আমরা এভাবে সমন্বয় করেছি যে, ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব দুপর্যায়ে সংঘটিত হবে। শনিবার অর্থাৎ আশুরার দিবসে বিশ্বব্যাপী আর আবির্ভাবের ঘোষণা দেয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে আশুরার রাতে (১০ মুহররমের রাতে) তিনি পবিত্র হারাম শরীফ ও মক্কা নগরীর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন।

আর নিঃসন্দেহে এঘটনা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হবে এবং মুসলিম জাতি সমূহের মাঝে এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। বিশেষ করে যখন ইমাম মাহদী (আ.) মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.) এর প্রতিশ্রুতি মুজিযা অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে বলে অবহিত করবেন এবং তাঁর আন্দোলন দমন ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য

মক্কাভিমুখে অগ্রসরমান সিরীয় সুফিয়ানী বাহিনী মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস হবে।

যেসব রেওয়ায়েতে তার অবস্থান কাল এবং সেখানে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সংখ্যায় অল্প। তন্মধ্যে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : মহান আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন তিনি পবিত্র মক্কায় অবস্থান করবেন ।[৩৪৯]

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত বর্ণিত হয়েছে : ইমাম মাহ্দী (আ.) পবিত্র কাবা শরীফের দস্যুদের ওপর শরীয়তের দণ্ড বিধি (হদ্দ) জারী করবেন। 'পবিত্র কাবা শরীফের দস্যুরা' বলতে ইমাম মাহ্দীর আগে হিজাযের শাসকদেরকেও বোঝানো হতে পারে। নিঃসন্দেহে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে মুসলিম জাতিসমূহের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান এবং তার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নীতি অবস্থানের ঘোষণা দান।

রেওয়ায়েতসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী, ভূমিধ্বসের মাধ্যমে সুফিয়ানী বাহিনীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুজিযা সংঘটিত হবার পরপরই তিনি পবিত্র মক্কা থেকে বের হবেন। সম্ভবত এ সেনাবাহিনী ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আন্দোলন স্পষ্ট প্রকাশিত হবার পরপরই তা দমন করার জন্য দ্রুত মক্কাভিমুখে প্রেরিত হবে এবং পবিত্র মক্কায় পৌঁছানোর আগেই মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ভূ- গর্ভে প্রোথিত করে ধ্বংস করবেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কুফরী শক্তিসমূহের নেতৃবর্গ ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আন্দোলনের সাফল্য ও বিজয়ের বিপক্ষে নিজেদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। তারা এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে যাবে যে তারা নিজেদের স্নায়ুবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।

ইমাম জাফর আস সাদিক (আ.) এ প্রসংগে বলেছেন : ''যখন সত্যের পতাকা প্রকাশিত হবে তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা একে অভিশাপ দিতে থাকবে।'' আমি (বর্ণনাকারী) তখন ইমামকে জিজ্ঞেস করলাম, ''কেন?'' তখন তিনি বললেন, ''বনী হাশিমের কাছ থেকে তারা যা পেয়েছে সেজন্য।''[৩৫০]

এ রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম মাহদী (আ.) এর আগে তাঁর আবির্ভাবের ক্ষেত্রপ্রস্তুতকারী আন্দোলন সমূহ প্রধানতঃ বনী হাশিমের সাইয়্যেদদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং আন্তর্জাতিক কুফরীচক্র এ আন্দোলনগুলোর দ্বারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইমাম মক্কার জন্য একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দশ হাজার বা ততোধিক সৈন্য নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। ইমাম বাকির (আ.) বলেন : পবিত্র মক্কানগরীতে পবিত্র কোরআন ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের ভিত্তিতে কায়েমের হাতে বাইআত করা হবে। আর ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে পবিত্র মক্কা নগরীতে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন। এরপর তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন এবং পথিমধ্যে তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছবে যে তাঁর প্রতিনিধিকে হত্যা করা হয়েছে। ইমাম মাহদী (আ.) পবিত্র মক্কা নগরীতে ফিরে আসবেন এবং কেবল তার প্রতিনিধির হত্যাকারী অথবা হত্যাকারীদেরকে হত্যা করবেন।[৩৫১]

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ”তিনি মক্কাবাসীদেরকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশসহ সত্যের দিকে আহবান জানাবেন এবং তারাও তাঁর আনুগত্য করবে। তখন তিনি তাঁর বংশধরদের থেকে এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করে পবিত্র মদীনা নগরীর দিকে রওয়ানা হবেন। ইমাম যখনই পবিত্র মক্কানগরী ত্যাগ করবেন ঠিক তখনই তাঁর প্রতিনিধির ওপর আক্রমণ চালানো হবে। আর এ কারণেই ইমাম তাদের কাছে ফিরে আসবেন। তারা মাথা অবনত করে কাঁদতে কাঁদতে ইমামের কাছে এসে বলতে থাকবেঃ ‘‘হে মুহাম্মদ (সা.) এর বংশোদ্ভূত মাহদী, আমাদের কৃতকর্মের জন্য আমরা অনুশোচনা প্রকাশ করছি এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।’’ আর তখন ইমাম তাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে তাদের ধ্বংসা ক কার্যকলপের জন্য তাদেরকে সতর্ক করে দেবেন এবং তাদের মধ্য থেকে আরেক ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পুনরায় পবিত্র মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাবেন।[৩৫২]

অবশ্য পবিত্র মক্কায় ইমাম মাহদী (আ.) এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার মত কোন আন্দোলন বা বিদ্রোহের অস্তিত্বের ঈঙ্গিত এ রেওয়ায়েতে বিদ্যমান নেই। আর প্রথম রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা

হয়েছে যে, তিনি হত্যাকারীদেরকে হত্যা করবেন। এতে 'হত্যাকারীদের' বলতে ঐসব ব্যক্তিদের বোঝানো হতে পারে যারা পবিত্র মক্কায় নিযুক্ত তাঁর প্রতিনিধিকে হত্যা করবে।

পবিত্র মদীনাভিমুখে যাওয়ার পথে তিনি সুফিয়ানী বাহিনীর ভূমিধ্বসে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার স্থান অতিক্রম করবেন।

আইয়াশীর তাফসীরে একটি রেওয়ায়েতে হযরত ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ তাঁদের (রাসূলের বংশধারা) থেকে এক ব্যক্তি (মাহদী) যখন তিনশ'র বেশী সঙ্গী এবং রসূলুল্লাহর (সা.) পতাকা সাথে নিয়ে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হবেন তখন তিনি বলবেন, ''এটি ঐ সম্প্রদায়ের স্থান যাদেরকে সেখানে মহান আল্লাহ ভূ- গর্ভে প্রোথিত করেছেন।'' আর এটি হচ্ছে সেই আয়াতের ব্যাখ্যা যাতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

''যারা খারাপ কর্মের দ্বারা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছিল তারা কি মহান আল্লাহ কর্তৃক ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস হওয়া অথবা সে স্থান থেকে তারা বুঝতেও পারবেনা সেখান থেকে তাদের কাছে শাস্তি আসা হতে নিরাপদ হয়েছে? আর তারা তো তা (শাস্তি) ব্যর্থ করতে পারবেনা।[৩৫৩]

মদীনা শরীফ ও হিজায মুক্ত করন

রেওয়ায়েত সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) পবিত্র মক্কার অবস্থার (বিনাযুদ্ধে জয়) সম্পূর্ণ বিপরীতে পবিত্র মদীনায় এক বা একাধিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

একটি দীর্ঘ হাদীসে ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : যখন তিনি পবিত্র মদীনা নগরীতে প্রবেশ করবেন তখন কুরাইশগণ তাদের কাছে থেকে আ গোপন করবে। আর তাদের ব্যাপারে এটি হচ্ছে আলী ইবনে আবী তালিবের (আ.) উক্তি : মহান আল্লাহর শপথ কুরাইশগণ আশা করবে যে, আমি এমনকি একটি মাদী উট কোরবানী বা জবাই করতে যে পরিমাণ সময় লাগে ততটুকু সময়ও তাদের কাছে তাদের যাবতীয় সহায়- সম্পত্তি এবং যা কিছুর ওপর সূর্যালোক পতিত হয়েছে সেগুলোর বিনিময়ে হলেও থাকতাম।'' অতঃপর ইমাম মাহদী (আ.) এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এমন এক অবস্থার উদ্ভব ঘটাবেন যে কুরাইশগণ তখন বলবে যে আমাদেরকে

এ সীমালংঘনকারীর কাছে নিয়ে যাও। মহান আল্লাহর শপথ , সে যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আলী (আ.) এবং হযরত ফাতেমা (আ.) বংশধর হত তাহলে সে এ ধরনের কাছে হাত দিত না।'' তখন মহান আল্লাহ্ কুরাইশদেরকে হযরত মাহদীর কাছে আ সমর্পণ করাবেন (করতে বাধ্য করবেন।)। আর তিনি হত্যাকারীদেরকে হত্যা করবেন এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে ব ী করবেন। এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে শাকরাহ্ নামক এলাকায় অবতরণ করবেন। (শাকরাহ্ : ইরান ও ইরাকের দিক থেকে হিজাযের একটি এলাকার নাম) সেখানে তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছবে যে তাঁর প্রতিনিধিকে হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং এতটা হত্যাকান্ড চালাবেন যে হাররাহ দিবসের হত্যাকাণ্ডও তাদের কাছে অতিনগণ্য ও তুচ্ছ গণ্য হবে। ... অতঃপর তিনি জনগণকে মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাতের দিকে আহবান জানাবেন।[৩৫৪]

এ রেওয়ায়েতে মদীনায় দু'টি যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। যে ঘটনা ইমাম মাহদী (আ.) এর হাতে সংঘটিত হবে এবং কুরাইশ ও অন্যান্যরা যার জন্য তাঁকে তিরস্কার ও নি া করবে তার পরপরই প্রথম যুদ্ধ বেঁধে যাবে আর মনে হচ্ছে যে ঐ ঘটনাটা, মসজিদে নববী ও মহানবীর (সা.) পবিত্র কবর ধ্বংস করে পুনঃনির্মাণ করার সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। আর কতিপয় রেওয়ায়েত ও এতদর্থেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মাহদী (আ.) এর শত্রুরা এ ঘটনাকে তাঁর বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহ্ ও উত্তেজিত করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করবে। হযরত মাহদী (আ.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন এবং অন্য একটি রেওয়ায়েতানুসারে তাদের শতশত ব্যক্তিকে হত্যা করবেন। আর তখনই কুরাইশগণ অর্থাৎ কুরাইশ গোত্র ও শাখা সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আশা করতে থাকবে যে, হায় যদি আমীরুল মু'মিনীন আলী (আ.) তাদের মাঝে এমনকি একটি মাদী উট জবাই করা পরিমাণ সময়ও উপস্থিত থাকতেন তাহলে তিনি তাদেরকে ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কারণ, তাদের ব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীন আলী (আ.) ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন এবং তাদেরকে ক্ষমা করতেন।

তবে দ্বিতীয় যুদ্ধটি মদীনাবাসীদের এ প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা ও বিদ্রোহের অবসান এবং ইমাম মাহদীর পক্ষ থেকে মদীনা নগরীর জন্য একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করার পর ইরাক ও ইরানের দিকে তাঁর যাত্রা করে শা য়াহ্ অথবা শাক্কারাত অঞ্চলে অবতরণ করার পরপর সংঘটিত হবে। এই শাকারাহ্ অঞ্চল খুব সম্ভবতঃ ইমাম মাহদী (আ.) এর সেনাবাহিনীর শিবির হবে। মদীনাবাসীরা ইমামের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আবারও বিদ্রোহ করে ইমামের নিযুক্ত প্রতিনিধিকে হত্যা করবে। সংবাদ পেয়ে ইমাম মাহদী (আ.) সেখানে ফিরে আসবেন এবং হাররাহর প্রসিদ্ধ ঘটনায় উমাইয়্যা সেনাবাহিনী কর্তৃক যে পরিমাণ হত্যা করা হয়েছিল তার চেয়েও বেশী মদীনাবাসীদেরকে হত্যা করবেন। পুনরায় তিনি মদীনা নগরীকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন নিয়ে আসবেন। ইতিহাসে হাররাহর ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা ৭০০ এর বেশী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইমাম হুসাইন (আ.) এর শাহাদতের পর মদীনাবাসীগণ ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদের বিদ্রোহ ছিল যথার্থ ও শরিয়ত সম্মত। কিন্তু মদীনাবাসীদের এ বিদ্রোহটা হবে ইমাম মাহদী (আ.) এর বিরুদ্ধে ও শরীয়ত বিরুদ্ধ। আর মদীনাবাসীদের সাথে ইমাম মাহদী (আ.) এর সেনাবাহিনীর আচরণের মধ্যেকার তুলনার দিক হল কেবল নিহতদের সংখ্যার পরিমাণ।

‘ইয়াওমুল খালাস’ গ্রন্থের রচয়িতা উক্ত গ্রন্থের ২৬৫ পৃষ্ঠায় তফসীরে আইয়াশীর পূর্বোক্ত হাদীসটির কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) মদীনায় প্রবেশ কালে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন ... অথচ পাঠকরা লক্ষ্য করতে পারছেন যে এ রেওয়ায়েতে মদীনায় ইমাম মাহদীর প্রবেশ করার পর দুটো যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ইয়াওমুল খালাস গ্রন্থের রেওয়ায়েতসমূহকে উৎসের দিক থেকে সুক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ উক্ত গ্রন্থের লেখক রেওয়ায়েত সমূহকে খণ্ড খণ্ড করে একটি রেওয়ায়েতের অংশ বিশেষকে অন্য রেওয়ায়েতের সাথে যুক্ত করেছেন এবং এরপর তিনি উক্ত সংযোজিত রেওয়ায়েতকে কোন একটি উৎস্য বা সূত্রের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, ইমাম মাহদী (আ.) যখন তার সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করাবেন তখন হিজায সরকার অথবা সুফিয়ানী বাহিনীর অবশিষ্ট অংশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার কারণে প্রতিরোধের সৃষ্টি হতে পারে। অথবা তাদের মধ্যে একটা যুদ্ধেও বেঁধে যেতে পারে। আর ইমাম মাহদী (আ.) তাদের ওপর বিজয়ী হবেন।

তবে এতদর্থ সম্বলিত কোন রেওয়ায়েত আমি পাই নি। কিন্তু আমি এমন একটা রেওয়ায়েতের সন্ধান পেয়েছি যাতে মদীনাবাসীদের সন্তুষ্টচিত্তে ইমামকে বরণ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করার প্রতি ঈঙ্গিত রয়েছে। যেমনঃ আল- কাফী গ্রন্থে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে একটি দীর্ঘ বিস্তারিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : ''তখন (সুফিয়ানী বাহিনীর মদীনায় প্রবেশ ও দখল করার পর) মদীনায় বসবাসরত হযরত আলীর (আ.) বংশধররা সবাই মক্কায় পালিয়ে গিয়ে এ বিষয়ের অধিপতির (ইমাম মাহদীর) সাথে যোগ দেবে। এ বিষয়ের অধিপতি ইরাক অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং মদীনায় একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন । যার ফলে মদীনাবাসীগণ নিরাপদ হবে এবং তারা সেখানে প্রত্যাবর্তন করবে।''

এ হাদীসের বিষয়বস্তু অনুসারে মদীনার অধিবাসী সুফিয়ানী বাহিনীর পক্ষ থেকে কঠোরতার সম্মুখীন হবে, অতঃপর তারা ঐ বাহিনীর ভূ- গর্ভে প্রোথিত হওয়া ও হিজায সরকারের পতন প্রত্যক্ষ করবে । সম্ভবত সফিয়ানী বিাহিনীর ধ্বংস হওয়ার পরপরই হিজায সরকারের পতন ঘটবে ।তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী ইমাম মাহদীর পক্ষে গণজোয়ারের ধারা লক্ষ্য করে মদীনাবাসী গর্ব বোধ করবে যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই ।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করবেন, এ রেওয়ায়েত ঈঙ্গিত করে যে, ইমাম মাহদী (আ.) ঐ সময় সরাসরি মদীনায় আগমন করবেন না বরং তিনি মদীনাভিমুখে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন।

যাহোক, রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে যে, মহান আল্লাহ্ তার জন্য হিজায বিজিত করে দেবেন। এর অর্থ হবে ক্ষয়িষ্ণু ও দূর্বল হিজায সরকারের অবশিষ্টাংশের পতন এবং সুফিয়ানী বাহিনীর অবশিষ্টাংশের পশ্চাদপসরণ।

আবার পবিত্র মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সুফিয়ানী বাহিনীর ভূমিধ্বসে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরপর হিজায বিজয় হতে পারে এবং তখন হিজায বাসীগণ তাঁর হাতে বাইআত করবে। আর হিজায ইমাম মাহদীর (আ.) শাসনাধীনে আসার পর ইয়ামান, ইরান ও এমনকি ইরাকও (সেখানে তাঁর বিরোধীরা থাকা সত্ত্বেও) তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরকার ও প্রশাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। আর শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, হিজাযের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কারণে অথবা উপসাগরীয় দেশগুলোর জনগণ এবং তাঁর ইরানী ও ইয়েমেনী সাহায্যকারীদের সহায়তায় পারস্যোপসাগরীয় দেশগুলোও তার শাসনকর্তৃত্বে চলে আসবে।

এটিই স্বাভাবিক যে, ইমাম মাহদী (আ.) এর নেতৃত্বে এত বিশাল একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। কারণ বাব আল মা াব ও হরমুজ প্রণালীদ্বয়ের ওপর এ নবরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ফলে এ বিষয়টি তাদের জন্য এক মৌলিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আর এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ সরকারের সাংস্কৃতিক হুমকী এবং এর ইসলামী সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসার যা প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইহুদীদের যাবতীয় ধারণাকে পাল্টে দেবে। ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.) থেকে ইতোমধ্যে বর্ণিত রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর পতাকাকে অর্থাৎ তাঁর বিপ্লব ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে অভিশম্পাত করবে।

আর এ সম্ভাবনাও খুব বেশী যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এ মুক্ত এলাকাসমূহে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোর পর পারস্যোপসাগর ও নিকটবর্তী অন্যান্য সমূদ্রে তাদের রণতরীসমূহ প্রেরণ ও মোতায়েন করবে। তাই তখন সাগর-মহাসাগরসমূহে নৌবহরের সমাবেশ এবং নৌশক্তি ও বিমান বাহিনীর দ্বারা হুমকী প্রদর্শন করা ব্যতীত তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা থাকবে না। সম্ভবত তারাই বসরা ও বাইয়া-ই ইস্তাখরের যুদ্ধের ইন্ধন যোগাবে। আর এ দু'টি যুদ্ধের বিবরণ সামনে দেয়া হবে।

ইরান ও ইরাক অভিমুখে ইমাম মাহদী (আ.)

হিজায থেকে ইমাম মাহদী (আ.) এর অগ্রাভিযান সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে পার্থক্য ও ভিন্নতা বিদ্যমান । আমাদের শিয়া সূত্র ও উৎস্যসমূহে বর্ণিত হাদীসসমূহে সার্বিকভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সরাসরি হিজায থেকে ইরাকের দিকে যাত্রা করবেন। তবে কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পবিত্র মক্কা নগরী থেকেই সরাসরি ইরাকের দিকে যাত্রা করবেন। আর রওয়াতুল কাফী গ্রন্থের পূর্বোল্লেখিত রেওয়ায়েতটি থেকেও এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায় এভাবে যে তিনি পবিত্র মদীনায় একটি সেনাদল প্রেরণ করবেন।

তবে, আহলুস সুন্নাহর সূত্র সমূহে বর্ণিত রেওয়ায়েত সমূহে সার্বিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পবিত্র মক্কানগরী থেকে সরাসরি শাম ও বাইতুল মুকাদ্দেসের দিকে যাবেন। আর সুন্নী সূত্রসমূহে বর্ণিত কিছু কিছু রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে ইরাকে যাবেন এবং তারপর তিনি শাম ও বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হবেন।

তবে ইবনে হাম্মাদের হস্তলিপিতে কেবল দু'একটি রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম তিনি দক্ষিণ ইরানে আসবেন। সেখানে ইরানীরা এবং তাদেরকে নেতা খোরাসনী ও তাঁর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক শুআইব ইবনে সালেহ্ তাঁর হাতে বাইআত করবেন। এরপর তিনি তাদেরকে বসরা অঞ্চলে সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত করবেন। অতঃপর তিনি ইরাকে প্রবেশ করবেন।

তাই রেওয়ায়েত সমূহে যে বিষয়টির ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা হচ্ছে এই যে, তাঁর লক্ষ্যস্থল হবেম বাইতুল মুকাদ্দাস্। আর তিনি এ দুভয়ের মাঝখানে কিছুকাল তার নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারের বিশেষ করে ইরাকের সার্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা এবং আল- কুদস্ অভিমুখে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবেন।

এটাই স্বাভাবিক যে, মহানবী (সা.) নিষ্পাপ ইমামগণ (আ.) সাহাবা এবং তাবেয়ীদের রেওয়ায়েত সমূহের লক্ষ্য ইমাম মাহদী (আ.) এর যাবতীয় পদক্ষেপ এবং অভিযানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করা নয় বরং এমন সব মৌলিক ঘটনা বর্ণনা করাই লক্ষ্য যেগুলো তার আ ালন

ও গৃহীত পরিকল্পনার জন্য ক্ষতিকর হবে না এবং মুসলমানদের অন্তরে আশার আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে। এরপর সেগুলো ঐশী মুজিযা বলেও পরিগণিত হবে যা তাঁর আবির্ভাবকালে মুসলমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়- মজবুত করবে এবং তাঁকে (আ.) সাহায্য করার ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত হচ্ছে এই যে তিনি এ সময় ইসলাম ও আে ালনের স্বার্থে হিজায, ইরান, ইরাক ও ইয়েমেনে যাতায়াত করতে থাকবেন আর তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজন না হলে তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না।

বিশেষ কতকগুলো কারণে আমরা ইমাম মাহদী (আ.) এর দক্ষিণ ইরানে আগমনের বিষয়টি ইরান সংক্রান্ত অধ্যায়ে' প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়েছিলাম। এসব কারণের মধ্যে এ বিষয়টি আছে যে শিয়া- সূন্নী হাদীস সূত্র ও গ্রন্থ সমূহের রেওয়ায়েতসমূহে হিজায মুক্ত করার পর বসরার যুদ্ধের উল্লেখ আছে। আর সেটি হবে একটি বিরাট ও ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ।

এ সব কারণের মধ্যে এ বিষয়টিও আছে যে তাঁর সেনাবাহিনী ও জনবলের বৃহত্তম অংশ বা সিংহভাগই হবে অন্ততঃ পক্ষে ঐ পর্যায়ে ইরানীরা। তাই বসরা ও পারস্যোপসাগরের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য তখনও তার ইরানে আসাই হবে স্বাভাবিক।

ইবনে হাম্মাদ তার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (পৃ. ৮৬) বলেছেন : ''হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) থেকে আবু রুমান, তাঁর থেকে আমাদেরকে ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম ও রুশদ (রাশাদ) ইবনে সা'দ বলেছেন : যখন কূফার দিকে সুফিয়ানীর অশ্বারোহী বাহিনী (সাজোয়া বাহিনী) বের হবে তখন সে খোরাসাবাসীর খোজে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে । আর খোরাসানবাসী মাহদীর সন্ধানে বের হবে । সে তখন হাশেমী এবং কালো পতাকাধারীদের সাক্ষাত পাবে । উল্লেখ্য যে, কালো পতাকাবাহী সেনাদলের নেতৃত্বে থাকবে শুআইব ইবনে সালেহ । সে ইস্তাখরের ফটকের কাছে সুফিয়ানীর সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করবে । তাদের মধ্যে ভয়ংকর যদ্ধ বেধে যাবে । অতঃপর কালো পতাকাবাহী সেনাবাহিনী জয়যুক্ত হবে এবং সুফিয়ানীর সাজোয়া বাহিনী পালিয়ে যাবে । আর তখনই জনগণ মাহদীকে কামনা করবে এবং তার সন্ধান করতে থাকবে ।"

একইভাবে তিনি সাঈদ আবু উসমান সূত্রে ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন । ইমাম বাকির বলেছেন : "সুফিয়ানী কুফা ও বাগদাদে পৌঁছানোর পর সমগ্র বিশ্বে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ ও মোতায়েন করবে । এ সময় মধ্য এশিয়া ও খোরাসানবাসীর পক্ষ থেকে সে হুমকির সন্মুখীন হবে । কারণ, প্রাচ্যবাসী সুফিয়ানী বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ চালাতে থাকবে ।যখন এ সংবাদ সুফিয়ানী বাহিনীর কাছে পৌছবে তখন সে উমাইয়্যা বংশীয় এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি বিশাল সেনাবাহিনী ইস্তাখরের দিকে প্রেরণ করবে এবং কোমেম, দৌলতে রাই এবং মারযে যার অঞ্চলে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে । এ সময় সুফিয়ানী কুফা ও মদীনাবাসীকে ব্যাপকভাবে হত্যা করার আদেশ জারী করবে । এ সময় কালো পতাকাবাহীরা আবির্ভূত হবে যাদের অগ্রভাগে হাতে একটি পতাকা নিয়ে বনি হাশিমের এক যুবক থাকবে । মহান আল্লাহ তার জন্য সকল বিষয় ও কাজ সহজসাধ্য করে দিবেন । খোরাসান সিমান্তে সে একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে । আর রাইয়ের দিকে যাওয়ার পথে সে দাসদের অন্তর্ভূক্ত শুআইব ইবনে সালেহ নামের বনি তামীম গোত্রের এক ব্যক্তিকে ইস্তাখরের দিকে যাত্রা ও সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহবান জানাবে । বাইযা- ই ইস্তাখরে সে (শুআইব), মাহদী ও হাশিমী পরস্পর সাক্ষাৎ করবে । তখন তাদের ও সুফিয়ানীর মধ্যে ব্যপক যুদ্ধ বেধে যাবে । এ যুদ্ধে এতটা রক্তপাত হবে যে, অশ্বসমূহের পায়ের নলি পর্যন্ত রক্তে ভরে যাবে । এ সময় সীস্তানের দিক থেকে বনি উদ্দী গোত্রের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিশাল সেনাদল সেখানে পৌছবে এবং এভাবেই মহান আল্লাহ তার সাথী ও সেনাবাহিনীকে বিজয়ী করবেন । রাই অঞ্চলে দু'টি সংঘর্ষের পর মাদায়েনেও যুদ্ধ হবে এবং আকের কুফেতে সাইলামীয়ার যুদ্ধও সংঘটিত হবে । ঐ সময় তাদের গ্রামগুলোর মধ্য থেকে একটি সম্প্রদায় আখওয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে । তারা এমন সব দল হবে যারা সাধারণভাবে কুফা ও বসরার অধিবাসী হবে । অতঃপর তারা তার হাত থেকে কুফার ব ীদের মুক্ত করবে ।

যদিও একদিকে এ দু'রেওয়ায়েতের সনদ দুর্বল এবং তাতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মধ্যে বিভ্রাট বিদ্যমান, অন্যদিকে যে সব ঘটন ও যুদ্ধ দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কেবল

দুর্বল রেওয়ায়েতসমূহেই দেখতে পাওয়া যায়, এতদসত্ত্বেও বসরার যুদ্ধ যা ইরাক সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে তা এ রেওয়ায়েতেও সমর্থিত হয়েছে। একইভাবে ইমাম মাহদী (আ.) এর বিপ্লব বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ যে সব রেওয়ায়েতে বসরা যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে সমর্থন করে। তবে এ দিক থেকে যে, ইমাম মাহদী ও তার সাথীদের বিপক্ষ শক্তি হবে বাইবেলের অনুসারী পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা এবং ইবনে হাম্মাদের রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে বলা যায় পাশ্চাত্য সেনাশক্তির পক্ষেই সুফিয়ানী বাহিনীর দাড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বসরার ব্যাপারে একটি ভাষণে বলেছেন : "আবুল্লার শহীদদের সংখ্যার অনুরূপ সংখ্যক বসরাবাসী- যাদের বুকে ইঞ্জিল ঝোলানো থাকবে, তারা তার পেছনে যেতে থাকবে।[৩৫৫]

যদি এ রেওয়ায়েত সঠিক এবং এর উদ্দেশ্য বসরা ও পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ হয় যেমনটি ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব সংশ্লিষ্ট ইবনে হাম্মাদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে বিষয়টির গুরুত্ব ও বিরাটত্ব প্রমাণিত হয় এ দৃষ্টিতে যে, পরবর্তিতে সবার কাছে পরিষ্কার হবে শক্তির পাল্লা ইমাম মাহদীর দিকেই ঝুকে রয়েছে। ইবনে হাম্মাদের বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, তখন জনগণ ইমাম মাহদীকে চাইবে ও তাকে পাবার জন্য খুজবে।

একটি রেওয়ায়েত যা আমি মৌলিক কোন গ্রন্থে পাই নি সেই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : ইমাম মাহদী (আ.) আলোর সাত হাওদায় করে ইরাকে প্রবেশ করবেন।

(يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ)

"হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায় যদি তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজ্যসমূহ অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হও তাহলে প্রবেশ করে দেখ তো। তবে তোমরা শক্তি ও ক্ষমতা ব্যতীত সেগুলোয় প্রবেশ করতে পারবে না।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "কায়েম (মাহদী) ভূমিকম্পের দিনে এমনভাবে আলোর সাত হাওদার মাঝে ইরাকে প্রবেশ করবে যে, কুফায় অবতরণ করা পর্যন্ত কেউ বুঝতেই পারবে না মাহদী ঐ সব হাওদার কোনটিতে আছে।"[৩৫৬]

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : তিনি কুফার অদূরে ফারুকে আলোর হাওদাসমূহের মধ্যে অবতরণ করবেন । ইমাম মাহদীর ক্ষেত্রে এ ঘটনা মহান আল্লাহর ঐশী বিষয় বলে গণ্য হতে পারে । আবার তা এক স্কোয়াড্রন বিমান অথবা এতদসদৃশ যান্ত্রিক যান ব্যাবহার করে ইমাম মাহদীর ইরাকে প্রবেশ করার একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে যেগুলোকে রেওয়ায়েতসমূহে 'আলোর হাওদা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে । যা হোক, পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোর সাত হাওদার উল্লেখ ওপরে উল্লিখিত অভিমতকে (বিমান বা এতদসদৃশ যান্ত্রিক যান ব্যবহার) সমর্থন করে ।

ইরাকে ইমাম মাহদী (আ.) পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেসব সংক্রান্ত বহু রেওয়ায়েত বিদ্যমান । আমরা সেগুলোর কয়েকটি 'ইরাক অধ্যায়ে' বর্ণনা করেছি । এখন সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলো অবশিষ্ট আছে সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরব ।

এগুলোর মধ্যে বহু রেওয়ায়েত আছে যেগুলোয় ইমাম মাহদীর হাতে ইরাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিশুদ্ধকরণ এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর নির্মূল হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে । আমরা সেগুলোর অধিকাংশই স্ব- স্ব স্থানে উল্লেখ করেছি ।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইমাম মাহদীর কুফা, নাজাফ ও কারবালায় প্রবেশ, কুফা নগরীকে রাজধানী হিসেবে মনোনীত করা এবং এ নগরীর অদূরে 'বিশ্ব জুমআ মসজিদ' নির্মাণ- রেওয়ায়েতসমূহ অনুযায়ী যা একহাজার দরজাবিশিষ্ট হবে ।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "নিশ্চয় আমাদের কায়েম যখন আবির্ভূত হবে তখন পৃথিবী স্বীয় প্রভুর আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহর বা ারা সূর্যালোকের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে না । তার শাসনামলে পুরুষরা এতটা দীর্ঘায়ু লাভ করবে যে, প্রত্যেক পুরুষের এক হাজার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যাদের মধ্যে কোন কন্যা সন্তান থাকবে না । সে কুফার পশ্চাতে অর্থাৎ নাজাফে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে যা এক হাজার দরজা বিশিষ্ট হবে । কুফার বাড়িগুলো কারবালার নদী ও হিরার সাথে এমনভাবে যুক্ত থাকবে যে, যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবার দিনে দ্রুতগামী চিকন খচ্চরের পিঠে (দ্রুতগামী যানে) সওয়ার হয়ে জুমআর নামায পড়ার জন্য সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয় তবুও সে নামাযে উপস্থিত হতে সক্ষম হবে না।[৩৫৭]

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : যখন দ্বিতীয় জুমআ (শুক্রবার) সমাগত হবে তখন জনগণ বলবে : হে রাসূলুল্লাহর সন্তান ! আপনার পেছনে নামায রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পেছনে নামায পড়ার মতোই । কিন্তু মসজিদে স্থান সংকুলান হচ্ছে না । তখন সে মজবুত ভিত্তিসম্পন্ন একটি মসজিদের নকশা তৈরি করবে যা এক হাজার দরজা বিশিষ্ট হবে । আর জনগণেরও এর ভিতরে স্থান সংকুলান হবে ।”[৩৫৮]

এক হাজার দরজার উল্লেখ হয়তোবা মসজিদটির বিশাল আয়তনবিশিষ্ট হবার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে । আর এ থেকে মণে হয় যে, মসজিদটি জামে মসজিদ হবে যেখানে পৃথিবীর দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ইমাম মাহদীর পেছনে জুমআর নামায পড়ার জন্য আসবে । আর এ মসজিদ হয়তো বিমানব র এবং গাড়ি পার্কিং করার স্থানসমেত কুফা ও কারবালার মধ্যবর্তী পুরো জায়গাই ধারণ করবে যার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় আশি কিলোমিটার ।

রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে ইমাম মাহদী (আ.)- এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে থাকবে পবিত্র কারবালার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে নিজ প্রপিতামহ শহীদের নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সে সাথে কারবালাকে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করা ।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : “মহান আল্লাহ অবশ্যেই কারবালাকে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ও দুর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা হবে ফেরেশতা ও মুমিনদের যাতায়াত করার স্থল এবং কারবালাও তখন এর সর্ব্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হবে ।”[৩৫৯]

এ সব পদক্ষেপের মধ্যে থাকবে ঐ নিদর্শন বা মুজিযা যা কুফার নাজাফে প্রকাশ পাবে । আর তা এভাবে হবে যে, তিনি স্বীয় পিতামহ মহানবী (সা.)- এর বর্ম পরিধান এবং একটি বিশেষ বাহনের ওপর আরোহণ করবেন যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করবে । এর ফলে বিশ্বব্যাপী সব মানুষ তাদের নিজ নিজ দেশ ও স্থান থেকেই তাকে দেখতে পাবে ।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : “আমি যেন কায়েমকে নাজাফে দেখতে পাচ্ছি, সে মহা নবী (সা.)- এর বর্ম পরিধান করেছে এবং ঐ বর্ম তার দেহে ওপর আটসাট হলে সে তা নাড়া দিচ্ছে, ফলে তা ঢিলা হয়ে যাচ্ছে । এরপর সে মোটা সবুজ রেশমী বস্ত্র দ্বারা ঐ বর্ম ঢেকে দিচ্ছে

এবং নিজের সাদাকালো বর্ণের অশ্বের ওপর সওয়ার হয়েছে যার দু'চোখের মাঝ থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে । এরপর সে তার অশ্বকে চালনা করছে । পৃথিবীর ওপর এমন কোন লোক থাকবেনা যার কাছে এ আলোর দ্যুতি পৌছবে না । এটি হবে তাদের জন্য একটি নিদর্শন । অতঃপর সে মহানবী (সা.)- এর পতাকা উত্তোলন করবে । যখনই সে ঐ পতাকা বাতাসে নাড়বে তখন এর আলোয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলোকিত হয়ে যাবে ।[৩৬০]

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন : "আমি যেন তাকে শ্বেত পাবিশিষ্ট ও সুসজ্জিত একটি অশ্বের ওপর সওয়ার অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি যার কপাল থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে । সে ওয়াদীউস সালাম (নাজাফে অবস্থিত) অতিক্রম করে সাহলার নদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় বলছে :

لا اله الا الله حقاً حقاً، لا اله الا الله تعبداً ورقاً اللهم معز كل مؤمن وحيد و مذل كل جبار عنيد، انت كنفى حين تعيينى المذاهب و تضيق على الارض بما رحبت. اللهم خلقتنى و كنت غنياً عن خلقى و لولا نصرك اياى لكنت من المغلوبين. يا منشر الرحمة من مواضعها و مخرج البركات من معادنها و يا من خص نفسه بشموخ الرفعة فأولياؤه بعزه يتعززون، يا من وضعت له الملوک نير المذلة على اعناقهم فهم من سطوته خائفون........الخ

সত্যসত্যই মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই; একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন উপাস্য নেই । হে আল্লাহ যিনি প্রত্যেক নিঃসঙ্গ মুমিনের মর্যাদা দানকরী এবং প্রত্যেক শত্রুভাবাপন্ন অত্যাচারী পরাক্রমশালীকে অপদস্তকারী । যখন ধর্ম, পথ ও মতসমূহ আমাকে বিচ্যুত করতে চায় এবং প্রশস্ত হওয়া সত্বেও পৃথিবী যখন আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন আপনিই আমার রক্ষাকারী । হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অথচ আমাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আপনি মোটেও মুখাপেক্ষী ছিলেন না (আপনি আমাকে সৃষ্টি নাও করতে পারতেন) । হে আল্লাহ যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করতেন তাহলে আমি পরাভূত হয়ে যেতাম । হে ঐ সত্তা! যার সামনে সব রাজা- বাদশাহ নিজেদের গর্দানের ওপর অপদস্ততার জোয়াল পড়েছে; তাই তারা সবাই তার প্রতিপত্তি ও দাপটে ভীত- সন্ত্রস্ত...।

আমরা শীঘ্রই মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে যে সব গায়েবী সাহায্য, কারামত ও মুজিযা প্রকাশ করবেন সেগুলো এবং যে সব রেওয়ায়েতে তার যুগে জ্ঞান- বিজ্ঞানের চরম বিকাশ ও বিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করব ।

তার গৃহিত পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডসমূহের মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে, তিনি সাহলাকে নিজের ও তার পরিবারের বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করবেন । আর কারবালার দিক থেকে সাহলা কুফার কাছাকাছি একটি স্থানের নাম । এ ব্যাপারে বেশ কিছু রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে । এগুলোয় ইঙ্গিত রয়েছে যে, আবির্ভাবের পর তার স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততি থাকবে ।

তার গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে থাকবে আল কুদসের দিকে অভিযান ও যাত্রার আগে ইরাকে তার দীর্ঘকাল অবস্থান । রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "অতঃপর তিনি কুফায় আসবেন এবং সেখানে মহান আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তিনি তার অবস্থানকে দীর্ঘ করবেন ।"[৩৬১]

সম্ভবত ইরাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা স্থিতিশীল হওয়া এবং সে দেশকে তার প্রশাসনের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়াও সেখানে তার দীর্ঘকাল অবস্থান করার কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি ইরাকে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তার মনোনীত সঙ্গী- সাথীদেরকে একত্রিত করবেন । তিনি ইরাক থেকে সেনাদল গঠন করে পৃথিবীর সব দেশে প্রেরণ করবেন । এরপর তিনি তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে পবিত্র কুদস বিজয়ের জন্য যাত্রা করবেন ।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "কায়েম যখন কুফায় প্রবেশ করবে তখন (পৃথিবীর বুকে) এমন কোন মুমিন থাকবে না যে সেখানে উপস্থিত থাকবে না অথবা সেখানে আসবে না । আর এটিই হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) এর বাণী । আর সে তার সঙ্গীদেরকে বলতে থাকবে : আমাদেরকে এ অত্যাচারী সীমা ল নকারীর কাছে নিয়ে যাও ।"[৩৬২]

ইমাম বাকির থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : "আমি যেন কায়েমকে কুফার নাজাফে দেখতে পাচ্ছি । সে পবিত্র মক্কা থেকে পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাঝে সেখানে এসেছে । তার ডান পাশে জীবরাঈল, বাম পাশে মীকাঈল এবং মুমীনরা তার সামনে রয়েছে । আর সে সেখান থেকে প্রথিবীর বিভিন্ন দেশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করছে ।"

‘এবং শুআইব ইবনে সালেহ তার সামনে থাকবে’—এ শিরোনামে বর্ণিত রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে শুআইব হবেন তার সেনাপতি ।

কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে তার প্রথম সামরিক অভিযান শুরু করবেন অর্থাৎ প্রথমে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন । তাই ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (পৃ.৫৮) আরতাত থেকে বর্ণিত হয়েছে : “সুফিয়ানী তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; অতঃপর মাহদীর হাতে তাদের পূর্ণ বিলোপ সাধিত হবে ; আর মাহদী সর্বপ্রথম যে সেনাদল প্রস্তুত করবেন তা তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন ।

এ রেওয়ায়েতের সদৃশ্য একটি রেওয়ায়েত সাইয়্যেদ ইবনে তাউসের আল মালাহিম ওয়াল ফিতান গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে । তিনি এ গ্রন্থে ইবনে হাম্মাদের গ্রন্থ থেকে সত্তর বা ততোধিক পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করেছেন ।

আরো কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমম মাহদী (আ.) একটি সেনাবাহিনী ক ট্যান্টিনোপল, দেইলাম ও চীনের দিকে প্রেরণ করবেন । আর সম্মিলিতভাবে সব রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী ইরাকে নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসনের অবস্থা সুশৃঙ্খল ও দৃঢ়ীকরণ, রাশিয়া ও চীনের দিক থেকে রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তসমূহ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও তা জোরদার করা, অতঃপর কুদস বিজয়ের যুদ্ধের জন্য জাতীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক পর্যায়ে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের মতো বেশ কিছু মৌলিক কাজ করবেন ।

বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অভিযান

কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম মাহদী (আ.) আনতাকিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন । তিনি ঐ সেনাবাহিনীর সাথে তার কতিপয় সাহাবীকেও প্রেরণ করবেন । অতঃপর তারা আনতাকিয়ার একটি গুহা থেকে পবিত্র সিন্দুক বের করে আনবেন যার ভেতরে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আসল কপি থাকবে ।[৩৬৩] অবশ্য ইয়াওমুল খালাস গ্রন্থে এ বিষয়টি বিহার (পৃ.২৮৪) এবং মুন্তাখাবুল আসার গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে । অবশ্য আমি

এ দু'টি গ্রন্থে তা পাইনি...সম্ভবত পাশ্চাত্যের জন্য এ মুজিযা প্রকাশিত হওয়া হচ্ছে ইমাম মাহ্দীর পক্ষ থেকে এমন এক পদক্ষেপ যা আনতাকিয়ার উপকুলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত পাশ্চাত্য সেনাবাহিনীকে কুদস মুক্ত করার মহাসমরে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে । রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, এ সব সৈন্য (পাশ্চাত্য- বাহিনী) রমযান মাসে আসমানী গায়েবী আহবান ধ্বনির পরেই এ অঞ্চলে অবতরণ করবে এবং মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহাফকে মুজিযাস্বরূপ তাদের সামনে আবির্ভূত করবেন ।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত : "রোমানরা আসহাবে কাহাফের গুহার নিকটবর্তী সমুদ্র সৈকতের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে এবং মহান আল্লাহ্ ঐ যুবকদেরকে তাদের কুকুরসহ গুহা থেকে বের করে আনবেন । তাদের মধ্য থেকে 'মালীখা' ও 'খাসলাহা' নামক দু'ব্যক্তি থাকবে যারা উভয়ই কায়েমের নির্দেশ মেনে নেবে ।"[৩৬৪]

এ কথার অর্থ এও হতে পারে যে, মালীখা ও খাসলাহা ইমাম মাহ্দীর কাছে এসে তার হাতে বাইআত করবেন অথবা তার কাছে আসহাবে কাহাফের সাথে বিদ্যমান উত্তরাধিকারসমূহ অর্পণ করবেন ।

সুতরাং গায়েবী সাহায্য পাশ্চাত্য বিহিনীকে ইহুদীদের ও সুফিয়ানীর পক্ষাবলম্বন এবং ইমাম মাহ্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধায় ফেলে দেবে । প্রথম মুজিযা আসহাবে কাহাফের আবির্ভাব এবং দ্বিতীয় মুজিযা আনতাকিয়ার গুহা থেকে পবিত্র সিন্দুক এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের বেশ কিছু (আসল) কপি বের করে এনে সেগুলোর সাহায্যে ইমাম মাহ্দীর সঙ্গীদের ইসলাম ধর্মের পক্ষে যুক্তি ও দলিল প্রমাণ উপস্থাপন । আর এ কারণেই পাশ্চাত্য শক্তি এবং ইমাম মাহ্দীর মধ্যে আনতাকিয়ায় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয় । একইভাবে তুরস্কে নয়, বরং তুর্কী সমুদ্রোপকূলে পাশ্চাত্য বাহিনীর অবতরণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তুরস্ক পাশ্চাত্যের আধিপত্যের বাইরে থাকবে অথবা ঐ সময় তুর্কী জাতির বিপ্লবের মাধ্যমে অথবা ইমাম মাহ্দীর সেনাবাহিনীর দ্বারা তুরস্ক বিদেশী আধিপত্য ও প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে থাকবে ।

তবে রোমের যে সব সৈন্য ফিলিস্তিনের সমুদ্রোপকূলে রামাল্লায় অবতরণ করবে এবং যাদেরকে কতিপয় রেওয়ায়েতে ‘রোমের বিদ্রোহী’ বলে অভিহিত করা হয়েছে সেই সেনাদলটি আল কুদসের মহাসমরে ইহুদীদের ও সুফিয়ানীর পক্ষে অংশগ্রহণ করবে ।

একইভাবে কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) আল কুদসের রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করার জন্য শামে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন যা থেকে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি উক্ত যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন না । বরং তার শত্রুদের পরাজয়ের পর তিনি আল কুদসে প্রবেশ করবেন । তবে অধিকাংশ রেওয়ায়েতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজেই সেনাবাহিনীর সাথে যাত্রা করবেন এবং দামেস্কের অদূরে মারজ আযরায় সেনাশিবির স্থাপন করবেন ।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “অতঃপর সে কুফায় এসে সেখানে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করা পর্যন্ত যতদিন মহান আল্লাহ চাইবেন ততদিন অবস্থান করবে । এরপর সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে মারজ আযরায় যাবে এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোক তার সাথে যোগ দেবে । আর সুফিয়ানী তখন রামাল্লা উপত্যাকায় অবস্থান নেবে । রদবদল করার দিনে যখন মাহদী ও সুফিয়ানী পরস্পর সাক্ষাৎ করবে তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আহলে বাইতের যে সব অনুসারী সুফিয়ানীর সাথে থাকবে তার এবং সুফিয়ানীর যে সব অনুসারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইতের অনুসারীদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে থাকবে তারা বের হয়ে নিজ নিজ দলের পতাকাতলে আশ্রয় নিবে । আর সেদিনটি হবে রদবদল করার দিন । আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন : সেদিন সুফিয়ানী এবং যারা তার সাথে থাকবে তারা নিহত হবে, এমনকি তাদের মধ্য থেকে কোন কোন সংবাদদাতাও জীবিত থাকবে না । ঐ দিন হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে ঐ ব্যক্তি যে সুফিয়ানীদের গনীমতের সম্পদ লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে ।”[৩৬৫]

এর রেওয়ায়েত বেশ কয়েকটি বিষয় নির্দেশ করে । এ সব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জনগণের সার্বিক অবস্থা । যারা ইমাম মাহদীকে সমর্থন ও তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করবে । কারণ সিরিয়ার ভূ- খণ্ডে ইমাম মাহদীর সেনাবাহিনী প্রবেশ করার সময় তারা কোন ধরণের প্রতিরোধ

ছাড়াই দামেস্কের ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে শিবির স্থাপন করবে । আর এভাবে যে সব বিষয় আমরা সুফিয়ানীর আে ালনের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছি সেগুলোও এ রেওয়ায়েতে নির্দেশিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত ।

আল কুদস মুক্ত করার যুদ্ধের আগে এ এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা যা রেওয়ায়েতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় তা হচ্ছে পাশ্চাত্য ইয়েমেন, হিজায ও ইরাকে ইমাম মাহদী এবং তার সঙ্গীদের আশ্চর্যজনক বিজয় ও সাফল্য, যেমন পরস্যপোসাগরীয় অঞ্চলের ওপর তাদের আধিপত্য লাভ এবং মুসলিম জাতিসমূহ, বিশেষকরে এ অঞ্চলের মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইমাম মাহদী ও তার সাথীদের প্রতি জোরালো সমর্থন এবং তাদের পক্ষে তাদের উত্থানের কারণে ইমাম মাহদীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে এক ধরণের ভীতি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যাবে । যার ফলে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহে অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তারা আনতাকিয়ার সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চল, ফিলিস্তিনের রামাল্লা অথবা মিশরে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা ব্যতীত । অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না । এ যুদ্ধে পাশ্চাত্যের ভূমিকা হবে নিজেদের ইহুদী মিত্র এবং সুফিয়ানীকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদান ।

তবে ইহুদীদের অবস্থা অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ ও উত্তেজনাকর হবে । কারণ, যুদ্ধের পরিণতি তাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িত হবে । এ কারণেই তারা ইমাম মাহদীর সেনাবাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না জড়িয়ে বরং সুফিয়ানীর নেতৃত্বে একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ স্থাপন করাকে বেশী গুরুত্ব দেবে । আর এটিই হচ্ছে বিভিন্ন জাতি এবং সীমা ল নকারী ও আরাম প্রিয় সরকারের মধ্যে ক্রিয়াশীল একটি সার্বিক ঐশ্বরিক রীতি (সুন্নাতে ইলাহী) যে, এ সব স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী সরকার সব সময় একটি জাতি বা একটি সামরিক শক্তিকে কিনে নিয়ে তাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধে লিপ্ত করে এবং ঐ জাতি বা সামরিক গোষ্ঠির পশ্চাতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে অবস্থান গ্রহণ করে । আজও পাশ্চাত্য- বিশ্ব ও ইহুদীদের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে আমারা এ অবস্থা বিদ্যমান দেখতে পাচ্ছি । মহান আল্লাহ বলেছেন :

(لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ)

"নিশ্চয় তারা তাদের অন্তরসমূহে মহান আল্লাহর চেয়েও তোমাদেরকে অধিক ভয় পায়; আর তা এজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা কিছুই বোঝেনা । তারা সবাই সুরক্ষিত দুর্গসমূহে অথবা প্রাচীরসমূহের পশ্চাতে অবস্থান করেই তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় । তাদের নিজেদের মধ্যেই তারা তীব্র ও প্রবল; আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন, অথচ তাদের হৃদয়সমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । আর তা এজন্য যে, তা এজন্য যে তারা এমন সম্প্রদায় যারা অনুধাবন করে না।"[৩৬৬]

তবে এ অঞ্চলের জনগণের সার্বিক অবস্থা ইমাম মাহদীকে সাহায্য ও সমর্থন করার ক্ষেত্রে এতটা অনুকূল থাকবে যে, যদি বিদেশী পরাশক্তি ও ইহুদীরা সুফিয়ানী ও তার সেনাবাহিনীকে সাহায্য ও সমর্থন না করে তাহলে এলাকার জনগণই সুফিয়ানীকে উৎখাত করে সমগ্র শামদেশকে ইমাম মাহদীর শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হবে ।

এও অসম্ভব নয় যে, ইমাম মাহদীর সেনাদলের অভিযানের ফলশ্রুতিতে সুফিয়ানী বাহিনীর রামাল্লায় পশ্চাতপসরণের সময়ে সিরয়ায় রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে ।

ইবনে হাম্মাদ তার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'পবিত্র মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর অগ্রযাত্রা' শিরোনামে বিশটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কয়েকটি শিয়া সূত্র ও গ্রন্থসমূহেও বিদ্যমান । যেমন হযরত আলী (আ.)- কে ইবনে যারীর গাফিকী বলতে শুনেছেন : "সে কমপক্ষে বারো হাজার থেকে সর্বাধিক পনের হাজার লোকসহ পবিত্র মক্কা থেকে বের হবে । তার অগ্রযাত্রার সাথে শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢুকে যাবে । যে শত্রুই তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তাকে সে মহান আল্লাহর নির্দেশে ধরাশায়ী করবে । তাদের সামরিক ে াগান হবে 'হত্যা করুন, হত্যা করুন' । তারা মহান আল্লাহর পথে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না । এ সময় সিরীয় একটি সেনাদল তাদের ওপর আক্রমণ করবে । ইমাম তাদের সবাইকে পরাস্ত এবং ব ী করবে । তাদের ভালবাসা, নেয়ামত, قاصه ও بزاره

মুসলমানদের কাছে ফিরে আসবে । এরপর দাজ্জালের আবির্ভাব ও উত্থান ব্যতীত আর কোন ঘটনা ঘটবে না । আমি জিজ্ঞাসা করলাম : قاصه ও براره কী ? তিন বললেন : যামানার ইমাম এমনভাবে শাসনকর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করবে যে, কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছা করবে তা বলতে পারবে এবং কোন কিছুকেই ভয় করবে না ।"[৩৬৭]

একই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : "বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করা পর্যন্ত মাহদীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে । তখন তার কাছে ধনভাণ্ডারসমূহ উপস্থাপন করা হবে । আরব- অনারব, যুদ্ধবাজ ও রোমানসহ সবাই তার আনুগত্য করবে ।"

একই গ্রন্থের আরেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে : "মাহদী বললেন ; আমার চাচাত ভাইকে (সুফিয়ানী) নিয়ে এসো যাতে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি; তখন তাকে তার কাছে আনা হবে এবং তিনি তার সাথে কথা বলবেন । সে ইমামের কাছে আ সমর্পণ করবে এবং তার হাতে বাইআত করবে । কিন্তু যখনই সে বনি কালব গোত্রীয় তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা তার কৃতকর্মের জন্য তাকে অনুতপ্ত হতে বাধ্য করবে এবং সে ইমামের কাছে এসে তার বাইআত প্রত্যাহার করবে । ইমাম মাহদী তার বাইআত বাতিল করে দেবেন । এরপর ইমাম ও সুফিয়ানী বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে । আর তার বাহিনী সাত দলে বিভক্ত হবে যার প্রতিটি দলের অধিনায়ক যাবতীয় ক্ষমতা নিজেই কুক্ষিগত করতে চাইবে । কিন্তু ইমাম তাদের সবাইকে পরাজিত করবেন ।"[৩৬৮]

একই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :"সুফিয়ানী ইমামের কাছে এসে তার বাইআত ভঙ্গ করার আবেদন জানালে ইমামও তা বাতিল ঘোষণা করবে । তখন সে ইমামের বিরুদ্ধে স্বীয় সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ করার জন্য পরিচালনা করবে । আর ইমাম তাকে পরাজিত করবে এবং মহান আল্লাহ রোমানদেরকেও তার হাতে পরাজিত করাবেন ।"

অভিশপ্ত সুফিয়ানী ইমাম মাহদী (আ.)- এর চাচাত ভাই হবে । কারণ, প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী উমাইয়্যা ও হাশিম ছিলেন পরস্পর ভাই । যদি এ রেওয়ায়েত সহীহ হয়ে থাকে তাহলে ইমাম মাহদী (আ.) তার এই প্রাজ্ঞজনোচিত নীতি এবং উন্নত চারিত্রিক মহানুভবতার দ্বারা যতদূর সম্ভব

সুফিয়ানীকে পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইবেন অথবা তার সকল অজুহাত পেশ করার পথ বন্ধ করে দেবেন । যদিও সুফিয়ানী ইমাম মাহদী (আ.)- এর মহান ব্যক্তিত্বের দ্বারা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়ে দ্রুত অনুতপ্ত হবে, কিন্তু তার বনি কালব গোত্রীয় আ ীয়স্বজন এবং তার সেনাবাহিনীর সাত অধিনায়ক যাদের নেতৃত্বের ভার তার হাতে থাকবে তারা এবং তার পাশ্চাত্য ও ইহুদী প্রভুরা তাকে ইমামের প্রতি আনুগত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে ।

'মালাহিম ও ফিতান' গ্রন্থে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) থেকে উপরিউক্ত যুদ্ধের বর্ণনা করে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে : "মহান আল্লাহ সুফিয়ানীর ওপর ক্রুদ্ধ হবেন এবং আল্লাহর বা ারাও মহান আল্লাহর ক্রোধের কারণে তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন । পাখিরা তাদের ডানা দিয়ে, পাহাড়- পর্বতসমূহ পাথর দিয়ে এবং ফেরেশতারা তাদের ধ্বনি দিয়ে তাদের (সুফিয়ানী বাহিনী) ক্ষতিসাধন করবে । আর এক ঘন্টা গত না হতেই মহান আল্লাহ সুফিয়ানীর সকল সঙ্গীকে ধ্বংস করে দেবেন এবং কেবল সে (সুফিয়ানী) ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন শত্রুই থাকবে না । মাহদী তাকে ব ী করে যে বৃক্ষের শাখা- প্রশাখাগুলো তাবারীয়াহ হ্রদের ওপর ছায়া দেবে সে বৃক্ষের নিচে হত্যা করবে ।"

ইলযামুন নাসিব' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে : "সাইয়াহ না ী ইমাম মাহদীর সেনাবাহিনীর এক সেনাপতি সুফিয়ানীর কাছে যাবেন এবং তাকে ব ী করবেন । ইশার নামাযের সময় সে সুফিয়ানীকে মাহদীর কাছে আনবে । মাহদী সুফিয়ানীর ব্যাপারে নিজ সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করবে এবং তারও তাকে হত্যা করর মধ্যে কল্যাণ আছে বলে অভিমত প্রকাশ করবে । তখন সে যে বৃক্ষের ডালপালাগুলো ঝুলে থাকবে তার ছায়ায় ছাগল যেভাবে জবাই করা হয় সেভাবে সুফিয়ানীকে হত্যা করবে ।"[৩৬৯]

পূর্বের রেওয়ায়েতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও আরো কতিপয় রেওয়ায়েত এ যুদ্ধকে মুসলমানদের জন্য আরো এক ধরনের গায়েবী সাহায্য বলে উল্লেখ করেছে : "ঐ দিন আকাশ থেকে একটি আহবান ধ্বনি শোনা যাবে এবং একজন আহবানকারী ঘোষণা করতে থাকবে : তোমরা জেনে রাখ, মহান আল্লাহর ওলীরা হচ্ছে অমুক অর্থাৎ মাহদীর সঙ্গীরা এবং সুফিয়ানীর

সঙ্গীদের জন্য নির্ধারিত আছে পরাজয় ও দুর্ভাগ্য। অতঃপর সুফিয়ানীর সঙ্গীরা এমনভা্বে নিহত হবে যে, একমাত্র পলাতক ব্যক্তি ব্যতীত তাদের মধ্য থেকে আর কেউ সেদিন জীবিত থাকবে না।"[৩৭০]

সম্ভবত শিয়া ও সুন্নী সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহে ইহুদীদের বিরুদ্ধে শেষ যামানায় মুসলমানদের যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এ যুদ্ধ অর্থাৎ ইহুদী ও পাশ্চাত্য সমর্থিত সুফিয়ানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ। কারণ, একদিকে সেগুলোর বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গী সদৃশ, অন্যদিকে পবিত্র কোরআনের (بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) (তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী বা াদেরকে প্রেরণ করব)- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী বা া বলতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গীদেরকেই বোঝানো হয়েছে।

আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহে এতৎসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে একটি রেওয়ায়েত আছে যা মুসলিম, আহমদ ও তিরমিযী মহানবী (সা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন :"মুসলমান ইহুদীদের মধ্যে এমন এক যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে যুদ্ধে মুসলমানরা তাদের সবাইকে হত্যা করবে, এমনকি কোন ইহুদী যদি পাথর বা গাছের পেছনে লুকায় তাহলে একমাত্র ইহুদীদের গাছ গারকদ ব্যতীত সব পাথর ও গাছ বাকশক্তি লাভ করে বলতে থাকবে : হে মুসলমান! এ ইহুদী আমার কাছে এসে আ গোপন করেছে। অতএব, তাকে হত্যা কর।"[৩৭১]

সহীহ মুসলিম ও সহীহ আত তিরমিযীর 'কিতাবুল ফিতান' অধ্যায়ে এবং সহীহ বুখারীর 'কিতাবুল মানাকিবে' (ফযিলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে) বর্ণিত 'ইহুদীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তোমরা তাদের ওপর বিজয়ী হবে'- এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েত উপরোল্লিখিত রেওয়ায়েতের সদৃশ্।

একইভাবে শিয়া- সুন্নী উভয় মাজহাবের হাদীস গ্রন্থ ও সূত্রসমূহে ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মধ্যে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পবিত্র সিন্দুক এবং

তাওরাতের কয়েকটি অধ্যায় আনবেন এবং সেগুলো দিয়ে ইহুদীদের বিপক্ষে যুক্তি ও দলিল প্রমাণ পেশ করবেন । সম্ভবত তা ইহুদীদের ওপর তার বিজয় এবং পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাসে তার প্রবেশ করার পরই হবে ।

আমি এ সব রেওয়ায়েতে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে আগত মুসলিম বাহিনী অথবা সুফিয়ানী বাহিনী অথবা ইহুদী ও পাশ্চাত্য বাহিনীর সৈন্যদের নির্দিষ্ট সংখ্যা খুজে পাই নি । তবে কিছু কিছু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সুফিয়ানীর সব সৈন্যকে তাবারিয়াহ হরদে মোতায়েন করা হবে কবেল তাদের সংখ্যাই একলক্ষ সত্তর হাজার হবে । তবে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দানকারী কিছু কিছু বিষয় থেকে প্রতিয়মান হয় যে, উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা হবে বিরাট । যেমন ইমাম বাকির (আ.) থেকে ইতোমধ্যে বর্ণিত রেওয়ায়েত যেখানে তিনি বলেছেন : “এবং তার সাথে অগণিত জনতা যোগ দেবে ।” আর যুদ্ধক্ষেত্রের বিশাল আয়তন যা অধিকাংশ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তারাবীয়াহ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বিস্তৃত হবে । কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মারজ আক্কা, সূর ও দামেস্কও ঐ বিশাল রণাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত হবে ।

তবে কতিপয় রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সৈন্যসংখ্যা যে কয়েক দশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা আসলে ঐ সৈন্যসংখ্যা হবে যারা তার সাথে পবিত্র মক্কা থেকে পবিত্র মদীনায় যাবে । সম্ভবত কতিপয় রাবী যে সেনাবাহিনী নিয়ে ইমাম মাহদী ইরাক থেকে পবিত্র কুদসের দিকে রওয়ানা হবেন সেটাকে এ সেনাবাহিনী মনে করে ভুল করেছেন । উল্লেখ্য যে, ইরাক থেকে পবিত্র কুদসের দিকে যাত্রাকারী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন ইরানী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক শুআইব ইবনে সালিহ । এ সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষাধিক হতে পারে । কারণ, এ সেনাবাহিনীতে ইরানী, ইয়েমেনী ও ইরাকী সেনাবাহিনী ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে আগত বাহিনীও যোগ দেবে । অতঃপর শাম থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক যোদ্ধা এ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে । সম্ভবত অন্যান্য ভূ- খণ্ড থেকেও যোদ্ধারা এ বাহিনীতে যোগ দেবে ।

তিনি এ গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার দেহরক্ষীর সংখ্যা হবে ছত্রিশ হাজার এবং বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখী প্রতিটি রাস্তার ওপর বারো হাজার সৈন্য মোতায়েন থাকবে । আর এ রেওয়ায়েত থেকে ইমাম মাহদীর সেনাবাহিনীর বিশালতা প্রতীয়মান হয় ।

ইবনে হাম্মাদ অনুরূপভাবে তার গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠায় মাহদী (আ.) কর্তৃক পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মাণ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, বনি হাশিমের এক খলীফা এসে পৃথিবীকে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন । তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসকে এমনভাবে নির্মাণ করবেন যেভাবে তা কখনো নির্মিত হয় নি ।

এটিই স্বাভাবিক যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর আশ্চর্যজনক ও অবধারিত বিজয় এবং বিজয়ী বেশে তার বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ পাশ্চাত্য- বিশ্বের ওপর বজ্রপাত তুল্য মনে হবে । তাদের ইহুদী মিত্রদের পরাজয় ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার কারণে তারা উন্মাদ হয়ে যাবে । রাজনৈতিক হিসাব –নিকাশের ভিত্তিতে এবং তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে তার আলোকে বলা যায়, তারা ইমাম মাহদী (আ.) ও তার সেনাবাহিনীর ওপর অবশ্যই সমুদ্র ও আকাশ পথে সামরিক আক্রমণ চালাবে এবং সম্ভাব্য সব ধরণের মারণাস্ত্র (পারমাবিক, রাসায়নিক ও অন্যান্য অস্ত্র) ব্যবহার করবে ।

তবে রেওয়ায়েতসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, বেশ কিছু শান্তকারী নিয়ামকও থাকবে যেগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হবে পৃথিবীতে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) এর অবতরণ এবং এর পরই থাকবে ইমাম মাহদীর (আ.) মোকাবিলা করার ভয়- ভীতি যা পাশ্চাত্যবাসী তাদের হৃদয়ের গভীরে অনুভব করবে ।

এ ছাড়াও ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের আ লনে মহান আল্লাহ তাকে যে গায়েবী সাহায্য করেছিলেন সেই গায়েবী সাহায্যের উপায় উপকরণও থাকবে । এ প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবতারণা করা পয়োজন । আর এগুলো দ্বারা কেবল পাশ্চাত্য সরকারসমূহ নয়; বরং সেখানের জাতিসমূহও যথেষ্ট প্রভাবিত হবে । এগুলোর পাশাপাশি ইমাম মাহদীর হাতে

অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রও থাকবে যেগুলো পাশ্চাত্য বাহিনীর সমরাস্ত্রসমূহের সমকক্ষ বা সেগুলো অপেক্ষা উন্নত হবে ।

আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণ

মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য) আছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) আখেরী যামানায় (সর্বশেষ যুগে) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। আর এতদর্থেই অধিকাংশ মুফাসসির পবিত্র কোরআনের নি ক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন :

(و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا)

এ আয়াতটি (আহলে কিতাবের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর (ঈসা) প্রতি তাঁর মৃত্যুর আগে অবশ্যই ঈমান আনবে এবং কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের সবার ওপর সাক্ষী থাকবেন।- সূরা নিসা : ১৫৯)

ইবনে আব্বাস, উবাই, মালিক, কাতাদাহ্, ইবনে যাইদ এবং বলখী থেকে উপরিউক্ত বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন : "আর তাবারীও তা গ্রহণ করেছেন।"

আল্লামা মাজলিসী এই একই অর্থে বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে (১৪তম খণ্ড, পৃ. ৫৩০) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ইমাম বাকির (আ.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন : "তিনি (ঈসা) কিয়ামত দিবসের আগে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কেউ ইহুদী ধর্মাবলম্বী অথবা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না; অথচ তারা তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর তিনি মাহ্দীর পেছনে নামায পড়বেন।"

শিয়া- সুন্নী সূত্রসমূহে হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণ করার হাদীসসমূহ অগণিত। শাওকানী ও কা ীরী ইমাম মাহদী (আ.) এবং ঈসা মসীহ্ (আ.)- এর অবতরণের হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির হবার বিষয় প্রমাণ করে দু'টি স র্ভ রচনা করেছেন। এ সব মুতাওয়াতির হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ এ হাদীসটি। মহানবী (সা.) বলেছেন :

كيف بكم (أنتم) إذا نزل عيسى بن مريم فيكم و إمامكم منكم

"তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন- ঐ অবস্থায় যখন তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম বিদ্যমান থাকবে।"[৩৭২]

ইবনে হাম্মাদ তাঁর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে ১৫৯ থেকে ১৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতরণ এবং তাঁর সীরাত' এবং 'অবতরণের পর হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)- এর আয়ুষ্কাল'- এ শিরোনামে প্রায় ত্রিশটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

এ সব হাদীসের মধ্যে ১৬২ পৃষ্ঠায় নি োক্ত হাদীসটি রয়েছে যা সকল সহীহ হাদীসগ্রন্থ এবং বিহারুল আনওয়ারে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী বলেছেন : "ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিঃসে হে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও (ন্যায়পরায়ণ) নেতা হিসেবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন; তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযিয়া কর আরোপ করবেন এবং তিনি এত সম্পদ দান করবেন যে, কেউ তা আর নেবে না।"[৩৭৩]

একই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : "বিশেষ কতকগুলো কারণে নবিগণ পরস্পর ভ্রাতা; তাঁদের ধর্ম এক ও অভিন্ন, তবে তাঁদের জননীরা ভিন্ন। নবীদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হচ্ছেন ঈসা ইবনে মরিয়ম। কারণ, তাঁর ও আমার মাঝে কোন নবী নেই। তিনি তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। তাই তোমাদের উচিত তাঁকে যথাযথভাবে জানা ও চেনা। তিনি হবেন প্রশস্ত কাঁধ বিশিষ্ট, শক্তিশালী দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী শ্বেত বর্ণের পুরুষ। তিনি শুকর হত্যা ও ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং (জিযিয়া) কর আরোপ করবেন। তাঁর কাছে ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর আ ান সব সময় একদিক বিশিষ্ট হবে অর্থাৎ তিনি কেবল নিখিল বিশ্বের মহামহিম প্রভুর দিকেই সবাইকে আ ান করবেন।"

ইবনে হাম্মাদের বেশ কিছু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈসা (আ.)- এর অবতরণস্থল হবে আল কুদস (বাইতুল মুকাদ্দাস নগরী)। তবে আরো কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হযেছে যে, তাঁর অবতরণস্থল হবে দামেস্ক নগরীর পূর্ব ফটক এবং আরো কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত অনুসারে ফিলিস্তিনের লুদ্দ- এর ফটক। অবশ্য যেমনভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তদনুযায়ী এও সম্ভব যে, প্রথমে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন এবং এরপর শাম ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও ভ্রমণ করবেন।

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হযেছে যে, তিনি ইমাম মাহদীর পেছনে নামায পড়বেন এং প্রতি বছর হজ্ব পালন করার জন্য পবিত্র মক্কা গমন করবেন। মুসলমানরা তাঁর সাথে ইহুদী, রোম (পাশ্চাত্য) ও দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তিনি পৃথিবীতে চার বছর জীবন যাপন করবেন এবং এরপর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানরা তাঁর পবিত্র দেহ দাফন করবে।

আহলে বাইত থেকে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মাহদী (আ.) জনগণের চোখের সামনে প্রকাশ্যে ঈসা (আ.)- এর দাফন সম্পন্ন করবেন যাতে খ্রিস্টানরা আর অতীতের কথা পুনর্ব্যক্ত করতে না পারে। ইমাম মাহদী (আ.) হযরত মরিয়ম (আ.)- এর হাতে বোনা কাপড় দিয়ে ঈসা (আ.)- এর দেহে কাফন পড়াবেন এবং তাঁর মা হযরত মরিয়মের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করবেন।

আমার দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ.)- এর পৃথিবীতে পুনরাগমন সংক্রান্ত শক্তিশালী সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে, 'আহলে কিতাবের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে না যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না'- পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সকল খ্রিস্টান ও ইহুদী তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। তাঁর ঊর্ধ্বকাশে উড্ডয়ন ও দীর্ঘ জীবন লাভ করার দর্শন হচ্ছে, ইতিহাসের সবচেয়ে সংবেদনশীল পর্যায়ে যখন ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন এবং খ্রিস্টানরা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পরাশক্তিতে পরিণত হবে তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য মহান আল্লাহ্ ঈসা (আ.)- কে দীর্ঘজীবন দান করেছেন এবং তাঁকে জীবিত রেখেছেন। খ্রিস্টানদের বৃহত্তম পরাশক্তিতে পরিণত হওয়াই হচ্ছে বিভিন্ন জাতির কাছে ইসলামের শাশ্বত বাণী ও শিক্ষা পৌঁছানো এবং ঐশী হুকুমত ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়স্বরূপ। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ ঈসা (আ.)- কে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য জীবিত রেখেছেন এবং তাঁকে সংরক্ষণ করেছেন।

আর এ কারণেই যে সমগ্র খ্রিস্ট বিশ্বজুড়ে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল ও সমাবেশ এবং এক বিশেষ ধরনের আন ঘন পরিবেশের সৃষ্টি হবে তা আসলেই এক বাস্তব বিষয়। কারণ, তারা (খ্রিস্টানরা) হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণকে তাদের নিজেদের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের বিপরীতে এক বিরাট নেয়ামত বলে মনে করবে। হযরত ঈসা (আ.) যে বিভিন্ন খ্রিস্টান দেশ সফর করবেন এবং মহান আল্লাহ্ যে তাঁর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ঐশী নিদর্শন ও মুজিযা জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন এবং তিনিও যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় সমগ্র খ্রিস্ট বিশ্বকে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করার দিকে পরিচালিত করবেন তা নিতান্ত স্বাভাবিক। হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণ বা পুনরাগমনের প্রাথমিক রাজনৈতিক ফলাফল হচ্ছে এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি পাশ্চাত্য সরকারসমূহের শত্রুতা হ্রাস পাবে। কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে, ইমাম মাহদী (আ.) এবং পাশ্চাত্য সরকারসমূহের মাঝে একটি 'যুদ্ধবিরতি ও শান্তিচুক্তি' সম্পাদিত হবে।

রেওয়ায়েতসমূহে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তদনুসারে পাশ্চাত্য কর্তৃক একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ও শান্তিচুক্তি ল ন এবং এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মাহদীর পেছনে নামায পড়ার বিষয়টি ঐ স্থানে সংঘটিত হতে পারে যেখানে ঈসা (আ.) ইমাম মাহদী (আ.) এবং মুসলমানদের প্রতি স্বীয় সমর্থনের কথা স্পষ্ট ভাষায় ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করবেন।

তবে এ অঞ্চলে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ইমাম মাহদীর হাতে এ মহাযুদ্ধে পাশ্চাত্যের পরাজয়বরণ করার পর ক্রুশ ধ্বংস ও শুকর নিধন অভিযান পরিচালিত হবার সম্ভাবনা আছে। একইভাবে হযরত ঈসা (আ.)- এর সমর্থনকারী পাশ্চাত্য জনগণের ব্যাপক গণ- আ ালনের তরঙ্গ যা ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে বিশাল যুদ্ধের আগে ও পরে পাশ্চাত্য সরকারসমূহের ওপর আশ্চর্যজনক প্রভাব ফেলবে তাও বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

তবে দাজ্জাল সংক্রান্ত রেওয়ায়েত ও হাদীসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমার (এ গ্রন্থের লেখক) কাছে শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে মনে হচ্ছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বের সকল জাতির ব্যাপক কল্যাণ ও সুখ- সমৃদ্ধির বাস্তবায়ন এবং জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উৎকর্ষ সাধিত হবার অব্যবহিত পরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

দাজ্জালের উত্থান ও আবির্ভাব ইহুদী এবং তাদের সদৃশ পাশ্চাত্য দল ও ধারাসমূহ থেকে উদ্ভূত এক আন্দোলন হবে। উক্ত পাশ্চাত্য ধারা ও দলসমূহ হবে ইন্দ্রিয় পরায়ণ এবং আমোদ-প্রমোদ ও স্ফূর্তিকেন্দ্রিক। এক চক্ষুবিশিষ্ট দাজ্জালের আন্দোলন হবে প্রযুক্তিগত দিক থেকে অত্যন্ত অগ্রসর এবং ব্যাপক বস্তুবাদী মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দিকসম্পন্ন। ইহুদীরা হবে দাজ্জালের উক্ত আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ও মূল ভিতস্বরূপ। তারা তরুণ-তরুণীদেরকে ধোঁকা দিয়ে প্রতারিত করে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করবে। দাজ্জালের ফিতনা ও গোলযোগ মুসলমানদের জন্য খুব কঠিন ও কষ্টদায়কই হবে।

হযরত ঈসা (আ.) যে দাজ্জালকে বধ করবেন এতৎসংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। কারণ, এটি হচ্ছে খ্রিস্টানদের আকীদা-বিশ্বাস যা তাদের ইঞ্জিলের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অথচ মুসলমানদের ঐকমত্য অনুসারে বিশ্ব সরকার ও প্রশাসনের প্রকৃত শাসনকর্তা ও প্রধান হবেন ইমাম মাহদী এবং হযরত ঈসা (আ.) হবেন তাঁর সহকারী। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইতের রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানরা দাজ্জালকে বধ করবে।

ইমাম মাহদী (আ.) এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদন

এ সন্ধি সংক্রান্ত রেওয়ায়েত অগণিত। এটি হবে অনাক্রমণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংক্রান্ত চুক্তি। মনে হচ্ছে, এ চুক্তি সম্পাদন করার পেছনে ইমাম মাহদী (আ.)-এর উদ্দেশ্য হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের মাঝে তাঁর প্রচার কার্যক্রম সাফল্যের সাথে পরিচালনা করার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যাতে তিনি (ঈসা) পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে হেদায়েত করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং রাজনীতিতে পরিবর্তন সাধন করতে এবং পাশ্চাত্যের সরকারসমূহ ও সভ্যতার বিচ্যুতিসমূহ তাদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হন। উক্ত শান্তি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি সংক্রান্ত রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে এ চুক্তি এবং মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির মাঝে যে বহু সাদৃশ্য

আছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিতে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হয়েছিল এবং মহান আল্লাহ্ এ সন্ধিচুক্তিকে 'ফাতহুম মুবীন' বা 'মহা বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের অত্যাচারী নেতৃবর্গ এ চুক্তিকে একতরফাভাবে ল ন করেছিল বিধায় আরব উপদ্বীপের জনগণ ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং কাফির-মুশরিকদের শক্তি চিরতরে আরবের বুক থেকে নিঃশেষ করে দেয়ারও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। আর ইমাম মাহদী (আ.) ও পাশ্চাত্যের মাঝে সম্পাদিত এ চুক্তিও পাশ্চাত্যই ভঙ্গ করবে এবং এভাবে তাদের আগ্রাসী ও সীমা ল নকারী চরিত্রও উন্মোচিত হয়ে যাবে। বেশ কিছু রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে যে, দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে পাশ্চাত্য এ অঞ্চলকে সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেবে এবং এ অঞ্চলে এমন এক যুদ্ধ বাঁধবে যা ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে আল কুদস মুক্ত করার যুদ্ধ অপেক্ষাও ভয়াবহ হবে।

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "তোমাদের ও রোমের মাঝে চারটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হবে যেগুলোর চতুর্থটি রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এক বংশধর কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে। আর তা কয়েক বছর (দু'বছর) পর্যন্ত স্থায়ী হবে।" সুদুদ ইবনে গাইলান না ী আবদুল কাইস বংশীয় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : "তখন জনগণের নেতা কে হবেন?" তখন তিনি বলেছিলেন : "আমার বংশধর মাহদী।"

ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত হাফেয আবু নাঈম কর্তৃক বর্ণিত চল্লিশ হাদীসের বারোতম হাদীসটি নি রূপ। হুযাইফা ইবনে ইয়ামান থেকে বর্ণিত : "মহানবী (সা.) বলেছেন : তোমাদের ও হলুদ বর্ণবিশিষ্ট ত্বকের অধিকারীদের মাঝে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। অথচ তারা নারীদের গর্ভধারণকাল পরিমাণ সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ নয় মাস পরেই তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশি ডিভিশন সৈন্যসহ স্থল ও নৌ পথে তোমাদের ওপর হামলা করবে। প্রত্যেক ডিভিশনে বারো হাজার সৈন্য থাকবে। ঐ বিশাল সেনাবাহিনী ইয়াফা ও আক্কার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবতরণ করবে। তাদের সর্বাধিনায়ক তাদের যুদ্ধ জাহাজসমূহে আগুন ধরিয়ে দেবে এবং সেনাবাহিনীকে নিজের দেশ ও ভূ- খণ্ডকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করার নির্দেশ দেবে। ঐ সময়

উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ ও রক্তপাত শুরু হয়ে যাবে। সৈন্যরা সবাই পরস্পরের সাহায্যার্থে দ্রুত ছুটে আসতে থাকবে, এমনকি ইয়েমেনের হাদরামাউত অঞ্চল থেকেও তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য লোকজন ছুটে আসতে থাকবে। ঐ দিন মহান আল্লাহ্ তাঁর বর্শা, তরবারি ও তীর- ধনুক দিয়ে তাদেরকে আঘাত করবেন এবং এ কারণেই তাদের মাঝে সেদিন সবচেয়ে বেশি হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হবে।"[৩৭৪]

আরো বর্ণিত হয়েছে, রোমীয়দের যুদ্ধ জাহাজসমূহ সূর থেকে আক্কা পর্যন্ত নোঙ্গর ফেলবে এবং অবস্থান গ্রহণ করবে। তখন সেখানে বিশাল যুদ্ধ সংঘটিত হবে।[৩৭৫]

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ্ খ্রিস্টানদের জন্য দু'ধরনের হত্যাযজ্ঞ নির্ধারণ করেছেন যেগুলোর একটি অতীতে সংঘটিত হয়েছে এবং অন্যটি এখনো সংঘটিত হয় নি। [৩৭৬]

'ঐদিন মহান আল্লাহ্ তাঁর বর্শা, তরবারি ও তীর- ধনুক দিয়ে তাদেরকে আঘাত করবেন'- এ কথার অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাদের প্রেরণ করে এবং তাঁর গায়েবী সাহায্য পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন।

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে : "তখন মহান আল্লাহ্ রোমীয়দের ওপর বাতাস ও পাখিদেরকে আধিপত্যশীল করে দেবেন যার ফলে পাখিগুলো ডানা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডলের ওপর উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকবে এবং কোটর থেকে তাদের চোখ বেরিয়ে আসবে। তাদের কারণে ভূমি ফেটে যাবে এবং এরপর তারা বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের শিকার হবে এবং উচু খাড়া পাহাড় বা ভূমি থেকে নি ভূমি বা উপত্যকার অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত ও পতিত হবে। মহান আল্লাহ্ ধৈর্য ধারণকারীদেরকে সাহায্য করবেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সঙ্গী- সাথিদেরকে যেভাবে পূণ্য ও পুরস্কার প্রদান করেছেন এবং তাঁদের বক্ষকে সাহস ও শক্তি দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছিলেন ঠিক তদ্রূপ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান ও পুরস্কার প্রদান করবেন।"[৩৭৭]

উপরিউক্ত দুই রেওয়ায়েতে যেমনটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তদ্রূপ ইয়াফা ও আক্কা অথবা সূর ও আক্কার মাঝে নৌবাহিনী অবতরণ ও মোতায়েন করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিলিস্তিনকে

পুনরায় ইহুদীদের হাতে অর্পণ করা। আসলে কুদস হবে তাদের সামরিক অভিযানে মূল অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য।

পরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মিশরের আবীশ সমুদ্রতট থেকে তুরস্কের আনতাকিয়া পর্যন্ত রোমীয়রা তাদের সেনাবাহিনী মোতায়েন করবে। হুযাইফাহ্ বিন ইয়েমেন থেকে বর্ণিত হয়েছে :

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর এমন এক বিজয় অর্জিত হয়েছে, যার অনুরূপ বিজয় তাঁর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে আর কখনো অর্জিত হয় নি। আমি বললাম : হে রাসূলাল্লাহ্! এ বিজয় ও সাফল্য আপনার জন্য মোবারক হোক। এ বিজয় অর্জিত হবার মাধ্যমে কি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে? তিনি বললেন : কখনোই না, কখনোই না। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। হে হুযাইফাহ্! এর আগে ছয়টি বৈশিষ্ট্য আছে... এবং সর্বশেষ যুদ্ধকে তিনি 'রোমের ফিতনা' বলে উল্লেখ করলেন এবং বললেন : রোমীয়রা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং শান্তিচুক্তি ল ন করে আশি ডিভিশন সৈন্য নিয়ে আনতাকিয়া থেকে শুরু করে আরীশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অবতরণ করবে।"[৩৭৮]

হযরত ঈসা (আ.)- এর পৃথিবীতে অবতরণ ও পুনরাগমন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ সময় (হযরত ঈসার পৃথিবীতে আগমন কালে) যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। আর রোমীয়দের (পাশ্চাত্য) সাথে মুসলমানদের যুদ্ধসমূহের বাস্তবতাও উপরিউক্ত বিষয়কে সমর্থন করে। আসলে এখনো পাশ্চাত্যের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে নি এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ও আকাশ থেকে ঈসা (আ.)- এর অবতরণ করা পর্যন্ত পাশ্চাত্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন চালাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ফিলিস্তিনে রোমীয়দের সাথে দু'টি যুদ্ধ হবে যেগুলোর একটিকে 'পুষ্পচয়ন' এবং অপরটিকে 'ফসল মাড়াই' বলে অভিহিত করা হয়।[৩৭৯] নামকরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দ্বিতীয় যুদ্ধ প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসা ক হবে।

পরের রেওয়ায়েত এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে যে, পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ইমাম মাহদীর যুদ্ধ হবে একটি অসম যুদ্ধ। অবশ্য যেহেতু ক্ষমতা ও শক্তির ভারসাম্য বাহ্যত পাশ্চাত্যের অনুকূলে থাকবে সেহেতু কিছু কিছু ভীরু আরব পাশ্চাত্যের সাথে যোগ দেবে এবং বাকী আরব নিরপেক্ষ থাকবে। 'তোমাদেরকে অতি সত্বর এক অত্যন্ত শক্তিশালী জাতির মোকাবিলা করার দিকে আ ান করা হবে'- এ আয়াতের তাফসীরে মুহাম্মদ ইবনে কাব থেকে ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : "(ভবিষ্যতে) রোমীয়দের একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আছে।" এরপর তিনি বলেন : "মহান আল্লাহ্ যখন ইসলামের শুরুতে আরবদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আ ান করেছিলেন তখন তারা বলেছিল : ধনসম্পদ, স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততি আমাদেরকে মত্ত করে রেখেছে। তখন তিনি বললেন : তোমাদেরকে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি জাতির দিকে আ ান জানান হবে। যুদ্ধের দিনে আবারও তারা ঐ কথাই বলবে যা তারা ইসলামের সূচনালগ্নে বলেছিল। আর 'মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে মহা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন'- এ আয়াতটি তাদের ব্যাপারে বাস্তবায়িত হবে। সাফওয়ান বলেন : "আমাদের শিক্ষক বলেছেন যে, সেদিন কিছু কিছু আরব ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং অন্যান্য আরব স হের মধ্যে পড়ে ইসলাম ও মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে।"

মুরতাদ হবে ঐ সকল ব্যক্তি যারা রোমীয়দেরকে সাহায্য করবে এবং ইসলাম ও মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করা থেকে যারা বিরত থাকবে। তারা হবে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী। এ সব মুরতাদ ও নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী রোমীয়দের ওপর বিজয় লাভ করার পর ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি লাভ করবে। ইবনে হাম্মাদ একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, এ যুদ্ধের শহীদদের পুরস্কার হবে মহানবী (সা.)- এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদদের পুরস্কারের সমতুল্য। রেওয়ায়েতটি নি রূপ : সৃষ্টির শুরু থেকে এ আসমানের নিচে সর্বশ্রেষ্ঠ নিহত (শহীদ) ব্যক্তিরা হচ্ছেন : ১. হাবীল, যিনি অভিশপ্ত কাবিলের হাতে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছিলেন, ২. ঐ সব নবী যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ জাতির হাতে নিহত হয়েছেন অথচ তাঁরা তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের কথা

ছিল, 'আমাদের প্রভু হচ্ছেন মহান আল্লাহ্' এবং জনগণকে তাঁরা মহান আল্লাহর দিকে আ ান করতেন, ৩. ফিরআউন বংশের মুমিন, ৪. ইয়াসীনের সঙ্গী, ৫. হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, ৬. উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ এবং তাঁদের পর ৭. হুদায়বিয়ার শহীদগণ এবং তাঁদের পর ৮. আহযাব বা খ ক যুদ্ধের শহীদগণ এরপর ৯. হুনাইন যুদ্ধের শহীদগণ, তাঁদের পর ১০. ঐ সব শহীদ যাঁরা অসৎ খারেজীদের হাতে নিহত হবে, তাঁদের পর ১১. রোমের (পাশ্চাত্য) মহাসমরের পূর্ব পর্যন্ত মহান আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ। অতঃপর যখন রোমের মহাসমর সংঘটিত হবে তখন ঐ যুদ্ধের শহীদগণ বদর যুদ্ধের শহীদদের সমতুল্য হবেন।[৩৮০]

উক্ত রেওয়ায়েতে উল্লিখিত 'হুদায়বিয়ার শহীদগণ'- এ বাক্যটি সম্ভবত ভুলক্রমে সংযোজিত হয়েছে। কারণ, কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থেই হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া ও তাতে কেউ নিহত হওয়ার কথা বলা হয় নি।

আহলে বাইতের উদ্ধৃতি দিয়ে শিয়া হাদীস সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ শহীদগণ হচ্ছেন শহীদদের নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর সঙ্গী-সাথিগণ এবং ঐ সব শহীদ যাঁরা ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গী হবেন।

মুসলিম দেশসমূহের ওপর পাশ্চাত্যের সর্বশেষ আক্রমণ ও আগ্রাসন চালানোর সময়কাল

রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের সাথে শান্তি ও সন্ধি চুক্তির সময়কাল হবে সাত বছর; তবে তারা দু'বছর পার হবার পর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তিন বছর গত হবার পর মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ করবে। উদাহরণস্বরূপ আরতাত থেকে উদ্ধৃত ইবনে হাম্মাদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "মাহদীর হাতে সুফিয়ানীর নিহত হওয়া এবং কালব গোত্রের[৩৮১] সকল সম্পদ গণীমতে পরিণত হবার পর মাহদী ও রোমের শাসনকর্তার মাঝে এক সন্ধি ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে যার ভিত্তিতে তোমাদের ও তাদের ব্যবসায়ীরা একে অপরের দেশে যাতায়াত করতে থাকবে এবং তারাও তিন বছর ধরে তাদের নৌবাহিনীকে পুনর্গঠন ও যুদ্ধ জাহাজগুলোকে নির্মাণ কাজে রত হবে (অস্ত্রশাস্ত্র ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করবে); অবশেষে রোমীয়দের যুদ্ধ জাহাজসমূহ সূর থেকে আক্কা পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল ও সমুদ্রের তীরে নোঙ্গর ফেলবে এবং ঐ জায়গা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে।" (ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৪২)

যে রেওয়ায়েতটিতে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার নয় মাস পরে রোমীয়রা বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করবে, তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

পাশ্চাত্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে

ইমাম মাহদী (আ.)- এর হাতে ফিলিস্তিন ও শামে পাশ্চাত্যের শোচনীয় পরাজয়বরণ পাশ্চাত্য জাতিসমূহ এবং তাদের ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে এবং নিঃসন্দেহে একমাত্র হযরত ঈসা (আ.), ইমাম মাহদী (আ.) এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্য থেকে ইমাম মাহদীর সমর্থনকারী জনতার কথা ও ক্ষমতাই সেখানে (পাশ্চাত্যে) কেবল কার্যকর হবে। পাশ্চাত্যে ইমাম মাহদীর সমর্থক গণশক্তির জোয়ার ও উত্থাল তরঙ্গ মালা সেখানকার ক্ষমতাসীন কুফরী- বস্তুবাদী খোদাদ্রোহী সরকারগুলোর পতন ঘটিয়ে এমন সব সরকার কায়েম করার দায়িত্ব নেবে যারা ইমাম মাহদীর সরকার ও প্রশাসনের সাথে সংহতি ঘোষণা করবে।

শিয়া- সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহে বিদ্যমান হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহের ভাষ্য মোতাবেক ইমাম মাহদী (আ.) পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন এবং স্বীয় সঙ্গী- সাথি ও সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে রোমের সর্ববৃহৎ নগরী অথবা পাশ্চাত্যের শহর ও নগরীগুলো জয় করবেন। কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী সঙ্গী- সাথিদের সাথে নিয়ে তাকবীর দিয়ে (রোমের) ঐ সব শহর ও নগরী জয় করবেন।[৩৮২]

আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি রোমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবেন এবং সঙ্গী- সাথিদের সাথে নিয়ে রোমের সর্ববৃহৎ নগরী মুক্ত করবেন।[৩৮৩]

ইমাম সাদিক (আ.) বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : "তখন রোমের অধিবাসী তার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং ইমামও তাদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে এবং সঙ্গী- সাথিদের মধ্য থেকে একজনকে পাশ্চাত্যে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবে।"[৩৮৪]

এ রেওয়ায়েতে আরো বর্ণিত হয়েছে : রোমের যে নগরী ইমাম মাহদী জয় করবেন তা বাহ্যত পাশ্চাত্যের রাজধানী ও এর মূল কেন্দ্র হয়ে থাকবে।[৩৮৫]

لهم في الدّنيا خزي (তাদের জন্য রয়েছে এ পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও অপমান)-   এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরামাহ্ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে : রোমে একটি নগরী আছে যা মুক্ত করা হবে।[৩৮৬]

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে : সত্তর হাজার মুসলমানের তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে তিনি (মাহদী) পাশ্চাত্যের একটি নগরী মুক্ত করবেন।[৩৮৭]

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশ্বজনীন শাসনের একটি চিত্র

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দানকারী স্পষ্ট আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর ঐশ্বরিক দায়িত্ব অত্যন্ত মহান এবং বিবিধ দিক, সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যমণ্ডিত হবে। স্বয়ং এ বিষয়টিই হচ্ছে এমন এক সুমহান পদক্ষেপ যা পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেবে এবং মানব জাতির সামনে সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা করবে।

এমনকি যদি তাঁর দায়িত্ব কেবল নতুনভাবে ইসলামের পুরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণ, ন্যায়ভিত্তিক ও ঐশ্বরিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা এবং পার্থিব জগতকে আলোকোজ্জ্বল করার সাথেই সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে সেটাই হবে যথেষ্ট। তবে এতকিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁর যুগে এবং এর পরে বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবনের উন্নতি ও পূর্ণতা এমনভাবে নিশ্চিত করবেন যে, যা এর পূর্ববর্তী পর্যায়গুলো উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর সাথে অতুলনীয় হবে।

আর অস্তিত্বের গভীরতা এবং উর্ধ্বলোক ও এর বাসি াদের কাছে পৌঁছানো ও প্রবেশাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করার মিশন যা কিয়ামত ও পারলৌকিক জীবন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে গায়েবী অজড় জগৎ এবং দৃশ্যমান এ পার্থিব জগতের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ঐক্য ক্রিয়াশীল রাখার ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ভূমিকা পালন করবে।

আমরা এখন এ গ্রন্থের কলেবর অনুসারে এ দায়িত্ব বা মিশনের বিভিন্ন দিক ও পর্যায়ের একটি খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরব।

অন্যায়- অত্যাচার ও জালিমদের থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করা

প্রথম দর্শনে এমনটা মনে হতে পারে যে, জুলুম, তাগুতী শক্তিবর্গ এবং অত্যাচারীদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়া আসলে একটি অসম্ভব বিষয়। আর এ পৃথিবী যেন মজলুমদের আর্তনাদ ও ক্র ন ধ্বনিতে ভরে গেছে এবং এগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যেন কোন ত্রাণকর্তা নেই। বিশ্ব যেন অত্যাচারীদের অশুভ অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে। অবস্থা এতটাই সঙ্গিন যে, ইতিহাসে এমন কোন

অধ্যায় বা যুগ আমাদের জানা নেই যা জালিমদের থেকে মুক্ত থেকেছে। কারণ, এসব জালিম আগাছা- পরগাছা ও অপবিত্র উদ্ভিদের ন্যায় সমাজের অভ্যন্তরে এমন সুদৃঢ় মূল বিস্তার করেছে যার একটিকে উপড়ে ফেলা হলে তার জায়গায় দশগুণ আগাছা- পরগাছা জন্মায়। আর কোন এক প্রজন্মে জালেমরা ধবংস হয়ে গেলেও অন্য প্রজন্মসমূহে দলে- দলে জালেম জন্ম লাভ করে।

কিন্তু মহান প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এতেই কল্যাণ নিহিত রেখেছেন যে, মানবজীবন সত্য- মিথ্যা এবং ভালো ও মে র মধ্যকার দ্বন্দ্ব- সংঘাতের ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করবে। তিনি প্রতিটি পদার্থের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সীমা- পরিসীমা, প্রতিটি সময় ও কালের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাগ্য এবং পরিশেষে সকল অন্যায়- অবিচারের জন্যও তিনি একটি পরিণতি নির্ধারণ করেছেন।

“সেদিন অসৎকর্মশীল ব্যক্তিরা নিজেদের চেহারা ও মুখ- মণ্ডলের দ্বারা চি িহ্নত হবে। অতঃপর...”

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

“মহান আল্লাহ্ তাদেরকে সব সময় চেনেন। তবে উপরিউক্ত আয়াতটি আল কায়েম আল মাহদীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। সে পাপীদেরকে তাদের চেহারা ও মুখ- মণ্ডলের দ্বারা চিনবে এবং সে ও তার সাথীরা তরবারি দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার মতো শাস্তি দেবে।”[৩৮৮]

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) বলেছেন : “মহান আল্লাহ্ আমাদের (আহলে বাইতের) মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে অকস্মাৎ (মুসলিম উম্মাহর জন্য) এক মহামুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। আমার পিতা সর্বশ্রেষ্ঠা দাসীর সন্তানের (ইমাম মাহদী) জন্য কোরবান হোন...। দীর্ঘ আট মাসে শত্রুরা তার কাছ থেকে তরবারি ও হত্যাকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই পাবে না।”[৩৮৯]

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “মহানবী (সা.) নিজ উম্মতের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ প্রদর্শন করতেন এবং তিনি জনগণকে অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করতেন। আর আল কায়েম আল মাহদী শত্রুদেরকে হত্যা করবে এবং কারো তাওবা সে গ্রহণ করবে না। তার সাথে সার্বক্ষণিক যে অঙ্গীকারপত্র আছে সে তার দ্বারাই এ কাজ করতে আদিষ্ট হয়েছে। ঐ ব্যক্তির জন্য আক্ষেপ যে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।”[৩৯০]

‘যে অঙ্গীকারপত্রটি তার সাথে আছে’ সেটা হচ্ছে ঐ প্রসিদ্ধ অঙ্গীকারপত্র যা তিনি তাঁর প্রপিতামহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর কাছ থেকে পেয়েছেন। রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে ঐ অঙ্গীকারপত্রে এ বাক্যটিও বিদ্যমান : “হত্যা কর, আবারও হত্যা কর এবং কারো তাওবা গ্রহণ করবে না।”

ইমাম বাকির (আ.) আরো বলেছেন : “তবে প্রপিতামহ মহানবী (সা.)- এর সাথে মাহ্দী (আ.)- এর সাদৃশ্য হলো সেও তরবারি সহকারে আবির্ভূত হবে এবং তার অভ্যুত্থানেরও লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রু এবং অত্যাচারী- তাগুতীদেরকে হত্যা করা। সে তরবারির দ্বারা শত্রুদের অন্তরে ভয়- ভীতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিজয়ী হবে এবং তার সেনাবাহিনী পরাজিত হবে না।”[৩৯১]

ইমাম জাওয়াদ (আ.) বলেছেন : “মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত সে বিরামহীনভাবে মহান আল্লাহর শত্রুদেরকে হত্যা করতেই থাকবে। যখন সে তার অন্তরে দয়া ও করুণা অনুভব করবে তখনই সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগত হবে।”[৩৯২]

এই একই হাদীসগ্রন্থে ইমাম জাওয়াদ (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “যখন তার সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা পর্যাপ্ত সংখ্যক অর্থাৎ দশ হাজার হবে তখন সে মহান আল্লাহর নির্দেশে আবির্ভূত হবে এবং মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ না করা পর্যন্ত সে বিরামহীনভাবে খোদার শত্রুদেরকে হত্যা করতে থাকবে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম : “তিনি কিভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির ব্যাপারে অবগত হবেন?” তিনি বলেছিলেন : “মহান আল্লাহ্ তখন তাঁর অন্তরে দয়া ও করুণার উদ্রেক করবেন।”

বরং রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর কতিপয় সাহাবী তাঁর হাতে জালিমদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতের কারণে তাঁর ব্যাপারে স ে হ পোষণ করবে এবং তাঁর কাছে প্রতিবাদও জানাবে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “যখন সে সালাবীয়ায় পৌঁছবে তখন তারই এক আ ীয় যে ইমাম মাহদী ব্যতীত জনগণের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিশালী হবে সে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবে : হে অমুক! আপনি কি করছেন? মহান আল্লাহর শপথ, আপনি

জনগণকে আপনার সামনে থেকে ছাগল- ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যেমনভাবে রাখাল অথবা নেকড়ে দুম্বা- ভেড়ার পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে মহানবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে কি আপনার প্রতি কোন অঙ্গীকার পত্র বা অন্য কিছু আছে? এ সময় যে ব্যক্তি ইমাম মাহদীর পক্ষ থেকে জনগণের বাইআত গ্রহণ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে সে বলবে : চুপ কর! নইলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। তখন আল কায়েম আল মাহদী (আ.) বলবে : হে অমুক! চুপ কর। হ্যাঁ, মহান আল্লাহর শপথ, আমার সাথে মহানবী (সা.)- এর কাছ থেকে একটি সনদ আছে। হে অমুক! ছোট সিন্দুকটি নিয়ে আস। ঐ ব্যক্তি তাঁর কাছে সিন্দুকটি নিয়ে আসবে। ইমাম মাহদী তখন মহানবীর সনদটি পাঠ করবে। ইত্যবসরে ঐ প্রতিবাদকারী লোকটি বলবে : আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হই; অনুমতি দিলে আমি আপনার মাথায় চুম্বন করব। ইমাম মাহদী তখন তার পবিত্র মস্তক সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেবে এবং ঐ ব্যক্তি তার দু'চোখের মাঝখানে চুম্বন করবে। সে আবারও বলবে : মহান আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিন। আপনি আবারও আমাদের বাইআত নবায়ন করুন। আর ইমাম মাহদীও তাদের বাইয়াত নবায়ন করবে।"[৩৯৩]

নিঃসন্দেহে বেশ কিছু প্রমাণ অথবা এমন একটি নিদর্শন থাকবে যেগুলো বা যার মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সঙ্গীরা অনুধাবন করতে পারবে যে, ঐ অঙ্গীকারপত্রটি মহানবী (সা.)- এর। তবে ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে বাইয়াত নবায়ন করার জন্য তাদের পুনঃ আবেদন এ কারণে হবে যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে (অর্থাৎ ব্যাপক রক্তপাত ও হত্যার ব্যাপারে) তাদের আপত্তি এক প্রকার বাইয়াত ভঙ্গকরণ বলে বিবেচিত হবে।

কতিপয় ব্যক্তি ইমাম মাহদী ধ্বংস ও শাস্তিদানের বিষয়টি ,কর্তৃক অত্যাচারীদেরকে হত্যা (.আ) পাষণ্ডতা এবং হত্যাকাণ্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বলে গণ্য করতে পারে । কিন্তু এ কাজ বাস্তবে একটি শল্য সিকিৎসা সদৃশ যা বিদ্রোহী ও অত্যাচারীদের অপবিত্র অস্তিত্ব থেকে মুসলিম সমাজ এবং বিশ্বের অন্য সব সমাজকে পবিত্র করার জন্য আবশ্যক । এটি ছাড়া কখনোই অন্যায় অত্যাচারের পরিসমাপ্তি হবে না এবং ন্যায় পরায়ণতা কর্তৃত্বশীল হবে না । যদি ইমাম মাহদী (আ.) তাদের সাতে কোমল আচরণ করেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে কখনোই

উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী চক্রের নতুন নতুন ষড়যন্ত্র ও প্রচারণা বন্ধ হবে না । উল্লেখ্য যে এ সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জীবন আসলে এ সব ষড়যন্ত্র ও প্রচারণার উপরই নির্ভরশীল । কারণ, বর্তমান সমাজসমূহে অত্যাচারীরা একটি গাছের শুকনো ডালপালার মতো বরং তারা হচ্ছে ক্য ারসদৃশ যা কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও রোগীর প্রাণ রক্ষার জন্য অবশ্যই কেটে ফেলা উচিত ।

অবশ্য এ ধরণের নীতি- আবস্থানের ক্ষেত্রে যা স হ পোষণকারীদের চিত্ত প্রশান্ত করে তা হচ্ছে, ইমাম মাহদীর সাথে মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিখ্যাত অঙ্গীকারপত্র আছে । মহান আল্লাহ তাকে জনগণ ও তাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন । তিনি মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে যে কোন লোকের দিকে তাকানো মাত্রই তাকে চিনে ফেলবেন এবং তার রোগের প্রতিষেধক সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকবেন । সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই যে, যে সব ব্যক্তির সুপথপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে তারা ইমাম মাহদীর হাতে নিহত হবে না । এ বিষয়টি যেন হযরত খিজির (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)- এর কাহিনীতে হযরত খিজিরের হাতে শিশুটির নিহত হওয়ার মতোই । এ কাহিনীতে বর্ণিত হয়েচে যে, যাতে ঐ ছেলে বড় হয়ে পিতা- মাতাকে খোদাদ্রোহিতা ও কুফরীর পথে নিয়ে না যায় সেজন্য তিনি ছেলেটিকে হত্যা করেছিলেন । বরং রেওয়ায়েতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, খিযির (আ.) ইমাম মাহদী (আ.) এর সাথে আবির্ভূত ও তার সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।বাহ্যত পরিদৃষ্ট হয় যে, খিযির (আ.) কল্যাণের বিকাশ এবং মুমিনদের থেকে অকল্যাণসমূহ দূর করা এবং এক শক্তিশালী অপবিত্র মহীরুহে পরিণত হবার আগেই ফিতনা- ফ্যাসাদ ও দুর্নীতির বীজ ধ্বংস করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে লাদুনী (আধ্যা ি ক দিব্যজ্ঞান) ব্যবহার করবেন : "আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দয়া প্রদর্শন করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ থেকে (দিব্য) জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম ।[৩৯৪]

শক্তিশালী সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর সরকার ও প্রশাসনে হযরত খিযির (আ.) ও তার সঙ্গীদের প্রকাশ্য ভূমিকা থাকবে । জনগণের ওপর এ সব মহান ব্যক্তির বেলায়েতের হক এবং ইমাম মাহদীর বিশ্ব- প্রশাসনে বাহ্যিক আইন কানুন এবং অবস্থা ল ন করার অধিকার তাদের থাকবে । রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)

মহান আল্লাহর প্রকৃত বিধান অনুসারে জনগণের মাঝে বিচার কাজ সম্পন্ন করবেন । উল্লেখ্য যে, , মহান আল্লাহই ইমাম মাহদীকে প্রকৃত বিচার করার ক্ষমাত প্রদান করবেন । এ কারণেই তিনি কারো কাছে সাক্ষী অথবা দলিল- প্রমাণ চাইবেন না । তিনি অত্যাচারী ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদেরকে নির্মূল করার ক্ষেত্রে তার খোদাপ্রদত্ত আধ্যা ক ও প্রকৃত জ্ঞান প্রয়োগ করবেন । কখনো কখনো তার সঙ্গীরাও জনগণের সাঝে বিচার- ফয়সালা এবং অপরাধীদের ধ্বংস করার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি বেছে নেবেন । কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রে তারা জনগণের সাথে তাদের প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতে আচরণ করবেন । তবে হযরত খিযির (আ.) ও তার সঙ্গীরাই ঐ সব বিশেষ যোগ্রতার অধিকারী হবেন ।

ইসলামের পুর্জাগরণ এবং ধর্মের সর্বজনীনতা

“তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তার রাসূলকে সত্য ধর্ম এবং মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্য প্রেরণ করেছেন যাতে তা সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে যদিও কাফিররা তা অপছ করে।”[৩৯৫] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন : “মহান আল্লাহ কি এখন পর্যন্ত এ আয়াতের বাস্তব নমুনা প্রকাশ করেছেন? না, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এমন কোন জনপদ পৃথিবীর বুকে থাকবে না যেখানে সকাল- সন্ধায় মহান আল্লাহর একত্ব এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা হবে না।[৩৯৬]

ইবনে আব্বাস বলেছেন : “ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ব্যতীত কোন ইহুদী, নাসারা অথবা অন্য ধর্মের অনুসারী থাকবে না। অবশেষে জিযিয়া কর (যিম্মী বিধর্মী কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ কর যার বিনিময়ে ইসলামী প্রশাসন তাদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস, নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা প্রতান করে) উঠিয়ে দেয়া হবে, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং শুকুর হত্যা করা হবে। এটিই হবে নি াক্ত আয়াতের বাস্তব নমুনা : ‘যাতে তিনি ইসলাম ধর্মকে সব ধর্মের ওপর বিজয়ী এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন যদিও কাফেররা তা পছ করে না।’ আর এ ঘটনা হযরত কায়েম আল মাহ্দীর হাতে বাস্তবায়িত হবে।”[৩৯৭]

‘জিযিয়া কর উঠিযে নেয়া হবে’ (বিলুপ্ত করা হবে) - এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, আহলে কিতাবের কাছ থেকে ইসলাম ব্যাতীত আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

আবু বসীর বলেছেন : “নি াক্ত এ আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম সাদিক (আ.) - এর কাছে প্রশ্ন করলাম : ‘তিনিই সেই আল্লাহ যিনি রাসূলকে সত্য ধর্মসহ মানব জাতিকে হিদায়াত করার জন্য প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি ইসলাম ধর্মকে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন যদিও কাফিররা তা অপছ করে’। ইমাম বললেন : মহান আল্লাহর শপথ, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এখনো বাস্তবায়িত হয় নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম :

আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত হোক । এটি কখন বাস্তবায়িত হবে ? তিনি বললেন : যখন মাহন আল্লাহর ইচ্ছায় আল কায়েম আল মাহদী আবির্ভূত হবে ও সংগ্রাম করবে ।যখন সে আবির্ভূত হবে তখন কাফির ও মুশরিকরা তার আবির্ভাব, আে ালন ও সংগ্রামের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়বে ; কারণ, কোন পাথরের পিছনে যদি কোন কাফির বা মুশরিক লুকায় তাহলে ঐ পাথর সবাক হয়ে বলবে : হে মুসলমান! আমার আশ্যয়ে কাফির বা মুশরিক লুটিয়ে আছে; তাকে হত্যা কর । আর সেও তখন তাকে হত্যা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।[৩৯৮]

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "(শত্রুর অন্তরে) ভয়-ভীতিবোধের উদ্ভব হবার ফলে আল কায়েম আল মাহদী বিজয়ী হবে । সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পাবে ও সমর্থিত হবে । দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করে তার কাছে লোকজন ছুটে আসবে । তার জন্য মাটির নিচে প্রেথিত গুপ্তধন বের হয়ে আসবে । তার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব সমগ্র প্রাচ্যoপাশ্চাত্যকে শামিল করবে । মহান আল্লাহ তার ধর্মকে তার মাধ্যমে বিশ্বের সব ধর্ম ও মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করবেন যদিও মুশরিকরা তা অপছ ও এর বিরোধীতা করবে । সে প্রথিবীর বুকে বিধ্বস্ত ও বিরাণ হয়ে যাওয়া জনপদ ও অঞ্চলসশূহ আবাদ করবে । তখন ঈসা রুহুল্লাহ পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং তিনি তার পেছনে নামায পড়বেন ।"[৩৯৯]

ইমাম বাকির (আ.) উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : "সেদিন মহানবী (সা.) এর রিসালাত মেনে নেয়া ও তা স্বীকার করা ব্যতীত (ধরাণির বুকে) কোন ব্যক্তিই থাকবে না ।"[৪০০]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন ; "আমার পিতাকে (ইমাম বাকির) 'তোমরা সকল মুশরিকের বিরুদ্ধে তেমনিভাবে যুদ্ধ করবে যেমনভাবে তারা সবাই তার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল যাতে পৃথিবীতে ফিতনা না থাকে এবং ধর্ম পরিপূর্ণরূপে মহান আল্লাহর হয়ে যায়'- এ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল । তিনি বলেছিলেন ; এখনোও এ

আয়াতের তাফসীররের সময়কাল উপস্থিত হয়নি ।যখন আল কায়েম আল মাহদী আবির্ভূত হবে ও বিপ্লব করবে তখন যারা তাকে পাবে তারা নিজেরাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা- প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করবে ।যেমনভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন তেমনি অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) - এর ধর্ম তিমির রাত্রি শেষে সত্য প্রভাতের (সূবহে সাদিকের) মতো আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর বুকে তখন শিরকের কোন চিহ্নই থাকবে না ।”[৪০১]

একইভাবে এটি বিশ্ববাসীর জন্য স্মরণ ব্যাতীত আর টিছুই নয় এবং নিঃসন্দেহে ঐ সময়ের পরে এর সংবাদ সম্পর্কে তারা অবগত হবে ।’- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : “এটি আল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাবকালে সংঘটিত হবে ।”[৪০২]

‘অতি সত্বর আমরা তাদের কাছে আমাদের নিদর্শনসমূহ আকাশে এবং যমীনে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করব যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনিই সত্য ।’[৪০৩] –এ আয়াতের ব্যাখ্যায়ও ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : “মহান আল্লাহর (বানর ও শুকরের আকৃতিতে) তাদের রূপান্তর হয়ে যাবার বিষয়টি স্বয়ং তাদেরকেই দেখবেন এবং দিগন্তে আকাশের কিদচক্রবাল রেখাসমূহের দেবে যাওয়া এবং তাদের শহর এবং নগরসমূহের অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করাবেন । আর তারাও নিজেদের মাঝে এবং সমগ্র বিশ্বজুড়ে মহান আল্লাহর মহিমা ও শক্তি অনুভব করবে এবং যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনিই সত্য ।- এআয়াতের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে আল কায়েম আল মাহদীর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে বাস্তব ঘটনা; আর সমগ্র মানব জাতি অগত্যা তা প্রত্যক্ষ করবেই ।[৪০৪]

কতিপয় রেওয়াওয়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, কতিপয় কাফের, মুনাফিক এবং ইমাম মাহদী (আ.) এর বিরোধী হটাৎ করে বানর ও শুকরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে । ‘দিগন্তের ভেঙ্গে পড়া’র অর্থ হচ্ছে শহর ও নগরসমূহে বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ,

অস্থিরতা ও বিদ্রোহ এবং আধিপত্য বিস্তারকারী শাসকবর্গের আধিপত্য থেকে জাতিসমূহের মুক্ত হওয়া এবং 'আকাশের দিকচক্রবাল রেখার ভেঙ্গে পড়া'র অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হওয়া ।

'আকাশসমূহ ও যমীনে সবাই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তার কাছে আ সমর্পণ করেছে'- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "উপরিউক্ত আয়াত আল কায়েম আল মাহদীর শানে অবতির্ণ হয়েছে । যখন সে আবির্ভূত হবে তখন বিশ্বের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইহুদী, খ্রিষ্টান, তারকা পূজারী, বেদীন, মুরতাদ এবং কাফিরদের কাছে ইসলাম ধর্মকে উপস্থাপন করবে; তাই যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে তিনি নামায, যাকাত এবং যে সব বিধান মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব সেগুলো পালন করতে বাধ্য করবেন । আর যে ইসলাম ধর্ম পালন করতে সম্মত হবে না তাকে তিনি হত্যা করবেন । এভাবে সমগ্র বিশ্বে কেবল একত্ববাদী ব্যতীত আর কোন ধর্মাবলম্বী থাকবে না । আমি বললাম : আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হই । কাফির ও বেদীনদের সংখ্যাই তো বেশী । তখন তিনি বলেছিলেন : অবশ্য যখন মহান আল্লাহ কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি অগণিতকে নগণ্য করে দেন ।"[৪০৫]

তবে এতদপ্রসঙ্গে শিয়া ও সুন্নী সূত্রসমূহে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত হচ্ছে এটিই যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর কুনিয়াহ হচ্ছে আবুল কাসিম যা মহানবী (সা.)- এর কুনিয়াহ । মহানবী (সা.) বলেছেন : "মাহদী আমার বংশধারার অন্তর্ভুক্ত এবং ফাতিমার একজন বংশধর হবে । আমি যেভাবে ওহীর ভিত্তিতে সংগ্রাম করেছি তদ্রূপ সে আমার পথ ও পদ্ধতির ভিত্তিতে সংগ্রাম করবে ।"[৪০৬]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েচে : "যেভাবে আমি ইসলাম ধর্মের সূচনালগ্নে এ ধর্মসহ উত্তিত হয়েছি ও আে ালন করেছি তদ্রূপ সে সর্বশেষ যুগে ইসলাম ধর্মসহ উত্থিত হবে (বিপ্লব করবে) ।"[৪০৭]

একইভাবে তিনি বলেছেন : "বিশ্বে কেবল ইসলামের শাসনকর্তৃত্ব ছাড়া আর কিছুই থাকবে না ।তখন পৃথিবী রূপালী ফলকের মতো আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাবে ।"[৪০৮]

অর্থাৎ পৃথিবী কুফর ও নিফাক থেকে পবিত্র হয়ে খাঁটি রূপার টুকরার মতো উজ্জ্বল ও সুশোভিত বেশ ধারণ করবে ।

হযরত আলী (আ.) বলেছেন : "অন্যেরা যখন পবিত্র কোরআনকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা, অভিরুচি ও বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় (অর্থাৎ নিজেদের অভিরুচির ভিত্তিতে অপব্যাখ্যা করবে) তখন সে পবিত্র কোরআন থেকে তার আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে । সে বিশ্ববাসীকে ন্যায়প্রক্রিয়া কিভাবে অবলম্বন করতে হয় তা বাস্তবে দেখাবে এবং কিতাবে (কোরআন) ও সুন্নাহ যাকে পরিত্যাগ ও কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে তা পুনরুজ্জীবিত করবে ।"[৪০৯]

ইমাম মাহদী (আ.) পবিত্র কোরআনের অনুসরণ করবেন এবং বিচ্যুতদের মতো এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিকৃত করবেন না ।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পলায়নরত রক্তে রঞ্জিত কাতর পাখির মতো, আমাদের আহলে বাইতের এক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ তা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে না ।তখন সে তোমাদেরকে বছরে দু'বার পুর্স্কার এবং মাসে দু'টি জীবিকা প্রদান করবে । তোমরা তার সময় এমনভাবে প্রজ্ঞা অর্জন করবে যে, মহিলারা নিজ নিজ ঘরে মহান আল্লাহর কিতাব এবং মহানবী (সা.)- এর সুন্নাহর ভিত্তিতে বিচার করবে ।"[৪১০]

যেহেতু ইমাম বলেছেন 'রক্তে রঞ্জিত কাতর পাখির মতো' সেহেতু ইসলামের অবস্থা সংক্রান্ত একটি সূ উপমাস্বরূপ । ইসলাম হচ্ছে একটি আহত পাখির মতো যা পাখা মেলে ধরে এবং মুসলমানদেরকে ইসলামের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে । আর এ প্রক্রিয়া ঐ সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে যখন মাহদী (আ.) এ ধর্মকে মুক্তি দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং মুসলমানদের কাছে আবার ফিরিয়ে আনবেন । সে

তোমাদেরকে বছরে দু'বার পুরস্কার এবং মাসে দু'টি জীবিকা প্রদান করবে'- এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে বাইতুলমাল থেকে প্রতি ছয় মাস অন্তর একটি আর্থিক পুরস্কার এবং প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর খাদ্য- সামগ্রী এবং ভোজ্যদ্রব্য বন্টন করা হবে ।

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "ইসলাম ধর্ম শ্রীহীন ও হীন হওয়ার পর মহান আল্লাহ এ ধর্মকে তার মাধ্যমে সম্মান প্রদান করবেন, পরিত্যাক্ত ও অপাঙক্তেয় থাকার পর এ ধর্মকে পুনরায় জীবিত করবেন, জিযিয়হ পুনঃপ্রত্যাবর্তন করবেন এবং তরবারি দিয়ে কাফির ও প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তার পথে আহবান করবেন; আর যে এর বিরোধিতা করবে সে নিহত হবে; আর যে তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে সে-ই অপদস্ত হবে ।[৪১১]

তিনি আরো বলেছেন : "মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে সব ধরনের বিদআত দূরীভূত করবেন, প্রতিটি পথভ্রষ্টতাকে মিটিয়ে দেবেন এবং প্রতিটি সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করবেন ।"[৪১২]

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "পৃথিবীর বুকে এমন কোন বিরাণ ভূমি থাকবে না যা আবাদ হবে না । একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমা, মূর্তি ইত্যাদির মতো আর কোন উপাস্য থাকবে না যা অগ্নিদ হয়ে ধ্বংস হবে না ।"[৪১৩]

মানুষ যদি বিস্ময়বশত নিজেকেই প্রশ্ন করে, যে সব অমুসলিম জাতি পার্থিব জীবন যাপনে পূর্ণরূপে অভ্যস্ত, ঈমান এবং আধ্যা ি ক মূল্যবোধ থেকে বহু দূরে এবং ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করে তাদের মাঝে ইমাম মাহদী (আ.) কিভাবে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটাবেন, তাহলে এটিই স্বাভাবিক । তবে অবশ্যই প্রভূত বিশ্বাসভিত্তিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যককারণ যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি আমরা ইতোমধ্যে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের আ োলনের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত । এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বিশ্বের জাতিসমূহ পার্থিব ও ধর্মবর্জিত জীবনকে পরীক্ষা করে দেখেছে, এর স্বাদ নিয়েছে এবং

নিজেদের সমুদয় অস্তিত্ব ও বোধ দিয়ে এ জীবনের শূন্যতা এবং মানুষের বিবেকবোধের কাছে সঠিক জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে এর অপারগতা অনুভব করতে পেরেছে।

ঐসব কার্যকারণের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, পবিত্র ইসলাম ধর্ম আসলে স্বভাবজাত (ফিতরাত) ধর্ম । যদি অত্যাচারী শাসনকর্তারা এ ধর্মের আলো আলেম এবং সত্যিকার মুমিনদের মাধ্যমে জাতিসমূহের কাছে পৌছতে দেয় তাহলে তারা এ আলোর দিকে আকৃষ্ট হবে এবং দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে । আরেকটি বিষয় হচ্ছে এমন সব নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয় সংঘটিত হওয়া যা ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক বিশ্বের জাতিসমূহের জন্য বাস্তবায়িত হবে ।এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও স্পষ্ট বিষয় হবে আসমানী আহবান যা ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি । যদিও অত্যাচারী শাসকদের ওপর এ সব মুজিযার কার্যকরী প্রভাব ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল অথবা তা জনগণের ওপর ফলহীন, তবে তাদের নিজ নিজ জাতির ওপর এ সব মুজিযা বিভিন্নভাবে কার্যকরী প্রভাব রাখে । সম্ভবত তাদের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে ইমাম মাহদীর একের পর এক বিজয় । কারণ, পশ্চাত্যের জাতিসমূহ স্বভাবতই বিজয়ী শক্তিকে ভালবাসে এবং এগুলোর প্রশংসা করে , এমনকি যদি সেগুলো তাদের শত্রুও হয় । আরেকটি কারণ হযরত ঈসা (আ.) এর পৃথিবীতে অবতরণ এবং ঐ সব মুজিযা ও নিদর্শন যেগুলো মহান আল্লাহ তার শক্তিশালী হাতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ এবং পৃথিবীবাসী জন্য প্রকাশ করবেন । বরং বাহ্যত স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ভূমিকা ও তৎপরতা মূলত পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যেই হবে । আর স্বভাবতই পাশ্চাত্য জাতিসমূহ এবং তাদের শাসকরা শুরুতে তার সামনে উপস্থিতির কারণে আনি ত হয়ে তার প্রতি ঈমান আনবে । কিন্তু যখনই তিনি ইমাম মাহদী (আ.) এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে তার ঝোক ও অনুরাগ ব্যক্ত করবেন তখনই পাশ্চাত্য সরকারসমূহ তার ব্যাপারে সি হান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং সে সাথে তার প্রতি সর্বজনীন সমর্থন কমে যাবে । তবে পাশ্চাত্য

জাতিসমূহের মধ্য থেকে তার বেশ কিছু সঙ্গী ও সমর্থক থাকবে যাদের মধ্যে এমন এক আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হবে যে, তারা তাদের নিজ নিজ দেশে গণ আ ালনের জোয়াড় বইয়ে দেবে । আর এ বিষয়টি আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি ।

অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক দিক । ইমাম মাহদী (আ.) এর হাতে মুসলিম বিশ্বে জনকল্যাণের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা যথার্থভাবে পরিবর্তিত ও বিকশিত হবে । রেওয়ায়ে ও হাদীসসমূহের বক্তব্য অনুযায়ী মুসলমানরা তার যুগে এত বেশী নেয়ামতের প্রাচুর্য লাভ করবে যে, পৃথিবী ও জাতিসমূহের ইতিহাসে তা হবে অভূতপূর্ব । এ বিপরীতে অমুসলিম দেশসমূহে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবে । আর নিশ্চিতভাবে এ ধরণের পরিস্থিতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ওপর ব্যাপক প্রভা বিস্তার করবে ।

বস্তুগত জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন এবং জনকল্যাণের ব্যাপক বিকাশ

ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তার শাসনামলে অর্থনৈতিক কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ও বিকাশ ।

বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে, এ সব রেওয়ায়েত ও হাদীস মহানবী (সা.)-এর যুগে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহে আজ যে সব ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেগুলোর আগেই বর্ণিত হয়েছে । আর মানব জাতির পার্থিব জীবনকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, দৈনি ন, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রে এ সব পরিবর্তন অতীতের তুলনায় ভিন্ন । অধিকন্তু ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে মানুষের পার্থিব জীবনের যে ধরণের কথা রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের জানা আধুনিক যুগের জীবনের চেয়েও ব্যাপক । আর যা আমাদেরকে জনকল্যাণ ও

সমৃদ্ধির ঐ পর্যায়ে নিয়ে যাবে তা হচ্ছে মানব জাতির স্বাভাবিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের পরিবর্তন ও বিকাশ।

এখন আমরা এতৎসংক্রান্ত কতিপয় রেওয়ায়েত উল্লেখ করব :

ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ উত্তোলন এবং জনগণের মাঝে তা বন্টন

এতৎসংক্রান্ত প্রচুর রেওয়ায়েত ও হাদীস বিদ্যমান ।যেমন এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি প্রণিধানযোগ্য। মহানবী (সা.) বলেছেন : "পৃথিবী তার জন্য এর সমুদয় সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য বের করে দেবে এবং সে জনগণের মধ্যে অগণিত ধন-সম্পদ বণ্টন করবে।"[৪১৪]

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : "...সে ভূ-গর্ভ থেকে স্তম্ভের মতো স্বর্ণ উত্তোলন করবে।"[৪১৫]

আর এ রেওয়ায়েতটি শিয়া ও সুন্নী সূত্রসমূহে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তা অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণ নির্দেশ করে। আর সে সাথে ইমাম মাহদী (আ.)-এর দানশীলতা ও মানব জাতির প্রতি তাঁর মমত্ববোধ এবং ভালোবাসাও এ রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "যখন আহলে বাইতের আল কায়েম আবির্ভূত হবে এবং আে ালন করবে তখন সে যাবতীয় সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে জনগণের মাঝে বণ্টন করবে এবং সর্বত্র ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। যে কেউ তার আনুগত্য করবে সে আসলে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করবে এবং যে কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করবে সে আসলে মহান আল্লাহরই বিরুদ্ধাচরণ করবে। সে আনতাকিয়ার একটি গুহা থেকে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ বের করে আনবে এবং তাওরাতের বিধানের ভিত্তিতে ইহুদীদের মধ্যে, ইঞ্জিলের বিধান অনুযায়ী খ্রিস্টানদের মধ্যে, যবুরের বিধানের ভিত্তিতে এ গ্রন্থের অনুসারীদের মধ্যে এবং পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে। পৃথিবীর অভ্যন্তর ও বাইরের যাবতীয় সম্পদ তার কাছে সঞ্চিত হবে। আর সে জনগণকে আহবান করবে : তোমরা সবাই যে জিনিসের জন্য আ ীয়তা ও রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করেছ, পরস্পরের রক্ত

ঝরানো হালাল বলে গণ্য করেছ এবং হারামসমূহ আঞ্জাম দিয়েছ সে দিকে চলে এসো...। সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এতটা দেবে যে, এর পূর্বে সে কারো কাছ থেকে তা পায় নি। সে পৃথিবীকে যেমনভাবে তা অন্যায়-অবিচার, বৈষম্য ও অকল্যাণ দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তেমনি ন্যায়বিচার দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবে।”[৪১৬]

মুসলিম উম্মাহর নেয়ামতসমূহের অধিকারী হওয়া এবং সমগ্র পৃথিবীর আবাদ ও পুনর্গঠিত হওয়া

মহানবী (সা.) বলেছেন : "মাহদীর যুগে আমার উম্মত এমন নেয়ামত লাভ করবে যে, তারা পূর্বে কখনই তা লাভ করে নি। আকাশ থেকে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তখন পৃথিবীর বুকে সব ধরনের উদ্ভিদই জন্মাবে।"[৪১৭]

তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁর উম্মত তাঁর (মাহদী) কাছে এমনভাবে আশ্রয় নেবে যেমনভাবে মক্ষীরাণীর কাছে মৌমাছিরা আশ্রয় নিয়ে থাকে। তিনি পৃথিবীকে যেভাবে তা অন্যায়- অবিচার ও বৈষম্য দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে ন্যায়বিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন। আর সমগ্র মানব জাতি ঠিক তাদের আদি সমাজের মতো হয়ে যাবে। তিনি কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করবেন না এবং কোন রক্ত ঝরাবেন না (অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবেন না)।"[৪১৮]

মনে হচ্ছে 'ঠিক তাদের আদি সমাজের মতো'- এ বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে আদি মানব সমাজ যা এক অখণ্ড জাতি ছিল। মানব জাতি স্বভাবজাত প্রকৃতি ও নির্মলতার ভিত্তিতে জীবন যাপন করত এবং তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য ছিল না। আর এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে : "মানব জাতি এক অখণ্ড জাতি ছিল।"[৪১৯]

এ বিষয়টি কতিপয় রেওয়ায়েত ও হাদীসের মতামতকে সমর্থন করে। কারণ, ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগে মানব সমাজ প্রথমে দারিদ্র্যমুক্ত ও অভাবমুক্ত একটি সমাজে পরিণত হবে। অতঃপর তখন তা মতভেদ, টানাপড়েন ও দ্বন্দ্ব- সংঘাতবিহীন প্রেম- প্রীতি, সৌহার্দ্র্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে যেখানে বিচারকার্য ও বিচারালয়ের কোন প্রয়োজন হবে না। এর পরবর্তী পর্যায়ে ঐ সমাজ এমন এক সমাজে রূপান্তরিত হবে যেখানে অর্থ ও টাকা- পয়সা ছাড়াই সব ধরনের লেন- দেন সম্পন্ন হবে। জনগণ তখন মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় একে অপরের সেবা করবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পবিত্র বংশধরগণের ওপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে নিজেদের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করবে।

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন : "আসমান ও যমীনের বাসি ারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করার ব্যাপার কার্পণ্য করবে না এবং যমীনেও উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও তরুলতা জন্মানোর পথে কোন বাধা থাকবে না অর্থাৎ পৃথিবী বৃক্ষ, তরুলতা, ফুলে- ফলে ভরে যাবে। এর ফলে জীবিতরা আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে : হায় যদি এ সব নেয়ামত ভোগ করার জন্য মৃতরা জীবিত হতো।"[৪২০]

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "মহান আল্লাহ্ তার মাধ্যমে নিজ ধর্মকে বিজয়ী করবেন যদিও কাফের- মুশরিকরা তা পছ করবে না এবং পৃথিবীর সমস্ত বিধ্বস্ত ও বিরাণ এলাকা তার মাধ্যমে আবাদ হয়ে যাবে।"[৪২১]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "মাহদী মানব জাতির প্রাণপ্রিয় নেতা এবং মহান আল্লাহ্ তার মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ফিতনার প্রজ্বলিত অগ্নি নিভিয়ে দেবেন।"[৪২২]

مدهامّتان এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "পবিত্র মক্কা ও মদীনা খেজুর গাছের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যাবে।"[৪২৩]

সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে : "যে বছর আল কায়েম আল মাহদী আবির্ভূত হবেন এবং কিয়াম করবেন সে বছর চব্বিশ বার পৃথিবীর ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হবে যার বরকত ও কল্যাণকর প্রভাব সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হবে।"[৪২৪]

ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করছেন : "মাহদীর চিহ্ন হচ্ছে নিজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপারে কঠোর আচরণ, মুক্ত হস্তে ধন- সম্পদ দান এবং দুঃস্থ, সহায়- সম্বলহীন মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া।"

আরো বর্ণিত হয়েছে : "মাহদী যেন অসহায়দের মুখে মাখন পুরে দেবেন।"[৪২৫]

প্রাকৃতিক বি   ান ও জীবন- ধারণের উপায়- উপকরণের পরিবর্তন

ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে অতীত ও বর্তমান প্রজন্মসমূহের বহু অস্বাভাবিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন : গণযোগাযোগের মাধ্যমসমূহ, গবেষণা কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, অডিও- ভিজুয়াল সামগ্রীসমূহ, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ, সরকার ও প্রশাসন, বিচার- ব্যবস্থা এবং আরো অন্যান্য বিষয় যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি আবার বাহ্যত কারামত বা মুজিযাস্বরূপ। আর মহান আল্লাহ্ এগুলোই ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করবেন। তবে এসব বিষয়ের অনেকগুলোই আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহে (পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যা) পরিবর্তন এবং মহান আল্লাহর ঐশী নিয়ম ও নেয়ামতসমূহের যথার্থ ব্যবহার থেকে উদ্ভূত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বিভিন্ন প্রকার মৌল ও খনিজ পদার্থ হিসাবে পৃথিবী ও মহাকাশে মানুষের হাতের নাগালেই আছে। বেশ কিছু রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর মাধ্যমে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে তা পৃথিবীতে মানব জীবনের যাবতীয় দিক ও পর্যায়ে উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপস্বরূপ।

এ কারণেই ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : “জ্ঞান সাতাশটি অক্ষর (শাখা- প্রশাখা) সমতুল্য। সকল নবী- রাসূল সম্মিলিতভাবে যা এনেছেন তা আসলে জ্ঞানের দু’টি অক্ষরস্বরূপ। মানব জাতি মাহদীর আবির্ভাবের দিবস পর্যন্ত এ দু’টি অক্ষরের বেশি কিছু জানতে পারবে না। আর যখন আল কায়েম আল মাহদী আবির্ভূত হবে ও কিয়াম করবে তখন সে জ্ঞানের অবশিষ্ট পঁচিশটি অক্ষর বের করে তা মানব জাতির মধ্যে প্রচার করবে; আর এভাবে সে জ্ঞানের সাতাশ ভাগই প্রচার করবে ও জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেবে।”[৪২৬]

এ রেওয়ায়েতে যদিও মহান নবী- রাসূলদের আনীত জ্ঞান- বিজ্ঞানের দিকে দৃকপাত করা হয়েছে তবুও মহান আল্লাহর পরিচিতি (স্রষ্টাতত্ত্ব), রিসালাত ও আখিরাত সংক্রান্ত জ্ঞান ছাড়াও এ রেওয়ায়েতে প্রাকৃতি বিজ্ঞানসমূহের দিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। আর বর্ণিত হাদীসসমূহ অনুযায়ী

মহান নবিগণ মানব জাতিকে এ সব জ্ঞানের কতিপয় মূলনীতিও শিখিয়েছেন এবং তাদেরকে এ দিকে ধাবিত করে তাদের সামনে এসব জ্ঞান- বিজ্ঞানের গুটিকতক প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছেন। যেমন : হযরত ইদ্রিস (আ.)- এর মাধ্যমে সেলাই শিক্ষা, হযরত নূহ (আ.)- এর মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ এবং কাঠের কাজ ও আসবাবপত্র প্রস্তুত করার পদ্ধতি এবং হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)- এর মাধ্যমে বর্ম তৈরি করার পদ্ধতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ রেওয়ায়েতে জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও হতে পারে এতদর্থে যে, ইমাম মাহদী (আ.) মানব জাতিকে যে জ্ঞান- বিজ্ঞান শিখাবেন সেটার অনুপাত হবে ২ : ২৫।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : "তোমরা জেনে রাখ, যূলকারনাইন বশীভূত ও অবাধ্য মেঘদ্বয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে তিনি বশীভূত মেঘকে বেছে নেন এবং তোমাদের বন্ধু ও প্রিয়ভাজন ব্যক্তিটির (মাহদী) জন্য ঐ অবাধ্য মেঘটি বরাদ্দকৃত হয়েছে।" রাবী বলেন : "আমি প্রশ্ন করলাম : উদ্ধত মেঘ কোনটি?" তিনি বললেন : "যে মেঘে গর্জন, বিদ্যুত ও বজ্রপাত আছে সেই মেঘটি- যার ওপর তোমাদের প্রিয়ভাজন ব্যক্তিটি সওয়ার হবে। তোমরা জেনে রাখ, সে মেঘের ওপর আরোহণ করে যাবতীয় উপায়- উপকরণসমেত উর্ধ্বাকাশে উড়ে যাবে। এসব উপায়- উপকরণ হচ্ছে সাত আসমান ও যমীন যেগুলোর পাঁচ স্তর আবাদ এবং দুই স্তর বীরাণ সেগুলোর সকল উপায়- উপকরণ।"[৪২৭]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "আল কায়েমের যুগে প্রাচ্যে বসবাসরত মুমিন ব্যক্তি পাশ্চাত্যে অবস্থানকারী নিজ ভাইকে দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি পাশ্চাত্যে আছে সেও প্রাচ্যে বসবাসরত তার ভাইকে দেখতে পাবে।"[৪২৮]

ইমাম সাদিক (আ.) আরো বলেছেন : "যখন আল কায়েম আবির্ভূত হয়ে বিপ্লব করবে তখন মহান আল্লাহ্ আমাদের অনুসারীদের চোখ ও কান এতটা শক্তিশালী করে দেবেন যে, তাদের ও ইমামের মাঝে কোন মধ্যবর্তী মাধ্যম ও দূত বিদ্যমান থাকবে না। এটা এমনভাবে হবে যে, ইমাম যখনই তাদের সাথে কথা বলবে, তারা তা শুনতে পাবে এবং তাকে দেখতেও পাবে। অথচ ইমাম তার নিজ জায়গাতেই থাকবে।"[৪২৯]

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "সাহিবুল আমরের (ইমাম মাহদী) হাতে যখন যাবতীয় বিষয় ও কাজ অর্পণ করা হবে তখন ভূ- পৃষ্ঠের নীচু স্থানগুলোকে উঁচু এবং উঁচু স্থানগুলোকে সমতল করে দেয়া হবে। আর তা এমনই হবে যে, তার কাছে পৃথিবী হাতের তালুর মতো হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আছে যে তার হাতের তালুতে একটি চুল থাকলে তা দেখতে পায় না?"

বর্ণিত হয়েছে যে, আলোর একটি স্তম্ভ ভূ- পৃষ্ঠ থেকে আকাশ পর্যন্ত তাঁর জন্য স্থাপন করা হবে এবং তিনি তার মধ্যে বা াদের যাবতীয় কাজ প্রত্যক্ষ করবেন। আর মিশরের পিরামিডের একটি পাথরের নীচে তাঁর জন্য বেশ কিছু জ্ঞান গচ্ছিত রাখা আছে যেগুলো তাঁর আগে কারো হস্তগত হয় নি।"[৪৩০]

আরো কিছু রেওয়ায়েত আছে যেগুলো পূর্ণরূপে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। যেমন : এগুলোর মধ্যে কতিপয় রেওয়ায়েতে জ্ঞান- বিজ্ঞানের পূর্ণ পরিবর্তন, মুমিনদের মানসিক যোগ্যতা ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণসমূহের আমূল পরিবর্তন এবং ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর সঙ্গী- সাথীদের ব্যবহৃত উপায়- উপকরণ, যন্ত্রপাতি এবং কারামতসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "আমি যেন আল কায়েমের সঙ্গী- সাথীদেরকে দেখতে পাচ্ছি যারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের আজ্ঞাবহ, এমনকি ভূ- পৃষ্ঠের হিংস্র পশুকুল এবং আকাশের শিকারী পাখীরাও তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করবে। সবকিছুই, এমনকি ভূ- পৃষ্ঠের এক অঞ্চল আরেক অঞ্চলের ওপর গর্ব করে বলবে : আজ আল কায়েমের একজন সঙ্গী আমার ওপর পদধুলি দিয়েছেন এবং আমাকে অতিক্রম করেছেন।"[৪৩১]

ইমাম বাকির (আ.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : "যখন আমাদের কায়েম আবির্ভূত হবে ও বিপ্লব করবে তখন পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে যে ব্যক্তিকেই প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করবে তখন তাকে বলবে : তোমার হাতের তালুতেই তোমার কর্মসূচী ও প্রয়োজনীয় দিক- নির্দেশনা আছে। যখনই

তোমার ক্ষেত্রে কোন ব্যাপার ঘটবে যা তুমি বুঝ নি এবং যার হিকমতও তোমার জানা নেই তখন তুমি তোমার হাতের তালুর দিকে তাকাবে এবং সেখানে যে নির্দেশনা বিদ্যমান আছে তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"[৪৩২]

এ রেওয়ায়েত সম্পর্কে 'ইয়াওমুল খালাস' গ্রন্থে এমন সব সূত্র ও উৎসের কথা বর্ণিত হয়েছে যেগুলো অন্যান্য গ্রন্থে আমি পাই নি। আর তাঁদের ইমাম মাহদীর সঙ্গী- সাথীদের ক্ষেত্রে এসব ঘটনা মুজিযা ও কারামত আকারে ঘটা অথবা বৈজ্ঞানিক নিয়ম- নীতি এবং অত্যাধুনিক ও অতি উন্নত মাধ্যম ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

হযরত সুলাইমান ও যূলকারনাইনের সা াজ্য অপেক্ষাও বিশাল সা াজ্য

ইমাম মাহদী (আ.)- এর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ থেকে খুব ভালোভাবে বোঝা যায় যে, তিনি যে বিশ্ব ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন তা হযরত সুলাইমান (আ.) ও বাদশাহ যূলকারনাইনের রাজত্ব অপেক্ষাও বিশাল। আর কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন ইমাম বাকির (আ.)- এর নি োক্ত রেওয়ায়েত :

“আমাদের (ইমাম মাহদীর) রাজত্ব হযরত সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)- এর রাজত্বের চেয়ে ব্যাপক এবং আমাদের রাজ্যের পরিসীমা তাঁর রাজ্যের পরিসীমা অপেক্ষা বড় হবে।”

আর পরবর্তী রেওয়ায়েতটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর হাতে এমন সব হাতিয়ার ও উপায়- উপকরণ বিদ্যমান যেগুলো বাদশাহ যূলকারনাইনেরও ছিল না এবং ঐ সব রেওয়ায়েত যেগুলোয় বর্ণিত হয়েছে যে, মহান নবীদের থেকে যা কিছু উত্তরাধিকার হিসাবে বিদ্যমান, যেমন হযরত সুলাইমান (আ.)- এর উত্তরাধিকার সেগুলো সব তাঁরই আয়ত্তে থাকবে এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে।

কারণ, হযরত সুলাইমান (আ.)- এর রাজত্বের অন্তর্গত ছিল ফিলিস্তিন ও শামদেশ। মিশর ও এর পশ্চিমের দেশসমূহ অর্থাৎ আ ি কা মহাদেশ তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বেশ কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত অনুসারে ইয়েমেন থেকে ভারত, চীন এবং অন্যান্য দেশ তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং দক্ষিণ ইরানে অবস্থিত ইস্তাখর শহরও তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অথচ রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে ইমাম মাহদী (আ.)- এর হুকুমত সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। যার ফলে এমন কোন জনপদ থাকবে না যেখানে মহান আল্লাহর একত্ব এবং মহানবী (সা.)- এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া হবে না। আর পৃথিবীর বুকে এমন কোন বিধ্বস্ত অঞ্চলও বিদ্যমান থাকবে না যার পুনর্গঠন ও আবাদ করা হবে না।

আরেকদিকে, ইমাম মাহদীর হাতে যেসব সুযোগ- সুবিধা থাকবে সেগুলো ঐ সব সুযোগ- সুবিধা অপেক্ষা অধিক যেগুলো হযরত সুলাইমান (আ.)- এর আয়ত্তে ছিল। সে সব সুযোগ-

সুবিধা মুজিযাস্বরূপ ও মহান আল্লাহর কৃপায় তাঁর হাতে তুলে দেয়া হবে অথবা সেগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুযোগ- সুবিধাসমূহকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর কারণে অর্জিত হয়ে থাকবে। তবে রেওয়ায়েতসমূহ ও ইতিহাসবেত্তাদের বক্তব্য অনুসারে কালগত দিক থেকে হযরত সুলাইমান (আ.)- এর রাজত্বকাল প্রায় অর্ধ শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুবরণের পর (৯৩৬ খ্রিস্টপূর্ব) বিচ্যুতি দেখা দেয় এবং তাঁর রাজত্ব ও প্রশাসন ধ্বংস হয়ে যায় এবং আল কুদস ও নাবলূস- এ দু'রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়।

যদিও ইমাম মাহদী (আ.)- এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হুকুমতের সময়কালের সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন ধরনের, তবে যা আমাদের বিশ্বাসে প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত তা হচ্ছে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশ্বজনীন সরকার পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। আর তাঁর পর তাঁর সন্তান- সন্ততিগণ যাঁরা তাঁরই আদর্শ ও পথ নিরবচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষণ ও অনুসরণ করবেন তাঁরাই শাসনকর্তৃত্ব পাবেন। আর তখন কতিপয় নবী এবং আহলে বাইতের কয়েকজন ইমাম পুনঃপ্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাঁরা এ বিশ্বের পরিসমাপ্তিকাল পর্যন্ত রাজত্ব করবেন ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখবেন।

উ তর জগতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্তি

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : “মহান আল্লাহ্ যূলকারনাইনকে বশীভূত এবং অবাধ্য মেঘদ্বয়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং তিনি বশীভূত মেঘটি বেছে নেন যার মধ্যে কোন বজ্রনিনাদ ও বিদ্যুত ছিল না। আর তিনি যদি উদ্ধত মেঘকে বেছে নিতেন তাহলে তা তাঁর অধিকারভুক্ত হতো না। কারণ, মহান আল্লাহ্ এ উদ্ধত মেঘকে আল কায়েম আল মাহদীর জন্য বরাদ্দ করেছেন।[৪৩৩]

এ রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ, আসমানসমূহের তারকারাজির মাঝে এবং ঊর্ধ্বজগতে গমনাগমন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম এবং বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করবেন। যেমন যে মেঘের বজ্রপাত, গর্জন ও বিদ্যুত

আছে তা... এবং তিনি এসব মাধ্যম ব্যবহার করে ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডয়ন করবেন। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মাধ্যমগুলো তাঁর ইখতিয়ারে থাকবে।

আর ঠিক একইভাবে এ রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের পৃথিবী ছাড়াও সাত আকাশের জগৎ এবং আমাদের পৃথিবীর বাইরের ছয় পৃথিবীতে ইমাম মাহদীর উড্ডয়ন সম্পন্ন হবে। আর এ বিষয়টি এতদর্থে নয় যে, কেবল তিনি নভোযান ও স্পেস শিপ এর মতো মাধ্যম ব্যবহার করবেন; বরং তাঁর যুগে অবস্থা এমনই হবে যে, গ্রহ থেকে গ্রহে এবং গ্যালাক্সি থেকে গ্যালাক্সিতে ভ্রমণ হবে আমাদের বর্তমান যুগে এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ভ্রমণতুল্য।

আর ইমামের বাণী থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, পাঁচটি বসবাসযোগ্য গ্রহ অথবা পাঁচ পৃথিবী অথবা পাঁচ আসমান আছে যেগুলোর অধিবাসীদের সাথে অচিরেই (ইমাম মাহদীর শাসনামলে) আমাদের এ পৃথিবীর যোগাযোগ স্থাপিত হবে। বিভিন্ন হাদীস ও রেওয়ায়েত অনুযায়ী আসমানসমূহে অগণিত গ্রহ আছে যেগুলোয় মহান আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের বিভিন্ন সমাজ বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, এসব সৃষ্টি মানুষ, ফেরেশতা ও জিনদের থেকে ভিন্ন। আর আল্লামা মাজলিসী 'বিহারুল আনওয়ার' গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েতের মধ্য থেকে গুটিকতক রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। একইভাবে পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু আয়াতও এতদর্থই নির্দেশ করে। যেমন পবিত্র কোরআনের নি োক্ত আয়াতটি :

"হে জ্বিন ও মানব জাতি! যতি তোমরা ঊর্ধ্বাকাশসমূহ এবং ভূ- গর্ভের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হও, তাহলে এ ব্যাপার পদক্ষেপ গ্রহণ কর তো দেখি; তবে আধিপত্য ও দক্ষতা ব্যতীত তোমরা মহাকাশ সফর অর্থাৎ ঊর্ধ্বাকাশসমূহে উড্ডয়ন এবং পৃথিবীর গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।" (সূরা রাহমান : ২৩- ২৪)

অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.)- এর যামানায় অতি সত্বর পৃথিবীর বুকে মানব জীবন এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করবে যা এর পূর্ব পর্যন্ত অতীতকালের মানব জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। এখানে এ ব্যাপারে অধিক ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও আলোচনার অবকাশ নেই।

আখেরাত ও বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি লাভ

যে সব কর্ম তৎপরতা, আ ালন ও গতি আমাদের এ জগতে সেগুলোর নিজস্ব স্থান-কাল এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার মধ্যেই সংঘটিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে বস্তু জগৎ থেকে অবস্তু জগতের দিকে গমন অথবা অবস্তু জগৎ থেকে বস্তুগত জগতের দিকে প্রত্যাবর্তন উল্লেখযোগ্য। পবিত্র কোরআন ও ইসলাম ধর্ম এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা দূর করে যথোপযুক্ত আলোকপাত করেছে এবং এব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে এর সাথে খাপ খওয়ানোর জন্য জোর দিয়েছে।

এ পরিক্রমণকে মহান আল্লাহর দিকে মানুষের প্রত্যাবর্তন এবং তার সাথে মিলন অথবা উর্ধ্বালোক ও আখেরাতের দিকে গমন বলে অভিহিত করা হয়।

জাগতিক প্রেক্ষাপটে যেহেতু আমাদের এ জগৎ এবং বিস্তৃত অদৃশ্যলোকের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হবে সেহেতু পবিত্র কোরআন ও ইসলামে মহান আল্লাহর দিকে মানুষের প্রত্যাবর্তন বা উর্ধ্বলোকে (আখেরাত) উত্তোরণকে 'কিয়ামত' এবং 'পুনরুত্থান' বলে অভিহিত করা হয়েছে।উল্লেখ্য যে, এ অদৃশ্যলোক আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আছে।

মানুষের ক্ষেত্রে এ পরিক্রমণ ও গতির চুড়ান্ত বিকাশের পর্যায় হচ্ছে মৃত্যু যা ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বিস্তৃত (অসীম) জীবনে প্রবেশ যা কখনো ধ্বংস হবে না। আসলে এ ধর্মের দৃষ্টিতে মৃত্যু ধ্বংস নয়, অথচ এমনটিই আমরা কখনো কখনো ভেবে থাকি। আর অস্তিত্ব জগতের ক্ষেত্রে মৃত্যুর চুড়ান্ত বিকাশের পর্যায় হচ্ছে কিয়ামত এবং বস্তু জগৎ ও অদৃশ্য অবস্তু জগতের এক সমান হওয়া।

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত ও পুনরুত্থানের বেশ কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ ও নিদর্শন আছে যেগুলো পৃথিবী, আকাশ এবং মানব সমাজে প্রকাশ পাবে ও বাস্তবায়িত হবে। বেশ কিছু রেওয়ায়েত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর সরকার ও প্রশাসনের ব্যাপারে সবাই একমত যে, তার

হুকুমতের পরে কিয়ামত ও পুনুরুত্থানের নিদর্শনসমূহ শুরু এবং প্রকাশ পেতে থাকবে। এখন আমরা দেখব কিভাবে কিয়ামত ও পুনরুত্থান শুরু হবে।

সম্ভবত উর্ধ্বলোকের উত্তোরণ ও প্রবেশ করার পথ প্রাপ্তির বিষয়টি রেওয়ায়েতসমূহে আলোচনা করা হয়েছে এবং তা ইমাম মাহদীর যুগে বাস্তবায়িত হবে। তখন নিঃসংেহে আখেরাত ও বেহেশতে ব্যাপকতর প্রবেশ ও উত্তোরণের শুভ সূচনা হবে। সুতরাং যে সব রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদীর পরে পৃথিবীতে কতিপয় নবী এবং ইমামের রাজআত (মৃত্যুর পরে কিয়ামতের আগে একদল মৃত ব্যক্তির পৃথিবীতে পুনরুজ্জীবিত হওয়া) এবং তাদের শাসনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো এবং কতিপয় রেওয়ায়েতে যা কিছু রাজায়াত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ হচ্ছে ঠিক এ পর্যায়। রাজাআতে বিশ্বাস যদিও ইসলাম ধর্ম ও শিয়া মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ রাজায়াতে বিশ্বাস না করার কারণে কোন ব্যক্তি আহলে বাইতে মাযহাব ও ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যায় না। কিন্তু রাজায়াত সংক্রান্ত রেওয়ায়ে এত অধিক এবং বিশ্বাস যোগ্য যে, তা রাজায়াতে বিশ্বাস করার কারণ হবে।

কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে রাজআত ইমাম মাহদী (আ.) এর হুকুমতের পরে এবং তার পরে এগার জন মাহদীর পরে শুরু হবে। কারণ ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন: "নিশ্চয় আল কায়েম আল মাহদীর পরে ইমাম হুসাইন (আ.) এর বংশধরদের মধ্য থেকে এগার জন মাহদী আসবে।"[৪৩৪]

এখানে আমরা রাজআত সংক্রান্ত কতিপয় রেওয়ায়েত উল্লেখ করব।

"যে আল্লাহ আপনার ওপর পবিত্র কোরআনকে ফরয করেছেন তিনি অবশ্যই আপনাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনবেন"- পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন : "তোমাদের নবী (সা.) পুনরুজ্জীবিত হয়ে তোমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন।"[৪৩৫]

আবু বাসীর বলেছেন : "ইমাম বাকির (আ.) আমাকে বলেছেন : তাহলে ইরাকবাসী কি রাজআত প্রত্যাখ্যানকারী ? আমি বললাম "; হ্যাঁ। তিনি বললেন : তারা কি কোরআন তেলাওয়াত করে না এবং পড়ে না : 'আর সেদিন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে এক দলকে পুনরুজ্জীবি করব' ?"[৪৩৬]

আরেকটি রেওয়ায়েতে উপরিউক্ত আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম সদিক (আ.) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন : "জনগণ এ ব্যাপারে কি বলে ? তখন তিনি বলেছিলেন : তাদের অভিমত হচ্ছে উপরিউক্ত আয়াত কিয়ামত দিবস প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন : কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতি থেকে একদলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং অবশিষ্টদেরকে তাদের পূর্বাবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন (তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না)! এ আয়াতটি নিঃসন্দেহে রাজাআত প্রসঙ্গে অবতির্ণ হয়েছে এবং কিয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হচ্ছে : 'তাদের সবাইকে আমি পুনরুত্থিত করে একত্রিত করব আর তাদের কাউকে উপেক্ষা করব না এবং...'।"[৪৩৭]

যুরারাহ বলেন : "রাজাআতের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং অন্যান্য ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে বললেন : যে ব্যাপারে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ তার সময় এখনো হয় নি; বরং যে ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিল না তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যায় উপনীত হয় নি।"[৪৩৮]

কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামদের রাজআতের পর মহানবী (সা.)-এর রাজআত হবে। আর ইমামদের মধ্যে যিনি প্রথম এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন তিনি হলেন ইমাম হুসাইন (আ.)।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "যিনি প্রথম এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন (মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবেন) তিনিই ইমাম হুসাইন (আ.)। তিনি এত দিন রাজত্ব করবেন যে (বার্ধক্যের কারণে) তার তার চোখের সামনে এসে পড়বে।"[৪৩৯]

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে : “রাজাআত সর্বজনীন বিষয় নয়; বরং এটি গুটিকতক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটবে। কারণ, প্রকৃত সত্যবাদী মুমিন এবং শকতকরা একশ’ ভাগ মুশরিক-কাফির ব্যতীত আর কারো রাজআত হবে না।”[৪৪০]

ষোলতম অধ্যায়

শিয়া মাজহাবের দৃষ্টিতে ইমাম মাহদী (আ.)

মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতভুক্ত বারো ইমামের ইমামতে বিশ্বাস শিয়া মাজহাবের অন্যতম মূল ভিত্তিস্বরূপ। এ কারণেই আমাদের মাজহাবকে 'ইমামীয়া মাজহাব', 'মাজহাব- ই তাশাইয়্যু' এবং 'আহলে বাইতের মাজহাব' বলে অভিহিত করা হয়। আর আমরা যারা এ আকীদার অনুসারী তাদেরকে 'ইমামী শিয়া' এবং 'আহলে বাইতের অনুসারী' বলা হয়।

শিয়াদের বিশ্বাস মতে প্রথম নিষ্পাপ ইমাম হলেন আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (আ.) এবং সর্বশেষ ইমাম হলেন প্রতিশ্রুত হযরত মাহদী- মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল- আসকারী (আ.)- যাঁর জন্য সবাই অপেক্ষমাণ এবং যিনি ২৫৫ হিজরীতে ইরাকের সামাররা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর আয়ুষ্কাল ও জীবন দীর্ঘায়িত করেছেন এবং তাঁকে মানুষের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে গোপন রেখেছেন ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন তিনি তাঁর ঐশী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত ও তাঁকে আবির্ভূত করবেন এবং তাঁর মাধ্যমে সকল ধর্মের ওপর ইসলামকে বিজয়ী ও সমগ্র পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন।

অতএব, প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.) যে দ্বাদশ ইমাম এবং জীবিত ও গায়েব (অপ্রকাশ্য) ইমাম তা বিশ্বাস করা আমাদের মাজহাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য। এ বিশ্বাস ব্যতীত একজন মুসলিম বারো ইমামী শিয়া, এমনকি একজন সুন্নী অথবা যায়দী অথবা ইসমাঈলী মুসলিমও হতে পারবে না।

অবশ্য আমাদের কতিপয় ধর্মীয় ভাই ইমামত, নিষ্পাপ ইমামগণ এবং হযরত মাহদীর গাইবতে (অন্তর্ধানে থাকাতে) বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে থাকেন। অথচ সম্ভাব্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে মানদণ্ড তা অসম্ভব বলে বিবেচনা অথবা সেগুলোকে মনোপুত হলে গ্রহণ করা নয় বরং মহানবী (সা.)- এর থেকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান থাকতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর ইমামত ও গাইবাত নির্দেশকারী যেসব স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান সেগুলো অকাট্য ও মুতাওয়াতির। যদি দ্ব্যর্থহীন উক্তি বিদ্যমান থাকে এবং এর জন্য দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করা

যায়, তাহলে যে কোন মুসলমান তা মেনে নিতে এবং পালন করতে বাধ্য। আর অন্যদের উচিত হবে দলিল উপস্থাপনকারীর অবস্থানকে সঠিক বলে গণ্য করা অথবা তাকে বিপরীত দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে নিঃসন্দেহ করা (অর্থাৎ সে যা মেনে চলছে তা ভুল বলে প্রমাণ করা এবং সন্তুষ্ট করা)। এক আরব কবি কতই না চমৎকার বলেছেন :

“আমরা যুক্তি ও দলিল- প্রমাণের অনুসারী

যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ যে দিকে যাবে আমরাও সেদিকে ঝুঁকে পড়ব।”

আমাদের সুন্নী ভাইয়েরা যদিও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল আসকারী যে প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.) এ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত নন, তবুও যে সব রেওয়ায়েত ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সাথে একমত এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। যেমন তাঁর অস্তিত্ব, আন্দোলন ও আবির্ভাব, তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মের পুনপ্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা, তাঁর হুকুমত বিশ্বজনীন এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী কর্তৃত্বশীল হওয়া ইত্যাদি। আর আপনার শিয়া ও সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহে ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ একই ধরনের অথবা পরস্পর সদৃশ বলে লক্ষ্য করে থাকবেন। এ সব রেওয়ায়েত পরবর্তী অধ্যায়ে আপনাদের সামনে পেশ করা হবে।

একই সময় ইবনে আরাবী, শারানী এবং অন্যান্য ব্যক্তির মতো কতিপয় সুন্নী আলেমও আমাদের অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হযরত মাহদী (আ) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল আসকারীই হবেন। তাঁরা তাঁর নাম ও বংশ পরিচিতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে তাঁরা জীবিত ও গায়েব বলে বিশ্বাস করেন। ‘প্রতিশ্রুত মাহদী’ গ্রন্থের রচয়িতা এ সব সুন্নী আলেমের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম মনীষিগণ এবং ইসলামী আন্দোলনসমূহের কর্মতৎপর কর্মীবৃন্দের উচিত উপযুক্ত পন্থায় ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত এ অভিন্ন আকীদা- বিশ্বাসের সদ্ব্যবহার করা। কারণ, এ বিশ্বাস সকল মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান এবং তা গায়েব (অদৃশ্য অবস্তুগত জগত) এবং মহান আল্লাহর সাহায্যের ক্ষেত্রে আপামর মুসলিম জনতার ঈমানের মাত্রা উন্নীত করার ক্ষেত্রে প্রাণ উজ্জীবনী

প্রভাব রাখবে। সে সাথে শত্রুদের বিপক্ষে তাদের দৃঢ়তা ও আপোষহীন দৃষ্টিভঙ্গি সমুন্নত হবে এবং তারা তাদের প্রতিশ্রুত নেতাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল আসকারী (আ.)- এর ওপর 'মাহদী' উপাধি আরোপ করার বিষয়টি যা আমাদের সুন্নী ভাইদের কাছে প্রতিষ্ঠিত নয় তা অবশ্যই যেন যারা এ বিশ্বাস পোষণ করে এবং তাঁকে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে অভিহিত করে তাদের সমালোচনা ও ভর্ৎসনা করার কারণ না হয়।

অবশ্য এখানে ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে শীয়াদের বিশ্বাস সংক্রান্ত কালামী আলোচনা উত্থাপন করা আমাদের লক্ষ্য নয়; বরং লক্ষ্য হচ্ছে প্রবল উদ্যম সহকারে প্রবহমান ও উপচে পড়া এ আি ক মনোবল উদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন যার সাথে শিয়া মুসলিম সমাজ পরিচিত। আর এটি এমন এক বিশ্বাস ও চেতনা যা দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিয়া পিতামাতারা তাদের নিজ সন্তানদেরকে প্রতিপালন করেছেন। তাই এ বিশ্বাস ও চেতনা শিয়াদের অন্তরে ইমাম মাহদীর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষমাণ থাকার এক বিশাল ভাণ্ডার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

এ কারণেই মাহদী (আ.)- আমাদের প্রাণ তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত হোক- পৃথিবীতে মহান আল্লাহর রেখে দেয়া, মহানবী (সা.)- এর বংশধর মহান হুজ্জাত এবং সর্বশেষ ইমাম ও ওয়াসী। তিনি পবিত্র কোরআন ও ওহীর রক্ষক এবং পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহর নূর প্রক্ষেপকারী বলে গণ্য। ইসলামের যাবতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং এগুলো নবুওয়াত সদৃশ এবং রিসালাতের আলোকরি রই সম্প্রসারিত রূপ।

তাঁর অন্তর্ধানের মধ্যে অনেক বড় লক্ষ্য, ঐশ্বরিক রহস্যাবলী ও প্রজ্ঞা এবং মহান নবী, ইমাম, আহলে বাইত, ওলী ও মুমিনদের মাজলুমীয়াত যা অত্যাচারী শাসক ও বৈষম্যকারী রাজা-বাদশাহ কর্তৃক সৃষ্ট তা নিহিত রয়েছে। মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব সংক্রান্ত মহানবীর প্রতিশ্রুতি দ্বারা মুমিনদের আকাঙ্ক্ষা আরো শক্তিশালী ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তাদের দুঃখ- ভারাক্রান্ত হৃদয় কর্মচাঞ্চল্য ও উৎসাহ- উদ্দীপনায় ভরে যায়। তখন তীব্র ঝড়- ঝঞ্ঝা এবং যাত্রাপথ দীর্ঘ হওয়া

সত্ত্বেও তারা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখে। তারা ঐ পতাকার অধিপতির সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শিয়ারা যদি তাদের আধ্যা ক জীবনের পাথেয়সহ মহানবী (সা.) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের সাথে জড়িত এবং এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তা এজন্য যে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রতিশ্রুত দায়িত্ব ও মিশন আশা- আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার দ্বারা শিয়াদের আ াকে পরিতৃপ্ত করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ আকর্ষণ শক্তির অধিকারী।

যেহেতু শিয়ারা তাদের আলেমদের ক্ষেত্রে অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সেহেতু কোন কোন গোষ্ঠী তাদের সমালোচনা করে। অথচ আরেকটি গোষ্ঠী এর প্রশংসা করেছে। বিস্ময় ও সমালোচনা ঐ সময় বৃদ্ধি পায় যখন তারা দেখে যে, শিয়ারা তাদের মারজায়ে তাকলীদ ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতিনিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর ফতোয়া অনুসরণ করে। কিন্তু নিষ্পাপ ইমামদের প্রতি যখন এই মাত্রায় তারা তাদের ভক্তি ও ভালোবাসা ব্যক্ত করে তখন একদল লোক তাদেরকে চরমপন্থী বলে অভিযুক্ত করে, এমনকি অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে (মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি) তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আবার বাড়াবাড়ি করে বলে : শিয়ারা মহানবী (সা.), ইমাম ও মারজাদেরকে খোদা বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের উপাসনা করে!

তবে আসল বিষয় কেবল খোদাভীরু আলেম এবং নিষ্পাপ ইমামদের প্রতি শিয়াদের অগাধ সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের আনুগত্য ও তাঁদেরকে পবিত্র বলে জ্ঞান করাই নয়; বরং তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আমরা মুসলমানরা মানুষ ও তার সাথে লেন- দেন ও আচার- আচরণ সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে গিয়েছি। ফলে আমরা পবিত্র কোরআনে মানুষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে তিনটি পদ্ধতি লক্ষ্য করি যথা : জাহেলী পদ্ধতি যা পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াত অনুসারে আরব জাতির ঐ সব ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যারা মহানবী (সা.)- কে হুজরাসমূহের পেছন থেকে আ ান করত, দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে বস্তুবাদী মতাদর্শ যা নবীদের শত্রু এবং নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার ধারক- বাহকদের অনুসৃত পদ্ধতি যা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে, আর তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে স্বয়ং পবিত্র ইসলাম ধর্মের পন্থা ও পদ্ধতি যা মানুষের প্রতি

সম্মান এবং তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যা ি ক ও কার্যকর ব্যবহারিক জগতের দিকে পরিচালনা সংক্রান্ত আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছে- তার মধ্যে অনৈসলামিক পথ দুটিই গ্রহণ করেছি।

আমরা যে মুসলিম বিশ্বে বসবাস করি সেখানে মহান নবী, ইমাম, ওয়ালী, শহীদ, মুমিন এবং মুসলিম জাতিসমূহ, এমনকি আমাদের নিজেদের ব্যাপারেও আমরা যে (অবমাননাকর) দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি তাতে জাহেলিয়াত ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদের বহু প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি। আর তাই আলেমদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার সমালোচনার জবাবে এ পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট।

বস্তুবাদী সভ্যতার অধঃপতন এবং আমাদের সমাজের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বেশ কিছু কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে এখন মুসলমানদের জীবন সম্মানিত বলে গণ্য হচ্ছে না। অতএব, এমতাবস্থায় তাদের জীবনের অন্যান্য দিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি কিভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সম্ভব?

ঠিক একইভাবে আমাদের চিন্তাচেতনাকে জাহেলী যুগের মন-মানসিকতায় পরিণত করে যা সবসময় অগভীর ও সরল চিন্তার দিকে পরিচালিত করে এবং সার্বিক, সমন্বিত ও গভীর চিন্তা থেকে দূরে রাখে। আর তা বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ও বিন্যাস বিরোধী। এ কারণেই আপনারা প্রত্যক্ষ করেন যে, আমরা কোন একটি বিষয়কে কেবল একটি পর্যায় বা দিক থেকে চিনতে চাই এবং এর বিভিন্ন দিক ও পর্যায় উপেক্ষা করে থাকি। ঠিক একইভাবে আমাদের অন্তরে কোন একটি সমস্যা বা বিষয়ের দিকে এক ধরনের দৃষ্টি ও মনোযোগের উপস্থিতি অনুভব করি কিন্তু আমরা ঐ বিষয় বা সমস্যার অন্যান্য দিক সম্পর্কে বোঝার ও জানার চেষ্টাই করি না। আমরা মহান নবী, ওয়ালী ও ইমামদের ব্যাপারেও এ ধরনের আচরণ করে থাকি। বরং আমরা তাঁদের বাহ্য অবস্থাকেই পর্যবেক্ষণ করি অথচ আমরা তাদের সুমহান আধ্যা ি ক পূর্ণতা এবং তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অমনোযোগী থাকি। আর যদি কোন ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়ের ব্যাপারে এমন চিন্তা-ভাবনা করে (সকল বিষয়ের সার্বিক দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে) তাহলে আমরা বলি যে, সে চরমপন্থা অবলম্বন করেছে ও বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। আর তার বিবেক ও অন্তর যদি এ জন্য কেঁপে ওঠে তাহলে আমরা তাকে ‘পাগল ও বিচ্যুত’ বলে অভিহিত করি।

এটি তখনই সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়ে উপনীত হয় যখন আমরা একে মাজহাব অর্থাৎ ধর্মের পোশাক পড়াই এবং মহান নবী- রাসূল, ইমাম ও ওয়ালীদের সম্মান ও মর্যাদার বিপরীতে এ অজুহাতে দাঁড়িয়ে যাই যে, তা মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার সম্মান- মর্যাদা এবং তাঁর তাওহীদের পরিপন্থী। আর তারাও মানুষ- এ কথার অর্থ হচ্ছে তাঁরা যেন মরুভূমির এক মুষ্ঠি পাথর বালুর মতই। আর মরুভূমি ও আসমানের পাথরের মধ্যেই কেবল তুলনা চলে এবং এ ক্ষেত্রে তৃতীয় কোন অস্তিত্বই নেই। যেন এ মানব সমাজের ঊষর মরুভূমিতে উদ্যান, নহর- নদী, উঁচু জায়গা ও পর্বত শৃঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই। যেন মহান ঐশী আলো যে ব্যাপার মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন : "তাঁর নূরের উপমা হচ্ছে প্রদীপদানীর ন্যায় যাতে প্রদীপ আছে", তা অন্য গ্রহে এবং মহান আল্লাহ্ নবী- ইমাম ও ওয়ালিগণ ব্যতীত অন্য সৃষ্ট জীব ও পদার্থসমূহের মধ্যে সেই নূর প্রস্ফুটিত হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যতই দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও আলেমদের চিন্তা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে ততই মহানবী (সা.) এবং তাঁর আহলে বাইতের বাণীসমূহের নতুন দিক তাদের সামনে প্রকাশিত হবে এবং তাঁদের মহান মর্যাদাকে তারা বুঝতে পারবে। সেই সাথে জানবে পবিত্র ব্যক্তিদের অবশ্যই তাঁদের বাণী থেকে চিনতে হবে। একথা সত্য যে, আল্লাহ বলেছেন : '(হে নবী) বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরই মত মানুষ যার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়।' কিন্তু তাঁর সত্তার একটি দিক (মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে) আমাদের মত হলেও অপর দিকটি আমাদের মত নয় যার মাধ্যমে তিনি ওহী লাভ করেন। আমাদের তাঁর অদৃশ্যের সাথে সম্পর্কেও দিকটি ভুলে গেলে চলবে না। তিনি আমাদের মত হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তাঁর চিন্তা, বোধশক্তি ও আি ক যোগ্যতাও আমাদের পর্যায়ে বরং তা এতটা উঁচু পর্যাযের যে, সেখানে অন্য কেউ পৌঁছা সম্ভব নয় যেমন তাঁর পক্ষে আমাদের পর্যায়ে নামা সম্ভব নয়। ইব্রাহিম(আ.)- এর ব্যাপারে যেমন বলা হয়েছে অদৃশ্যের জ্ঞান এতটা ছিল যে, বিশ্ব জগতের পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তেমন যোগ্যতা কি নবিগণ ব্যতীত অন্যকেউ অর্জন করতে পারে?

আমি এ বিশ্বাসের ওপর আছি যে, মুসলিম উম্মাহর সচেতনতা এবং ইসলাম ধর্মের দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন ও শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধই হচ্ছে সেই পথ যার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের এবং একজন মুসলিম ব্যক্তির ইসলামী পরিচয় ও অস্তিত্ব খুঁজে পাব, নতুন করে মহানবী (সা.)- কে চিনতে পারব, আমাদের নেতা ও আলেমদেরকে পুনরায় খুঁজে পাব, তাঁদের সাথে এমনভাবে থাকতে পারব এবং এমন আচরণ করতে পারব যা একজন পূর্ণাঙ্গ আল্লাহ্ওয়ালা (রাব্বানী) ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদার জন্য উপযোগী আর আমাদের অন্তকরণকে তাঁদের ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ করতে পারব। আর এ সত্যপ্রেম আমাদেরকে এক মহান প্রেম অর্থাৎ তাঁদের ও আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসায় রূপান্তরিত করে দেবে। কারণ প্রেম মহান আল্লাহর গোপন রহস্যাবলীর স্বরূপ।

যে ব্যক্তিকে একটি বৃক্ষ দর্শন গোটা জঙ্গল দর্শন করা থেকে বিরত রাখে সে যে ব্যক্তি জঙ্গল, পাহাড়- পর্বত ও আকাশসহ বৃক্ষ দর্শন করে তাকে কিভাবে বুঝবে। আর একারণেই যে ব্যক্তি আলেম- ওলামা, নবী- রাসূল, ইমাম ও ওয়ালীদের পবিত্রতা ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের বিশ্বে জীবন- যাপন করাকে মহান আল্লাহর তাওহীদের পরিপন্থী বলে গণ্য করে তার পক্ষে যে ব্যক্তি এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনকে ইসলামেরই এক নিদর্শন বলে গণ্য করে- যা শরীয়ত কর্তৃক এজন্য প্রণীত হয়েছে যাতে তাঁদের উসীলায় জীবন চলার যাবতীয় উপায়- উপকরণ আমাদের হস্তগত হয় এবং সেই মহান আল্লাহর যিনি কোন কিছুরই অনুরূপ নন তাঁর পবিত্রতা, সুমহান মর্যাদা ও স্মরণের দিকে আমাদের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়- তাকে বোঝা সম্ভব নয়।

অতএব, যখন আমাদের চিন্তা- ভাবনার ধারণক্ষমতা সীমিত এবং আমাদের অন্তর ছোট হবে কেবলমাত্র তখনই তাঁর বড় বড় সৃষ্টির ভালোবাসা দ্বারা আমাদের অন্তর পূর্ণ হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আর বিদ্যমান থাকবে না। আর তখন সমুদ্রের মতো প্রশস্ত হৃদয়ের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ যাঁদের অন্তরে অস্তিত্বগত বিভিন্ন দিক ও পর্যায়ের সমাবেশ ঘটেছে এবং যাঁরা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চ শৃঙ্গগুলো উপলব্ধি করতে এবং সেগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতে সক্ষম তাঁদেরকে সম্মানের দর্শনও বোঝা সম্ভব হবে না।

মহান আল্লাহর দরবারে ইমাম মাহদী (আ.)- এর মর্যাদা

রেওয়ায়েত, দু'আ ও যিয়ারতসমূহ যেগুলো ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন সেগুলোর মধ্য থেকে গুটি কতক এখানে উল্লেখ করার পূর্বে যে সব রেওয়ায়েত ও হাদীসে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যথার্থ হবে। শিয়া- সুন্নী হাদীস সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের নেতা। তিনি বেহেশতের নেতৃবৃ র অন্তর্ভুক্ত। তিনি বেহেশতবাসীর ময়ূর। তিনি মহান আল্লাহর নূর নির্মিত উজ্জ্বল পোশাক পরিহিত। তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশী ইলহাম ও হেদায়েতপ্রাপ্ত, যদিও তিনি নবী নন। মহান আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে অনেক কারামত এবং মুজিযার বাস্তবায়ন করবেন।

বরং যে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতটি শিয়া- সুন্নী সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মহান নবী ও রাসূলের কাতারে অবস্থান করবেন। মহানবী (সা.) বলেছেন : "আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা বেহেশতবাসীর নেতা অর্থাৎ আমি, হামযাহ্, আলী, হাসান, হুসাইন ও মাহদী।[৪৪১]

ঠিক একইভাবে আমাদের শিয়া সূত্রসমূহে মাসুম ইমামদের ফযীলত এবং মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদা সংক্রান্ত বেশ কিছু রেওয়ায়েত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী সংক্রান্ত কতগুলো বিশেষ রেওয়ায়েত বিদ্যমান যেগুলোয় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহর নূর। তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে তিনি পবিত্র কোরআনের অংশীদার অর্থাৎ পবিত্র কোরআনকে যেমন অনুসরণ করা ওয়াজিব ঠিক তেমনি তাঁকেও অনুসরণ করা ওয়াজিব। তিনি ঐশী জ্ঞানের খনি এবং মহান আল্লাহর রহস্যের ভাণ্ডার। অধিকাংশ শ্রদ্ধেয় আলেম আকায়েদ, তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থসমূহে আমীরুল মুমিনীন, হাসান ও হুসাইন (আ.)- এর ব্যতীত অন্যান্য ইমামদের ওপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর এ ব্যাপারে রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে।

আহলে সুন্নাতের কাছেও হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের চেয়েও মাহদী (আ.)- এর শ্রেষ্ঠ হওয়া সংক্রান্ত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে সীরীনকে প্রশ্ন করা হলো : “মাহদী শ্রেষ্ঠ নাকি আবু বকর ও উমর?” তিনি বললেন : “মাহদী ঐ দু’জন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আর তিনি নবী-রাসূলগণের সমমর্যাদার অধিকারী।”[৪৪২]

ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর ব্যাপারে ইমামগণের বাণী

যে বিষয়টি এখানে খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত তা হচ্ছে, আমরা ইমামগণকে ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর প্রতি তাঁদের নিজস্ব বিশেষ আবেগ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করতে দেখি। তাঁরা মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারের প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখতেন এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর জন্মগ্রহণ করার আগেই তাঁদের এ বংশধর এবং তাঁর হাতে যেসব মুজিযা বাস্তবায়িত হবে সেগুলোর ব্যাপারে জানতেন। এখন আমরা আমীরুল মুমিনীন (আলী) এবং ইমাম সাদিক (আ.)- এর কতিপয় বাণী উল্লেখ করব।

হযরত আলী (আ.) বলেন : "তোমরা জেনে রাখ যে, মুহাম্মদ (সা.)- এর আহলে বাইতের উপমা হচ্ছে আকাশের তারকাসমূহের ন্যায়। যখনই কোন তারকা অস্ত যায় তখন আরেকটি তারকার উদয় হয়। যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, ঐশী নেয়ামতসমূহ মহানবীর আহলে বাইতের আলোকে তোমাদের ওপর পূর্ণ করা হয়েছে এবং তোমরা তোমাদের আশা- আকাঙ্ক্ষায় উপনীত হয়েছ (তোমাদের আশা- আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে)।"[৪৪৩]

তোমরা মহানবীর আহলে বাইতের দিকে তাকাও। যদি তারা নীরবতা অবলম্বন করে তাহলে তোমরাও নীরবতা অবলম্বন কর। তারা যদি তোমাদের কাছে সাহায্য চান তাহলে তোমরাও তাদেরকে সাহায্য করবে। কারণ, মহান আল্লাহ্ হঠাৎ আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতভুক্ত এক ব্যক্তিকে আনবেন যে মুক্তি পাবার পথ প্রশস্ত ও সুগম করবে। আমার পিতা সর্বোত্তম দাসীর সন্তানের জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, যে শত্রুদেরকে তরবারি ব্যতীত আর কিছুই দেবে না এবং তাদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করতে থাকবে। সে আট মাস অস্ত্র কাঁধে রাখবে (সংগ্রাম করতে থাকবে) যার ফলে কুরাইশরা বলতে থাকবে : যদি এ ব্যক্তি হযরত ফাতিমার বংশধর হতো তাহলে আমাদের ওপর দয়া করত।

সে নিজ প্রবৃত্তির কামনা- বাসনার ওপর ঐশ্বরিক হেদায়েতকে কর্তৃত্বশীল করবে। আর ঐ সময় অন্যরা তাদের নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা- বাসনাকে মহান আল্লাহর হেদায়েতের ওপর প্রাধান্য

দেবে। সে পবিত্র কোরআনকে চিন্তা ও কর্মের মানদণ্ড ধার্য করবে, আর অন্যরা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে পবিত্র কোরআনকে ব্যাখ্যা করতে থাকবে। তার জন্য পৃথিবী তার গভীর হতে সম্পদরাজি বের করে দেবে এবং এগুলোর চাবি তার হাতে তুলে দেবে। তখন সে ন্যায়পরায়ণতা এবং মহানবীর পথ ও পদ্ধতি তোমাদের দেখিয়ে দেবে। সে কিতাব (কোরআন) ও সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনপ্রতিষ্ঠিত করবে যেগুলো আগে থেকেই পরিত্যাগ করা হয়েছিল এবং সবাই কোরআন ও সুন্নাহর কথা ভুলে গিয়েছিল।[৪৪৪]

সে প্রজ্ঞার বর্ম পরিধান করে তা পূর্ণ সচেতনতা, মনোযোগ, অদম্য চেষ্টা ও একাগ্রতাসহ পূর্ণাঙ্গ নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বন করে তা শিক্ষা দেবে। কারণ, প্রজ্ঞা তার হারানো সম্পদ এবং সে প্রজ্ঞা অনুসন্ধানরত যা তার প্রয়োজন, আর সেও তা অর্জন করতে চায়। আর যখনই ইসলাম নিঃসঙ্গ ও উপেক্ষিত হবে এবং ঐ উটের মতো হয়ে যাবে যা পথ চলার ভারে ক্লান্ত হয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে এবং ঘাঁড় মাটির ওপর পেতে দেয় তখন সে সকলের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে চলে যাবে। সে মহান আল্লাহর হুজ্জাতদের মধ্য থেকে এক হুজ্জাত এবং মহান নবীদের অন্যতম স্থলাভিষিক্ত।[৪৪৫]

সুদাইর সাইরাফী বলেছেন : "আমি, মুফাযযাল ইবনে উমর, আবু বসীর ও আবান ইবনে তাগলিব ইমাম জাফর আস সাদিক (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা দেখলাম, তিনি কলারবিহীন ও খাটো হাতাবিশিষ্ট খাইবরী জামা পড়ে মাটির ওপর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অবস্থায় বসে রয়েছেন ও মর্মস্পর্শীভাবে কাঁদছেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে দুঃখ ও বিষাদের ছাপ ফুটে উঠেছিল। তাঁর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পবিত্র চোখদু'টি অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল। তিনি বলছিলেন : হে আমার নেতা! তোমার অন্তর্ধান আমার থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে, আমার জন্য পৃথিবীকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে এবং আমার অন্তরের শান্তি ধ্বংস করেছে। হে আমার নেতা! তোমার অন্তর্ধান আমার বিপদাপদকে চিরন্তন বিপদের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে যে, একের পর একজনকে হারানোর কারণে আমাদের সংখ্যা ও পরিমাণ বিলুপ্ত হতে বসেছে। আমি অনুভব

করছি না যে, আমার চোখের পানি শুকিয়ে যাবে এবং আমার হৃদয়ের কান্না থেমে গিয়ে আমার হৃদয় স্থির ও শান্ত হবে।...”

সুদাইর বলেন : “এ ভয়ঙ্কর অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমাদের হৃদয় অস্থির হয়ে গেল এবং আমরা মনে করতে লাগলাম যে, এ অবস্থা এক ভয়ঙ্কর ও বিপদ ও দুঃখের লক্ষণ অথবা এমন এক বিরাট বিপদ যা তাঁকে স্পর্শ করেছে। আমি বললাম : হে মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সন্তান! মহান আল্লাহ্ আপনাদের নয়নকে কখনো অশ্রুসজল না করেন। কোন্ ঘটনার কারণে আপনি এভাবে কাঁদছেন? আপনার কী হয়েছে যে, এভাবে শোক প্রকাশ করছেন?”

সুদাইব বলেন : “তখন ইমাম এমনভাবে তাঁর বুক থেকে দুঃখভারাক্রান্ত আহ্ শব্দ করলেন যে, তা ছিল তাঁর ভয়ের তীব্রতা প্রকাশকারী। তিনি বললেন : তোমার জন্য আক্ষেপ! আজ আমি জাফরের গ্রন্থ (কিতাবে জাফর) দেখলাম। আর এটি এমন এক গ্রন্থ যাতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের সকল মৃত্যু, বিপদ ও জ্ঞান বিদ্যমান। মহান আল্লাহ্ এ গ্রন্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরবর্তী ইমামদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করে প্রদান করেছেন। এ গ্রন্থে আমাদের আহলে বাইতের কায়েমের (মাহদী) জন্মগ্রহণ, তার অন্তর্ধান ও তা দীর্ঘায়িত হওয়া, তার দীর্ঘ আয়ুষ্কাল, তার অন্তর্ধানকালে মুমিনদের বিপদাপদে জড়িয়ে পড়া, কায়েমের অন্তর্ধানকাল দীর্ঘ হওয়ার কারণে তাদের অন্তঃকরণসমূহে স হ- সংশয়ের উদ্ভব, তাদের অধিকাংশের দীনে ইসলাম থেকে (কুফরের দিকে) ফিরে যাওয়া ও হাত গুটিয়ে নেয়ার কথা পড়েছি। মহান আল্লাহ্ বলেছেন : আমরা প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য ও ভালো- ম র ফল তার ঘাড়ের ওপর নিক্ষেপ করেছি। আর এগুলো পড়ার কারণে আমার অন্তর জ্বলে গেছে এবং আমার উপর দুঃখ ও বিষাদ প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আপনি যা জানেন তা থেকে কিয়দংশ আমাদেরকে জানান। তিনি বললেন : মহান আল্লাহ্ আমাদের কায়েমের ব্যাপারে এমন তিনটি জিনিস বাস্তবায়ন করবেন যা তিনি পূর্ববর্তী তিন জন নবীর ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত করেছিলেন। মূসা (আ.)-

এর জন্মগ্রহণের মতোই তার জন্ম গোপন রেখেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)- এর অন্তর্ধানের মতো তার অন্তর্ধান এবং হযরত নূহ (আ.)- এর দীর্ঘ জীবনের মতোই তার দীর্ঘ জীবন নির্ধারণ করেছেন এবং এরপর তাঁর যোগ্য বা া হযরত খিযির (আ.)- এর জীবনকে তার দীর্ঘ জীবনের দলিল স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন।

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! এ সব বিষয় আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে শুনান। তিনি বললেন : তবে হযরত মূসা (আ.)- এর জন্মগ্রহণ সম্পর্কে : যখন ফিরআউন বুঝতে পারল যে, তার রাজত্বের ধ্বংস মূসা (আ.)- এর হাতে হবে তখন সে ভবিষ্যদ্বক্তাদেরকে উপস্থিত করেছিল। তার ফিরআউনকে হযরত মূসার বংশধারা ও জাতির ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করে বলেছিল যে, সে বনি ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফিরআউন তার কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিল যেন তারা ইসরাইল বংশীয় অন্তঃস্বত্তা মহিলাদের পেট চিড়ে ফেলে। আর এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য বিশ হাজারেরও অধিক সংখ্যক নবজাতক শিশুর শিরচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করার ইচ্ছা করেছিলেন সেহেতু তারা তাঁর নাগাল পায় নি এবং তাঁকে হত্যা করতেও সক্ষম হয় নি।

একইভাবে বনু উমাইয়্যা ও বনু আব্বাস যখন বুঝতে পারল যে, তাদের সরকারের বিলুপ্তি এবং তাদের শাসনকর্তা ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গের ধ্বংসের দায়িত্ব কায়েম আল মাহদীর হাতে ন্যস্ত তখন তারা আমাদের শত্রুতায় লিপ্ত হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর আহলে বাইতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল এবং কায়েমকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করার আশায় মহানবীর বংশধরদেরকে হত্যা করতে লাগল। কিন্তু মহান আল্লাহ্ কোন জালেমের কাছে তাঁর প্রকৃত পরিকল্পনা ও বিষয় প্রকাশ করতে দেন নি যাতে তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণ করতে সক্ষম হন। যদিও তা মুশরিকদের কাছে অপছ নীয় হোক না কেন।

ঈসা (আ.)- এর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে : ইহুদী ও খ্রিস্টানরা সবাই বিশ্বাস করে যে, তিনি নিহত হয়েছেন। তবে পবিত্র কোরআন তাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করে বলেছে : না তারা তাকে হত্যা করেছে, আর না তাকে ফাঁসী দিয়েছে; বরং তারা এ ক্ষেত্রে ভুল করেছে। (নিসা : ১৫৬)

কায়েমের অন্তর্ধানও ঠিক এমনই। কারণ, তার অন্তর্ধানকাল দীর্ঘ হবার কারণে মুসলিম উম্মাহ্ তা অস্বীকার করবে।

আর এখন নূহ (আ.)- এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হবার বিষয় : যখন তিনি তাঁর জাতির ওপর আকাশ থেকে আযাব প্রেরণ করার জন্য প্রার্থনা করলেন তখন মহান আল্লাহ্ জিবরাইল (আ.)- কে সাতটি খুরমার বীজসহ তাঁর কাছে প্রেরণ করে বলতে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ্ বলেছেন : এ জনগণ আমারই সৃষ্ট এবং আমারই দাস এবং তাদের কাছে আমার বাণী প্রচার ও দলিল পূর্ণ করা ব্যতীত তাদেরকে আমি বজ্রপাতের দ্বারা ধ্বংস করব না। অতএব, আপনি আপনার উম্মতের কাছে ফিরে যান। আর এ কারণে আমি আপনাকে প্রতিদান দেব। এ খুরমা বীজগুলো বুনে ফেলুন। এগুলো থেকে বৃক্ষ জন্মানো, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং ফলবতী হবার পর আপনি মুক্তি পাবেন। এ ব্যাপারে আপনার মুমিন অনুসারীদের সুসংবাদ দিন।

যখন খুরমা গাছগুলো জন্মালো, শাখা- প্রশাখা পত্রবিশিষ্ট হলো, গাছগুলোতে ফল ধরলো এবং দীর্ঘকাল ফল ধারণ করে রইল তখল নূহ (আ.) মহান আল্লাহর কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করার আবেদন জানালেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় ঐ গাছগুলোর বীজ বপন ও ধৈর্যধারণ করতে এবং নিজের জাতির কাছে সুস্পষ্ট দলিল পেশ করার আদেশ দিলেন। এ সময় যেসব দল তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল তারা ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত হলো। ফলে তাদের মধ্য থেকে তিনশ’ জন ধর্মত্যাগী হয়ে বলতে লাগল : যদি নূহের দাবি ও প্রচার সত্য হতো তাহলে তার প্রভুর পক্ষে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা একান্ত অনুচিত হতো।

আর এভাবেই মহান আল্লাহ্ নূহ (আ.)- কে পরপর সাত বার খুরমার বীজ বপন করে সেগুলো ফলবান বৃক্ষে পরিণত করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। আর প্রতিবারই তাঁর একদল অনুসারী ধর্ম থেকে বের হয়ে আসতে থাকে, যার ফলে তাঁর সমর্থক ও অনুসারীর সংখ্যা সত্তরের সামান্য বেশি রয়ে গেল। তখনই মহান আল্লাহ্ তাঁর কাছে ওহী পাঠিয়ে বলেছিলেন : হে নূহ! মনোযোগ দিয়ে শোন। এখন রাতের আঁধার আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে পরিণত হয়েছে। এখন ঐ সকল

অপবিত্র ব্যক্তিদের ধর্মত্যাগের মাধ্যমে সত্য অসত্য থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং কুফরের অস্বচ্ছতা থেকে ঈমানের স্বচ্ছ পানি পাতিত হয়েছে।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : হযরত কায়েম আল মাহদীর অন্তর্ধানকাল এতটা দীর্ঘ হবে যে, এর ফলে সত্য পরিপূর্ণরূপে আলোকোজ্জ্বল এবং আঁধার ও অবিশুদ্ধতা থেকে ঈমানের স্বচ্ছতা পবিত্র ও পৃথক হয়ে যাবে।”[৪৪৬]

ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত আহলে সুন্নাতের আকীদা- বিশ্বাস

কেউ কেউ ধারণা করে যে, প্রতীক্ষিত মাহদী (আ.) সংক্রান্ত আকীদা- বিশ্বাস কেবল শিয়াদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। অথচ শিয়াদের কাছে যেমন এটি মৌলিক আকীদা- বিশ্বাসস ঠিক তেমনি আহলে সুন্নাতের কাছেও এটি একটি মৌলিক আকীদা বিশ্বাস। শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সবার কাছে মহানবী (সা.)কর্তৃক প্রদত্ত প্রতীক্ষিত আল মাহদী সংক্রান্ত সুসংবাদ প্রমাণিত হওয়া, তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও মিশন, তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং তার আবির্ভাব ও বিপ্লবের নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য নেই। এতৎসংক্রান্ত একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে, শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, তিনি দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল আসকারী (আ.) যিনি ২৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মহান আল্লাহ যেমনভাবে হযরত খিযির (আ.)- এর বয়স দীর্ঘ করেছেন তেমনি তিনি তার জীবনকেও দীর্ঘায়িত করেছেন। তাই তিনি জীবিত আছেন এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক আবির্ভূত হবার অনুমতি দেয়া পর্যন্ত তিনি অন্তর্ধানে থাকবেন। অথচ আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ আলেম বিশ্বাস করেন যে, তিনি যে জন্মগ্রহণ করেছেন ও বর্তমানে অন্তর্ধানে আছেন তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং তিনি ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন এবং মহানবী (সা.) তার সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছেন তা তিনি বাস্তবায়ন করবেন। তবে অল্প সংখ্যক সুন্নী আলেম আমাদের (বার ইমামী শিয়াদের) সাথে ইমাম মাহদী (আ.) যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অন্তর্ধানে আছেন সে ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন।

আহলে সুন্নাতের হাদীস ও মৌল বিশ্বাস সংক্রান্ত (কালামশাস্ত্র) গ্রন্থাদিতে অগণিত হাদীসে এবং তাদের আলেমদের ফতোয়ার গ্রন্থসমূহে ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত আকীদা যে মৌলিক তা সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের রাজনৈতিক ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে।

এ ভিত্তির ওপরই হিজরী চতুর্দশ শতকে সুদানী মাহদীর আে ালন, পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে পবিত্র মক্কার হারাম শরীফের আে ালন এবং এতদসদৃশ আরো বহু আে ালন সুন্নী

মুসলমানদের মাঝে (মাহদী হওয়ার দাবীকারী আন্দোলনসমূহ এবং ইমাম মাহদী সংক্রান্ত সুস্পষ্ট চিন্তা- ধারণা লালনকারী আন্দোলনসমূহ, যেমন মিশরের 'হিজরত ও জিহাদ' আন্দোলন এবং এতদ; সদৃশ আন্দোলনসমূহ) চিন্তাগত কোন ভিত্তি ছাড়া অথবা ইমাম মাহদী সংক্রান্ত শিয়া চিন্তা- ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত হয়নি। তবে কতিপয় সুন্নী মুসলিম এমনই বিশ্বাস করে থাকেন।

সাহাবী ও সুন্নী তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত প্রতীক্ষিত মাহদী (আ.) সংক্রান্ত হাদীসসমূহের রাবীদের সংখ্যা এতৎসংক্রান্ত শিয়া রাবীদের সংখ্যা অপেক্ষা কম নয়, আর তাদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিত্ব আছেন যারা হাদীস বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ, হাদীস বিষয়ক বিশ্ব- কোষ এবং বিশেষ বিশেষ গ্রন্থও রচনা করেছেন।

সম্ভবত ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত আমাদের কাছে বিদ্যমান সবচেয়ে প্রাচীন সুন্নী গ্রন্থ হচ্ছে হাফেয নাঈম ইবনে হাম্মাদ আল মারওয়াযী (মৃ.২২৭ হি.) প্রণীত 'আল ফিতান আল মালাহিম' নামক গ্রন্থটি। আর তিনি সিহাহ অর্থাৎ সুন্নী সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের রচয়িতাদের অনেকের, যেমন ইমাম বুখারী ও অন্যদেরও শেখ (হাদীস বিষয়ক শিক্ষাগুরু) ছিলেন। এ গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ভারতের হায়দ্রাবাদের দায়েরাতুল মাআরিফ আল উসমানিয়াহ লাইব্রেরীতে (ক্যাটালগ নং ৩১৮৭- ৮৩) বিদ্যমান। এ গ্রন্থের আরেকটি হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি দামেস্কের আয যাহিরিয়াহ লাইব্রেরীতে (ক্যাটালগ নং ৬২: সাহিত্য) সংরক্ষিত আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে এ গ্রন্থের যে কপি বিদ্যমান তাতে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা রয়েছে। ৭০৬ হিজরীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ কপির কতিপয় পৃষ্ঠায় হুসাইন আফেন্দীর ওয়াকফ – এ বাক্যাংশ বিদ্যমান যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তা তুরস্কের ওয়াকফকৃত গ্রন্থসমূহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে তা নিবন্ধন করা হয়। আমরা আমাদের এ গ্রন্থে কপিটি থেকেই উদ্ধৃতি পেশ করেছি। তবে অন্যান্য সুন্নী হাদীস ও আকীদা- বিশ্বাস বিষয়ক প্রামাণ্য উৎসসমূহ যেগুলোয় প্রতীক্ষিত মাহদী (আ.) এর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে অথবা অন্তত একটি অধ্যায় বিদ্যমান সেগুলোর সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক হবে। এগুলোর মধ্যে আহলে

সুন্নাতের সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহও বিদ্যমান। তবে ইমাম মাহদী (আ.) বিষয়ক স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের সংখ্যা উপরিউক্ত প্রামাণ্য উৎসসমূহের সংখ্যার সমান হতে পারে।

ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন শিয়া গ্রন্থ যা আমাদের হাতে রয়েছে তা হচ্ছে 'আল গাইবাত' অথবা ফাদল ইবনে শামান আল আযদী আন নিশাপুরী (যিনি নাঈম ইবনে হাম্মাদের সমসাময়িক ছিলেন) প্রণীত 'আল কায়েম' । ফাদল ইবনে শামান উক্ত গ্রন্থ ইমাম মাহদী (আ.) এর জন্ম গ্রহন ও অন্তর্ধানের আগেই রচনা করেছিলেন । এ গ্রন্থের হস্তলিখিত কপিসমূহ আমাদের আলেমদের নিকট ছিল। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে বর্তমানে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে । তবে আলেমগণ এ গ্রন্থ থেকে তাদের প্রণীত গ্রন্থসমূহে যতটুকু উদ্ধৃত করেছেন কেবল ততটুকুই এখন বিদ্যমান । বিশেষ করে আল্লামা মাজলিসী তার হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ বিহারুল আনওয়ারে এ গ্রন্থ থেকে বেশ কিছু রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন ।

কালক্রমে আহলে সুন্নাতের আলেম ও সর্বসাধারণের কাছে প্রতীক্ষিত মাহদী (আ.) সংক্রান্ত আকীদা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও তর্কাতীত বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হয়েছে । ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত বিশ্বাস অস্বীকারকারী অথবা এ বিষয়ে স হ পোষণকারী কোন ব্যতিক্রমধর্মী ও বিরল অভিমত ও ধারণার উদ্ভব হয় তাহলে সুন্নী আলেম ও গবেষকগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন । তারা ইসলাম ধর্মের মৌলিক আকিদা- বিশ্বাস যা মহানবী (সা.) থেকে মুতাওয়াতির হাদীস সূত্রে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছে সে সম্পর্কে সংশয় পোষণকারীদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন । আমাদের হাতে ইমাম মাহদী সম্পর্কে যারা স হ পোষণ করেছে তাদের কতিপয় নমুনা বিদ্যমান । উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এ সব স হ পোষণকারীদের ধারণা ও অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন ।

কালক্রমে আহলে সুন্নাতের আলেম ও সর্বসাধারণের কাছে প্রতীক্ষিত মাহদী (আ.) সংক্রান্ত আকীদা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও তর্কাতীত বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হয়েছে । যদি ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত বিশ্বাস অস্বীকারকারী অথবা এ বিষয়ে স হ পোষণকারী কোন ব্যতিক্রমধর্মী ও বিরল অভিমত ও ধারণার উদ্ভব হয় তাহলে সুন্নী আলেম ও গবেষকগণ তা

প্রত্যাখ্যান করেছেন । তার ইসলাম ধর্মের অন্যতম মৌলিক আকীদা- বিশ্বাস যা মহানবী (সা.) থেকে মুতাওয়াতির হাদীস সূত্রে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছে সে সম্পর্কে সংশয় পোষণকারীদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন । আমাদের হাতে ইমাম মাহদী সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করেছে তাদের কতিপয় নমুনা বিদ্যমান । উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এ সব সন্দেহ পোষণকারীদের ধারণা ও অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন ।

প্রথম নমুনা : হিজরী অষ্টম শতাব্দীর আলেম ইবনে খালদুন তার প্রসিদ্ধ 'তারিখে' (তারিখে ইবনে খালদুন) গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. ৩১১; দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল আরাবী কর্তৃক প্রকাশিত) বলেছেন : "জেনে রাখুন, যুগের পর যুগ ধরে যে বিষয় সকল মুসলমানের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে, শেষ যুগে রাসূলের আহলে বাইতভুক্ত এক ব্যক্তির অবশ্যই আবির্ভাব হবে যিনি ধর্মকে সাহায্য করবেন ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন । মুসলমানরা তার অনুসরণ করবে এবং তিনি সকল মুসলিম দেশের ওপর শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন । তাকে 'মাহদী' বলা হবে । দাজ্জালের আবির্ভাব (ও বিদ্রোহ) এবং তারপর যা কিছু ঘটবে সে সব কিছুই কিয়ামতের লক্ষণ যেগুলো সহীহগ হাদীসে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত । হযরত ঈসা (আ.) তার পরে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন অথবা তিনি তার (মাহদী) সাথে অবতরণ করে দাজ্জালকে বধ করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবেন এবং মাহদীর পেছনে নামায পড়বেন ।

এরপর ইবনে খালদুন ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত ২৮টি হাদীস উদ্ধৃত করে সেগুলোর সনদসমূহের কতিপয় রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন এবং ৩২২ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত কথা বলে তার সমালোচনার ইতি টেনেছেন : "অতঃপর এগুলো হচ্ছে ঐ সব হাদীস যেগুলো হাদীসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ ইমাম মাহদী (আ.) এবং শেষ যামানায় তার আবির্ভাব ও আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন । ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে, মাত্র গুটিকতক হাদীস ব্যতীত বাকী হাদীসগুলি সমালোচনামুক্ত নয় ।

এরপর তিনি প্রতীক্ষিত মাহদী (আ.) সংক্রান্ত কয়েকজন সূফীর কিছু অভিমত তুলে ধরেছেন এবং ৩২৭ পৃষ্ঠায় এ সব অভিমত সম্পর্কে চুলচেরা সমালোচনা করার পর বলেছেন : "আর যে সত্য

আপনাদের কাছে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তা হচ্ছে, ধর্ম ও রাজত্বের দিকে আহবান কেবল তখনেই সম্ভব হবে যখন কোন শক্তিশালী ধর্মীয়- গোত্রীয় অনুভূতি বিদ্যমান থাকবে । এ বিষয়টিই ধর্ম ও রাজত্বের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আদেশ বা ফয়সালা না আসা পর্যন্ত ধর্মকে আক্রমণকারীর হাত থেকে সংরক্ষণ করে থাকে । আর আমরা অকাট্য দলীল উপস্থাপন করার মাধ্যমে আগেই তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করেছি । ফাতিমীয়সহ সকল কুরাইশ বংশের গোত্রীয় বন্ধনের অনুভূতি সব দিক থেকেই ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তাদের স্থলে অন্যান্য জাতির আবির্ভাব হয়েছে যাদের মধ্যে গোত্রীয় বন্ধনের অনুভূতি তীব্র অবস্থায় রয়েছে । তাই আমরা লক্ষ করি হিজাজের মক্কা এবং মদীনার ইয়াম্বুতে বসবাসকারী তালেবীয়দের (আবু তালিবের বংশধর) মধ্য থেকেই ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন ও ইমাম জাফর আস সাদিকের বংশধরগণ ব্যতীত বাকী সব কুরাইশ বংশ গোত্রীয় সংখ্যায় হাজার হাজার হওয়া সত্ত্বেও আবাসভূমি, শাসনক্ষমতা, আকীদা- বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তারা বহু দল ও উপদলে বিভক্ত । তাই এ মাহদীর আবির্ভাব যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তার আবির্ভাব ও আে ালনের একমাত্র গ্রহণযোগ্য কারণ হবে তার ফাতিমী (হযরত ফাতিমার বংশধর) হওয়া এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সকল ফাতিমীর অন্তরকে তার প্রতি আনুগত্যশীল করা যাতে ঐশী বাণী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে জয়ী করা এবং সমগ্র মানব জাতিকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার ব্যাপারে তার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও গোত্রীয় সমর্থনের ক্ষেত্র তৈরী করা যায় । গোত্রীয় সমর্থন ও ক্ষমতা ব্যতীত নিছক মহানবী (সা.) এর আহলে বাইতের সাথে আ ীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে পৃথিবীর কোন এক অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের দিকে কোন ফাতিমীর আহবান বাস্তবে কখনো সফল হবে না ।”

অধিকন্ত ইবনে খালদুন পতীক্ষিত মাহদী সংক্রান্ত আকীদা- বিশ্বাস ও ধারণা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে নিশ্চিত হন নি, তবে তিনি তা বাহ্যত অসম্ভব বলে মনে করেছেন এবং এতৎসংক্রান্ত বেশ কিছু হাদীসের সমালোচনাও করেছেন । কিন্তু আলেমগণ ইবনে খালদুনের এ মতকে ইসলামী আকীদার পরিপন্থি ও একরূপ বিকৃতি বলে গণ্য করেছেন । কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সমর্থনে অগণিত ও মুতাওয়াতির হাদীস বিদ্যমান । তাই তারা সমালোচনা করে বলেছেন যে,

তিনি একজন ঐতিহাসিক এবং কখনই হাদীস বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত নন যার ফলে হাদীসের সমালোচনা, তা গ্রহণ বা বর্জন এবং এ সম্পর্কিত ইজতিহাদ (গবেষণা) তার জন্য বৈধ নয় । আমি ইবনে খালদুনের অভিমত অপনোদন সংক্রান্ত যা কিছু দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হচ্ছে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলেম আহমাদ ইবনুস সিদ্দিকী আল মাগরিবী প্রণীত 'আল ওয়াহম আল মাকনূন মিন কালামি ইবনে খালদুন' (ইবনে খালদুনের বক্তব্যের মধ্যে লুক্কায়িত ভ্রান্ত ধারণা) নামক গ্রন্থ যা ১৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত । লেখক উক্ত গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ ভুমিকাও লিখেছেন যাতে তিনি প্রতীক্ষিত মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সত্যতার ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের ইমামদের বেশ কিছু অভিমতও উল্লেখ করেছেন । এরপর তিনি ইবনে খালদুনের উল্লিখিত ২৮টি হাদীসের সনদের সমালোচনাগুলোকেও একের পর এক খণ্ডন করেছেন এবং ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা একশ' পর্যন্ত পূর্ণ করেছেন ।

দ্বিতীয় নমুনা : لا مهدى ينتظر بعد الرسول خير البشر অর্থাৎ 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পর কোন প্রতীক্ষিত মাহদী নেই' নামক গ্রন্থ যার রচয়িতা হচ্ছেন কাতারের ধর্মীয় আদালতের প্রধান বিচারপতি শেখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ । তিনি এ গ্রন্থ (১৪০০ হিজরীর শুরুতে) 'মসজিদুল হারাম বিপ্লব' এবং এ বিপ্লবের নেতা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল কারাশীর 'প্রতীক্ষিত মাহদী' বলে নিজেকে দাবী করার পরপরই প্রকাশ করেন । অতঃপর হিজাযের কতিপয় আলেম এর প্রতিবাদ ও খণ্ডন করেছেন । এ মত খণ্ডনকারী আলেমদের মধ্যে আছেন শেখ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ যিনি الرد على من كذّب بالأحديث الصحيحة الواردة فى المهدى অর্থাৎ 'মাহদী সংক্রান্ত বর্ণিত সহীহ হাদীস যারা পত্যাখ্যান করেছে তাদের অভিমত খণ্ডন' শিরোনামে পঞ্চাশের অধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে উক্ত উক্ত লেখকের মত খণ্ডন করেছেন । উক্ত আলোচনা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে ৪৫তম সংখ্যায় (মুহররম, ১৪০০ হিজরী) প্রকাশিত হয়েছে। লেখক শেখ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ উক্ত ম্যাগাজিনে তার প্রকাশিত প্রবন্ধের ভুমিকায় উল্লেখ করেছেন : "আর প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরকে দুঃখ ও বেদনা দানকারী এ ঘটনা ঘটার পর ..

শেষ যুগে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ও আে ালন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, যেমন মাহদী মাহদীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) থেকে কি বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত বিদ্যমান ? এর পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় আলেম রেডিও, পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং বই পুস্তকে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত মুস্তাফীয ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন এবং এসব বাতিলপন্থী যারা পবিত্র বাইতুল্লাহর ওপর আগ্রাসন পরিচালনা করেছে তাদের ব্যাপারে কঠোর নি া করে রেডিওতে বক্তব্য দিয়েছেন এবং কতিপয় পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রবন্ধ লিখেছেন । তাদের মধ্যে মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব শেখ আবদুল আযীয বিনসালেহও আছেন । তিনি জুমআর এক খুতবায় এ জালেম পাপী গোষ্ঠির বিভ্রান্ত দল কর্তৃক বাইতুল্লাহ আক্রমণের তীব্র নি া করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা এবং যারা তাকে মাহদী বলে মনে করেছে তারা সবাই এক উপত্যকায় রয়েছে । আর যে মাহদীর কথা বলে হাদীসসমূহে বর্ণিত তিনি এদের থেকে ভিন্ন এক উপত্যকায় অবস্থান করছেন ।

উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপই কাতারের ধর্মীয় আদালতে প্রধান শেখ আবদুল্লাহ বিন যায়দ আল মাহমুদ ' সর্বশেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরে কোন প্রতীক্ষিত , মাহদী নেই' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছেন । তিনি উক্ত প্রবন্ধে হিজরী চতুর্দশ শতকের কতিপয় লেখকের সাথে সূর মিলিয়েছেন যাদের হাদীসের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য এবং তার বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা সংক্রান্ত কোন জ্ঞান নেই । এদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিও আছেন যারা বুদ্ধিবৃত্তিক সে হ-সংশয়ের ওপর নির্ভর করে ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি ঠিক তাদের মতই বলেছেন : "এগুলো হচ্ছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কথাবার্তা...।"

আমি এ প্রবন্ধে তার ভুল-ভ্রান্তি ও অলীক ধারণাসমূহ তুলে ধরে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করব যে, শেষ যুগে মাহদীর আবির্ভাব ও আে ালন সংক্রান্ত বিশ্বাস সহীহ হাদীসসমূহের দ্বারা সমর্থিত এবং বিরল কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত আহলে সুন্নাতের সকল আলেম এ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং এ আকীদা-বিশ্বাস প্রসঙ্গে অতীত ও বর্তমান কালে লেখা বই পুস্তকও বিদ্যমান ।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা আমি সমীচীন মনে করি । আর তা হলো আমি আগেরও ‘প্রতীক্ষিত মাহদী সংক্রান্ত আহলে সন্নাতের আকীদা- বিশ্বাস এবং তাদের লেখা বই পুস্তক’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম যা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনের প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৮৮ হিজরীর যীলকদ মাসে প্রকাশিত) ছাপা হয়েছিল । এ প্রবন্ধ দশটি বিষয় সম্বলিত ছিল । যথা :

১. মহানবী (সা.) এর ঐ সব সাহাবীর নাম যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে মাহদীর হাদীসসমূহ রেওয়ায়েত করেছেন;

২. ঐ সব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির নাম যারা তাদের গ্রন্থসমূহে মাহদী সংক্রান্ত হাদীস ও সাহাবীদের বক্তব্য বর্ণণা করেছেন;

৩ ঐ সব আলেমের নাম যারা ইমাম মাহদী সংক্রান্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন;

৪. ঐ সব আলেম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে মুতাওয়াতির বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের নাম এবং এতৎসংক্রান্ত তাদের বক্তব্য বর্ণনা;

৫. মাহদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসমূহ;

৬. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের দ্বারা যুক্তি ও দলিল পেশ করেছেন এবং এগুলোর সূত্রও বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করেছেন তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নামও উল্লেখ এবং এতৎসংক্রান্ত তাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি;

৮. যারা মাহদী সংক্রান্ত বিশ্বাসের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অস্বীকার করেছেন অথবা সেগুলোর ব্যাপারে দ্বিধা- সংশয় প্রকাশ করেছেন, তাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাসহ তাদের নাম;

৯. যে সব হাদীস মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের বিরোধী বলে ধারণা করা হয় সেগুলো এবং সেগুলোর জবাব দান;

১০. ‘শেষ যুগে মাহদীর আবির্ভাব সত্য বলে মেনে নেয়া আসলে গায়েবে ঈমাম বা বিশ্বাসেরই অন্তর্গত এবং (মাহদী সংক্রান্ত) শিয়াদের আকীদা- বিশ্বাসের সাথে আহলে সুন্নাতের আকীদা- বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই’ এতৎসংক্রান্ত একটি সমাপনী বক্তব্য ।

সত্যিই ইবনে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গির অপনোদন সংক্রান্ত ইবনুস সিদ্দীক আল মাগরিবীর আলোচনা এবং শেখ আব্বাদের উপরোল্লিখিত আলোচনাদ্বয় প্রতীক্ষিত মাহদী সংক্রান্ত আহলে সুন্নাতের হাদীস ও আকীদাভিত্তিক আলোচনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ । তবে ইসফাহানের ইমাম আমীরুল মুমিনীন লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত ‘আহলে সুন্নাতের নিকট ইমাম মাহদী’ নামক গ্রন্থ থেকে অন্যান্য সুন্নী আলেমের বক্তব্য ও অভিমত উদ্ধৃত করা যদি অধিক উপকারী না হতো তাহলে আমি ইবনুস সিদ্দীক আল মাগরিবীর প্রবন্ধ এবং শেখ আব্বাদের প্রবন্ধদ্বয় থেকে আরো কিছু উদ্ধৃতি পেশ করার ইচ্ছা করতাম । উল্লেখ্য যে, ‘আহলে সুন্নাতের নিকট ইমাম মাহদী’ গ্রন্থে প্রতীক্ষিত মাহদী প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ এবং পঞ্চাশ জনেরও অধিক সুন্নী আলেম ও ইমামের লিখিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ থেকে বেশ কয়েকটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে । আর ইমাম আমীরুল মুমিনীন লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ আরো একটি খণ্ডে হস্তলিখিত অবশিষ্ট সূত্রসমূহ প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।

ইবনুর কাইয়্যেম আল জাওযীয়াহ :

তিনি তার ‘আল মানার আল মুনীফ ফীস সহীহ ওয়াদ দাইফ’ গ্রন্থে প্রতীক্ষিত মাহদী সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন : “এ সব হাদীস চার শ্রেণীতে বিভক্ত । যতা:- সহীহ, হাসান, গরীব এবং বানোয়াট । আর মাহদী প্রসঙ্গে সাধারণ মুসলমান চারটি ভিন্ন অভিমত পোষণ করেছে ।

প্রথম অভিমত : মসীহ ইবনে মারিয়ামই হচ্ছেন মাহদী । এ অভিমত পোষণকারীরা পূর্বে উল্লিখিত মুহাম্মদ ইবনে খালিদ আল জুনদীর হাদীসের (لا مهدی الا عیسی অর্থাৎ ‘মাহদী- ই ঈসা’) দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছে আমরা এ হাদীসের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছি যে, এ হাদীস সহীহ নয়

। আর তা যদি সহীহ হয় তবু তাতে স্বতন্ত্র কোন মাহদীর অস্তিত্বের প্রমাণে কোন যুক্তি নেই । কেননা ঈসা (আ.)- ই মহানবী (সা.) ও কিয়ামতের মাঝে সবচেয়ে বড় মাহদী বলে গণ্য ।

দ্বিতীয় অভিমত : বনি আব্বাসের মধ্য থেকে যে মাহদী খিলাফত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার সময় গত হয়ে গেছে । আর এ অভিমতের প্রবক্তারা মুসনাদে আহমাদে যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তা দিয়ে এ মতের পক্ষে যুক্তি- প্রমান পেশ করেছে । হাদীসটি নি রূপ: “যখন তোমরা প্রত্যক্ষ করবে যে, খোরাসান থেকে কালো পতাকাসমূহ আগমন করেছে তখন এমনকি বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তোমরা সেগুলোর কাছে যাবে । কারণ, সেগুলোর মাঝে মহান আল্লাহর খলীফা আল মাহদী থাকবেন ।”

সুনানে ইবনে মাজায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত : “আমরা একদা মহানবী (সা.) এর কছে উপস্থিত ছিলাম, তখন বনি হাশিমের একদল যুবক সামনের দিকে এগিয়ে আসল । অতঃপর যখন মহানবী তাদেরকে দেখলেন তখন তার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেল এবং রং পরিবর্তিত হয়ে গেল । আমি তখন তাকে বললাম :আপনার পবিত্র মুখমণ্ডলে এমন কিছু এখনো দেখতে পাচ্ছি যা আমার কাছে পছ নীয় নয় । তিনি বললেন : মহান আল্লাহ আমাদের (আহলে বাইতের) জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে মনোনীত করেছেন । আর আমার আহলে বাইত অচিরেই বিপদাপদ, নির্বাসন ও দেশান্তরের শিকার হবে । এ অবস্থা প্রাচ্যবাসীর মধ্য থেকে একটি দল যাদের সাথে কালো পতাকা থাকবে, তাদের আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে । ঐ কালো পতাকাবাহীরা তখন ন্যায্য অধিকার দাবী করবে, কিন্তু তাদেরকে তা দেয়া হবে না । তাই তারা যুদ্ধ করবে এবং বিজয়ী হবে । অতঃপর তারা যা চেয়েছিল তা তাদেরকে দেয়া হবে । কিন্তু এবার তারা নিজেরাই তা গ্রহণ করবে না । তাই তারা যুদ্ধ করবে এবং বিজয়ী হবে । অতঃপর তারা যা চেয়েছিল তা তাদেরকে দেয়া হবে । কিন্তু এবার তারা নিজেরাই তা গ্রহণ করবে না । অবশেষে তারা তাদের পতাকাসমূহ আমার আহলে বাইতভুক্ত এক ব্যক্তি- যে এ পৃথিবী যেভাবে অন্যায়- অত্যাচার দিয়ে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তদ্রূপ তা ন্যায়পনায়ণতা দিয়ে ভরে দেবে-

তার হাতে তুলে দেবে । সুতরাং যারা তা প্রত্যক্ষ করবে তাদের উচিত হবে বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের সাথে যোগ দেয়া ।”

এ হাদীস এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসটি যদি সঠিক হয় তুবুও এগুলো থেকে প্রমাণিত হয় না যে, বনি আব্বাসের মধ্য থেকে যে মাহদী শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন তিনিই ঐ মাহদী যিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন । বরং তিনি অন্যতম মাহদী হিসেবে মাহদীর অন্তর্ভুক্ত । যেমন উমর ইবনে আব্দুল আযীযও মাহদী ছিলেন এবং তিনি বনি আব্বাসের মাহদীর চেয়েও ‘মাহদী’ নাম বা উপাধি গ্রহণ করার জন্য অধিক যোগ্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ।

দাজ্জাল যেমন পথভ্রষ্টতা ও অমঙ্গলের এক প্রান্তে ও শীর্ষে অবস্থান করেছে তদ্রূপ মাহদীও হেদায়েত, কল্যাণ ও মঙ্গলের শীর্ষে ও অপর প্রান্তে অবস্থান করছেন । যেরূপ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সবচেয়ে বড় দাজ্জালের আগমনের পূর্বে বহু মিথ্যাবাদী দাজ্জাল আছে তদ্রূপ প্রধান বা সর্বশ্রেষ্ঠ মাহদীর পূর্বেও অনেক হেদায়েতপ্রাপ্ত মাহদীও রয়েছেন ।

তৃতীয় অভিমত : তিনি মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ও হাসান ইবনে আলী (রা.)- এর বংশধর হবেন । তিনি শেষ যুগে বের হবেন যখন পৃথিবী অন্যায়- অত্যাচার দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে । তখন তিনি পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন । অধিকাংশ হাদীসই এ বিষয় নির্দেশ করে...। মাহদী যে ইমাম হাসানের বংশধর হবেন তাতে এক সু রহস্য বিদ্যমান । আর তা হল হাসান (রা.) মহান আল্লাহর উদ্দেশে খেলাফত ত্যাগ করেছিলেন । তাই মহান আল্লাহও তার বংশধরদের খিলাফতে অধিষ্ঠিত করবেন যিনি সমগ্র পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন । আর এটিই হচ্ছে স্বীয় বা দের মধ্যে মহান আল্লাহর সুন্নাত অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তাকে অথবা তার সন্তান- সন্ততিকে (বংশধর) ঐ জিনিসের চেয়েও উত্তম জিনিস প্রদান করেন...।(আল ইমাম আল মাহদী ইনদা আহলুস সুন্নাহ (আহলে সুন্নাতের নিকট ইমাম মাহদী), পৃ. ২৮৯)

ইবনে হাজার আল হাইসামী

তিনি তার 'আস সাওয়ায়িক আল মুহরিকাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন : "মুকাতির ইবনে সুলাইমান এবং তাকে যে সব মুফাসসির অনুসরণ করেছেন তারা বলেছেন যে, দ্বাদশ আয়াত

(و إنه لعلم للساعة)

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের নিদর্শন'- মাহদীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে । যে সব হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে যে, মাহদী মহানবী (সা.) এর আহলে বাইতভুক্ত সেগুলো শীঘ্রই বর্ণনা করা হবে । আর হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.)- এর বংশধারার মধ্যে যে বরকত ও কল্যাণ আছে এবং মহান আল্লাহ যে তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য পবিত্র ও যোগ্য মানুষ সৃষ্টি এবং তাদেরকে প্রজ্ঞার চাবিকাঠি ও করুণার খনি করে দেবেন এতৎসংক্রান্ত নির্দেশনা এ আয়াতে বিদ্যমান । এর অন্তর্নিহিত কারণ হলো এই যে, মহানবী (সা.) দোয়ার মাধ্যমে হযরত ফাতিমা এবং তার সন্তান ও বংশধদেরকে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আলীর জন্যও তিনি অনুরূপ প্রার্থনা করেছেন । এ বিষয় নির্দেশকারী হাদীসসমূহের বাচনভঙ্গি থেকেও জানা যায় এর সবগুলোই ইমাম মাহদী ?(আ.) সম্পর্কিত ।"[৪৪৭]

আমার অভিমত হচ্ছে و إنه لعلم للساعة এ আয়াতের যে ব্যাখ্যাদ্বয়ের একটিতে ইমাম মাহদীকে কিয়ামতের নিদর্শন এবং আরেকটিতে হযরত ঈসাকে কিয়ামতের নিদর্শন বলা হয়েছে সে ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব যে, হযরত ঈসা (আ.) ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগে অবতরণ করবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন । আর তাদের উভয়ের মাধ্যমেই একসঙ্গে মহাসত্য ও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হবে ।

মাহদী সংক্রান্ত কিছু হাদীস বর্ণনা করার পর ইবনে হাজার 'ঈসা ইবনে মারিয়ামই মাহদী' (لا مهدى إلا عيسى بن مريم) এ হাদীসের ওপর টীকা লিখতে গিয়ে বলেছেন : "অতঃপর 'ঈসাই মাহদী' (لا مهدى إلا عيسى) এর ব্যাখ্যা কেবল এ হাদীসটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হওয়ার

ভিত্তিতেই সম্ভব । তা না হলে হাকিম এতদপ্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটাই বলতে হবে ।” তিনি বলেছেন : “আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েই এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছি এবং আমি যুক্তি পেশ করার জন্য তা করিনি ।” আর বায়হাকী বলেছেন : “ এ হাদীস কেবল মুহাম্মদ ইবনে খালিদ বর্ণনা করেছে।” হাকিম বলেছেন : “মুহাম্মদ ইবনে খালিদ একজন অজ্ঞাত (مجهول) হাদীস বর্ণনাকারী এবং তার বর্ণনা মহানবী (সা.) এর সাথে সম্পর্কিত করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে ।” নাসাঈ স্পষ্টভাবে বলেছেন : “সে মুনকার অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী ।” নাসাঈ ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য হাফেয দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ হাদীসটির আগে সে সব হাদীস আছে অর্থাৎ যেগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে মাহদী ফাতিমার বংশধর সেসব হাদীস সূত্রের দিক থেকে অধিকতর সহীহ ।[৪৪৮]

আবুল ফিদা ইবনে কাসীর

তার রচিত গ্রন্থ ‘আন নিহায়াহ’য় তিনি বলেছেন : “শেষ যুগে যে মাহদী আবির্ভূত হবেন তার আলোচনা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফা ও ইমামদের অন্তর্ভুক্ত...। মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে তার সংক্রান্ত বর্ণনা বিদ্যমান এবং বলা হয়েছে যে, তিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন ।”

تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شئ حتى تنصب بإلياء অর্থাৎ ‘খোরাসান থেকে কালো পতাকাসমূহ বের হবে । ঈলিয়ায় সেগুলো স্থাপন করা পর্যন্ত কোন কিছুই সেগুলোকে বাধা দান করতে পরবে না’ – এ হাদীস বর্ণনার পরপরই তিনি বলেছেন : “এসব পতাকা ঐসব পতাকা নয় যেগুলো নিয়ে আবু মুসলিম খোরাসানী বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ১৩২ হিজরীতে উমাইয়্যা শাসনের মূলোৎপাটন করেছিলেন; বরং এগুলো হচ্ছে অন্য কালো পতাকা যেগুলো মাহদীর সাথে আসবে । আর তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আলাভী আর ফাতিমী আল হাসানী (রা.) । মহান আল্লাহ এক রাতের মধ্যেই তাকে প্রস্তুত এবং তার সবকিছু ঠিক করে

দেবেন অর্থাৎ তার তওবা কবুল করবেন, তাকে সামর্থ্য এবং ঐশী নির্দেশনা দেবেন ও সুপথ প্রদর্শন করবেন । তাকে একদল প্রাচ্যবাসী সমর্থন ও সাহায্য করবে, তার শাসনকর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তার ক্ষমতার ভিত মজবুত করবে; তার পতাকাও হবে কালো; আর এটি হচ্ছে এমন এক পতাকা যা মর্যাদ ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক । কেননা মহানবী (সা.) এর পতাকা কালো বর্ণের ছিল যা 'উকাব' ঈগল নামে অভিহিত ছিল ।

যা হোক শেষ যুগে যে মাহদীর আগমন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, মূলত তার আবির্ভাব ও উত্থান হবে প্রাচ্য (ইরান) থেকে এবং বায়তুল্লাহয় (মক্কায়) তার হাতে বাইআত করা হবে । এ বিষয়টি কিছু হাদীসেও উল্লিখিত হয়েছে...এবং আমি মাহদীর আলাচনায় একটি পৃথক খণ্ডও রচনা করেছি। আর সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর ।"[৪৪৯]

জালালুদ্দীন সুয়ূতী

তিনি 'আল হাভী লিল ফাতাওয়া' নামক গ্রন্থে বলেছেন : "ইবনে জারীর তার তাফসীর গ্রন্থে

و من أظلم ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها

অর্থাৎ 'যারা মহান আল্লাহর মসজিদসমূহে তার নাম স্মরণ করার ব্যাপারে বাধা দান করেছে এবং সেগুলো (মসজিদসমূহ) ধ্বংস করার ব্যাপারে চেষ্টা করেছে তাদের চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে?'- এ আয়াত প্রসঙ্গে সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন : তারা হচ্ছে রোমীয় যারা বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার ব্যাপারে বাখতুন নাসরকে সাহায্য করেছিল;

(اولئک ما کان لهم أن يدخلوها إلا خائفين)

অর্থাৎ 'তাদেরকে অবশ্যই ভীত- সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাকে প্রবেশ করতে হবে'- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : সেদিন পৃথিবীর বুকে রোমের সকল অধিবাসী (রোমান জাতি) নিজেদের গর্দান কর্তিত হওয়ার ভয়ে জিযিয়া কর প্রদানের ব্যাপারে ভীত হয়েই সেখানে প্রবেশ করবে । অতঃপর তারা জিযিয়া কর প্রদান করবে । لهم فى الدنيا خزى অর্থাৎ 'তাদের জন্য রয়েছে এ পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও অপমান'- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : তবে পৃথিবীতে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান

হচ্ছে এমন যে, যখন মাহদী আবির্ভূত হবেন এবং ক াট্যানটিনোপোল বিজয় করা হবে তখন তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন ; আর এটিই হচ্ছে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান ।"[৪৫০]

لا مهدى إلا عيسى بن مريم অর্থাৎ 'ঈসা ব্যতীত কোন মাহদী নেই' অথবা 'ঈসাই হচ্ছেন মাহদী'- এ হাদীসের ওপর টীকা লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "আল কুরতুবী তার 'আত তাযকিরাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন : এ হাদীসটির সনদ দুর্বল । মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত থেকে মাহদীর আবির্ভাব এবং তিনি যে হযরত ফাতিমা (আ.)- এর বংশধর হবেন এতৎসংক্রান্ত মহানবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত এবং এ হাদীসটির চেয়েও অধিক সহীহ । তাই এ হাদীসটি দিয়ে নয়, বরং ঐ সকল হাদীসের ভিত্তিতেই অভিমত প্রদান ও ফয়সালা করতে হবে ।"

আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে ইবরাহীম ইবনে আসেম আস সাহরী বলেছেন : "মাহদীর আগমন ও আবির্ভাব, তিনি যে আহলে বাইতভুক্ত হবেন, সাত বছর শাসন করবেন, পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন, তার সাথে হযরত ঈসা (আ.) আবির্ভূত হয়ে ফিলিস্তিনের বাব- ই লুদ্দের (লদ- এর ফটক) কাছে দাজ্জালকে বধ করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবেন, তিনি এ উম্মতের নেতৃত্ব দান করবেন এবং ঈসা (আ.) তার শাসনামলে তার পেছনে নামায আদায় করবেন- এতৎসংক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ মহানবী (সা.) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং বরণনাকারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এ হাদীসগুলো ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ।"[৪৫১]

ইবনে আবীল হাদীদ মুতাযিলী

তিনি 'শারহু নাহজিল বালাগাহ' গ্রন্থে و بنا يختم لا بكم 'এবং আমাদের দ্বারাই তিনি সমাপ্ত করবেন, তোমাদের দ্বারা নয়'- হযরত আলী (আ.)- এর এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন : "এ বাণী (ইমাম) মাহদীর প্রতি ইঙ্গিত যিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন । অধিকাংশ মুহাদ্দিস একমত যে,

তিনি হযরত ফতিমার বংশধর হবেন এবং আমাদের মুতাযিলা ভাইগণও তা অস্বীকার করেন না এবং তারা তাদের গ্রন্থসমূহে মাহদী প্রসঙ্গটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণও তা স্বীকার করেছেন । তবে আমাদের বিশ্বাস মতে তিনি এখনো জন্মগ্রহণ করেন নি এবং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন । এ একই অভিমত হাদীসপন্থিগণও পোষণ করে থাকেন ।”[৪৫২]

‘ক্ষিপ্ত উষ্ট্রীর ক্ষিপ্ততার পর নিজ শাবকের প্রতি সদয় হবার মতো পৃথিবী বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ করার পর আমাদের প্রতি অবশ্যই সদয় হবে ’- হযরত আলী এ কথা বলার পর তিলাওয়াত করলেন : যারা পৃথিবীতে নিপীড়িত- নির্যাতিত হয়েছে আমরা তাদের ওপর অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তাদেরকে ও উত্তরাধিকারী (অধিপতি) করতে চাই । হযরত আলীর এ বাণী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : “আর ইমামীয়া শিয়ারা ধারণা করে যে, এটি হচ্ছে তার পক্ষ থেকে গায়েব ইমাম সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি যিনি শেষ যুগে পৃথিবী শাসন করবেন । তবে আমাদের মাজহাবের ভাইয়েরা (মুতাযিলারা) বলেন যে, এটি হচ্ছে ঐ ইমাম সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি যিনি পৃথিবী শাসন করবেন এবং সকল রাষ্ট্র ও দেশের ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন । আর এ থেকে তার বর্তমান জীবিত ও বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য হয় না...। আর যায়দীয়ারা বলেন যে, যিনি পৃথিবী শাসন করবেন তিনি অবশ্যই ফাতিমী হবেন যাকে যায়দী মাজহাবের একদল ফাতিমী অনুসরণ করবে, এমনকি যদিও বর্তমানে তাদের একজনও নেই ।”[৪৫৩]

بأبى ابن خيرة الإماء ‘সর্বশ্রেষ্ঠ দাসীমাতাদের সন্তানের জন্য আমার পিতা উৎসর্গীকৃত হোক’ হযরত আলী (আ.)- এর এ বাণী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে আবীল হাদীদ বলেন : “তবে ইমামীয়া শিয়ারা ধারণা করে যে, তিনি তাদের দ্বাদশ ইমাম এবং তিনি দাসীমাতার সন্তান যার নাম নারজিস । কিন্তু আমাদের মুতাযিলা ভাইয়েরা মনে করে যে, তিনি হযরত ফাতিমার বংশধর যিনি ভবিষ্যতে দাসীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তিনি বর্তমানে নেই... পৃথিবী অন্যায়- অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তা ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দিয়ে ভরে দিবিন, তিনি জালেমদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন ।”[৪৫৪]

তবে উদাহরণস্বরূপ তিনি যদি আমাদের যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে এখন তিনি কোথাকার দাসী এবং তিনি কিভাবে দাসীমাতার সন্তান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাসীমাতার সন্তান হবেন ?

ইবনে আবীল হাদীদ বলেছেন : "فی سترة من الناس 'সে (মাহদী) জনচক্ষুর অন্তরালে থাকবে'- আলীর এ বাণীতে যে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা মোটেও ইমামীয়া শিয়াদের মাজহাবের অনুকূলে যায় না, যদিও তারা ধারণা করেছে যে, হযরত আলীর উক্ত উক্তি তাদের অভিমতকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ও সমর্থন করে । আর তা এ কারণে যে, মহান আল্লাহর পক্ষে এ ইমামকে শেষ যুগে সৃষ্টি করা এবং তাকে কিছুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখা সম্ভব । তার বেশ কিছু প্রচারক থাকবেন যারা তার দিকে জনগণকে আহবান জানাবেন এবং তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন । অতঃপর তিনি গোপন থাকার পর আবির্ভূত হয়ে সকল দেশের ওপর শাসন পরিচালনা করবেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে তার শাসনকর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করবেন।"[৪৫৫]

'ফাইযুল কাদীর' গ্রে লেখক আল্লামা মান্নাভী

المهدی رجل من ولدی وجهه کالکوکب الدّری 'মাহদী আমার বংশধরদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল তারকার মতো উজ্জ্বল হবে'- এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল মাতামিহ গ্রন্থে বলেছেন : "বর্ণিত আছে যে, এ উম্মতের মাঝে একজন খলীফা হবেন যার চেয়ে হযরত আবু বকর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নন...। আর মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অগণিত এবং প্রসিদ্ধ । অনেকেই সেগুলোর ব্যাপারে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন । আস সামহুদী বলেছেন : "তার(মহানবী) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে প্রতিষ্ঠিত বিষয় হচ্ছে এই যে, মাহদী ফাতিমার বংশধর হবেন । আর সুনানে আবী দাউদে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাসানের বংশধর হবেন ।এ ক্ষেত্রে মূল রহস্য হচ্ছে, মহান আল্লাহর উদ্দেশে উম্মতের প্রতি সদয় হয়ে ইমাম হাসানের খিলাফত ত্যাগ । তাই মহান আল্লাহ প্রথিবীবাসীর প্রচণ্ড প্রয়োজনের মুহূর্তে এবং অন্যায়- অবিচার দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ইমাম হাসানের বংশধর হতে এক ব্যক্তির ওপর সত্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করবেন । স্বীয়

বা াদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সুন্নাত বা রীতি হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি তার জন্য কোন কিছু ত্যাগ করবে তিন ঐ ব্যক্তিকে অথবা তার বংশধরকে যা সে ত্যাগ করেছে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু প্রদান করেন ।”

এরপর তিনি বলেছেন : “ঈসা ইবনে মারিয়াম ব্যতীত কোন মাহদী নেই- এ হাদীসটি মাহদী সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীসের পরিপন্থি নয় । কারণ, আল কুরতুবীর বক্তব্য অনুসারে এ হাদীসের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে হযরত ঈসা ব্যতীত আর কোন মাহদী পূর্ণরূপে মাসুম (নিষ্পাপ) নন । আর রুয়ানী হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল জাওয়ী ও ইবনুল আহমদ আর রাযী বলেছেন : উক্ত হাদীস আসলে একটি বাতিল হাদীস...। এ হাদীসের সনদে (রাবীদের পরম্পরায়) মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আস সূরী বিদ্যমান । তার সম্পর্কে ইবনুল জাল্লাব থেকে ‘আল মীযান’ নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাওয়াদ থেকে মাহদী সংক্রান্ত একটি প্রত্যাখ্যাত হাদীস বর্ণনা করেছেন । এরপর তিনি উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করে বলেছেন : এ হাদীসটি বাতিল ।”[৪৫৭]

আল্লামা খাইরুদ্দীন আল আলূসী

তিনি ‘গালিয়াতুল মাওয়ায়েয’ নামক গ্রন্থে বলেছেন : “অধিকাংশ আলেমের বিশুদ্ধ ও সঠিক অভিমতের ভিত্তিতে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব । আলেমদের মধ্যে যারা তার আবির্ভাবের বিষয়টি অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের এ মতের কোন মূল্য নেই...আর মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত বেশ কিছু হাদীস বিদ্যমান ।”

ঐ সকল হাদীসের একটি অংশ আলোচনা করার পর তিনি বলেছেন : “যা কিছু আমরা মাহদী প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম আসলে তা হচ্ছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অন্যতম বিশুদ্ধ অভিমত ।”[৪৫৮]

শেখ মুহাম্মদ আল খিদর হুসাইন শাইখুল আযহার

‘আত তামাদ্দুন আল ইসলামী’ নামক ম্যাগাজিনে ‘মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের ওপর এক পলক দৃষ্টি’- এ শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : “খবরে ওয়াহিদের (একক

সূত্রে বর্ণিত হাদীস) দ্বারা যুক্তি পেশ করার বৈধতার বিষয়টি ব্যবহারিক বিধির অন্তর্ভুক্ত । এটি এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে শরীয়ত প্রণেতা মহান আল্লাহ এমন কিছু সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করেন যা জানা ঈমানের সঠিকতার মানদণ্ড হিসাবে পরিগণিত নয়, তবে তাদের তা অবশ্যিই জানা উচিত । ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এরূপ (খবরে ওয়াহিদ) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত । তাই যখন মহানবী (সা.) থেকে শেষ যামানা সম্পর্কে এমন কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় তখন যদি তা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের পর্যায়ে না- ও পৌছায় অর্থাৎ রাবীদের সংখ্যা অধিক না- ও হয় তবুও তা গ্রহণ করা ও মেনে নেয়া অপরিহার্য ।

সহীহ বুখারীতে মাহদী সংক্রান্ত কোন হাদীস বর্ণিত হয় নি । সহীহ মুসলিমে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে মাহদীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি এবং কতিপয় হাদীসশাস্ত্রবিদের মতে এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মাহদী অথবা অন্তত এতে তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিকে ইঙ্গিত করা । তবে আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ, আত তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, তাবারানী, আবু নাঈম ইবনে হাম্মাদসহ অন্যান্য হাদীসবেত্তা তাদের নিজ নিজ হাদীসগ্রন্থে মাহদী সংক্রান্ত হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন ।

মোল্লা আলী আল কারী প্রণীত 'আল উরফুল ওয়াদী ফী হাকীকাতিল মাহদী' এবং শাওকানী প্রণীত 'আত তাওহীদ ফি তাওয়াতুরে মা জায়া ফিল মুনতাজার ওয়াদ দাজ্জাল ওয়াল মাসীহ' (প্রতীক্ষিত মাহদী, দাজ্জাল ও মাসীহ সক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহের মুতাওয়াতির হওয়া সংক্রান্ত ব্যাখ্যা) নামক স র্ভে এসব হাদীস সংকলিত হয়েছে ।

আমাদের জানা মতে প্রথম যে ব্যক্তি মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তিনি হলেন আবু যাইদ আবদুর রহমান ইবনে খালদুন । তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, (মাহদী সংক্রান্ত) কতিপয় হাদীস সমালোচনার উর্দ্ধে ।...আর আমাদের অভিমত হচ্ছে, এ সব হাদীসের মধ্যে যখন অন্তত একটি হাদীস সঠিক বলে প্রমাণিত হবে এবং সমালোচনার উর্দ্ধে বলে গণ্য হবে তখন ঐ হাদীস শেষ যুগে এমন এক ব্যক্তি যিনি শরিয়ত অনুসারে মানব

জাতিকে নেতৃত্বদান এবং ন্যায়পরায়ণতাসহ পৃথিবীতে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, তার আবির্ভাবের বিষয়টিতে বিশ্বাস অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে ।

যে সব সাহাবীর সূত্রে মাহদী সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদের সংখ্যা সাতাশ জন ।...প্রকৃত ব্যাপার হলো বানোয়াট এবং নিকটবর্তী দুর্বল হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহকে প্রথক করার ব্যাপার হলো বানোয়াটের নিকটবর্তী দুর্বল হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহকে প্রথক করার পর মাহদী সংক্রান্ত অবশিষ্ট হাদীস সম্পর্কে কোন বিচক্ষণ গবেষক ও আলেমেই উপিক্ষা করতে পারেন না ।...আর একটু আগে উল্লিখিত স র্ভে শাওকানী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে । তিনি বলেছেন : এ সংক্রান্ত যে সব হাদীসের ওপর নির্ভর করা সম্ভব সেগুলোর সংখ্যা পঞ্চাশ, যার মধ্যে সহীহ, হাসান ও সংশোধনযোগ্য দুর্বল হাদীস (যে দুর্বল হাদীসের সমর্থক হাদীসসমূহ রয়েছে যার দ্বারা তার বিষয়বস্তুগত দুর্বলতা দূর করা সম্ভব) বিদ্যমান । তাই এ সংক্রান্ত হাদীস নিঃসে হে মুতাওয়াতির; বরং যে সব হাদীস এ হাদীসসমূহ অপেক্ষাও স্বল্প সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও উসূলশাস্ত্রের গ্রহীত পারিভাষিক নীতিমালার ভিত্তিতে ‘মুতাওয়াতির’ পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ সেগুলোরকেও মুতাওয়াতির হাদীস বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এসব হাদীস শিয়াদের তৈরী । কিন্তু তাদের বক্তব্য এভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় যে, হাদীসগুলো তার সংশ্লিষ্ট সূত্রসহই বর্ণিত হয়েচে এবং আমরা এগুলোর সনদসমূহের রাবীদের ব্যাপারে অনুসন্ধান গবেষণা করেছি । অতঃপর আমরা তাদেরকে এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পেয়েছি যারা ন্যায়পরায়ণতা এবং সূ স্মরণশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যাদের মধ্যে কেউই জারহ ও তাদীল (হাদীসসমূহের বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও ত্রুটি পর্যালোচনা) বিশেষজ্ঞ আলেমদের পক্ষ থেকে শিয়া বলে অভিযুক্ত হন নি । অথচ এ সব বিশেষজ্ঞ আলেমের মধ্যে এমন অনেক রয়েছেন হাদীসের রাবীদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে যারা খ্যতি লাভ করেছেন ।...আবার কোন কোন শাসক তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিষয়কে নিজ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে । তাই তারা জনগণকে নিজেদের চারপাশে সমবেত করার জন্য নিজেদেরকে ‘মাহদী’ বলে দাবী করেছে । ফাতেমীয় সাম্রাজ্যে এ দাবীর ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কারণ, এর প্রতিষ্ঠাতা উবাইদুল্লাহ মনে করতেন যে, তিনিই মাহদী । মুওয়াহহিদদের প্রশাসনও এ দাবীর ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কারণ, এ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবনে তূমার্ত এ দাবীর ওপরই তার শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।

মুরিইনিয়াহ রাজবংশের শাসনামলে মরক্কোর ফেজ নগরীতে ‘তূযদী’ নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল এবং মানহাজাহ গোত্রের সর্দাররা তার চারপাশে জড়ো হয়েছিল । সে মাসমাতীদেরকে হত্যা করেছিল ।

৬৯০ হিজরীতে মরক্কোর এক পল্লীতে আব্বাস নামের এক ব্যক্তি নিজেকে মাহদী দাবী করে বিদ্রোহ করে । একটি গোষ্ঠি তার অনুসারী হয় । অবশেষে সে নিহত হয় । এভাবে তার দাবী ও প্রচার কার্যক্রমেরও যবনিকাপাত হয় ।

মিশরে আরাবীর বিপ্লবের পর মুহাম্মদ আহমদ নামের এক ব্যক্তি সুদানে আবির্ভূত হয়ে নিজেকে মাহদী বলে দাবী করে এবং ১৩০০ হিজরীতে জাহীনা অঞ্চলের বাক্কারাহ গোত্র তাকে মাহদী হিসেবে মেনে নিয়ে তার অনুসারী হয় । তার স্বভাবিক মৃত্যুর পর বাক্কারাহ গোত্রের এক সর্দার তার স্থলাভিষিক্ত হয় ।

যখন জনগণ মহানবী (সা.)এর কোন হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে ভুল করে অথবা তা সঠিকভাবে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করার ফলে ফিতনার উৎপত্তি হয় তখন হাদীসের এরূপ অপব্যবহারের বিষয়টি যেন হাদীসটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে স হ পোষণ অথবা তা অস্বীকার করার কারণ না হয় । কারণ, নবুওয়াত নিঃস হে একটি প্রকৃত বিষয়; অথচ বেশ কিছু ব্যক্তি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছে এবং এ দাবী দ্বারা অনেক লোককে পথভ্রষ্টও করেছে, যেমন বর্তমানকালে কাদিয়ানী ফিরকার কর্মকাণ্ড (এ ভ্রান্ত ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) । আর উলূহীয়াতের (উপাস্য হওয়া) বিষয়টি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া

সত্ত্বেও এবং তা দ্বিপ্রহরের মধ্যে আকাশে দীপ্তমান সূর্যের চেয়েও উজ্জল জানার পরও কিছু কিছু সম্প্রদায় তাদের নেতাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন । যেমন এ যুগে বাহাঈ সম্প্রদায় এমন দাবীই করে থাকে । তাই পরম সত্য মহান আল্লাহকে তার (উলূহীয়াতের) ক্ষেত্রে যে ভ্রান্ত ধারণা (শিরক) পোষণ করা হয়েচে সেজন্য অস্বীকার করা মোটেও সমীচীন হবে না ।"[৪৫৯]

শেখ নানিরুদ্দীন আলবানী

শেখ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী 'আত তামাদ্দুন আল ইসলামী' ম্যাগাজিনে 'মাহদী প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : "মাহদী প্রসঙ্গে জানা থাকা উচিত যে, তার আবির্ভাব সংক্রান্ত প্রচুর সহীহ হাদীস বিদ্যমান যার বেশ কিঠু সহীহ সনদযুক্ত অর্থাৎ মহানবী (সা.) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । আমি এ প্রবন্ধে এগুলোর মধ্য থেকে কতিপয় সনদ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করব । এর পরপরই যারা এ সব হাদীস ও রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে আপত্তি করেছেন এবং এগুলোর দোষ-ক্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাদের আপত্তি ও সংশয়সমূহ অপনোদন করব ।" তিনি উদাহরণস্বরূপ এ সংক্রান্ত কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করে সেগুলো মুতাওয়াতির হওয়ার পক্ষে বিশেষজ্ঞ আলেমদের অভিমত তুলে ধরেছেন ।

এরপর তিনি বলেছেন : "সাইয়্যেদ রশীদ রিযা এবং অন্যরা ইমাম মাহদী সংক্রান্ত যে সব হাদীস বার্ণত হয়েছে সেগুলোর ওপর স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা চালান নি এবং সূ ভাবে যাচাই করে দেখেন নি; আর এ সব হাদীসের প্রতিটির সনদও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন নি । যদি তা করতেন তাহলে তারা প্রত্যক্ষ করতেন যে, এ হাদীসগুলোর মধ্যে এমন সব হাদীস আছে যেগুলো দিয়ে শুধু এ বিষয়েই নয়, এমনকি গায়েবী অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও শরীয়তের দলিল পেশ করা সম্ভব । অথচ কেউ কেউ ধারণা করেন যে, এসব গায়েবী বিষয় কেবল মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয় । রশীদ রিযা (রহ.) দাবী করেছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সনদ শিয়া বর্ণনাকারী মুক্ত নয় । কিন্তু ব্যাপারটি একেবারেই এমন নয় । আমি যে চরাটি হাদীস উল্লেখ করেছি সেগুলোয় 'শিয়া' বলে প্রসিদ্ধ কোন রাবী নেই । যদি তর্কের খাতিরে

ধরেও নিই যে, এ দাবী সত্য, তবুও তা মাহদী (আ.) সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সত্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না। কারণ হাদীস সত্য ও বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র শর্ত বা বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে রাবীর সত্যবাদিতা এবং সূ ভাবে স্মরণ রাখার ক্ষমতা। তাই রাবীর ভিন্ন মাজহাবের অনুসারী হওয়ার বিষয়টি কোন হাদীস অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মাপকাটি হতে পারে না। তেমনি সম মাজহাবের অনুসারী হওয়াও কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত নয়। আর বিষয়টি হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতির মধ্যেও গ্রহণ করা হয়েছে এবং হাদীসশাস্ত্রবিদদের নিকট এটি একটি সর্বস্বীকৃত নীতি। তাই শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে অনেক শিয়া ও অন্য মাজহাবের অনুসারী রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং এ ধরনের হাদীসের দ্বারা দলিল- প্রমাণও পেশ করেছেন।

তবে সাইয়্যেদ রশীদ রিযা অন্য কোন কারণে এ সব হাদীসকে ত্রুটিমুক্ত বলে থাকতে পারেন। আর তা হলো তাআরুদ (تعارض) বা পরস্পর বিরোধিতা অর্থাৎ হয়তো তার মতে মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পরস্পর বিরোধী এবং সেগুলো পরস্পরকে বাতিল করে দেয়। কিন্তু এ কারণটি প্রত্যাখ্যাত। কেননা পরস্পর বিরোধী হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, প্রামাণ্যের দৃষ্টিতে হাদীসসমূহের সমান হওয়া। তাই শক্তিশালী ও দুর্বল হাদীসদ্বয়ের মধ্যে তাআরুদ- এর নীতি কার্যকর হওয়াকে কোন সুবিবেচক ও জ্ঞানী ব্যক্তিব বৈধ বিবেচনা করেন না। সাইয়্যেদ রশীদ রিযা মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে যে তাআরুদ- এর কথা উল্লেখ করেছেন তা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বিধায় বিবেকবান জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে তা স্বীকৃত ও বৈধ নয়।

মোটকথা হলো মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত বিশ্বাস হচ্ছে এমন একটি বিশ্বাস যা মুতাওয়াতির সূত্রে বার্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং যেহেতু এ বিশ্বাস গায়েবী বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা খোদাভীরু (মুত্তাকী) ব ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমনটি মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

(الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)

আলিফ লাম মীম । এটি ঐ গ্রন্থ যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং পরহেজগারদের জন্য পথ প্রদর্শক যারা গায়েবে বিশ্বাস রাখে ।

এ সব বিষয় একমাত্র অজ্ঞ অথবা অহংকারী ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করে না । আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে যে সব বিষয় পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহয় প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছে তাতে বিশ্বাস আনার তাওফীক দেন।”[৪৬০]

আল কিত্তানী আল মালিকী

তিনি তার ‘নাজমুল মুনতাসির মিনাল হাদীস আল মুতাওয়াতির’ গ্রন্থে যে বিশ জন সাহাবী মাহদী সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের বিবরণ দানের পর বলেছেন : “আল হাফিয আস সাখাভী থেকে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির । আর সাখাভী এ কথা ‘ফাতহুল মুগীস’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং আবুল হাসান আল আবিরী থেকে তা উদ্ধৃত করেছেন ।

এ সন্দর্ভের শুরুতে এ কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে । মাহদী সংক্রান্ত আবুল আলা ইদ্রীস আল হুসাইনী আল ইরাকীর একটি লেখায় ‘মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির অথবা প্রায় মুতাওয়াতির’- এ কথা বিদ্যমান । তিনি বলেছেন : একাধিক সমালোচক হাফিয মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন...।

‘শারহু রিসালাহ’ পুস্তিকায় শেখ জাওস হতে বর্ণিত হয়েছে : আস সাখাভী বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে মাহদী সংক্রান্ত হাদীস বিদ্যমান এবং বলা হয়েছে যে, এ হাদীসগুলো মুতাওয়াতির হাদীসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে...। শারহুল মাওয়াহিবে শাফিঈর মানাকিব অধ্যায়ে আবুল হাসান আল আবিরীর উদ্ধিতি দিয়ে বলা হয়েছে : মাহদী যে এ উম্মতের মধ্য থেকে হবেন এবং তার পেছনে ঈসা (আ.) নামায পড়বেন- এতৎসংক্রান্ত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির । আর ‘ঈসাই মাহদী’ (لا مهدى الا عيسى) – ইবনে মাজার এ হাদীস রদ্দ করার জন্য ‘মাহদী এ উম্মতের

মধ্য থেকেই হবেন এবং ঈসা মাসীহ তার পেছনে নামায পড়বেন- এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে...।

'মাআনীল ওয়াফা ফি মাআনীল ইকতিফা' গ্রন্থে শেখ আবুল হাসান আল আবিরী বলেছেন : মাহদীর আগমন, তিনি যে সাত বছর রাজত্ব করবেন এবং পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দিয়ে ভরে দেবেন এতৎসংক্রান্ত হাদীস মহানবী (সা.) থেকে অগণিত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তাই এ হাদীসসমূহ বর্ণনাকারীর সংখ্যার দৃষ্টিতে মুস্তাফিয হাদীসের পর্যায় অতিক্রম করে মুতাওয়তিরের পর্যায়ে পৌছেছে...। শেখ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সাফারাইনী আল হাম্বলী তার 'শারহুল আকীদাহ' গ্রন্থে বলেছেন : মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অগণিত এবং তা অর্থগতভাবে মুতাওয়তিরের পর্যায়ে পৌছেছে এবং আহলে সুন্নাতের আলেমদের মাঝে এতটা প্রচলিত হয়েছে যে, তারা মাহদীর আবির্ভাবকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। এরপর তিনি কতিপয় সাহাবী থেকে মাহদী সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : সাহাবীদের থেকে ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে অনেকেরই নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং অনেকের নাম উল্লিখিত হয় নি। যদি এ সকল হাদীসের সাথে তাবেয়ীদের হতে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে যোগ করা হয় তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়। তাই মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত বিশ্বাস ওয়াজিব। আর এ বিষয়টি আলেম ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে প্রতিষ্ঠিত এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা- বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত...।"[৪৬১]

আল আদভী আল মিশরী

তিনি তার 'মাশারিকুল আনওয়ার' গ্রন্থে বলেছেন : "কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মাহদী আবির্ভুত হবার সময় তার মাথার ওপর এক ফেরেশতা আহবান জানিয়ে বলতে থাকবে : এই মাহদী মহান আল্লাহর খলিফা; অতএব, তোমরা সবাই তার আনুগত্য কর। অতঃপর জনগণ তার দিকে ছুটে আসবে এবং তাদেরকে মাহদী- প্রেমের সুধা পান করানো হবে। তিনি

সাত বছর পশ্চিম ও পূর্ব অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব শাসন করবেন; প্রথমে যারা কাবা ঘরের রুকন ও মাকামের মাঝখানে তার বাইআত করাবে তাদের সংখ্যা হবে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম যোদ্ধাদের সমান অর্থাৎ তিনশ' তের জন। এরপর শামের ঈমানদার ব্যক্তিরা, মিশরের সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা, প্রাচ্যের (ইরানের) বিভিন্ন গোত্র ও দল এবং অন্যান্য জাতি তার কাছে আসবে এবং তার হাতে বাইআত করবে। মহান আল্লাহ খোরাসান থেকে তার সাহায্যার্থে কালো পতাকাবাহী এক সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করবেন; তারা এক বর্ণনামতে শামের দিকে এবং আরেক বর্ণনা অনুসারে কুফার দিকে অগ্রসর হবে। আর এতদুভয়ের মধ্য সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। মহান আল্লাহ তাকে তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আসহাব- ই কাহাফ (গুহাবাসী সাত যুবক) তার সাহায্যকারী হবেন। উস্তাদ সুয়ূতী বলেছেন : এ সময় পর্যন্ত তাদের জীবিত রাখার রহস্য হচ্ছে এ উম্মতের মধ্যে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সত্যাশ্রয়ী খলীফা ইমাম মাহদীকে সাহায্য করার মহান মর্যাদা দান করা। তার সেনাবাহীনি তার সামনে ও পেছনে যথাক্রমে হযরত জিবরাইল ও মীকাঈল থাকবেন।"[৪৬২]

সাদুদ্দীন তাফতাযানী

তিনি 'শারহু মাকাসিদ' গ্রন্থে বলেছেন :"আলোচনার পরিসমাপ্তি মাহদীর আবির্ভাব এবং ঈসার : অবতরণ ইমামতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। তারা দু'জন হচ্ছেন কিয়ামতের নিদর্শন। এতদপ্রসঙ্গে বেশ কিছু সহীহ হাদীস বিদ্যমান যদিও সেগুলো হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ একক বা) (স্বল্প সূত্রে বর্ণিত হাদীস

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক বিপদের কথা উল্লেখ করলেন যা এ উম্মতকে এমনভাবে স্পর্শ করবে যে, এর ফলে কোন লোকই তখন অন্যায়- অত্যাচার থেকে বাচার জন্য কোন আশ্রয়স্থলই খুজে পাবে না। অতঃপর মহান আল্লাহ আমার বংশধারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যে পৃথিবীকে অন্যায়- অত্যাচার দিয়ে যেমনভাবে ভরে যাবে ঠিক তেমনি ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন। তাই আহলে সুন্নাতের

আলেমদের অভিমত হচ্ছে, তিনি হবেন একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম এবং হযরত ফাতিমার বংশধর । মহান আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে সৃষ্টি করবেন এবং ঐশী ধর্ম ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তাকে প্রেরণ করবেন । আর ইমামীয় শিয়ারা ধারণা করেছে যে, তিনি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল আসকারী যিনি শত্রুর আশংকায় লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন অর্থাৎ আ গোপন করেছেন এবং নূহ (আ.) লোকমান খিযির (আ.)- এর মত তার জীবন দীর্ঘায়িত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয় । তবে অন্য সকল মাজহাব ও ফিরকা তাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে । কারণ, তা অত্যন্ত দূরবর্তী সম্ভাবনার একটি বিষয় । এ উম্মাতের ক্ষেত্রে এ ধরণের দীর্ঘ জীবনের ঘটনা বিরল বলে গণ্য এবং অনুরূপ নজীরের কথা কোন দলিল- প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় নি ।”[৪৬৩]

আল কিরমানী আদ দামেশকী

তিনি ‘আখবারুদ দুওয়াল ওয়া আসরারুল আউয়াল’ গ্রন্থে বলেছেন : “আলেমদের মধ্যে ঐক্যমত্য আছে যে, মাহদী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন এবং বিপ্লব করেবেন । এমন ব্যক্তির আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ইমাম মাহদীর অস্তিত্ব সমর্থন করে এবং তার মতো ব্যক্তিত্বের দ্যূতি ও আলোর বিচ্ছুরণের সাথেই তা সামাঞ্জস্যশীল । তার আবির্ভাব ও আ প্রকাশে শতাব্দীর অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোকোদ্ভাসিত হবে । তার দর্শনে রাতের কালো আধার আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে পরিণত হবে । তার ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের দিগন্তপ্রসারী আলোকচ্ছটা সমগ্র বিশ্বকে আলোদানকারী চাঁদ অপেক্ষাও উজ্জ্বল করবে ।”[৪৬৪]

মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী

তিনি তার ‘আল ফুতুহাত আল মাক্কীয়া’ গ্রন্থে বলেছেন : “জেনে রাখ (মহান আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন), মহান আল্লাহর একজন খলীফা আছেন যিনি এমন অবস্থায় আবির্ভূত হবেন যখন পৃথিবী অন্যায়- অত্যাচার দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে । আর যদি পৃথিবীর আয়ু শেষ হতে

একদিনও অবশিষ্ট থাকে তাহলে মহান আল্লাহ ঐ দিনটাকে এতটা দীর্ঘায়িত করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বংশধারায় হযরত ফাতিমার সন্তানদের মধ্য থেকে আল্লাহর খলীফা এক ব্যক্তি শাসনভার গ্রহণ করবেন; মহনবী (সা.)- এর নামের সাথে তার নাম মিলে যাবে ।

...মারজ আক্কায় মহান আল্লাহর সর্ববৃহৎ দস্তরখান প্রত্যক্ষ করবে; তিনি অন্যায়- অনাচার ও অত্যাচারীদের নিশ্চিহ্ন করবেন, দীন প্রতিষ্ঠা করবেন এবং ইসলামে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবেন । হীন অবস্থায় থাকার পর তার মাধ্যমে ইসলাম সম্মানিত হবে এবং মৃত্যুর পর তা পুনরুজ্জীবন লাভ করবে । তিনি জিযিয়া কর চালু করবেন এবং মহান আল্লাহর দিকে তরবারির সাহায্যে আহবান জানাবেন । তাই যে তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে তাকে তিনি হত্যা করবেন এবং যে তার সাথে সংঘর্ষ ও দ্বে লিপ্ত হবে সে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হবে । তিনি যে প্রকৃত দীনের ওপর আছেন সেই দীনকেই প্রকাশ করবেন; রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি থাকতেন তবে যেভাবে ধর্ম পালন করতে বলতেন সেভাবে তা পালন করার আদেশ দেবেন । তিনি পৃথিবীর বুক থেকে সকল ধর্ম ও মাজহাব বিলুপ্ত করবেন । যার ফলে পৃথিবীতে একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম (ইসলাম) ব্যতীত আর কোন ধর্ম থাকবে না ।

তার শত্রুরা হবে ফকীহ- মুজতাহিদদের অনুসারী । কারণ তারা দেখবে তাদের ইমামরা যে ফতোয়া প্রদান করেছে সেগুলোর পরিপন্থি নির্দেশ ও হুকুম ইমাম মাহদী প্রদান করেছেন । কিন্তু তারা তার তরবারি ও কর্তৃত্বের ভয়ে বাধ্য হয়ে এবং তার কাছ থেকে সুবিধা লাভের আশায় তার নির্দেশ মেনে নেবে ।

সাধারণ মুসলিম জনতা, অভিজাত মুসলমানদের চেয়ে মাহদীকে পেয়ে বেশী আনি ত হবে । হাকীকতপন্থী আরেফগণ যাদের কাশফ ও শুহুদ (আধ্যা ক জগতের বিষয় ও রহস্যাবলী উন্মোচন ও প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা) আছে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পরিচিতি লাভ করার কারণে স্বভাবিকভাবেই তার হাতে বাইআত করবেন ।

তার আল্লাহওয়ালা সঙ্গী- সাথী থাকবেন যারা তার রাষ্ট্র কায়েম করবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন। তারা হবেন তার মন্ত্রী। তার রাষ্ট্র ও প্রশাসনে গুরুদায়িত্ব পালন করবেন এবং মহান আল্লাহর বিধি- বিধান প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও তাকে সাহায্য করবেন।

...তার নেতৃত্বে যুদ্ধকারী শহীদরা হবেন শ্রেষ্ঠ শহীদ; তার বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত; মহান আল্লাহ তার জন্য একটি দলকে সাহায্যকারী নিযুক্ত করবেন যাদেরকে তিনি তার গায়েবী জগতে তার জন্য লুক্কায়িত রেখেছেন তিনি কাশফ ও শুহুদের মাধ্যমে তাদেরকে হাকীকতসমূহ (সত্যের প্রকৃত রূপ)দেন এবং স্বীয় বা াদের প্রতি করণীয় দায়িত্ব তাদের মাধ্যমেই সম্পাদন করেন, তাদের সাথে পরামর্শ করে ইমাম বিভিন্ন বিষয়ে ফয়সালা করবেন। কারণ, তারা গায়েবী জগতে যা আছে তা জানেন।

তবে তিনি নিজেই সত্যের তরবারি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সবচেয়ে যোগ্য রাজনীতিক তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু অবহিত অর্থাৎ তিনি তার অবস্থান ও মর্যাদা অনুসারে তার নিকট হতে জ্ঞাত। কারণ, তিনি নিষ্পাপ খলীফা যাকে মহান আল্লাহ ভুল- ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন; তিনি পশুর ভাষাও বুঝবেন; মহান আল্লাহ তার জন্য যে সব সহযোগী নিযুক্ত করেছেন তাদের জ্ঞানের রহস্যাবলী দ্বারা তিনি মানুষ ও জ্বিন জাতির মাঝে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করবেন। কারণ, মহান আল্লাহ বলেছেন : মুমিনদেরকে সাহায্য করাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব (و كان حقا علينا نصر المؤمنين)।

এসব সহযোগী হবেন তার সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী ও শ্রেষ্ঠ; তারা হবেন অনারব- তাদের মধ্যে একজনও আরব থাকবেন না। তবে তারা আরবী ভাষায় কথা বললেন; তাদের একজন রক্ষক আছেন যিনি তাদের (মানব) জাতিভুক্ত নন। তারা কখনো মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেন নি এবং তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসভাজনদের অন্তর্ভুক্ত।"[৪৬৫]

তিনি তার 'আল ইশাআহ ফী আশরাতিস সাআহ' গ্রন্থে লিখেছেন : "মাহদী প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে বর্ণনাগত পার্থক্য থাকলেও তা নিতান্ত কম নয়; তাই মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আদ দাস্তরী তার মানাকিবুশ শাফিঈ গ্রন্থে বলেছেন : মাহদী প্রসঙ্গে এবং তিনি যে তার (মহানবীর) আহলে বাইতভুক্ত হবেন এতৎসংক্রান্ত মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির বা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

...আনাস ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত আছে যে, মাহদী আবু বকর ও উমর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাকে বলা হলো : হে আনাস! তিনি কি আবু বকর ও উমর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ? তিনি বললেন : এমনকি তিনি কতিপয় নবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আর তার থেকে আরো বর্ণিত আছে : তার (মাহদীর) ওপর আবু বকর ও উমরের শেষ্ঠত্ব নেই। সুয়ূতী 'আল উরফ আল ওয়ার্দী' গ্রন্থে বলেছেন : এটি সনদের দিক থেকে সঠিক (অর্থাৎ মাহদীর ওপর আবু বকর ও উমরের শ্রেষ্ঠত্ব নেই- এ কথা ইবনে সীরীন থেকে প্রকৃতই বর্ণিত হয়েছে) এবং তা প্রথম বাক্যের (মহদী আবু বকর ও উমর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) চেয়ে হালকা। তিনি বলেছেন : আমার কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত হচ্ছে 'বরং তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জনের পুরস্কার' (بل أجر خمسين منكم) – এ হাদীসটি যে বিষয় নির্দেশ করে তার ভিত্তিতে উপরিউক্ত বাক্যদ্বয় (মাহদী আবু বকর ও উমর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এবং এমনকি তিনি কতিপয় নবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ') ব্যাখ্যা করা। কারণ, মাহদীর যুগে ফিতনা অত্যন্ত প্রবল হবে।

আমার মতে আসলে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে বিভিন্ন; আর মহানবী (সা.) কোন ব্যক্তিকে যেভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেছেন সেভাবেই তাকে প্রাধান্য দেয়া ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা উচিত এবং নিরঙ্কুশভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কখনোই সমীচীন হবে না। কারণ, অনুত্তম ব্যক্তির মধ্যেও কোন কোন গুণ থাকে যা উত্তম ব্যক্তির মধ্যে নেই। ফুতুহাত গ্রন্থে শেখ মুহিউদদ্দীন আরাবী থেকে ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিচার ও ফয়সালা প্রদান করার

ক্ষেত্রে নির্ভুল হবেন; করাণ, তিনি মহানবী (সা.)- এর পদাঙ্কের অনুসারী হবেন বলে কখনো ভুল করবেন না। নিঃসন্দেহে এটি আবু বকর ও উমরের মধ্যে ছিল না। আর যে নয়টি বৈশিষ্ট্য আগে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর সব কয়েকটি তার আগের কোন নেতার মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নি। তাই এ সব দিক থেকে তাদের দু'জনের ওপর তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যায়। যদিও তাদের দু'জনেরই মহানবী (সা.) এর সাহাবী হওয়া, ওহী অবলোকন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। আর মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। শেখ আলী কারী 'আল মাশরাব আল ওয়ার্দী ফী মাজহাবিল মাহদী' নামক গ্রন্থে বলেছেন : "আর তার শ্রেষ্ঠত্বের দলিল হচ্ছে মহানবী (সা.) তাকে 'খালিফাতুল্লাহ' (মহান আল্লাহর খলীফা) বলে অভিহিত করেছেন এবং আবু বকরকে কেবল 'খলিফাতু রাসূলিল্লাহর' (রাসূলুল্লাহর খলীফা) বলা হয়।"[৪৬৬]

পরিশিষ্ট

আহলে সুন্নাতের হাদীস ও মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাহদী (আ.)

“আর সে হচ্ছে কিয়ামতের একটি নিদর্শন।” (সূরা যুখরূফ :৬১)

আহলে সুন্নাতের নিকট সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলন ছয়টি যা ‘সিহাহ সিত্তাহ’ নামে পরিচিত । হাদীসের প্রামাণ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করার জন্য আহলে সুন্নাতের হাদীস সংকলকগণ যে সব মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন এ ছ’টি সংকলন সে সব মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত । এ ছ’টি গ্রন্থ হচ্ছে : সহীহ আল বুখারী, সহীহ আল মুসলিম, সহীহ আত তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ ও সহীহ আন নাসাঈ । ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে সিহাহ সিত্তাহ ও আহলে সুন্নাতের অন্যান্য সূত্রে অসংখ্য হাদীস রয়েছে । এখানে উদ্ধৃত নি োক্ত হাদীস ও বর্ণনাগুলো এমন যেগুলোর সত্যতা ও প্রামাণ্যতার ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের হাদীস বিশারদগণ একমত ।

১. মহানবী (সা.) বলেছেন : এমনকি সমগ্র বিশ্বের আয়ু যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কিয়ামত হতে একদিনও অবশিষ্ট থাকে তাহলেও মহান আল্লাহ ঐ দিবসকে এতটা দীর্ঘায়িত করবেন যাতে তিনি ঐ দিবসেই আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন যাকে আমর নামেই ডাকা হবে । পৃথিবী অন্যায়- অত্যাচারে ভরে যাওয়ার পর সে তা শান্তি ও ন্যায়ে পূর্ণ করে দেবে ।” (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬ ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৪- ৭৫; আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড পৃ. ৩৭৬ ৩য় খণ্ড, পৃ.৬৩; মুস্তাদরাকুস সাহীহাইন (হাকেম), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭; আল মাজমা (তাবারানী), পৃ. ২১৭; তাহযীবুস সাবিত (ইবনে হাজার আসকালানী), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ (ইবনে হাজার হাইসামী), ১১শ অধ্যায়, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড পৃ. ১৮৬; ইকদুদ দুরার ফী আখবারিল মাহদী আল মুনতাযার, ১২শ খণ্ড, ১ম অধ্যায়; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান (গাঞ্জী শাফিয়ী), ১২শ

অধ্যায়; ফাতহুল বারী (ইবনে হাজার আসকালানী), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫; আল তাযকিরাহ (কুরতুবী), পৃ. ৬১৭; আল হাভী (সুয়ূতী) পৃ. ১৬০; আল উরফুল ওয়ারদী (সুয়ূতী) পৃ. ২ । আশ শাফিয়ী (ওফাত ৩৬৩/৯৭৪) বলেছেন যে, এ হাদীস বিপুলসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত এবং বহু বর্ণনাকারী কর্তৃক তা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বর্ণিত ও প্রচারিত হয়েছে । এছাড়া হাদীসটি ইবনে হিব্বান, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির প্রমুখ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাদিতেও উদ্ধৃত হয়েছে ।

২. মহানবী (সা.) বলেছেন : "মাহদী আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের সদস্যদের একজন ।" (ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ৪০৮৫)

হাদীসে যেমন আমরা দেখতে পাই, ইমাম মাহদী (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত । তাই তিনি হযরত ঈসা (আ.) হতে পারেন না । ইমাম মাহদী (আ.) এবং ঈসা (আ.) ভিন্ন দুই ব্যক্তি, তবে তারা দু'জন একই সময় আগমন করবেন । নি োক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশধর হবেন ।

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "মাহদী ফতিমার বংশধর।" (ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮৬; নাসাঈ; বাইহাকী; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯- এর বর্ণনানুসারে অন্যান্য হাদীস- সংকলকগণ) ।

৪. মহানবী (সা.) বলেছেন : "আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংমধরগণ বেহেশতবাসীদের নেতা : স্বয়ং আমি, হামযাহ, আলী, জাফর, হাসান, হুসাইন, ও মাহদী।" (ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮৭; মুস্তাদরাকে হাকেম (আনাস ইবনে মালিক- এর সূত্রে বর্ণিত); দাইলামী; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৫)

৫. মহানবী (সা.) বলেছেন : " মাহদী আমার উম্মাহর মাঝে আবির্ভূত হবে । সর্বনি ৭ বছর এবং সর্বোচ্চ ৯ বছরের জন্য আবির্ভূত হবে ।[১] এ সময় আমার উম্মাহ অফুরন্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে যা তারা আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি । উম্মাহ তখন বিপুল পরিমাণ খাদ্যের অধিকারী হবে যার ফলে তাদের (খাদ্য) সঞ্চয় করে রাখার প্রয়োজন হবে না । সে সময় ধন-

সম্পদের প্রাচুর্য এত বেশী হবে যে, তখন কোন ব্যক্তি মাহদীর কাছে কোন কিছু প্রর্থনা করলে সে বলবে : ওখানে আছে নিয়ে যাও ।" (ইবনে মজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নয় ৫০৮৩)

৬. মহানবী (সা.) বলেছেন : আমার ও আমার আহলে বাইতের সদস্যদের জন্য আল্লাহ পারলৌকিক জীবনকে ইহলৌকিক জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন ও মনোনীত করেছেন । আমার (ওফাতের) পরে আমার আহলে বাইতের সদস্যরা অনেক কষ্ট ভোগ করবে এবং তাদেরকে ঘর- বাড়ি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হবে । তখন প্রাচ্য থেকে একদল লোক কালো পতাকাসহ আগসন করবে এবং তাদেরকে কিছু ভাল জিনিষ (অধিকার) প্রদান করার জন্য তারা আবেদন করবে । কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যাত হবে অর্থাৎ তাদেরকে সেই অধিকার দেয়া হবে না । এ কারণে তারা যুদ্ধ করবে । সে যুদ্ধে তারা বিজয়ী হবে এবং তারা যা প্রথমে চেয়েছিল তা- ই তাদেরকে দেয়া হবে । কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে যতক্ষণ না আমার আহলে বাইত থেকে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে এবং যেভাবে পৃথিবী অন্যায়- অবিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে তা ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে । তাই যে ব্যক্তি ঐ যুগ প্রত্যক্ষ করবে তার উচিৎ হবে বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের সাথে মিলিত হওয়া ।" (ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ৪০৮২; তারিখে তাবারী; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫০- ২৫১)

৭. আবু নাদরা বর্ণনা করেছেন : আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহর সাথে ছিলাম ।...জাবির ইবনে আবদুল্লাহ দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "আমার উম্মতের সর্বশেষ যুগে একজন খলীফা হবে যে গণনা না করেই জনগণকে হাত ভরে ধন- সম্পদ দান করবে ।" (বর্ণনাকারী বলেন :) আমি আবু নাদরা ও আবুল আ'লাকে জিজ্ঞাসা করলাম : "আপনারা কি উমর ইবনে আবদুল আযীযকে বুঝাতে চাচ্ছেন " তারা বললেন : "না ।" (অর্থাৎ তিনি হবেন ইমাম মাহদী ।)[২] (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৩৪, হাদীস নং ৬৭)

৮. মহানবী (সা.) বলেছেন : “সর্বশেষ যুগে আমার উম্মত অত্যন্ত কঠিন দুঃখ যাতনা ভোগ করবে যেরূপ তারা আগে কখনো ভোগ করে নি; তখন মানুষ মুক্তির পথ খুজে পাবে না। তখন আল্লাহ আমার বংশধারা থেকে এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন যে অন্যায়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া পৃথিবীকে ন্যায় দ্বারা পূর্ণ করে দেবে। পৃথিবীবাসী ও আসমানবাসী তাকে ভালবাসবে। আকাশ থেকে পৃথিবীর সকল স্থানের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং পৃথিবীও যা কিছু দিতে পার তার সব কিছু উজাড় করে দেবে। আর সমগ্র পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে যাবে।” (আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫০, হাকেম প্রণীত সাহীহ ফিল হাদীস)

৯. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : “আরবদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না যার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ।” (তিরমিযী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৪)

১০. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : “মাহদী আমার আহলে বাইত থেকে আবির্ভূত হয়ে একটি বিপ্লব ঘটাবে এবং পৃথিবী অন্যায়- অবিচার ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাকে ন্যায় ও সাম্য দ্বারা পূর্ণ করে দেবে।” (মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; জামিউস সাগীর, পৃ ২ ও ১৬০; আল উরফুল ওয়ার্দী, পৃ. ২; কানযুর উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৮৬; ইকদুদ দুরার, ১২শ খণ্ড, অধ্যায় ১; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান, ১২শ অধ্যায়; আল ফুসুসুল মুহিম্মাহ, ১২শ অধ্যায়; আরজাহুল মাতালিব, পৃ. ৩৮০; আল মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২৬৬)

১১. মহানবী (সা.) বলেছেন :“আল্লাহ শেষ বিচার দিবসের আগে, এমনকি এ পৃথিবীর আয়ুস্কাল যদি একদিনও অবশিষ্ট থাকে, আমার আহলে বা্ইতের মধ্য থেকে মাহদীকে অন্তর্ধান থেকে আবির্ভূত করবেন। সে এ পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের প্রসার ঘটাবে এবং সব ধরণের অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের মূলোৎপাটন করবে।” (মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯)

সুনানে আবু দাউদেও উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ইংরেজি অনুবাদ, অধ্যায় ৩৬, হাদীস নং ৪২৭০)

১২. মহানবী (সা.) বলেছেন : "মাহদী আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত; নিঃসন্দেহে আল্লাহ এক রাতের মধ্যেই তাকে আবির্ভূত করবেন (অর্থাৎ তিনি কখন আবির্ভূত হবেন সে ব্যাপারে পূর্ব হতে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয় । এবং তার আবির্ভাব হবে আকস্মিক)।" (ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯; মুসনাদে আহমাদ; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫২)

১৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) বলেছেন : "আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি :আমার উম্মাহর একদল ব্যক্তি শেষ বিচার দিবসের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে । তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতরণ করবেন এবং তাদের নেতা (মাহদী) তাকে নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবে; কিন্তু ঈসা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলবেন : না, আপনাদেরকে মহান আল্লাহ অণ্যদের (মানব জাতির) জন্য মনোনীত করেছেন ।" (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩; মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫ ও ৩৮৪; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫১; সুয়ূতী প্রণীত নুযূল ইসা ইবনে মারিয়াম আখিরি যামান)

১৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন ; "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক ঈসা ইবনে মারিয়ামের অবতরণ পর্যন্ত সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে । ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতরণ করলে তাদের ইমাম (মাহদী) তাকে নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবে । কিন্তু ঈসা বলবেন : এ কাজ করার জন্য আপনি অধিক হকদার । আর মহান আল্লাহ এ উম্মতে আপনাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে অন্যদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন ।" (মুসনাদে আবু ইয়ালা; সহীহ ইবনে হিব্বান)

ইবনে আবী শাইবাহ (আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ হাদীসশাস্ত্রবিদ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার) ইমাম মাহদী সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, ইমাম –যিনি নামাযে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ামেরও ইমাম হবেন তিনি মাহদী (আ.) ।

সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন : "হযরত ঈসা যখন অবতরণ করবেন তখন ইমাম মাহদীর পিছনে নামায পড়বেন- এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ যে সব ব্যক্তি অস্বীকার করেছে তাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে আমি সত্য অস্বীকার করে বলতে শুনেছি : এমন ব্যক্তি যিনি নবী নন, তার পিছনে নামায পড়া অপেক্ষা ঈসা (আ.) এর মর্যাদা উচ্চতর ।" কিন্তু পরম সত্যবাদী মহানবী (সা.) থেকে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসের মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আ.) এর পিছনে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ামের নামায পড়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি একটি অদ্ভুত অভিমত ।"

আল্লামা সুয়ূতী এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন । (নুযূলু ঈসা ইবনে মারিয়াম আখিরি যামান)

ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন : "মাহদী এ উম্মতেরই একজন । হযরত ঈসা অবতরণ করে তার পিছনে নামায পড়বেন ।" (ফতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২)

আহলে সুন্নাতের আরেক বিখ্যাত আলেম ইবনে হাজার হাইসামীও একই কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "আহলে বাইত আকাশের তারকারাজির ন্যায় যাদের মাধ্যমে আমরা সঠিক দিকে পরিচালিত হই এবং তারকারাজি যদি অস্ত যায় (ঢাকা পড়ে যায়) তাহলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমার কিয়ামত দিবসের নিদর্শনাদির মুখোমুখি হবো । আর হাদীস অনুযায়ী এটি তখনই ঘটবে যখন ইমাম মাহদীর আগমন হবে, নবী হযরত ঈসা (আ.) তার পিছনে নামায পড়বেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করা হবে । আর তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশসমূহ একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকবে ।" (আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৩৪)

আবুল হুসাইন আল আজীরীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে হাজার বলেছেন : "ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব ও উত্থান সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সনদসহ বর্ণিত হয়েছে এবং তা মুতাওয়াতির হওয়ার পর্যায়কেও ছাড়িয়ে গেছে । এসব হাদীসে মহানবী (সা.) এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মাহদী তার (রাসূলুল্লাহর) আহলে বাইতভুক্ত হবেন, তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন এবং হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) ও ঐ একই

সময় আগমন করবেন । মাহদী ফিলিস্তিনে দাজ্জালকে বধ করার ব্যাপারে ঈসা (আ.) কে সাহায্য করবেন । তিনি এ উম্মতের নেতৃত্ব দবেন এবং হযরত ঈসা (আ.) তার পিছনে নামায পড়বেন ।”(আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫৪)

ইবনে আলী আশ শাওকানী (ওফাত ১২৫০/১৮৩৪) ‘আত তাওহীদ ফী তাওয়াতুরি মা জাআ ফীল মুনতাযার ওয়াদ দাজ্জাল ওয়াল মাসীহ’ (প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও মাসীহ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা) নামক গ্রন্থে ইমাম সম্পর্কে লিখেছেন : “মাহদী সংক্রান্ত হদীসসমূহ বহু নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং এ করাণেই এসব হাদীস নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য; কারণ, ফিকহশাস্ত্রে ঐ সব হাদীসের ক্ষেত্রেও মুতাওয়াতির হওয়ার বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য যেগুলো ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সংখ্যার চেয়েও অল্প সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে । মহানবীর সাহাবীদের প্রচুর বাণী আছে যেগুলোতে স্পষ্ট ও বিশদভাবে মাহদী (আ.) সংক্রান্ত আলোচনা বিদ্যমান । এসব বাণী মহানবী (সা.) এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের সমপর্যায়ভুক্ত । কারণ, ইজতিহাদের মাধ্যমে এসব বাণী প্রতিষ্ঠিত করায় কোন সমস্যা নেই।” লেখক ‘আল ফাতহুর রাব্বানী’ নামক তার অপর এক গ্রন্থেও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন । (এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে দেখুন মাওযূআতুল ইমাম আল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১- ৩৯২, ৪১৩- ৪১৪ ও ৪৩৪ এবং তুহাফুল আহওয়াযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৫)

আস সাবান তার ইসআফুর রাগিবীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : “ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীসসমূহ যে মহানবঅ (সা.) কর্তৃক বর্নিত তা বোঝা যায় । তিনি (মাহদী) মহানবীর আহলে বাইতের সদস্য এবং তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন ।”

সুয়ূতী তার সাবাইকুয যাহাব গ্রন্থে লিখেছেন : “আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মাহদী শেষ যুগে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন । তার আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীস বিপুল সংখ্যক ।”

হাফেজ আবুল হাসান সিজিস্তানী (ওফাত ৩৬৩হি/৯৭৪হিখ্রি.) বলেছেন : "মহানবীর নিকট থেকে ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । মাহদী (আ.) মহানবীর আহলে বাইতভুক্ত হবেন এবং সমগ্র বিশ্বকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।"

পরবর্তী যেসব খ্যাতনামা আলেম এ বক্তব্য মেনে নিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন ইবনে হাজার আসকালানী (তাহযীবুত তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪ ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃ ৩০৫, কুরতুবী (আত তাযকিরাহ, পৃ. ৬১৭), সুয়ূতী (আল হাভী, ২য় খণ্ড পৃ. ১৬৫-১৬৬), মুত্তাকী হিঁ (আল বুরহান ফী আলামাতি মাহদীয়ে আখিরিয যামান, পৃ. ১৭৫-১৭৬), ইবনে হাজার হাইসামী (আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯) যুরকানী (শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়াহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮), সাখাভী (ফাতহুল মুগীস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১)

ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আকীদার সর্বোৎকৃষ্ট চিত্র এমন এক ব্যক্তি কর্তৃক চিত্রিত হয়েছে যিনি নিজে ইমাম মাহদীর আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং এতৎসংক্রান্ত হাদীসসমূহের সত্যতা অস্বীকার করেছিলেন । তিনি হলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (ওফাত ৮০৮ হি./ ১৪০৬খ্রি.) । তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুকাদ্দিমায় লিখেছেন : "এটি একটি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাত বিষয় যে, সকল মুসলিম কর্তৃক সকল যুগে বর্ণিত হয়েছে সর্বশেষ যুগে মহানবী (সা.) এর আহলে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিশ্চতভাবে আবির্ভূত হবেন । তিনি ইসলাম ও ন্যায়বিচারকে শক্তিশালী করবেন । আর মুসলমানগণ তার অনুসরণ করবে এবং তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন । তাকে 'আল মাহদী' বলা হবে ।" (আল মুকাদ্দিমা, ইতিহাস সংক্রান্ত ভূমিকা, ইংরেজি অনুবাদ, লন্ডন, ১৯৬৭, পৃ. ২৫৭-২৫৮)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মাহদী সংক্রান্ত আকীদা ইসলামের বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের নয়; বরং এ হচ্ছে সকল মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত একটি সর্বজনীন আকীদা ।

সমকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস ও তাফসীরশাস্ত্র বিশারদ শেখ আহমদ মুহাম্মদ শাকের (ওফাত ১৩৭৭হি/১৯৫৮ খ্রি.) লিখেছেন : "মাহদীর আগমনে বিশ্বাস কেবর শিয়াদের সাথেই

সংশ্লিষ্ট নয় । কারণ, এ আকীদা মহানবী (সা.) এর অনেক সাহাবীর বর্ণনা থেকে এমনভাবে এসেছে যে, কেউই এর সত্যতার ব্যাপারে স হান হতে পারে না ।” এরপর তিনি ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ইবনে খালদুন কর্তৃক দুর্বল বলে আখ্যায়িত করার কঠোর সমালোচনা করেন । [আহমদ মুহাম্মদ শাকের প্রণীত (ব্যাখ্যাসহ) মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, দারুল মাআরেফ, মিশর থেকে প্রকাশিত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬-১৯৮, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮৮]

ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনের মুফতী সাইয়্যেদ সাবেক তার গ্রন্থ আল আকাইদুল ইসলামিয়াহ গ্রন্থে লিখেছেন : “মাহদী সংক্রান্ত আকীদা আসলেই সত্য যা ঐস সব ইসলামী আকীদা ও মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে ।”

দু’জন বিখ্যাত শাফেয়ী আলেম আল্লামা গাঞ্জী তার গ্রন্থ ‘আল বায়ান’-এ এবং সাবলানজী তার গ্রন্থ ‘নুরুল আবসার’-এ ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি তার রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি তা সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করে দেন’- কোরআন মজীদের এ আয়াতের ব্যাপারে সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবীর প্রতি মহান আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি আল মাহদীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে যিনি হযরত ফাতিমার বংশধর ।

ইবনে তাইমিয়াহ (মৃ. ৭২৮হি./১৩২৮ খ্রি.) ‘মিনহাজুস সুন্নাহয় (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১১-২১২) লিখেছেন যে, ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য এবং তার শিষ্য যাহাবী এ গ্রন্থের সার সংক্ষেপে এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন । (মুখতাসার মিনহাজুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪)

রা্বেতায়ে আলমে ইসলামী কর্তৃক ১১ অ োবর ১৯৭৬ তারিখে প্রদত্ত এক ফতোয়ায় বলা হয়েছে যে, ২০ জনেরও অধিক সাহাবী ইমাম (আ) সংক্রান্ত এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন । এছাড়া যে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মাহদীর ওপর বই-পুস্তক লিখেছেন তাদের একটি তালিকাও ফতোয়ার সাথে প্রদান করা হয়েছে । এ ফতোয়ায় বলা হয়েছে : হাদীসের হাফেজ এবং হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ প্রত্যয়ন করেছেন যে, ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মধ্যে অনেক সহীহ এবং হাসান হাদীস বিদ্যমান । এর অধিকাংশ হাদীসই বিপুল

সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত (অর্থাৎ মুতাওয়াতির বা অকাট্য) । তারা আরো প্রত্যয়ন করেছেন যে, মাহদীর আগনে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয এবং এটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার অন্যতম । সুন্নী মাজহাবের কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিরা ও বিদআতপন্থীরা মাহদী সংক্রান্ত আকীদা অস্বীকার করেছেন । (এ ফতোয়ার পূর্ণ পাঠের জন্য আল বায়ান গ্রন্থে লেখক আল গাঞ্জী আশ শাফেয়ীর ভূমিকা দেখুন, বৈরুত ১৩৭৯হি./১৯৭৯ খ্রি., পৃ. ৭৬- ৭৯)

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট আলেম শেখ খাজা মুহাম্মদ পার্সা নাকশাব ীর বক্তব্য : "আবু মুহাম্মদ আসকারী (আ.) আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত । তিনি ৬ রবিউল আওয়াল ২৬০ হি. শুক্রবার ইন্তেকাল করেন এবং তাকে তার পিতার সমাধির কাছে সমাহিত করা হয় ।তিনি তার পিতার ইন্তেকালের পর ৬ বছর জীবতি ছিলেন এবং (মৃত্যুকালে) কেবল এক পুত্র সন্তান রেখে যান যিনি হচ্ছেন আবুল কাশেম মুহাম্মদ । তিনিই প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা । প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা ২৫৫ হিজরীর ১৫ শাবান জন্মগ্রহণ করেন; তার মায়ের নাম ছির নারজিস (রা.) । যখন তার বয়স ৫ বছর তখন তার পিতা ইমাম হাসান আসকারী (আ.) ইন্তেকাল করেন ।"

সাইয়্যেদ হাকীমাহ বিনতে আবি জাফর মুহাম্মদ আল জাওয়াদ (আ.) ছিলেন ইমাম হাসান আল আসকারীর ফুপু, তিনি বলেছেন : "২৫৫ হিজরীর ১৫ শাবান আমি ইমাম হাসান আসকারীর বাড়িতে ছিলাম । তিনি আমাকে তার বাড়তে থাকতে অনুরোধ করেন । ফজরের ওয়াক্ত হলে আমি দেখতে পেলাম । ইমাম হাসান আসকারী তাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দিলেন । এরপর তিনি আমাকে বললেন : ফুপু! এ সদ্যপ্রসূত শিশুই হচ্ছে প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা ।" (ফাসলুল খেতাব, পৃ. ৪৪৩ ও ৪৪৭, তাশখ থেকে মুদ্রিত গ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে 'লামাহ আলামাতুল আউলিয়া'; আহলে সুন্নাতের অন্যতম মনীষী ভারতের মাদ্রাসায়ে দেওব র বিখ্যাত আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেছেন ।

শেখ ওয়াহাব ইবনে আহমাদ আবনে আলীর বক্তব্য : কিয়ামতের শর্তাবলী অন্যতম ইমাম মাহদী (আ.) এর পুনরাবির্ভাব, দাজ্জালের আবির্ভাব, আকস্মিক নতুন নতুন রোগের প্রদুর্ভাব, পশ্চিম

দিক হতে সূর্যোদয়, কোরআন উধাও হয়ে যাওয়া, ইয়াজুজ –মাজুজের আবির্ভাব ও বিজয় ।" এরপর তিনি বলেন : "এসব ঘটনা ঘটবে এবং ঐ সময় ঘটবে যখন ইমাম মাহদী (আ.) এর পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশা করা হবে যিনি হবেন ইমাম হাসান আসকারী (আ.) এর পুত্র এবং ২৫৫ হিজরীর ১৫ শাবান জন্মগ্রহণ করেছেন । তিনি এখনো জীবিত আছেন এবং ঈসা ইবনে মারিয়ামের সাথে তার সাক্ষাত হবে ।" (আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির ফী আকাইদুল আকবার, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২৭)

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী ইমাম হুসাইন দিয়ার বাকরীর বক্তব্য : "ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (আ.) হচ্ছেন দ্বাদশ ইমাম । আবুল কাসেম তার উপাধি এবং বারো ইমামী শিয়াদের আকীদা অনুসারে তার উপাধিসমূহের অন্যতম হচ্ছে আল কায়েম (বিপ্লবকারী), আল মাহদী, (সুপথপ্রাপ্ত), আল মুনতাযার (প্রতীক্ষিত) সাহেবুল আসর ওয়ায যামান (যুগের অধিপতি) । তাদের মতানুযায়ী তিনি দ্বাদশ ও সর্বশেষ ইমাম । তারা আরো বিশ্বাস করে যে, তিনি সামাররায় তার মায়ের সামনে একটি কুয়ার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং থেকে তিনি আর বের হননি । এ ঘটনা ২৬৫ বা ২৬৬ হিজরীতে ঘটেছিল । আর এ ঘটনা সত্য । তার মা ছিলেন উম্মে ওয়ালাদ (ঐ দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বলা হয় যে তার নিজ মালিকের সন্তান গর্ভে ধারণ করে জন্ম দেয়)। তার বেশ কিছু নাম, যেমন সাকীল, সুসান ও নারজিস উল্লেখ করা হয়েছে ।" (তারিখুল খামিস, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৮৮, বৈরুত থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত)

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী ইমাম ইবনে জওযী : "মুহাম্মদ ইবনে হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মূসা বিন জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)! আবুল কাসিম আপনার উপাধি এবং আপনি খলীফা ও সকল যুগের ইমাম । আপনার মায়ের নাম সাকীল।" (তাযকিরাতুল খা্ওয়াস, পৃ. ২০৪, মিশর থেকে প্রকাশিত)

শেখ ইবনে হাজার আল হাইসামী ইমাম হাসান আসকারী (আ.) প্রসঙ্গে লিখেছেন : "কথিত আছে, তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা কার হয়েছিল এবং আবুল কাসেম মুহাম্মদ ব্যতীত তার আর

কোন পুত্র সন্তান ছিলনা । আবুল কাসেম মুহাম্মদ (আ.) এর বয়স যখন ৫ বছর তখন তার পিতা ইন্তেকাল করেন । কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে (ঐ অল্প বয়সেই) জ্ঞান প্রদান করেন এবং তিনি প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা হিসাবে প্রসিদ্ধ । তিনি আ গোপন করে আছেন এবং কেউ জানেনা তিনি কোথায় আছেন ।" (আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, পৃ. ২০৮, মূলতান, পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত)

'গ্রান্ড মুফতিয়ে দিয়ার' (দেশের প্রধান মুফতি) নামে খ্যাত আল হাযারমা আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে উমর আল মাশহুর আলাভীর বক্তব্য : "শেখ ইরাকীর মতে, ইমাম মাহদী (আ.) ২৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন । শেখ আলী আল খাওয়াসের জীবদ্দশায় অর্থাৎ ৯৫৮ হিজরীতে ইমাম মাহদী (আ.) সত্য (বাস্তবে বিদ্যমান); আর একই কথা ইমাম আবদুল ওয়াহাব শারানীও বলেছেন ।" (বাকিয়াতুল মুস্তারশিদীন, পৃ. ২৯৪, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

'ইমাম কিরমানী' নামে প্রসিদ্ধ আহমাদ ইবনে ইউসুফ ওয়া মুশকীর বক্তব্য : "পিতার মৃত্যুর সময় ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসকারীর বয়স ছিল ৫ বছর । মহান আল্লাহ যেমন নবী হযরত ইয়াহইয়াকে ঐ বয়সে জ্ঞান দিয়েছিলেন যখন তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক শিশু, তেমনি তিনি তাকে ঐ অল্প বয়সেই ঐশী ও আধ্যা ক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন । তিনি সু র আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তার পবিত্র বদন মণ্ডলী ছিল আলোকিত (নূরানী) ।" (তারিখে আখবারুদ দুওয়াল ফী আছারিল আউয়াল, পৃ ১১৮, বাগদাদ, ইরাক থেকে প্রকাশিত)। এসব বৈশিষ্ট্য ইমাম মাহদীর বিবরণ প্রদানকালে হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও উল্লিখিত হয়েছে ।

আহলে সুন্নাতের আরেক মনীষী ইমাম আল্লামা শেখ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আমীর আশ শিবরাভীর বক্তব্য : "প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা ইমাম মাহদী ইবনে হাসান আল খালিস (আ.) ২৫৫ হিজরীর ১৫ শাবান সামাররায় জন্মগ্রহণ করেন । আব্বাসী শাসনকর্তার অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে ইমাম হাসান আসকারী মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে ইমাম মাহদী (আ.) এর জন্মগ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন । ইমাম মুহাম্মদের উপাধিগুলো হচ্ছে মাহদী (হেদায়েতপ্রাপ্ত),

কায়েম (বিপ্লবকারী), মুনতাযার(প্রতীক্ষিত), খালাফে সালেহ(পূণ্যবান উত্তরাধিকারী) এবং সাহেবুয যামান; এসব উপাধির মধ্যে আল মাহদী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।" (ইলা তাহাফি বেহুবিল আশরাফ, পৃ. ১৭৯-১৮০, মিশর থেকে প্রকাশিত)

আহলে সুন্নাতের আরেক মনীষী ইমাম আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ বিন মুতামাদ খান আল বাদাখশানী। 'নিশ্চয় আপনার শত্রু হবে নির্বংশ'- এ আয়াতের 'আবতার' শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন : "আবতার ঐ ব্যক্তি যার ভবিষ্যতে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ভবিষ্যৎ বংশধারা নেই।" অতঃপর তিনি বলেন : "ইমাম হুসাইনের পুত্র আবুল হাসান আলী বিন হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.), তার পুত্র আবু জাফর মুহাম্মদ আল বাকের (আ.), তার সন্তান আবু আবদিল্লাহ জাফর আস সাদিক (আ.), তার সন্তান আবু ইসমাইল মূসা আল কাযেম (আ.), তার সন্তান ছিলেন আলী আর রেযা (আ.) এবং তার সন্তান ছিলেন আবু মুহাম্মদ আয যাকী (আ.), আর তার সন্তান হচ্ছেন আল মুনতাযার আবুল কাসেম মুহাম্মদ আল মাহদী (আ.)।" (নাযালুল আবরার, পৃ. ১৭৪-১৭৫; ইরাক থেকে মুদ্রিত)

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী ইমাম শেখ মুমিন বিন হাসান মুমিন আশ শাবলানজীর বক্তব্য : "মুহাম্মদ বিন হাসান হচ্ছেন দ্বাদশ (ইমাম)। তিনি আবুল কাসেম মুহাম্মদ বিন হাসান বিন আলী আল হাদী বিন মুহাম্মদ আল জাওয়াদ বিন আলী আর রেযা বিন মূসা কাযেম বিন জাফর আস সাদিক বিন মুহাম্মদ আল বাকের বিন আলী যায়নুল আবেদীন বিন আল হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব (আ.)। তার মায়ের নাম ছিল নারজিস এবং কেউ কেউ তাকে সুসান ও সাকীল বলেও উল্লেখ করেছেন। আবুল কাসেম তার কুনিয়াহ এবং তার উপাধি হচ্ছে আল হুজ্জাত (খোদায়ী প্রমাণ), মাহদী, খালাফে সালেহ, আল কায়েম, আল মুনতাযার এবং সাহেবুয যামান। আল ফুসূলুল মুহিম্মাহ'র বিবরণ অনুসারে তিনিই বারো ইমামী শিয়াদের দ্বাদশ ইমাম। ইবনুল ওয়ার্দীর ইতিহাস অনুযায়ী তিনি ২৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।" (নুরুল আবসার)

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী আল্লামা কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন তালহা শাফিয়ীর বক্তব্য : "আবুল কাসেম মুহাম্মদ বিন আল হাসান খালিস বিন আলী আল মুতাওয়াক্কিল বিন মুহাম্মদ আল

কামিয়াহ বিন আলী আর রেযা বিন মূসা আল কাযেম বিন জাফর আস সাদিক বিন মুহাম্মদ আল বাকের বিন আলী যায়নুল আবেদীন বিন হুসাইন আয যাকী বিন আলী বিন আবী তালিব (আ.); তিনি প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা । তার মায়ের নাম ছিল সাকীলাহ এবং তিনি 'হাকীমাহ' নামেও পরিচিতা ছিলেন । তার নাম মুহাম্মদ; তার কুনিয়াত আবুল কাসেম; তার উপাধিসমূহের মধ্যে আল হুজ্জাত, খালাফে সালেহ ও আল মুনতাযার প্রসিদ্ধ ।" (মাতালিবুস সুউল ফী মানাকিবে আলে রাসূল, পৃ. ৮৯; মিশর থেকে প্রকাশিত) তিনি উক্ত গ্রন্থে আরো লিখেছেন যে, ইমাম মাহদী ইমাম আবু মুহাম্মদ আল হাসান আল আসকারীর পুত্র । কিনি সামাররায় জন্মগ্রহণ করেন । তিনি তার 'আদ দুরারুল মুনাযযাম' গ্রন্থেও একই কথা উল্লেখ করেছেন ।

আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত আলেম শেখ আসলাহুদ্দীন তার 'শারহে দারিয়াহ' গ্রন্থে লিখেছেন : "হযরত মাহদী (আ.) আহলে বাইতের ইমামদের মধ্যে দ্বাদশ ইমাম । ইমাম আলী ছিলেন প্রথম ইমাম এবং ইমাম মাহদী হচ্ছেন সর্বশেষ ইমাম ।"

আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত আলেম শেখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল হামুয়ানী আশ শাফিয়ী 'ফারায়িদুস সিমতাইন' গ্রন্থে আবাল খাযাঈ থেকে লিখেছেন যে, তিনি বর্ণনা করেছেন : ইমাম আলী আর রেযা বিন মূসা (আ.) বলেছেন : আমার পরে আমার পুত্র জাওয়াদ তাকী ইমাম হবে; তারপরে তার পুত্র আলী আল হাদী আন নাকী ইমাম হবে । তার পরবর্তী ইমাম হবে তার পুত্র আল হাসান আল আসকারী; আর তার পরে ইমাম হবে তার পুত্র মুহাম্মদ আল মাহদী । তার অবর্তমানে অর্থাৎ অন্তর্ধানকালে জনগণ তার পুনরাবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে ।তার পুনরাবির্ভাবের পর যারা তার আনুগত্য করবে তারাই হবে মুমিন ।"

আহলে সুন্নাতের অন্তত পয়ত্রিশ জন বিখ্যাত আলেম ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে ৪৬টি গ্রন্থ রচনা করেছেন । এর মধ্যে উল্লোখযোগ্য হচ্ছে :

১. কিতাবুল মাহদী : আবু দাউদ ।

২. আলামাতুল মাহদী : জালালুদ্দীন সুয়ূতী।

৩. আল কাওলুল মুখতাসার ফী আলামাতিল মাহদী আল মুনতাযার : ইবনে হাজার ।

৪. আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান : আল্লামা আবু আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইউসুফ আদ দাশেকী ।

৫. মাহদী আলে রাসূল : আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ আল হিরাভী আল হানাফী ।

৬. মানাকেবুর মাহদী : আল হাফেয আবু নাঈম আল ইসফাহানী ।

৭. আল বুরহান ফী আলামাতিল মাহদী আখিরায যামান : মুত্তাকী হি ী ।

৮. আরবাউনা হাদীসান ফীল মাহদী : আবদুল আলা আল হামাদানী ।

৯. আখবারুল মাহদী : আল হাফেয আবু নুআইস ।

পাদটিকা :

১. শিয়া মাজহাবের হাদীস ও বর্ণনা অনুযায়ী শান্তি ও সাম্যের সরকার ও রাষ্ট্র – যা ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবে তা বিনা প্রতিদ্ব তায় শত শত বছর টিকে থাকবে । আর তারপরই শেষ বিচার দিবসের আগমন হবে । উপরিউক্ত হাদীসসমূহে যা কিছু ৭ অথবা ৯ বছর হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে তা আসলে যখন থেকে ইমাম মাহদী (আ.) তার মিশন শুরু করবেন তখন থেকে তার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব বিজয় করার সময়কাল ।

২. এ হাদীসে বন্ধনীর মধ্যকার এ কথাটি সহীহ মুসলিমের ইংরেজি অনুবাদক আবদুল হামদি সিদ্দীকীর বক্তব্য ।

৩. আহলে সুন্নাতের একজন ইমাম শেখ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নিবহানী তার ‘জামালুল আউলিয়া’ গ্রন্থের ১৫১-১৫২ পৃষ্ঠায় (থানা ভবন, ভারত থেকে প্রকাশিত) লিখেছেন যে, মুহাম্মদ পার্সা বুখারার অধিবাসী । তিনি নকশাব ী সিলসিলার ইমাম এবং একজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ।

সূত্র : তেহরান থেকে প্রকাশিত আত তাওহীদ, সে ম্বর –অ োবর ২০০৩ সংখ্যা ।

তথ্যসূত্র :

১. এ শহর এবং এ শহরের প্রসিদ্ধ হ্রদটি জবরদখলকৃত ফিলিস্তিনে অবস্থিত ।

২. কাতাওয়ান : কুফার একটি এলাকার নাম ।

৩. কাবা : বিশেষ পোশাক ।

৪. দাবিক : জবরদখলকৃত ফিলিস্তিনের একটি এলাকার নাম ।

৫. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১- ২ ।

৬. আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ১৭ ।

৭. ইবনে হাম্মাদ, পৃ. ৬৩।

৮. ইবনে হাম্মাদ, পৃ. ৯ ।

৯. ইবনে হাম্মাদ, পৃ. ১০ ।

১০. مطلق (শর্তহীন) রেওয়ায়েতের অর্থ : আবির্ভাবের আগে ঘটার" শর্তটি যে রেওয়ায়েতে নেই সেটিই শর্তহীন রেওয়ায়েত; আর ঐ রেওয়ায়েতটি শর্তযুক্ত যার মাঝে ঐ শর্তটি বিদ্যমান। এ কারণেই মুতলাক (مطلق) রেওয়ায়েতকে মুকাইয়াদ (مقيد) রেওয়ায়েতের ওপর আরোপ করে অর্থাৎ উক্ত শর্তের অধীন হিসেবে আমরা এ ফিতনাকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর 'আবির্ভাব- পূর্ব ফিতনা' বলে অভিহিত করতে পারব।

১১. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৫, রওযাতুল ওয়ায়েযীন থেকে উদ্ধৃত ।

১২. যেমন : সাদ্দাম, তালিবান শাসকবর্গ ও ওসামা বিন লাদেন, ইে ানেশিয়া, তুরস্ক, লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও আি কীয় মুসলিম দেশসমূহ ও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা, সৌদী আরব, জর্ডান, মরক্কো, ব্রুনেই, ওমান, আরব- আমীরাত, কুয়েত- কাতারের শাসকবর্গ ও আমীরগণ ।

১৩. বিহারুল আনওয়ার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৬৮ ।

১৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২০৮ ।

১৫. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৭২- ২৭৩ ।

১৬. সুলামীর ইকদুদ দুরার থেকে বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৮ ।

১৭. ইয়া নাবীউল মাওয়াদ্দাহ্ থেকে উদ্ধৃত, বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৯ ।

১৮. আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ১২১ ।

১৯. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৫৩ ।

২০. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১২৪ ।

২১. আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ১০৮ ।

২২. আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ১০৭ ।

২৩. লেবানন ও ফিলিস্তিনের অত্যাচারিত জনসাধারণ তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং ইরান ও সিরিয়া তাদেরকে এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছে।—অনুবাদক

২৪. বিহারুল আনওয়ার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৭৫ ।

২৫. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ১০২ ।

২৬. সূরা রূম : ১- ৫ ।

২৭. বাহরানী রচিত মাহাজ্জাহ্, পৃ. ১৭০ ।

২৮. সূরা যুখরুফ : ৬১ ।

২৯. সূরা নিসা : ১৫৯ ।

৩০. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৫২ ।

৩১. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৩৫- সালামীর ইকদুদ দুরার এবং তাঁর বর্ণনায় বুখারী তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতটি আউফ বিন মালেকের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন ।

৩২. বিহারুল আনওয়ার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৮৮ ।

৩৩. গাইবাত, পৃ. ২৭৮ ।

৩৪. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৯৭ ।

৩৫. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৫১ ।

৩৬. ইলযামুন নাসেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪ ।

৩৭. নু'মানীর গাইবাত, পৃ. ১৭০ ।

৩৮. আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ৩২ ।

৩৯. নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১২৮ ।

৪০. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ১৮৫ ।

৪১. রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত 'তুর্ক জাতি ও গোত্রসমূহ' (বহুবচন : আতরাক) হচ্ছে মূলত তুর্কী- মঙ্গোল এবং পূর্ব ইউরোপের রুশ ও াভ জাতিসমূহ । তুর্কী মঙ্গোলয়েড জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো চীন, মঙ্গোল, কোরীয় ও জাপানী জাতিসমূহ । উল্লেখ্য যে, গত বিংশ শতাব্দীতে কমিউনিজম জাপান ব্যতীত এ সব জাতির মাঝে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল । আজও চীন ও উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক শাসিত হচ্ছে । ইরান, মধ্য

এশিয়া, এশিয়া মাইনর এবং পূর্ব চীনা- তুর্কীস্তানের মুসলিম তুর্কী জাতি ও গোত্রগুলো এদের থেকে ব্যতিক্রম হবে। এ সব মুসলিম তুর্ক জাতি অন্যান্য মুসলিম জাতির মতো কখনই ধ্বংস হবে না।- অনুবাদক

৪২. বনি ইসরাইল : ১- ৩।

৪৩. প্রাগুক্ত : ৪

৪৪. প্রাগুক্ত: ৫

৪৫. প্রাগুক্ত: ৬।

৪৬. প্রাগুক্ত: ৭

৪৭. প্রাগুক্ত: ৮

৪৮. বিহার ৬০তম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

৪৯. সূরা আল আরাফ : ১৬৭- ১৬৮।

৫০. সূরা মায়েদাহ্ : ৬৪।

৫১. সূরা ইসরা : ১০৪।

৫২. মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৬।

৫৩. বিহার, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ৬০।

৫৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৭৩।

৫৫. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ২৫।

৫৬. মুনতাখাবুল আসার, পৃ. ৩০৯।

৫৭. আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ৫৭।

৫৮. সূরা বাকারা : ২৪৮।

৫৯. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৯৭।

৬০. ইলযামুন নাসিব, পৃ. ২২৪।

৬১. দ্বিতীয় পুস্তিকা, অধ্যায় ৩৩ : ৫০- ৫৩।

৬২. দ্বিতীয় পুস্তিকা, অধ্যায় ১ : ৩৮।

৬৩. বিচারকগণ, অধ্যায় ৩ : ১৩।

৬৪. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ৪ : ২।

৬৫. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১ : ৮।

৬৬. প্রাগুক্ত, ১৩ : ১।

৬৭. সূরা বাকারা : ২৪৬ ।

৬৮. সামূয়েলের পুস্তিকা, ইসহাহ্ (আয়াত) ২৪ :২৪ এবং খবরসমূহ সংক্রান্ত ১ম পুস্তিকা, ইসহাহ্ ২১ : ২২, ২৮ ।

৬৯. সূরা শুরা : ২৭ ।

৭০. রাজন্যবর্গ ও শাসকদের ১ম পুস্তিকা, ইসসাহ্, ১১ : ১- ২ ।

৭১. জেরুজালেমকে হিব্রু ও আরবীতে উর শালিমও (اور شاليم) বলা হয় ।

৭২. রাজা ও শাসকবর্গের কাহিনীসমূহ সংক্রান্ত পুস্তিকা, অধ্যায় ১২ : ২৬- ৩৩ ।

৭৩. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১২ : ৩১; প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১১ : ১৩- ১৫ এবং অধ্যায় ১৩ : ৯ ।

৭৪. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১৪ : ২১- ২৪; প্রাগুক্ত, ২য় পুস্তিকা, অধ্যায় ১১: ১৩- ১৭ এবং অধ্যায় ১২ ।

৭৫. রাজা ও শাসকবর্গের কাহিনীসমূহ সংক্রান্ত ২য় পুস্তিকা, অধ্যায় ১৩ : ৩- ১৩ ।

৭৬. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ২১ : ১৬- ১৭ ।

৭৭. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ২৪ : ৩ এবং অধ্যায় ১২ : ১৭- ১৮ ।

৭৮. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১৪ :১১, অধ্যায় ২৫ : ২১- ২৪ ।

৭৯. প্রাগুক্ত, ২য় পুস্তিকা, অধ্যায় ১৫ : ২৯ ।

৮০. দিবসসমূহের সংবাদ ও তথ্যাবলী, ৫ম অধ্যায় : ২৯ ।

৮১. রাজা ও শাসকবর্গের তথ্য ও বিবরণাদি সংক্রান্ত ২য় পুস্তিকা, অধ্যায় ১৭ : ৫, ৬ ও ১৭ ।

৮২. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১৭ : ১৩- ১৫ ।

৮৩. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১৮ : ১৩- ১৫ ।

৮৪. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ২৪ : ১- ৬ ।

৮৫. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ২৪ : ১৭- ২০ এবং ২৫; অধ্যায় ৩৬ : ১১- ২১; ইরেমিয়ার পুস্তিকা, অধ্যায় ৩৯ : ১- ৪ ।

৮৬. আযরার পুস্তিকা, অধ্যায় ৬ : ৩- ৭, অধ্যায় ১ : ৭- ১১ ।

৮৭. তিনি মূলত মাকদুন বা ম্যাসেডোনিয়ার অধিবাসী ছিলেন ।

৮৮. দানিয়ালের পুস্তিকা, অধ্যায় ১১ :৫ ।

৮৯. মেকাবীয়দের পুস্তিকা, অধ্যায় ১ : ৪১- ৫৩ ।

৯০. মথির ইঞ্জিল, পৃ. ২ ।

৯১. মারকোসের ইঞ্জিল, ৬ : ১৬- ২৮ ।

৯২. সূরা রূম : ১- ৫ ।

৯৩. মুস্তাফীদ : ঐ খবরে ওয়াহেদকে বলা হয় যা প্রতি স্তরে তিনজনেরও অধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত ।

৯৪. বিহারুল আনওয়ার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ১১ ।

৯৫. হাকিম প্রণীত মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯ ।

৯৬. শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৩৬৪ ।

৯৭. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৪ ।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১ ।

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫ ।

১০০. সূরা মরিয়ম : ৩৭ ।

১০১. সূরা- ই শুআরা : ৪ ।

১০২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২২৯ ।

১০৩. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ১৮৩ ।

১০৪. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৬ ।

১০৫. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৯২ ।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯ ।

১০৭. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২২৯ ।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮ ।

১০৯. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯- ১০ ।

১১০. লেবাননের গৃহযুদ্ধ ১৯৭৫ সালে থেকে শুরু হয়ে ১৯৯০ সালে শেষ হয় ।

১১১. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৩ ।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২ ।

১১৩. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৫৩ ।

১১৪. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭১ ।

১১৫. প্রাগুক্ত।

১১৬. যে রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী নবী অথবা ইমাম হতে সরাসরি বর্ণনা করেছে, অথচ সে তাঁদের দেখে নি অথবা যার সূত্রে বর্ণনা করেছে তার নাম ভুলে গিয়ে ‘এক ব্যক্তি হতে শুনেছি’, ‘অনেকের হতে বর্ণিত হয়েছে’ প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করেছে।

১১৭. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১২ ।

১১৮. ইলযামুন নাসিব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪ ।

১১৯. প্রাগুক্ত।

১২০. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৩৭ ।

১২১. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৫ ।

১২২. বিহার, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ১৮২ ।

১২৩. অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির হাদীসের সংজ্ঞা ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি। (দেখুন পৃ: ১১)

১২৪. ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহে শাব্দিকভাবে মুতাওয়াতির হাদীসের উদাহরণ প্রচুর রয়েছে, যেমন : ওয়াজিব নামায, এর রাকাত সংখ্যা, রোযা ও হজ্ব ইত্যাদি বিষয়ে।

১২৫. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২০৫ ।

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩ ।

১২৭. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৫ ।

১২৮. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২০৮ ।

১২৯. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৬ ।

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০ ।

১৩১. (দ্র ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৮৪ ।

১৩২. (দ্র বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪ ।

১৩৩. সূরা আম্বিয়া ১২-১৩ ।

১৩৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭ ।

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০ ।

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫ ।

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩ ।

১৩৮. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৮ ।

১৩৯. বিহার ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৪৮ ।

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯ ।

১৪১. শেখ আল মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৩৫৯ ।

১৪২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২০৫ ।

১৪৩. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৫ ।

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫ ।

১৪৫. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৭২ ।

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১ ।

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২ ।

১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭ ।

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭ ।

১৫০. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯২ ।

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ ।

১৫২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৫০ ।

১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১- ২৩২ ।

১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫ ।

১৫৫. ইবনে হাম্মাদের পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৮৩ ।

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩ ।

১৫৭. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৯ ।

১৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩ ।

১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮ ।

১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮ ।

১৬১. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৮৪ ।

১৬২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৭৩- ২৭৪ ।

১৬৩. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৮৮ ।

১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯ ।

১৬৫. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২২২ ।

১৬৬. আল হাকিম প্রণীত মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড এবং বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ১৮৬ ।

১৬৭. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ১৮৬ ।

১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬ ।

১৬৯. গাইবাতে নু'মানী, পৃ. ১৬৩ এবং বাহরানী প্রণীত মাহাজ্জাহ্, পৃ. ১৭৭ ।

১৭০. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯০ ।

১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ ।

১৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০ ।

১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১ ।

১৭৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৭ ।

১৭৫. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৮৬ ।

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬ ।

১৭৭. বিহারুল আনওয়ার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২২৪ ।

১৭৮. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৬ ।

১৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭ ।

১৮০. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২০৪ ।

১৮১. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ৯৩, নুমানীর গাইবাত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ।

১৮২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৩৩ ।

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০ ।

১৮৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৭৫ ।

১৮৫. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ১৭৮ ।

১৮৬. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১০, তূসী প্রণীত 'গাইবাত' ।

১৮৭. ঐ ব্যক্তি যে তার চক্ষু ভিতরে নিয়ে চোখের পাতা নিচের দিকে নামিয়ে আনে ।

১৮৮. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৪৫ ।

১৮৯. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ১৭৬ ।

১৯০. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১০ ।

১৯১. বিশারাতুল ইসলাম, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২০৮ ।

১৯২. ইবনে শাহরাশুব প্রণীত মানাকিব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিসহ বিশারাতুল ইসলাম গ্রন্থ, পৃ. ৪২।

১৯৩. ইবনে হামাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৮ ।

১৯৪. মুহাদারাতুল আবরার গ্রন্থে ইবনে আরাবীর উদ্ধৃতি সহকারে বিশারাতুল ইসলাম, পৃ.২৮।

১৯৫. বিহার, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ৬০ ।

১৯৬. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ৭১ ।

১৯৭. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৩ ।

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০ ।

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০ ।

২০০. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৯২ ।

২০১. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২২২ ।

২০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭- ২১৯ ।

২০৩. শেষ মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৩৩৬ এবং বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৯- ২২১ ।

২০৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৭ ।

২০৫. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৪৩ ।

২০৬. মালাহিম ওয়া ফিতান, পৃ. ৪৩; এ ধরনের একটি রেওয়ায়েত জামে আত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে । রেওয়াযেতটি আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহীরা আবির্ভূত হবে (মাহদীর সমর্থনে) । অবশেষে সেগুলো ইলিয়ায় (বায়তুল মুকাদ্দাসে) স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না ।" - জামে আত তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ২২১৫, পৃ. ১৫৬, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত- অনুবাদক

২০৭. ঐ খবরে ওয়াহেদ যার রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা তিনের অধিক ।

২০৮. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৮৭ ।

২০৯. ঐ সব রেওয়ায়েত যেগুলোর রাবীদের পরম্পরায় কোন রাবীর ফাসিক হওয়া অথবা তার প্রকৃত অবস্থা অজ্ঞাত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার ব্যাপারে সে হ পোষণ করা হবে যে, সে সম্ভবত হাদীস জাল করে ।

২১০. ইলযামুন নাসিব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১ ।

২১১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০ ।

২১২. আল্লামা শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৩৬০ ।

২১৩. ইরশাদ, পৃ. ৩৬০ ।

২১৪. শেখ তূসীর গাইবাত, পৃ. ২৭২ ।

২১৫. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৭৩ ।

২১৬. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৫০, নুমানীর গাইবাত, পৃ. ২৫০ থেকে উদ্ধৃত ।

২১৭. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৩; শেখ তূসীর গাইবাত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

২১৮. নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১৩

২১৯. প্রাগুক্ত, খুতবা : ১২৮ ।

২২০. বিহার, ৬০তম খণ্ড, পৃ. ২২৪- ২২৬ এবং নাহজুস সাআদাহ্, পৃ. ৩২৫ ।

২২১. সূরা হাক্কাহ্ : ৯

২২২. শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৩৬২ ।

২২৩. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৮)

২২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩ ।

২২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪ ।

২২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩ ।

২২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫ ।

২২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫ ।

২২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫ ।

২৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭ ।

২৩১. শেখ তূসী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ২৮৪ ।

২৩২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫)

২৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩ ।

২৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩ ।

২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭ ।

২৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩ ।

২৩৭. বিহার, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ১১- ১২ ।

২৩৮. শেখ তূসীর গাইবাত, পৃ. ২৮০ ।

২৩৯. ইজমালীভাবে মুতাওয়াতির : ঐ রেওয়ায়েত ও হাদীস যা বিভিন্ন সূত্রে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয় ।

২৪০. শেখ মুফীদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৪০৫ এবং শেখ তূসী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ২৭৭ ।

২৪১. শেখ সাদুক প্রণীত কামালুদ্দীন, পৃ. ৪৩৪ ।

২৪২.   বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট কিন্তু ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন পদসমষ্টি বা বাক্য ।

২৪৩.   বিহার,   ৫২তম খণ্ড,   পৃ. ২২৯ ।

২৪৪.   প্রাগুক্ত,   পৃ. ২৩৫ ।

২৪৫.   প্রাগুক্ত,   পৃ. ১১৩ ।

২৪৬.   প্রাগুক্ত,   ৫৩তম খণ্ড,   পৃ. ৮২ ও ৮৩ ।

২৪৭.   প্রাগুক্ত,   ৫২তম খণ্ড,   পৃ. ২০৭ ।

২৪৮.   সূরা মুহাম্মদ : ৩৮

২৪৯.   কাশশাফ,   পৃ. ৩০১,   ৪র্থ খণ্ড

২৫০.   আল মীযান,   ১৮তম খণ্ড,   পৃ. ২৫০

২৫১.   মুসনাদে আহমাদ,   ৫ম খণ্ড,   পৃ. ১১

২৫২.   হাফেয আবু নাঈম প্রণীত যিকর- ই ইসফাহান,   পৃ. ১৩

২৫৩.   প্রাগুক্ত,   পৃ. ৮- ১০

২৫৪.   প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ ।

২৫৫.   প্রাগুক্ত, পৃ.১২ ।

২৫৬.   প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ ।

২৫৭.   প্রাগুক্ত ।

২৫৮.   বিহার,   ৫২তম খণ্ড,   পৃ. ৬৩

২৫৯.   ইবনে হম্মাদের হস্তলিখিথ পাণ্ডুলিপি,   পৃ. ৮৪ এবং এ রেওয়ায়েতের অন্তর্নিহিত অর্থের প্রায় কাছাকাছি অর্থবিশিষ্ট রেওয়য়েত উক্ত গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হয়েছে।)

২৬০.   বিহার,   ৫২তম খণ্ড,   পৃ. ২১০

২৬১.   প্রাগুক্ত,   পৃ. ২৩২

২৬২.   প্রাগুক্ত,   পৃ. ২৫২;   হাফিয আবু নাঈমের আরবাঈন গ্রন্থ থেকে

২৬৩.   ঐ হাদীস যার রাবীদের সংখ্যা এমন সীমায় উপনীত হয় যাতে স্বভাবতই হাদীসটি মিথ্যা হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর রাবীদের সংখ্যার আধিক্য ও বিশ্বস্ততা সকল পর্যায়ে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

২৬৪.   বিহার,   ৫২তম খণ্ড,   পৃ. ২৬৯

২৬৫.   প্রাগুক্ত,   পৃ. ২৩৪

২৬৬ প্রাগুক্ত,   ৬০তম খণ্ড,   পৃ. ২১৬,   তেহরান থেকে মুদ্রিত)

২৬৭. প্রাগুক্ত ।

২৬৮. আল্লামা আবদুর রহমান জামী প্রণীত শাওয়াহেদুন নবুওত, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থের ২৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে : এটি ঠিক যে, হযরত ফাতেমা বিনতে মূসা ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রা.)-এর মাযার কোম শহরে অবস্থিত। হযরত রেযা আলী ইবনে মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি তাঁর মাযার যিয়ারাত করে, সে জান্নাতে দাখিল হবে।– অনুবাদক

২৬৯. বিহার, ৬০তম খণ্ড, পৃ. ২১৬

২৭০. এ চৌদ্দ নিষ্পাপ ব্যক্তি হলেন : ১। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.); ২। হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) এবং ১২ ইমাম যাঁরা হলেন ৩। ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ৪। ইমাম হাসান ইবনে আলী (আ.) ৫। ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (আ.) ৬। হযরত আলী ইবনুল হুসাইন (আ.) ৭। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (আ.) ৮। হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (আ.) ৯। হযরত মূসা ইবনে জাফর (আ.) ১০। হযরত আলী ইবনে মূসা (আ.) ১১। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (আ.) ১২। হযরত আলী ইবনে মুহাম্মদ (আ.) ১৩। হযরত হাসান ইবনে আলী (আ.) ১৪। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী আল হুজ্জাহ্ আল কায়েম আল মাহদী (আ.)।

২৭১. বিহার, ৬০তম খণ্ড, পৃ. ২১৬

২৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

২৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

২৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

২৭৬. অর্থাৎ এ নগরীর দীনদার অধিবাসীরা প্রাচুর্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করার ফলে অন্যান্য স্থান থেকে জনতা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে জীবন যাপন করার জন্য সেখানে এসে এ নগরীর ধর্মীয় ভাব- গাম্ভীর্য ও মর্যাদা নষ্ট করে দেবে এবং এ নগরী ও এর অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে যাবে ।

২৭৭. বিহার, ৬০তম খণ্ড, পৃ. ২১৩

২৭৮. প্রাগুক্ত, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৮৩

২৭৯. আল্লামাহ্ সুয়ূতী প্রণীত আল হাভী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮২ এবং কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬২

২৮০. আল্লামা কুন্দুসী প্রণীত ইয়ানাবীউল মাওয়াদ্দাহ্, পৃ. ৪৪৯

২৮১. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩০৭

২৮২. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৬৩

২৮৩. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৭

২৮৪. ইবনে হাম্মাদ, পৃ. ৮৬

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২৮৬. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর নব্য স্বাধীন মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ : আজারবাইজান, নাখজাভান, তুর্কমেনিস্তান, কিরকিযিস্তান, কাজাখিস্তান, উযবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান ।

২৮৭. তখন তা সোভিয়েত শাসনাধীন ছিল। বর্তমানে এ নগরীটি স্বাধীন মুসলিম প্রজাতন্ত্র উযবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

২৮৮. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২২৪

২৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

২৯১. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৫৮

২৯২. অর্থগত মুতাওয়াতির হাদীস বলতে ঐ হাদীস ও রেওয়ায়েতকে বোঝায় যা বহুসংখ্যক রাবী কর্তৃক শাব্দিক ভিন্নতা ও শব্দগত পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীসগুলোর অর্থের দিকে দৃষ্টি দিলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হাদীসগুলোর মূল অর্থ সে হাতীতভাবে মাসুম অর্থাৎ নিষ্পাপ ব্যক্তি থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

২৯৩. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬

২৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

২৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

২৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

২৯৭. কারণ তিনি সত্যবাদী ও পরম বিশ্বস্ত।

২৯৮. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৭৮৯

২৯৯. প্রাগুক্ত, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৩৬১

৩০০. ঐ দর্শন ও পর্যবেক্ষণ যা প্রতিনিধিত্ব দাবির কারণ হতে পারে।

৩০১. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৩

৩০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৩০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৩০৫. মিফতাহুল জান্নাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০

৩০৬. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৯১

৩০৭. প্রাগুক্ত, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ২৫০

৩০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৩০৯. বিহার, ১৩ খণ্ড, পৃ. ১০১

৩১০. বিহার, ৫১তম খণ্ড, আস সাওয়াইক আল মুহরিকাহ্। পৃ. ১৫৮; এবং অগণিত শিয়া- সুন্নী হাদীস গ্রন্থ ও সূত্র ।

৩১১. বিহার, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ২৮১

৩১২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১০

৩১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

৩১৪. শেখ সাদুক প্রণীত কামালুদ্দীন, পৃ. ৬৫৫

৩১৫. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১০

৩১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

৩১৮. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ.৬২ ।

৩১৯. প্রাগুক্ত ।

৩২০. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৩৪

৩২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৩২২. ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮০

৩২৩. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪২ ও ৪৪৩

৩২৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২২১

৩২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

৩২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৩২৭. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৬৭

৩২৮. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩২

৩২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৩৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৩৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৩৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৩৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

৩৩৫. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২১০

৩৩৬. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৩৬

৩৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৩৩৮. এবং ইবনে আবী শাইয়াহ্ খণ্ড১৫, পৃ. ১৯৯

৩৩৯. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পৃ. ৯১

৩৪০. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ১৫৭

৩৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৩৪২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২১৭

৩৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৩৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৩৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫

৩৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৩৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৩৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

৩৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৩৫০. বিহার খণ্ড৫২, পৃ. ৩৩৪; অবশ্য আরেকটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তার আগে তার আহলে বাইতের কাছ থেকে তারা যা প্রত্যক্ষ করবে সে কারণে ।

৩৫১. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩০৮

৩৫২. বিহার, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ১১

৩৫৩. প্রাগুক্ত ।

৩৫৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৪২ তাফসীর- ই আইয়াশী থেকে উদ্ধৃত ।

৩৫৫. ইবনে মাইসাম বাহরানী প্রণীত নাহজুল বালাগার ব্যাখ্যা ।

৩৫৬. ইয়াওমুল খালাস, পৃ. ২৬৭, কোন উৎস উল্লেখ ছাড়াই ।

৩৫৭. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ.৩৩০ ।

৩৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১ ।

৩৫৯. প্রাগুক্ত, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ১২ ।

৩৬০. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৯১ ।

৩৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪ ।

৩৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০ ।

৩৬৩. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৮ ।

৩৬৪. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৭৫ ।

৩৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪ ।

৩৬৬. সূরা হাশর : ১৩- ১৪ ।

৩৬৭. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ.৯৬ ।

৩৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭ ।

৩৬৯. মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ১২৩ ।

৩৭০. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ.৯৭ ।

৩৭১. আত তাজুল জামে লিল উসূল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬ এবং আহমদ, ২য় খণ্ড পৃ. ৪১৭ ।

৩৭২. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২৫৬ এবং এ হাদীসটি বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসবেত্তাও বর্ণনা করেছেন; সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬, হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণের অধ্যায়।

৩৭৩. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ.১৬২

৩৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৩৭৫. ইবনে হাম্মাদ প্রণীত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৪২

৩৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৩৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

৩৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৩৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৩৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৩৮১. এ কালব গোত্র হবে সুফিয়ানীর সাহায্যকারী যাদেরকে ইমাম মাহদী (আ.) সুফিয়ানীকে হত্যা করার পর শাস্তি দেবেন।

৩৮২. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৫৮, তূসীর গাইবাত (অন্তর্ধান) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ।

৩৮৩. ইলযামুন নাসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫

৩৮৪. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৫১; বিহারুল আনওয়ার থেকে উদ্ধৃত

৩৮৫. আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, ৬৪তম খণ্ড

৩৮৬. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৩৬

৩৮৭. ইবনে আরাবী প্রণীত ফুতূহাতে মাক্কীয়াহ্ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৯৭

৩৮৮. নুমানী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ১২৭

৩৮৯. শারহু নাহজিল বালাগাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮

৩৯০. নুমানী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ১২১

৩৯১. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ২১৮

৩৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩৯৩. প্রাগুক্ত, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩

৩৯৪. সূরা কাহাফ :৬৫ ।

৩৯৫. সূরা তাওবাহ : ৩৩ ।

৩৯৬. বাহরানী প্রণীত আল মাহাজ্জাহ, পৃ. ৮৬ ।

৩৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭ ।

৩৯৮. বাহরানী প্রণীত আল মাহাজ্জাহ, পৃ. ৮৬ ।

৩৯৯. বিহার ৫২তম খণ্ড, পৃ. ১৯১

৪০০. তাফসীরে আইয়াশী, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৬ ।

৪০১. প্রাগুক্ত ।

৪০২. রওযাতুল কাফী, পৃ. ২৮৭ ।

৪০৩. সিজদাহ : ৫৩ ।

৪০৪. তাফসীরে আইয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩ ।

৪০৫.বায়ান- ই শাফিয়ী, পৃ.১২৯ ।

৪০৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩ ।

৪০৭. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ.৭৮ ।

৪০৮. আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ৬৬ ।

৪০৯. শারহু নাহজিল বালাগাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬ ।

৪১০. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ.৩৫২ ।

৪১১. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৯৭ ।

৪১২. আল কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১২ ।

৪১৩. শেখ সাদুক প্রণীত কামালুদ্দীন, পৃ. ৩৩১ ।

৪১৪. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৬৮

৪১৫. প্রাগুক্ত, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৫১

৪১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

৪১৭. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৮

৪১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৪১৯. সূরা বাকারাহ্ : ২১৩ ।

৪২০. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৯ ।

৪২১. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ১৯১ ।

৪২২. বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ১৮৫ ।

৪২৩. বিহার, ৫৬তম খণ্ড, পৃ. ৪৯ ।

৪২৪. কাশফুল গাম্মাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫০ ।

৪২৫. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৮

৪২৬. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬

৪২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৪২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

৪২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৪৩০. শেখ সাদুক প্রণীত কামালুদ্দীন, পৃ. ৫৬৫

৪৩১. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩২৭

৪৩২. নুমানী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ৩১৯

৪৩৩. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩২১

৪৩৪. শেখ তুসীর গেইবাত, পৃ.২২৯

৪৩৫. বিহার, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ৫৬৫

৪৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০

৪৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

৪৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৪৩৯. প্রগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৪৪০. প্রগুক্ত

৪৪১. শেখ তূসী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ১৩ এবং ইবনে হাজার প্রণীত সাওয়াইক, পৃ. ১৫৮

৪৪২. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৮

৪৪৩. নাহজুল বালাগাহ, খুতবা : ১০০

৪৪৪. প্রাগুক্ত, খুতবা : ১৩৮

৪৪৫. প্রাগুক্ত, খুতবা : ১৮২

৪৪৬. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ২১৯- ২২২

৪৪৭. সাওয়ায়িক আলমুহরিকাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২০

৪৪৮. আহলে সুন্নাতের নিকট ইমাম মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; এরপর তিনি ইবনে হাজার) ইমাম মাহদী (আ.) সংক্রান্ত আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করেন ।

৪৪৯. আহলে সুন্নাতের নিকট মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১ ও ৩০২

৪৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

৪৫১. আহলে সুন্নাতের নিকট মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ.১৯৬

৪৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৪৫৩.আহলে সুন্নাতের নিকট মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ.১৭৪

৪৫৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৫২

৪৫৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৫২

৪৫৬. প্রগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৪৫৭. আহলে সুন্নাতের নিকট মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৪

৪৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮- ১৬০

৪৫৯. আহলে সুন্নাতের নিকট মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ.২১০- ২১৪

৪৬০. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৮- ৩৯১

৪৬১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৪- ১৯৫

৪৬২. প্রাগুক্ত, পৃ.৬২

৪৬৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪

৪৬৪. আহলে সুন্নাতের নিকট মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৩

৪৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬- ১০৭

৪৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮০- ৫০৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়. 11

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব কালের সার্বিক চিত্র 12

দ্বিতীয় অধ্যায় 32

মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ফিতনা ও গোলযোগ সৃষ্টি 33

তৃতীয় অধ্যায় 50

রোমানরা এবং আবির্ভাবের যুগে তাদের ভূমিকা 51

চতুর্থ অধ্যায়. 60

ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবকালে তুর্কীদের ভূমিকা. 61

পঞ্চম অধ্যায় 68

আবির্ভাবের যুগে ইহুদীদের ভূমিকা 69

ইহুদী জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 86

ষষ্ঠ অধ্যায়. 104

আরব জাতি ও আবির্ভাবের যুগে তাদের ভূমিকা 105

বিশ্বব্যাপী ফিতনা ও শামের ফিতনা 114

সপ্তম অধ্যায়. 130

সুফিয়ানীর অভ্যুত্থান 131

অষ্টম অধ্যায়. 184

আবির্ভাবের যুগে ইয়েমেনের ভূমিকা. 185

নবম অধ্যায়. 193

আবির্ভাবের যুগে মিশরের ঘটনাপ্রবাহ 194
দশম অধ্যায়. 203
মুসলিম মাগরিব ভূ- খণ্ড এবং আবির্ভাবকালীন ঘটনাবলী 204
একাদশ অধ্যায় 207
আবির্ভাবের যুগে ইরাকের ভূমিকা 208
দ্বাদশ অধ্যায় 250
ইমাম মাহদী (আ.)- এর যুগে বিশ্বযুদ্ধ 251
ত্রয়োদশ অধ্যায়. 258
ইরানী জাতি এবং আবির্ভাবের যুগে তাদের ভূমিকা 259
চতুর্দশ অধ্যায়. 332
শুভ আবির্ভাবের আ ালন 333
আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণ 419
পাশ্চাত্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে 430
পঞ্চদশ অধ্যায় 432
ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশ্বজনীন শাসনের একটি চিত্র 433
ইসলামের পুর্জাগরণ এবং ধর্মের সর্বজনীনতা. 439
হযরত সুলাইমান ও যূলকারনাইনের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও বিশাল সাম্রাজ্য 455
ষোলতম অধ্যায়. 462
শিয়া মাজহাবের দৃষ্টিতে ইমাম মাহদী (আ.) 463
মহান আল্লাহর দরবারে ইমাম মাহদী (আ.)- এর মর্যাদা. 471

ইমাম মাহ্দী (আ.)- এর ব্যাপারে ইমামগণের বাণী 473

ইমাম মাহ্দী (আ.) সংক্রান্ত আহলে সুন্নাতের আকীদা- বিশ্বাস 479

পরিশিষ্ট 510

আহলে সুন্নাতের হাদীস ও মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাহ্দী (আ.) 511

তথ্যসূত্র : 526